অবিস্মরণীয়

প্রথম খণ্ড

১৯৬৪

যুগান্তর—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

'অবিস্মরণীয়' (১ম খণ্ড)—লেখক ও প্রকাশক শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। ৫৯গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

বইটির বিষয়বস্তু হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বীর বিপ্লবীদের অজ্ঞাত কীর্ত্তিকাহিনী। লেখক নিজে বিপ্লবীদের অন্যতম এবং বিপ্লবযুগের কর্ম্মধারার সঙ্গে তাঁর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বিপ্লবীরা 'বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি অসংখ্য যুগের তাঁরা একান্ত সাধন'—এই ভাবধারার একটি সুন্দর প্রমাণালেখ্য বইখানিতে সুপরিস্ফুট। বইটির রচনাশৈলী ও বিন্যাস পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। কেবল লেখনী-নৈপুণ্যের জন্য নয় ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনায় লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয়। বিপ্লবযুগের ইতিহাস হিসাবে আগে হয়ত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে তবু প্রমাণসিদ্ধ তথ্য পরিবেশন করে লেখক তাঁর গবেষণামূলক মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি নিশ্চয় দাবী করতে পারেন। বিপ্লবীদের দুর্লভ আলোকচিত্র ও প্রশস্তি সন্নিবেশিত এই ধরণের বই সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বইটির প্রচ্ছদপটের প্রতীক আকর্ষণীয়। যাঁদের আত্মোৎসর্গে ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল সেই বীর বিপ্লবীদের কথা ও কাহিনী বাংলা দেশে আদৃত হবে বলেই আশা করি। লেখকের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

প্রীতিভাজনেষু,

বছর বছর আমরা বন্যার খবর পড়ি। খবর পাই ক'টা গ্রাম ডুবল ক'জন মানুষ প্রাণ হারাল, ক'টা গরু মরল। তারপর প্রকাশ হয় সরকারী আন্দাজ—কত ফসল নষ্ট হ'ল। যে উদ্দামতায় নদী-কূল ছাড়ায়, যে তাণ্ডব নৃত্যে জলস্রোত প্রধাবিত হয় তার বর্ণনা কেউ লেখে না। লেখে না লিখতে পারে না বলে।

তোমার 'অবিস্মরণীয় ভারত' পড়তে পড়তে বন্যা কল্লোলের ধ্বনি শুনছিলাম। যেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস রচিত হ'বে, বইখানি প্রয়োজনে লাগবে।

একটা কথা মনে হচ্ছিল। যাঁদের কথা আলোচিত হয়েছে, তাঁদের অনেকেরই ফৌজদারী বিচার হয়েছিল। সেই সব মামলার রেকর্ড আজও আছে। সেগুলি পড়ে অনুসন্ধান করলে, হয়তো আরও তথ্য বেরুতে পারে। শ্রীক্ষুদিরামের মামলার রেকর্ড আলিপুরে জেলাজজের খাস কামরায় একটা গ্লাস কেসে সাজান আছে। কেউ পড়েনা।

বইখানি পড়ে ভালই লেগেছে। তোমার ঐতিহাসিক সাহিত্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতি—

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিস্মরণীয়

প্রথম খণ্ড

এক

মনে পড়ে আজও অতীতের আনন্দময় চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি আজও অন্তরের মাঝে তোলে আলোড়ন। উঁকি মারে বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে কত পুরানো দিনের ছবি, কত পরিচিত মুখ, কত কথা, কত স্মৃত বিস্মৃত অমৃতের স্বাদ। এইত সেদিন।

মনে পড়ে সেই শীতের কনকনে অন্ধকার রাতটা। তখন এগারোটা হবে—আমার দাদা এলেন। সঙ্গে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জ্বরে তখন তাঁর শরীর পুড়ে যাচ্ছে—লাঠিতে ভর করে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছেন।

দাদা বললেন "ওরে একটা কাজ করতে হবে—একটা ডাব যোগাড় করতে হবে এখুনি। ইনি খুব অসুস্থ।

বললুম—"বাগানের গাছ থেকে পাড়তে হবে, তা না হলে এত রাতে ডাব পাব কোথায়?" "তাই কর"—বললেন দাদা।

কাজেই সে রাতে চড়তে হ'ল গাছে। দাদা আলো দেখাতে লাগলেন নীচে থেকে। ডাব পাড়া হ'ল। মনে মনে তখন খুবই রাগ হ'ল বৃদ্ধের উপর—এই দারুণ শীতের রাতে তাঁরই জন্যে এত কষ্ট। কে ইনি?

কিন্তু পরক্ষণেই চোখে পড়ল বার্ধক্যের কি প্রশান্ত সৌন্দর্য, কি সৌম্য মূর্তি। চোখ দুটি যেন আশীর্ব্বাদ করছে।

তাই আজ মনের স্মরণীয়াগারে বার বার এই কথাটাই ভেসে উঠছে যে সে রাতের সে দুর্ভোগ আমার জন্ম-জন্মান্তরের বহু সুকৃতির ফল। যাঁর জন্যে আমাকে সে কষ্ট করতে হয়েছিল পরবর্তীকালে তাঁরই হাতে তাঁরই সংস্পর্শে গড়ে উঠেছিল আমার বিপ্লব আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি—কৈশোর ও যৌবনের অসন্দিগ্ধ কর্মপ্রেরণা। তিনিই আমার রাষ্ট্রগুরু, মাতৃমন্ত্রের উদ্গাতা অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশ চন্দ্র ঘোষ। আজীবন ব্রহ্মচারী, সাত্ত্বিক যোগীপুরুষ, মুখে সুগভীর প্রসন্নতার শান্তদীপ্তি, কর্মে অনলস, কর্তব্যে অটল, পাণ্ডিত্যে অসাধারণ, ঔদার্যে অকৃপণ।

১৯০৭ সনের জুলাই থেকে ১৯০৯ সনের অক্টোবর পর্যন্ত হুগলী সরকারী কলেজে করতেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা। ইতিহাস পড়াবার ভারও পড়েছিল তাঁর উপর। গড়ে তুলতেন ছাত্রদের মনোবল—তুলে ধরতেন তাদের সামনে ম্যাৎসিনির মতবাদ, পড়ে শোনাতেন ইতালীর সেই বিপ্লবীর জীবনী। নির্দেশ দিতেন অদূর ভবিষ্যতের কর্মধারার, প্রেরণা যোগাতেন উৎসাহী যুবকদের, সংগঠনের গুরুদায়িত্ব নিতেন নিজের হাতে। অর্জিত অর্থের প্রায় সমস্তটাই ব্যয় করতেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দরিদ্র ছাত্রদের জন্যে। স্নেহ ও শাসনের সমন্বয়ে ছাত্রেরা পেত নতুন জীবন, নতুন অভিজ্ঞতা। উজাড় করে দিতেন বাধাহীন উৎকর্ষময় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের বিপুল ভাণ্ডার।

এ জিনিস গোপন রইল না। কর্তৃপক্ষের চক্রান্তে রাজনৈতিক কারণে ছাড়লেন চাকরি। সমর্থন করলেন না শ্রীঅরবিন্দ। বললেন 'কাজটা ভাল হ'ল না।' তাই নিলেন তাঁরই পরামর্শে আবার দু' একটি বে-সরকারি কলেজে অধ্যাপনার ভার—মানুষ গড়ে তোলবার ঐকান্তিক সাধনা। রাহুর দৃষ্টি সেখানেও—ছাড়তে হ'ল চাকরি।

এর কিছুদিন পর থেকে আরম্ভ হ'ল বন্দী জীবন। অমানুষিক অত্যাচার, অসহনীয় লাঞ্ছনা, বর্বরোচিত শাস্তিতে অস্থিপঞ্জর চূর্ণিত। কারা প্রাচীরের অন্তরালে প্রশান্ত সৌম্য ধ্যানমগ্ন পুরুষ শুয়ে রইলেন সমাধিস্থ হয়ে বহুদিন—অনড় জড় পদার্থ বুদ্ধের মহাশয়ানের মত। রিক্ত বিত্ত উদাসী সন্ন্যাসীর কোথাও যেন প্রাণের উত্তাপ-টুকু নেই। তাঁর ললাটে আছে শুধু কবির ভাষায় 'অবসান রজনীতে দীপবর্তিকার স্থিরশিখা আলোকের আভাটুকু'। ইনিই "আত্মোন্নতি সমিতির" সদস্য আমাদের মাষ্টার মশাই।

চম্‌কে উঠল ইংরেজ সরকার—এ কেমন ধারা মানুষ? দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই ভাবে শুয়ে আছেন—নিরাসক্ত নির্বিকার বাহ্যজ্ঞানহীন ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, প্রকৃতির নিয়মকে হার মানিয়ে। ওরা ত জানে না তখন তিনি নিশ্চেতন হয়েও অতীন্দ্রিয় জগতের মানুষ—সীমাহীন আনন্দলোকের অতিথি। পঞ্চভৌতিক দেহ তখন দেবতাহীন প্রাচীন মন্দিরের বন্ধনহীন শূন্য অতিথশালার ভগ্নাবশেষ। দৈহিক অত্যাচার উৎপীড়ন তাঁকে বিচলিত করবে কেমন করে?

বহুদিন পরে পেলেন মুক্তি। কর্মযোগী পুরুষ আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বলিষ্ঠ মনের জয়যাত্রায়—উৎসাহ উদ্দীপনার মূর্ত প্রতীক্। মৃত্যুবিজয়ীর জটা থেকে নেমে এল অক্ষয় অমৃত স্রোত। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ প্রাচীন গুরুর মত মুক্তিকামী তরুণদের তপোবনে বজ্রমন্দ্রে যেন জানালেন আহ্বান। সে আহ্বান ধ্বনিত হ'ল অন্তরের অন্তরতম মনিকোঠায়। বাংলার ধৈর্যহারা বিপ্লবী তরুণের দল সাড়া দিল সে আহ্বানে—সোৎসাহে মেনে নিল তাঁর নেতৃত্ব, বেছে নিল কর্মপন্থা। দাঁড়াল পাশে এসে নিরলস উৎসাহে মৃত্যুপণ করে—নির্মমলাঞ্ছিত তপস্যায় মুছে ফেলতে হবে অবমাননার কালিমা, দুঃসাহসী যৌবনের তেজে দূর করতে হবে দেশ থেকে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ড পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ—বজ্রবাহুর বিপুল প্রয়াসে কেড়ে

আমার বাবা ছিলেন পরম নির্বিকার পুরুষ। শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায় এমন মানুষ খুব কম দেখেছি। জীবনে দুঃখভোগ করেছেন প্রচুর কিন্তু তার আভাসমাত্র কোনদিন তাঁর মুখে দেখিনি। সহজসামাণ্য সুকঠিন ধৈর্যে চিরদিনই ছিলেন অবিচলিত। কোন কাজেই জোর করে কোনদিন বাধা দেন নি। শুধু ভালো-মন্দর দুটো দিক্ দেখিয়ে দিয়েছেন। পিতৃস্নেহচ্ছায়ার রমনীয় পরিবেশে কেটেছে আমার প্রথম কৈশোরটা।

আমার মাকে খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে। শুনেছি তিনি খুব রাশভারি ছিলেন। আমার দাদারা তাঁর কাছে কড়া শাসনে মানুষ হয়েছিলেন। আমার বয়েস যখন চার বছর তখন মা মারা যান। আমিই তাঁর শেষকৃত্য করি। যেদিন মা মারা গেলেন সেদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে আমার দাদা ইন্দ্রনারায়ণকে বললুম "মা যেখানে আছেন আমি জানি। চল দু'জনে গিয়ে মাকে ফিরিয়ে আনি। বলব ভারি মন কেমন করছে তা হলেই মা চলে আসবেন।"

ভয় বলে কোন জিনিস কোনদিনই ছিল না। তাই সে রাতে দু'জনে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ী থেকে। মা মারা যান আমার মামার বাড়ীতে। দুজনে চলেছি গ্রামের বাইরে শ্মশানের দিকে। গ্রামের শেষ প্রান্তে আমার এক দূর সম্পর্কের মামার বাড়ী। তিনি রাত্রে বাইরে উঠে দেখেন দুটি ছোট ছেলে মাঠের উপর দিয়ে চলেছে। জ্যোৎস্নারাতে তাদের ঠিক চেনা যাচ্ছে না বটে—তবে তারা যে নিতান্ত ছোট তা বোঝা যাচ্ছে।

মামা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলেন আমরা দু'ভাই চলেছি মায়ের খোঁজে। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন "কোথায় যাচ্ছিস ?" উত্তর দিলুম "মায়ের জন্যে মন কেমন করছে, সারাদিন মাকে

দেখিনি তাই ইচ্ছা হ'ল মাকে ফিরিয়ে আনি।" শিশু মনের সরল অভিব্যক্তি।

তিনি অনেক বুঝিয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এলেন—রাখলেন সে রাতটা নিজের কাছে। অন্ধ-বিশ্বাসের মোহ ভাঙ্গতে অনেক দেরী হয়েছিল। ছেলে বয়েসের অন্ধ-বিশ্বাস, অসংযত কল্পনাবৃত্তি যুক্তি তর্ক মানে না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিরচঞ্চল মনের বাসনা কামনার পরিবর্তন—পৃথিবী চিরদিন তাই এত বিচিত্র। বিশ্বাস ও ইচ্ছাই বিধাতার ঐশ্বর্য—সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথা। বিমূর্ত বিশ্বাসের মূলেই মানুষের ঐতিহ্য। সে দিনের সেই মাতৃঅন্বেষণ হয়ত কুঁড়ির মধ্যে নিত্যবিকাশমান ফুলের প্রয়াসের মত পরবর্তী জীবনে চিনিয়েছিল আর এক মা'কে উপলব্ধির প্রথম অভিজ্ঞান। চিনেছিলুম উদয়দিগ্বলয়ে দেশমাতৃকাকে—তাই তার স্বাধীনতা অর্জনের পথে মনকে করেছিল চরম আকর্ষণ, দিয়েছিল নব জাগরণের পরিচয়। অনুদ্‌ঘাটিত হৃদয় মুকুলটি কখনও অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনবা শ্রাবণের দাক্ষিণ্যে দুঃসাধ্য সেবাব্রত ও দুরন্ত আনন্দের অপরূপ আলোয় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল দিশেহারা অনির্দিস্ট—বৈদেহী বাসনার অন্তর্গূঢ় আকাঙ্খায়।

সেদিন দেশকে হয়ত এমনি করেই ভালবেসেছিলুম আমার সর্বদেহমনে অপরিসীম আনন্দে। সেই কুয়াসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের নব চেতনার প্রথম সূর্যোদয়ের আলো আজ যেন অমাবস্যার দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বিরহে কোথায় মিলিয়ে গেছে। সেদিন ছিল আমার অন্তরলোকের সুপ্তআত্মার জাগরণ—আর আজ বিলুপ্ত জীবনের গণ্ডী ছেড়ে তা' কোন্ পথের ধূলায় নৈরাশ্যের তীব্র বেদনায় মলিন হয়ে গেল? সেদিনের সে তরুণ মন, সে অপরিচিত অপরীক্ষিত ভবিষ্যতের আকাঙ্খা, সে আবেগময় কর্ম প্রচেস্টা মনে হয় অনাচ্ছন্ন কালের বিবর্তিত স্বপ্নের মতই ক্ষয়িষ্ণু। স্বাধীনতার এ রূপ ত আমরা কল্পনা করি নি। কোথায় সেই

দ্বন্দ্বসংঘাতময় মানুষের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—নবজীবনের সঙ্গত উপকরণ—চিত্তের জাগরণ, আত্মমর্যাদার আনন্দ, প্রাণের লীলা, বৈচিত্র্যের অজস্রতা, সমাপ্তির পূর্ণতা? বিষাদকরুণ অতীতের স্মৃতি কখনও মুছবে না, পথভ্রষ্ট বর্তমানের দুঃখও কোনদিন ঘুচবে না, অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকারও আলোকিত হবে না। যাক্ যা' বলতে চেয়েছিলুম।

দাদার কর্মপ্রচেষ্টা বহুমুখী। তিনি বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন, অজ্ঞাতবাসে দিন কাটান। কাজের পরিধি চট্টগ্রাম থেকে লাহোর। কদাচিৎ বাড়ী আসেন তাও অল্প সময়ের জন্যে। কাজেই সংসার ব্যাপারে তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মেজদা পিসীমার বাড়ী কলকাতায় মানুষ হচ্ছেন। আর আমরা দু'ভাই চুঁচুড়ায় বাবার কাছে। সূত্রছিন্ন মালার মত সমস্ত সংসারটা ছিটকে পড়েছে চারিদিকে। এমনি ভাবেই মানুষ হয়েছি।

আজ মনে পড়ে বৈপ্লবিক কর্মধারার কাল-বিধৃত চেতনার প্রতিফলনে রঙিণ কৈশোরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মৌল পরীক্ষা ও নিরীক্ষার দিনগুলি। মৃত্যুর জন্যে সব সময়ে তৈরী থাকার সে কি দুঃসাধ্য সাধনা। কর্মে আনন্দই তখন অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিচয়। মনে হ'ত এ উৎসাহ, এ উদ্যম, এ স্পর্ধা কাল-তিরোহিত চিন্ময়ীশক্তির এষণা—প্রাণের কেন্দ্র থেকে প্রকাশমান। হৃদয়াবেগের প্রমত্ততায় স্বপ্নের মত সে দিনগুলো আজও মনে পড়ে। সে দিন বিপ্লবের আদর্শ মাথায় ঢুকিয়েছিল দেশ-জননী জগৎজননীর বরাভয় মৃণ্ময় মূর্তি। গীতার জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্বের মধ্য থেকে পেয়েছিলুম সংসার-কুরুক্ষেত্রে পাপ-পীড়িতের একমাত্র শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ধর্ম ধর্মযুদ্ধ; মুক্তির উপাস্য কর্তব্য নিরাসক্ত নিষ্কাম কর্ম বিশুদ্ধ প্রেম—জয়পরাজয়ের প্রশ্ন অবান্তর। চণ্ডী ও গীতার পথই একমাত্র পথ—জন্ম-মৃত্যুরপ্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র। সেই সংগতি

ও অসংগতির মধ্যে মনের গভীরতম উপলব্ধির পথের সন্ধানে শক্তির নিরলস উদ্যমে, আত্মদানযজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে, সর্বস্ব সমর্পণের পরমৈশ্বর্যে যাঁরা পথ দেখিয়ে আমাকে কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে আশ্চর্যনৈপুণ্যে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন—দেখিয়েছিলেন মৃত্যুর সামনে অফুরাণ হাস্যধারা, তাঁরা বিপ্লবধর্মে দীক্ষিত, প্রাণশক্তিতে আচ্ছন্ন আবৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দুর্গমপথে, দুঃসহদুঃখে, তাঁদের কর্মপ্রবাহ, তাঁদের মহত্তর ত্যাগের আদর্শ, নিঃসন্দিগ্ধ বিচিত্রতর জীবন-সর্ববস্ব পণ, বিকশিতমাধুর্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনা, মৃত্যুফেনিল প্রাণের উচ্ছাস, আমাকে একদিন ঘর থেকে নিঃশব্দ গতিপথে কারাপ্রাচীরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁদের আজও জানাই চরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। জীবনের গূঢ়তম মজ্জার মধ্যে অলক্ষ্য অপ্রজ্জ্বলিত অগ্নিসঞ্চয়ের সাধন-লব্ধ ঐশ্বর্যের সুখ-দুঃখ-বিজড়িত অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

তিন

মাস্টারমশাই রয়ে গেলেন কয়েকটা দিন আমাদের বাড়ীতে। তাঁর সম্বন্ধে তখন বিশেষ কিছুই জানি না। স্বল্পভাষী মানুষটিও কিছু বলেন না। তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোন আলোচনা পচ্ছন্দ করতেন না—আত্মপ্রচারে নিতান্ত অনীহ। শুধু দাদা বলে গেছেন "এঁকে দেখিস্"—সেটুকুই যথেষ্ট। কোন প্রশ্ন নেই, কোন জিজ্ঞাসা নেই। কি এক অজ্ঞাত প্রেরণা জলবায়ুর মত সহজে কাজ করিয়ে নেয়। একদিন মুখে মুখে বললেন সন্ন্যাসী ও সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস। আর একদিন বললেন মারাঠাদের বীরত্বের গৌরবময় ঐতিহ্য। এমনি করে শুনে গেলুম কেমন করে ১৭৬৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বাংলার পঞ্চদশ সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ দমনে

তিনজন নেতা শ্রীরঘুনাথ সিং, শ্রীউমরাও গড় ও জনাব ইউসুফ খাঁকে কামানের মুখে বেঁধে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ উড়িয়ে দিয়েছিলেন—অপরাধ অনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে অকর্তব্য পালনে অস্বীকার। বলে গেলেন মীরকাসিম, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, নানা সাহেব, দৌলতরাও, ধুন্দিয়া বাগ, তীতুমীর, উজীর আলি ও রানাডের অপ্রকাশিত জীবনকাহিনী, ওহাবি আন্দোলন, কুকা ও মনিপুর বিদ্রোহ ও চাপেকার ভ্রাতৃগণের আত্মোৎসর্গের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ। বললেন বাসুদেব বলবন্ত ফড়কের অদ্বিতীয় শৌর্যের জীবনসংগ্রাম। শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত এই তরুণ দেশের স্বাধীনতার জন্যে সৈন্যদল তৈরী করে ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৭৯ পর্যন্ত দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের জেলায় জেলায় নিঃসংশয়ে চালিয়ে যান বিদ্রোহ। ইংরেজকে ব্যঙ্গ করে ঘোষণা করেন যে বোম্বাইয়ের গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পেলের মাথা আনতে পারলে দেওয়া হবে নগদ পাঁচশ টাকা পুরস্কার। পুণার আশে পাশে তাঁর বিদ্রোহী অনুচরদের দ্বিধাহীন দৌরাত্ম্যে ইংরেজ হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। শেষে হায়দারাবাদের কালাদ্গিগ্রামের এক মন্দির থেকে ১৮৭৯ সালের ৩রা জুলাই পূজানিরত তাঁকে গ্রেপ্তার করে অকথ্য নির্যাতনের পর সারাজীবন শৃঙ্খলিত অবস্থায় এডেনে বন্দী করে রাখা হয়। পরাস্ত হয়েও পরাভব স্বীকার করবার লোক তিনি নন—কবির ভাষায় "পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলে ঝঙ্কারিয়া।" সেই অবস্থায় পালিয়ে যান জেল থেকে। অন্তরের নিবিড় বেদনার ভেতর দিয়েই মাতৃসাধনা অভাবনীয়রূপে বিচিত্র হয়ে উঠে। অপূর্ণতার মাঝেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। আবার ধরা পড়ে জেলের মধ্যেই ১৮৮৩ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর একদিন বললেন ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডীর কাহিনী ও ব্যাণ্ডিয়েরা ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মত্যাগের কথা—মৃত্যুর অঙ্গনে যারা শোধ করে বিধাতার দেনা। হয়ত তখন ভাল বুঝিনি কিন্তু

শুনে মনের মধ্যে তাঁদের মত হবার ইচ্ছে জেগেছিল—সেইটেই মনে আছে—বহুদিনের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।

আর একদিন আমাদের কোন প্রশ্নের উত্তরে বললেন তাঁর চাকরি জীবনের কথা। হুগলী কলেজের খেলার মাঠে নতুন এসেছে বিদেশী সার্কাস পার্টি ব্যবসা করতে। কলেজের ছেলেরা কোন রকম সঙ্গত সুবিধা পাচ্ছে না। তাঁদেরই খেলার মাঠে সার্কাস হচ্ছে অথচ তাঁদের জন্যে কোন কন্‌সেসন নেই। ছাত্রেরা তাঁদের দুঃখের কথা জানালেন তাঁদের প্রিয় অধ্যাপক মাষ্টার মশাইকে। তিনি তখন হোষ্টেল সুপারিণ্টেডেণ্ট। তিনি বললেন "তোমাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিতে পার না?" ইঙ্গিত পাবামাত্র উৎকণ্ঠিত অধৈর্য ছাত্রের দল বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙ্গে মারামারি করে ঢুকে পড়ল সার্কাস দেখতে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বিদেশী কোম্পানী করল অভিযোগ ছাত্রদের বিরুদ্ধে। বললে "হোষ্টেলের ছেলেরা এ গুণ্ডামী করেছে।"

অধ্যক্ষ এলেন তদন্তে। ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্যি কিনা?" মাষ্টার মশাই দাঁড়িয়ে আছেন অধ্যক্ষের চেয়ারের পেছনে। ছাত্রদের মঙ্গলের জন্যে তাঁর প্রাণ অস্থির। তিনি ছাত্রদের মুখে বললেন "সত্যি কথা বলো।" কিন্তু আঙ্গুল নেড়ে নিষেধ করলেন। অধ্যক্ষের চোখের চশমায় তাঁর আঙ্গুলের ছায়া ধরা পড়তেই তিনি পিছন ফিরে তাকালেন—তখনও মাষ্টারমশাইয়ের হাতের আঙ্গুল নড়ছে। অধ্যক্ষ বললেন "আপনার বিরুদ্ধে সরকারের কাছ থেকে যে সমস্ত অভিযোগ আসছে তা তা'হলে সত্যি।" কাজেই সমস্ত দায়িত্ব প্রকারান্তরে এসে পড়ল তাঁর উপর—ছাত্রেরা গেল বেঁচে।

১৯০৯ সাল। চুঁচুড়ায় প্রাদেশিক কনফারেন্স। মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রকট। অভ্যর্থনা সমিতির মনোনীত সভাপতি উত্তরপাড়ার শ্রীরাজেন্দ্র লাল

মুখোপাধ্যায়—মিছরী বাবু। তিনি চরমপন্থীদলের লোক কাজেই তাঁকে বাধাদেবার জন্যে অপরপক্ষ বদ্ধপরিকর। সেই কনফারেন্সে শ্রীঅরবিন্দ যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। আমাদের মাষ্টারমশাই অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের আন্তরিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনদর্শন ও সাধনায় সেদিন একটি সুন্দর রূপের আবির্ভাব।

৬ই সেপ্টেম্বর—মাষ্টারমশাইয়ের কর্মজীবনে দেবতার আনন্দের মত এক অপূর্ব শক্তির চিন্ময় প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ উপরোধে কান না দিয়ে কলকাতা থেকে আসছেন কনফারেন্সে, কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে। তাঁদের অভ্যর্থনা করে ষ্টেশন থেকে বিরাট শোভাযাত্রায় আনা হবে ডাচভিলায় শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল মশায়ের বাড়ী। সে শোভাযাত্রায় যোগদানকারী প্রায় পাঁচহাজার তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ষ্টেশনে উপস্থিত। মাষ্টারমশাইও একজন সেবক কর্মী হিসেবে সেখানে গেছেন।

প্লাটফর্মে গাড়ী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সকলে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে শ্রীঅরবিন্দের কামরার সামনে এগিয়ে গেলেন। মাষ্টারমশাই তাঁর বিশেষ পরিচিত বলে সবার আগে তাঁকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর মধ্যে এক বিরাট মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ। তিনি যেন সেই অনন্তের কাছে নৃত্যহারা শান্ত নদীর মত আত্মনিবেদন করছেন। মাষ্টার মশাই শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষাপ্রাপ্ত—আর সাধনার দিক থেকে প্রাণায়াম, কুম্ভক, আংশিক সমাধি অভ্যেস করা ছিল তাঁর নিত্যকার কর্ম। শ্রীঅরবিন্দ তা' জানতেন। সেই অপরূপ নিঃসঙ্গের আহ্বানে তিনি তাড়াতাড়ি প্লাটফর্মের একপাশে বসে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল যেন তিনি এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী। তাঁর মধ্যে এক অভূতপূর্ব সুচিরবাঞ্ছিত বর্ণ-সমারোহদীপ্ত আনন্দের বন্যাধারা প্রবাহিত ও দাক্ষিণ্যের নব

বৈচিত্র্যে অসীমের মাঝে গিরিশিখরের পাগলা ঝোরার মত মুক্ত প্রবাহিণী বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এদিকে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী যথারীতি শ্রীঅরবিন্দকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওভারব্রীজ পার হয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। পড়ে রইলেন মাষ্টারমশাই একা। তখন তাঁর সামনে এক বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন নিঃসীম বিস্ময়ের রহস্যময় দৃশ্যপট উন্মুক্ত হয়ে গেল। সমস্ত ভেতরটা যেন এক অনির্বাণ দীপ্তিময়ী তীব্র জ্যোতিতে গেল ভরে। তড়িৎশক্তির স্পর্শে অন্তরাত্মার মাঝে এক অনবদ্য প্রাণস্পন্দনের অনির্বচনীয় প্রবাহের আমন্ত্রণ—জ্যোতির্ময় লীলা-পারাবার। তাঁর মনে হ'ল তখন তিনি অন্য এক অনাত্মীয় জগতের অজ্ঞাতপরিচয় মানুষ—সামনে এক অভিনব দিব্যজগৎ মূর্ত হয়ে তাঁর অন্তর বার সব একাকার করে দিয়েছে—অনন্তের বিরাট স্পর্শে তিনি শূন্যে উঠে যাচ্ছেন। সেই অপরূপ ছন্দের জগতে কোন প্রতিরোধ নয়, অন্তরের উটজপ্রাঙ্গণে শুধু আত্ম-সমর্পণ। তিনি দেখলেন দিব্য বায়ব্য শ্মশ্রুধারী পল্টনবাহিনী তাঁকে কাঁধে করে ওপারের প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিচ্ছেন—আর তখন একটি বাণী বিশ্বের প্রাঙ্গণ থেকে প্রকট হয়ে তাঁর এল "জ্যোতিষ পরীক্ষার জন্যে দেখে নিয়ে স্মরণ রেখো তুমি শূন্য থেকে ষ্টেশন ছাড়িয়ে ফুটপাতে নামছ। এখনও তোমার পা মাটি থেকে দু'হাত উঁচুতে।" তিনি সেটি দেখে নিয়ে বুঝলেন যে শূন্যে বায়ব্য রাজ্যের যেকথা শোনা যায় তা' ঠিক। তাঁরা কে বা কারা তাঁর জানা নেই তবে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হলো এ আর এক জগতের খেলা—ওতঃপ্রোতভাবে সূক্ষ্মদেহে আলোআঁধারের আনন্দবিপ্লবে আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন এবং নব নব পরিচয়ে ইচ্ছেমত আত্মপ্রকাশ করছেন—। আর মানুষের জীবনে প্রচণ্ড দৈবীশক্তি ও বিপুলবীর্য পুরুষাকার নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে জগতকে নানাদিকে চালিত করছেন। নিশ্চিন্ত হওয়া বা

দুর্ভাবনার চাপে অভিভূত হওয়া বুঝিবা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাধীন—অসংকোচ অধিকার। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সেই স্মরণীয় উৎসর্গপত্রের বাণী তাঁর মনে পড়ল—"স্বর্গে ও মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে লোক এসে হাজির। বললেন "আসুন আপনাকে ডাকছেন। আপনার জন্যে সকলে দাঁড়িয়ে আছেন।" তিনি শুনলেন ষ্টেশনের রাস্তা শেষ করে বাঁদিকে অমরপুর সুগন্ধ্যার পথ ছেড়ে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ডানদিকে রাস্তা নেবার আগে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—"জ্যোতিষবাবু পড়ে রইলেন—তাঁকে নিয়ে এস।" মাষ্টারমশাইকে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের গাড়ীতে তুলে দেওয়া হ'ল। কি ব্যাপার হয়ে গেল তা' কেউ জানলেন না। অধ্যাত্মচেতনায় পূর্ণবিশ্বাসী গুরুশিষ্য শুধু একবার মুখ চাওয়াচায়ি করলেন।

ডাচভিলার বৈঠকখানা ঘরে শ্রীঅরবিন্দ আর তাঁর সঙ্গীদের বসানো হয়েছে আর মাষ্টারমশাই পাশের একটি ঘরে বসেছেন। প্রায় পনর মিনিট পরে কংগ্রেস কমিটির অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মাস্টারমশাইকে এসে বললেন "আপনাকে অরবিন্দবাবু একবার ডাকছেন।" তিনি সে ঘরে গিয়ে দেখলেন তাঁরা দু'জন ছাড়া অন্য কোন লোক সেখানে নেই।

তখন তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভের যে কল্যাণময় প্রকাশ,—যে সৌন্দর্যের নিমন্ত্রণ—সমাধির সেই আশ্চর্য আনন্দের উপলব্ধি হ'ল। এক অপরিম্লান দিব্য আলোকস্রোত তাঁর ভেতর ঢুকে পড়ল আর তাঁর সমস্ত ভেতরটা জ্যোতিতে দীপ্যমান হয়ে উঠল। তিনি বসে পড়লেন।

শ্রীঅরবিন্দ তখন তাঁকে অপর্যাপ্তরূপে সার্থক শুদ্ধবেদী উপলব্ধি করে তাঁর মধ্যে শ্রীশ্রীমাকে প্রকট করে নামিয়েছেন। তিনি দিব্য-—বালকরূপে মাষ্টারমশাইয়ের সামনে নতজানু হয়ে কাতরবেদনা জানালেন, বললেন "মা আমি জগতের দুর্ভাবনায় একেবারে অভিভূত

কি করবো মা?"

মাষ্টারমশাইয়ের ভেতর থেকে শ্রীশ্রীমায়ের উত্তর এলো "আমি সব ভার নিয়েছি, তোমার এত ভাবনা কেন?" শ্রীঅরবিন্দের মুখ থেকে বালক শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি বেরিয়ে এলো "আমি আর ভাববো না।" তারপর সেই আশ্চর্য মহাশক্তির অপরূপ আলোর প্রবাহ চারদিকে সঞ্চারিত হয়ে মহানিষ্ক্রমণের পথে বেরিয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে এই উপলব্ধির ভাবাবেশ শেষ হয়ে গেল।(১) সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী জেনে তাঁরা দু'জনে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। 'দিব্যপুরুষের নির্মুক্ত চেতনায় বৈচিত্র্যের শেষ নেই—আত্মারও সামর্থ্যের অন্ত নেই।'

পরের দিন কনফারেন্সে মাষ্টারমশাই কুখ্যাত রিজলীসার্কুলার অমান্য করে ছাত্রদল নিয়ে ঢুকে পড়লেন। গোন্দলপাড়ার নরেনদা শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় কৌশলে শ্রীসুদর্শন চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় আগে হতে কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ে জায়গা দখল করে নিলেন। টিকেটের ব্যবস্থা ছিল। তাই নরেনদা মাষ্টারমশাইয়ের পরামর্শে আগে থেকেই অনেকগুলি টিকিট ভিন্ন ভিন্ন লোক দিয়ে কিনে ফেলেন। সভায় এঁদেরই প্রাধান্য হয়ে গেল। কিন্তু হুগলী কলেজে এ নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি বসল। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে ছাত্রদের নিয়ে সম্মেলনে যোগদেবার মূলে মাষ্টারমশাই। বরখাস্ত করবার আগে ছাড়লেন তাঁর চাকরি —শুধু দু'জন ছাত্রনেতার হ'ল জরিমানা পাঁচ টাকা করে।

এর বছর দুই পরে ১৯১১ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী মাষ্টার মশাইয়ের একান্ত অনুগত শিষ্য ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোটভাই শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর অত্যাচারী পুলিশ অফিসার শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে দিয়ে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য শেষ করার ভার পড়ে। শ্রীচক্রবর্তী সন্ধ্যের

(১) অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের ডায়েরী থেকে।

সময় অফিস থেকে এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শিকদারবাগান ষ্ট্রীটে তাঁর বাসায় ফিরছিলেন এমন সময় পিছন দিক থেকে বুলেট এসে তাঁর পিঠে লাগে। কাছেই ছিল তাঁর কাকার ডাক্তারখানা স্থূলবপু শ্রীচক্রবর্তী ছুটে গেলেন কাকার কাছে—কাকাও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মেডিক্যাল কলেজে কিন্তু তাঁকে আর বাঁচানো গেল না। ননীদা কাজ সেরে নির্বিঘ্নে চলে এলেন। এ দুর্ঘটনার পর যখন ননীদা আত্মগোপন করে আছেন তখন অন্য এক পুলিশ অফিসার মিঃ ডেনহ্যামকে মারবার প্রশ্ন ওঠে। জীবনের আয়োজনে ননীদার ভাণ্ডার তখন ঐশ্বর্যে পূর্ণ। তিনি সানন্দে এগিয়ে এলেন এ কাজের ভার নিয়ে। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে নরেনদা অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে বোমা এনে দিলেন এবং ননীদাকে সাহস দেবার জন্যে সঙ্গে গেলেন। ননীদা বোমাটা রাইটার্স বিল্ডিংএর সামনে মিঃ ডেনহ্যামের গাড়ীতে ফেললেন কিন্তু দৈবক্রমে সেটা ফাটল না। দূর থেকে একজন কনেষ্টবল দেখতে পেয়ে ছুটে আসায় ননীদা ধরা পড়ে গেলেন। সে গাড়ীতে মিঃ ডেনহ্যাম ছিলেন না ছিলেন মিঃ কাউলে। তিনি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। একটু পরেই বোমা দেখে গাড়ী থেকে প্রাণভয়ে নেমে পড়লেন। নাবালক ননীদা ধরা পড়ে নির্যাতনের মাঝে, অসমাপ্ত আকাঙ্খার অপূর্ণতায় রইলেন অবিচলিত। শেষ পর্যন্ত চোদ্দ বছরের দ্বীপান্তরের দণ্ড নিয়ে চলে গেলেন আন্দামান। আর সেই ব্যাপারে সন্দেহে ধরা পড়লেন মাষ্টারমশাই, নরেনদা ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ। কয়েক দিন হাজতবাসের পর মাষ্টারমশাই পেলেন মুক্তি কিন্তু দুজন পুলিশের লোক সব সময়ে তাঁর পিছনে লেগে রইল। তিনি প্রথমে বাঁকুড়া ওয়েসলীয়ান মিশন কলেজে অধ্যাপনার ভার নিলেন কিন্তু সরকারের তাড়নায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাখতে সাহস পেলেন না। কিছুদিন করলেন রিপন কলেজে চাকরি, সেখানেও ঐ একই ব্যাপার।

ইতোমধ্যে অনুচর পুলিশ দু'জনের উপর বিরক্ত হয়ে মাষ্টার মশাই প্রতিদিন পনর ষোল জন ছাত্র নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দশ বারো মাইল পথ মার্চ করে যাওয়া ও ফিরে আসা আরম্ভ করলেন। পুলিশের লোকদু'টি একদিন কাতর হয়ে অনুনয় করে জানালেন যে তাঁরা গরীব মানুষ পেটের দায়ে নোকরি করতে এসেছেন— এভাবে বিনা কাজে খাটানো আর কষ্ট দেওয়া মাষ্টারমশায়ের মত মহানুভব লোকের উচিত নয়। তাঁদের কাতরতা দেখে মাষ্টার মশাই সেটা বন্ধ করে দিলেন। পরে কাজ নিলেন একটি বে-সরকারি স্কুলে।

মাঝে মাঝে আমাদের পীড়াপীড়িতে মাষ্টারমশাই বলতেন দু'একটা পুরানো দিনের কথা। ১২৯১ সনে ২৭শে অগ্রহায়ণ তাঁর জন্ম। পিতা শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ ছিলেন বর্ধমান জেলার দণ্ডপাড়া গ্রামের অবস্থাপন্ন জমিদার। ছেলেবেলা থেকেই তিনি যেমন মেধাবী, ভগবতপ্রভাব অধ্যুষিত আত্মউন্মীলনে ও ধর্মের অনুশীলনে তেমনি ছিলেন আগ্রহী। তখন তাঁর বয়েস মাত্র আট ন'বছর হবে—দেওয়ালের টাঙ্গানো একটি জগদ্ধাত্রীর ছবি ছিল। অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বললেন "মা তুমি যদি সত্যি হও আর সিংহ যদি তোমার বাহন হয় ত তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দাও মা।" সঙ্গে সঙ্গে ছবি থেকে একটা সিংহের থাবা বেরিয়ে এসে তাঁর হাত দিল আঁচড়ে। রক্ত ছুটল—ছুটে এল বাড়ীর লোকজন। ভক্তিতে তখন তাঁর চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। কি ব্যাপার হ'ল কেউ জানল না—তিনিও কিছু বললেন না। হয়ত তখন তাঁর একদিকে 'পরাচেতনার অনুত্তর জ্যোতি, অন্যদিকে অচেতনায় বিপুল চিন্তাধারার প্রয়াস।' যেদিন প্রথম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় সেইদিনই তিনি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন যাকে ইংরেজীতে বলে **absolute surrender.** আর তখন থেকেই তাঁর জীবনে এসে

যায় একটা অভূতপূর্ব রূপান্তর।

কয়েকদিন প'র তিনি আমাদের বাড়ী থেকে চলে গেলেন অন্য জায়গায়। বহুলোক তাঁর কাছে আসে যায়—নানা বয়সের লোক। কাজের ভেতর দিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে কেমন করে আস্তে আস্তে আমি তাঁদেরই একজন পরম বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে উঠলুম তা' বলতে পারি না। সমস্ত অন্তর ভরে উঠতে লাগলো যাদুরসধারায়। শুধু তাই নয় দায়িত্বের ভারও আসতে লাগল ক্রমে ক্রমে। মাষ্টারমশাই একদিন বললেন—শুধু শপথ করে কাজ আরম্ভ করলেই হবে না—নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে বন্ধনহীন প্রকাশের মাঝে—যাতে কোন কাজই অসম্ভব বলে ভয়ে পিছিয়ে আসতে না হয়। সব সময় এগিয়ে যেতে হবে, পিছনে তাকাবার কথা যেন মনে না ওঠে। কোন কারণেই লোভ যেন না ভোলায়, জড়তা যেন পথরোধ করে না দাঁড়ায়, দম্ভ যেন অভিভূত করতে না পারে, দুশ্চিন্তার গুরুভার মনকে যেন বিপর্যস্ত না করে। জীবনের আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই বিধাতার করুণার সার্থক দান—স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।

এমনি করেই কয়েক বছর কেটে গেল। কর্মনাগরদোলার ঘূর্ণিনেশায় কাজ করে যাই নিজের জন্যে নয়—কিছু আশা করেও নয়। ফলাকাঙ্খাহীন কাজের তাড়ার অদ্ভুত নেশা—এক সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি, কলুর ঘানির বলদের মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মন সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধান-তৎপর। কি দুঃসাধ্য উদ্যম, দুর্লভের সন্ধানে কি বিচিত্র অধ্যবসায়, আত্মঅবদানের পথে কি দুর্বার আকর্ষণ, মৃত্যুর অর্ঘপাত্রে জীবনের সঞ্চয়কে সার্থক করবার কি নব নব আয়োজন—জয়োদ্ধত প্রবল তার গতি।

সংসারের দ্বন্দ্ববহুল বৈচিত্র্যের বাইরে থেকে ভাবলোকের অমৃতনির্ঝরের অনির্বচনীয় রসধারার মত তখনকার দিনের অন্তরের আবেগ, অত্যাজ্য ধর্মের মত একাগ্র সতর্কতা। মনে হত এ

তুলনা নেই। অগ্নিশিখার উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তির মত এক অদ্ভুত উপসর্গ—উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। কল্পনার স্বর্গরাজ্য থেকে কেউই তখন একপা নড়াতে পারতো না। তখন কোন দিনই মনে এ প্রশ্ন জাগেনি কেন এ কাজ করব? অধিমানসিক বিশ্বাসের বলে আমার জীবন দিয়ে দেশকে স্বাধীনতার পথে কতখানি এগিয়ে দিতে পারব? যা' করতে যাচ্ছি তা' সত্যিই মহান্ কি না? না অকিঞ্চিৎকর মোহগ্রস্ত আদর্শের অভ্রংলিহ মরীচিকা মাত্র। এই অদ্ভুত নেশার ঘোরে অবসর মুহূর্তে আমার দুরন্ত মনে মাঝে মাঝে ভয়হীন মৃত্যুর অপার মহিমা অনাগত বিপ্লবের রক্তশিখায় ঝলমল করে ওঠে।

যা' আদেশ আসে নির্বিবাদে করে যাই—কেন বলার কোন অধিকার নেই। ও শব্দটা তখন আমাদের অভিধানের বাইরে। ছোট হয়ে কাজ করার অনেক সুবিধে। বড় গাছে বড় ঝড়। হুকুম তামিল করা ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব নেই। যিনি হুকুম দেবেন সব দায়িত্ব ত তাঁরই। তাই অশ্রান্ত হাসিমুখে দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে কাজ করে যাই অকপট আনন্দে, কোন বিরক্তির চিহ্ন নেই। তখন দুরাশা ও দুঃসাহসে মন উন্মাদ। ত্যাগের ঐশ্বর্যের বিপুল সমারোহে অন্তর তখন উৎসবময়। একজন শুধু লক্ষ্য করে যান। একদিন মাস্টারমশাই বললেন "তোর দাদার মেঘটা জমাট, কোন ফাঁক নেই। তোরটা খাপ-ছাড়া মেঘ, জমাট বাঁধছে না। আমার কষ্টি পাথরে এ পর্যন্ত দু'জন লোক পাশ করেছে—একজন তোর দাদা শ্রীহরিনারায়ণ আর একজন শ্রীসন্তোষ মিত্র।"

জানিনা কেন তিনি একথা বললেন। আমার মধ্যে কি তিনি শুধু দেখলেন প্রদোষের অন্ধকার? মেঘবিমুক্ত নব অরুণোদয়ের সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটার চিহ্ন কি কিছুই ছিল না? ক্ষণিকের দুর্বলতায় মনে সন্দেহ হ'ল পারব ত জীবনের সাধনাকে সার্থক

করে তুলতে, না অপরিণামদর্শী অন্ধতার অপঘাতে ঝঞ্ঝাশেষের মেঘের মত দিকচক্রবালে সমস্তই শেষ হয়ে যাবে? ছেলেবয়েসের যা' সম্বল অভিমানের ব্যর্থ-বোঝার ছায়ান্তরালে এই কথাটাই বার বার মনে আসতে লাগল—তবে কি আমার সমস্ত চেষ্টা পঙ্গু হয়ে যাবে? দুর্লভের রুদ্ধদ্বারে বৃথাই আঘাত হানব বারে বারে? চিরদিনই কি অজ্ঞতার চারপাশে ঘুরে মরব—সাফল্যের দুর্গম শিখরে পৌঁছুতে পারব না? বিলুপ্তির গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবনা আমার আত্মপরিচয়? অস্বস্তিতে মন ভরে গেল। আত্মগৌরবের পাথেয় ধুলায় হ'ল মলিন। জীবনে ঘাত প্রতিঘাতের দোলা এমনি করেই আবহমানকাল থেকে নিরন্তর উৎসারিত।

চার

অতীত ইতিহাসের অনধীত অধ্যায়ের বিস্মৃত ঘটনাবলীর পানে তাকাই। সিপাহীবিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রচেষ্টা। সামন্ত নৃপতিগণের ইংরেজ আধিপত্য অবসানের শেষ সংগ্রাম। মনে ভেসে উঠে কেমন করে কূটনীতিজ্ঞ নানা-সাহেব, স্থিরপ্রাজ্ঞ আজিমুল্লা খাঁ, রণনিপুণ তাঁতিয়া তোপে ইংরেজের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। আজও কানে ভেসে আসে ঝাঁসীর রাণী বীরাঙ্গণা তরুণী লক্ষ্মীবাইয়ের দম্ভবাণী "মেরী ঝাঁন্সী নেহি দেউঙ্গী।" মনে পড়ে অবধের হজরৎ মহলকে, অশীতিপর বৃদ্ধ কুঁঅরসিংকে আর ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট অন্ধ বাহাদুরশাহকে—। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে এই স্মরণের শহীদ বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রির ৩৪ নম্বর রেজিমেন্টের
কি
সং সিপাহী মঙ্গল পাঁড়ে আর বিন্দা সিংকে স্মরণ করে।
২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ের উদ্ধত
অমৃতনিং
আবেগ,

রাইফেলের একটি গুলির শব্দ সারা ভারতবর্ষে সমস্ত দেশী সিপাহীদের মনে উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোর মত বিদ্রোহের আগুন দিল জ্বেলে। বিচারপতি Macarthyর ভাষায় এ বিদ্রোহ সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ—সামন্তরাজতন্ত্রের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা মাত্র নয়। স্মরণ করি পরের যুগের কর্মী মারাঠা বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে, শিখগুরু কুকারাম সিং আর হো নেতা বীরশা ভগবানকে। আর মনে পড়ে ১৮৭৪ সনে প্রথম যিনি বিলাতী বর্জনের প্রস্তাব আনেন—তিনি হলেন শ্রীভোলানাথ চন্দ্র। আর যিনি প্রথম ১৮৮৬ সনে ইংরেজকে 'ভারত ছাড়' এ কথা বলেন তাঁর নাম শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। বীটন সভায় ইংরেজ ও দেশীয়দের সামনে তিনি 'ভারত ছাড়'র প্রস্তাব আনেন।(১) আয়ারল্যাণ্ডের নেতা মিঃ গ্রীফিথ অসহযোগ আন্দোলনের উদ্গাতা। কাজেই বিলাতী বর্জন, অসহযোগ আন্দোলন বা ১৯৪২ সনের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পরিকল্পনা গান্ধীজির নিজস্ব মৌলিক অবদান নয়। ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ১৮৭৫ সনে—প্রতিষ্ঠাতা শ্রীআনন্দমোহন বসু।

আরও মনে পড়ে ১৭৫৭ সনের ২রা জুলাই নবাব সিরাজৌদ্দলা কেমন করে ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিলেন। ১৭৬৪ সনের ২৩শে অক্টোবর বক্সার যুদ্ধে মীরকাশেমের দুর্ভাগ্যজনক পরাজয়, ১৭৯৯ সনের ৪ঠা মে অপরাজেয় টিপুসুলতানের মৃত্যু। ১৭৮১ সনের ১৫ই আগস্ট চৈত্ সিংহের পরাজয়, ১৮০০ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর কোংগলের যুদ্ধে বীর ধুন্ধিয়া বাগের জীবনাবসান, ১৮৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল তাঁতিয়াতোপের ফাঁসিকাঠে জীবন-দান, আর ১৮৬২ সনের ৭ই নভেম্বর নির্বাসিত মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু।

---

(১) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—শ্রীযদুগোপাল মুখোপাধ্যায় pp.12-19

তারও অনেক আগে মহারাজ নন্দকুমার। তিনিই বাংলামায়ের প্রথম পূজারী। দেশের লোকের সমস্ত ক্ষমতা যখন বিলুপ্তির পথে এই ব্রাহ্মণ সেই হৃতশক্তির পুনরুদ্ধার মানসে বাদশাহ শাহ আলমকে কেন্দ্র করে অন্যান্য শক্তিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজের হাতে দেওয়ানী তুলে দেবার জন্যে তখন পুণার পেশোয়া শাহআলমের উপর খড়গহস্ত। নিরুপায় হয়ে তিনি যোগাযোগ করলেন পেশোয়ার সঙ্গে।(১) পেশোয়ার প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর প্রতিনিধি—শ্রীজগমোহন দত্ত পরামর্শ করতে লাগলেন গোপনে চন্দননগরে, বৃহত্তম কর্মোদ্যমের আশায়। সন্দেহ করলেন ওয়ারেণ হেষ্টিংস—চর নিযুক্ত করলেন তাঁর সেক্রেটারী শ্রীনবকৃষ্ণকে।(২) স্বার্থসিদ্ধির প্রকৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন শ্রীনবকৃষ্ণ। সব গোপন তথ্য জানিয়ে দিয়ে হলেন ইংরেজ প্রভুর প্রীতিভাজন। মহারাজ নন্দকুমারও ইতোমধ্যে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির তদন্ত চাইলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। শ্রীজগমোহন হলেন কারারুদ্ধ; আর হেষ্টিংস নিজের বিরুদ্ধে সত্যিকারের অভিযোগের তদন্ত বন্ধ করবার জন্যে ১৭৭৫ সনের ৬ই মে চক্রান্ত করে ১৭৭০ সনের কাল্পনিক এক মিথ্যা জালিয়াতির দায়ে মহারাজ নন্দকুমারকে প্রধান বিচারপতির গোপন সহায়তায় বন্দী করলেন। যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও ৬ই থেকে ১৮ই জুনের মধ্যে বিচারের প্রহসন শেষ করে ৫ই আগষ্ট মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হ'ল।(৩) তাঁকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন সম্রাট শাহ আলম ১৭৬৪ সনের মে মাসে। শ্রীনবকৃষ্ণ হলেন পুরস্কৃত।

---

(১) নবাবী আমলের বাংলা—শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) Maharaj Nandakumar—a study, N. N. Ghose

(৩) History of British India 1858—Mill, J. & Wilson, H. H., vol. III, p. 446

ইতিহাসের দুরপনেয় কলঙ্কের অধ্যায়ে গ্লানির স্মৃতি মাথায় নিয়ে প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে রয়ে গেলেন চিরদিনের জন্যে। ইংরেজের সুবিচারের স্পর্ধা লজ্জায় ম্লান হয়ে রইল। আর ভারতবাসীর কাছে চিরকাল অমর হয়ে রইলেন মহারাজ নন্দকুমার। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত মহারাজ নন্দকুমারের সদা হাস্যময় সৌম্যমূর্তি ও অবিচলিত ধৈর্য সত্যিই অবিস্মরণীয়।(১)

তারপরেও রাজা রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহকে সামনে রেখে ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা নিখিল ভারত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টারও পরিকল্পনা করেছিলেন—করতে চেয়েছিলেন দেশের যুবকদের ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ফরাসী বিপ্লবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ভারতের তখনকার অবস্থার কোন মিল ছিল না—ফরাসী বিপ্লবের এক পাল্লায় ডিমোক্রেসী আর এক পাল্লায় ফ্রী-ট্রেড।

এর পরেও যাঁরা চিন্তায়, আদর্শে, দেশকে জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে এলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাজ নারায়ণ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিশিরকুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ও স্বামী বিবেকানন্দ সকলের অগ্রগণ্য।

১৮৮৩ সনে এক মোকদ্দমায় হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ নরিস শালগ্রামশিলাকে তাঁর আদালতে হাজির করবার হুকুম দেন। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আদালতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর দু'মাস কারা-

(১) Echo from Old Calcutta 1858—Busteed, H E. p. 89

দণ্ড হয়।(১) সে ব্যাপারে ছাত্রমহলে বিশেষ করে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়—সেই বিক্ষোভের নেতৃত্ব করেন শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়—পরবর্তীকালে যিনি 'বাংলার ব্যাঘ্র' বলে পরিচিত ছিলেন।

১৮৯০ সনে মনিপুর বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। রাজার আদেশে মন্ত্রী শ্রীটিকেন্দ্রজিৎ আসামের চীফ কমিশনার ও অন্যান্য ইংরেজদের হত্যা করেন। ১৮৯৪ সনে পুনায় কনষ্টেবল হত্যার অপরাধে চারজনের কারাদণ্ড হয়ে গেল। ১৮৯৫ সনে পুনায় আরম্ভ হল প্লেগ। সেই মহামারীর সময় ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের সীমা ছিল না। তাঁরা দুই নাটুভায়ের উপর করলেন জঘন্য ব্যবহার ও নির্মম উৎপীড়ন। শেষ পর্যন্ত দু'ভাইকে ১৮২৭ সনের ২৫নং রেগুলেশন আইনে নির্বাসিত করা হ'ল। লোকের মনে ত্রাস সঞ্চার করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৯৭ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সরকার অন্ধ অবজ্ঞায় এপিডেমিক ডিজিজেস অ্যাক্ট পাশ করিয়ে উন্মত্ত স্পর্ধায় আরম্ভ করলেন নরনারী নির্বিশেষে অকথ্য অপমান ও নির্দয় উৎপীড়ন। স্থানীয় রাজপুরুষেরা উন্মুক্ত বরাহের মত এদেশের লোকদের দাঁত দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলেন। সেই বছরই ২২শে জুন গুলি করা হ'ল এই দুর্দান্ত অব্যবস্থা ও বীভৎস অত্যাচারের নিষ্ঠুর নায়ক মিঃ র‍্যাণ্ড ও মিঃ আয়ার্স্টকে। মিঃ আয়র্স্ত সঙ্গে সঙ্গে ও মিঃ র‍্যাণ্ড ৩রা জুলাই মারা গেলেন। ধরা পড়লেন শ্রীদামোদর হরি চাপেকার —আত্মগোপন করলেন শ্রীবালকৃষ্ণ। শ্রীদামোদরকে ধরিয়ে দেবার জন্যে হেড কনেস্টবল শ্রীরাম পাণ্ডুকে গুলি করেছিলেন শ্রীবাসুদেব কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। এই ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দু'জন গুপ্তচর শ্রীগণেশ শঙ্কর দ্রেভিড ও শ্রীরামচন্দ্র দ্রেভিড

---

(১) I.L.R. 10 Cal. 109

শ্রীবাসুদেব ও শ্রীর‍্যানাডের হাতে হলেন নিহত। ১৮৯৯ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগণেশ ও পরদিন শ্রীরাম চন্দ্র মারা যান। ধরা পড়লেন শ্রীবালকৃষ্ণ, শ্রীবাসুদেব ও শ্রীর‍্যানাডে। যারবেদা সেণ্ট্রাল জেলে ১৮ই এপ্রিল গীতাহাতে হাসিমুখে দামোদরহরি চাপেকার ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। ১৮৯৯ সনের ৮ই মে সদাহাস্যময় বাসুদেব, ১০ই মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ র‍্যানাডে আর ১২ই মে কর্মপাগল বালকৃষ্ণ যারবেদা সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসিমঞ্চে জীবন উৎসর্গ করলেন। মৃত্যুদণ্ড শোনাবার পর শ্রীদামোদর জিজ্ঞেস করেছিলেন "এর চেয়ে অন্য কোন কঠোরতর দণ্ডের ব্যবস্থা আইনে আছে কি না?" নব জীবনের সঙ্কটময় পথে অগ্রগামী শ্রীবাসুদেব তামাসা করে বলেছিলেন "আমাদের ত দু'বার ফাঁসি দেওয়া হবে—কোন্‌টা—আগে দেওয়া হবে?" রত্নগর্ভা চাপেকার জননী আত্মবিস্মৃত তপস্যায় আসক্তিবন্ধনহীন ত্যাগে তিন তিনটি পুত্রকে দেশের স্বাধীনতার অসাধ্য সাধনযজ্ঞে নীরবে উৎসর্গ করলেন। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করে এলেন অনুচ্চারিত ভাষায় ভগিনী নিবেদিতা।(১)

বিদ্রোহের প্রতিশোধে সভ্য ইংরেজ মনিপুরের রাজাকে আন্দামানে পাঠালেন নির্বাসনে। দুঃসাহসী সেনাপতি শ্রীথেঙ্গল ও দূরদর্শী মন্ত্রী শ্রীটিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয়ে গেল।

১৮৯৯ সনের ১২ই অক্টোবর আরম্ভ হ'ল বুয়র যুদ্ধ—চলল ১৯০২ সনের ৩১শে মে পর্যন্ত। সে যুদ্ধে সেনাপতি রেডভার্স বুলারের অধিনায়কত্বে ইংরেজের বারবার বিপর্যয়ে আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের আশাতীত সাফল্যে ভারতবাসীর বহুকালের তমিস্র আবরণ ভেদ করে আশার বাণী হ'ল জাগ্রত। মনেপ্রাণে তাঁরা এঁদের সমর্থন জানালেন এমন কি সাহায্যের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ

---

(১) লেখকের অবিস্মরণীয় ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ হলো। বালগঙ্গাধর তিলকের প্রবর্তিত গণপতি ও শিবাজী উৎসবের ভেতর দিয়ে দেশবাসীর মনে যে আশার ও আনন্দের অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল এই দুই যুদ্ধের ফলাফলের উপর তার পরিণতি আশা করে আরম্ভ হ'ল মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গলময়ের কাছে প্রার্থনা।(১) ১৯০৪ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'বঙ্গবাসী' কাগজে জাপানের জয় কামনা করে প্রবন্ধ হ'ল প্রকাশিত। পাশ্চাত্যের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের এ নবজাগরণকে এশিয়ার জনগণ সেদিন বিধাতার সুনিশ্চিত দান বলে অকুণ্ঠিত মর্যাদায়, অদম্য নিষ্ঠায় ও আনন্দময় অভিবাদনে জানিয়েছিলেন নমস্কার।(২)

১৮৯৭ সনের জুন মাসে পুণায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে চারদিকে ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। কাথিয়াবাড়ের অধিবাসী শ্রীশ্যামজী কৃষ্ণবর্মা সেই বছরই লণ্ডন চলে গেলেন সেখান থেকে কাজের সুবিধে হবে বলে। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদা রাজ-সরকারের অধীনে অধ্যাপনাকার্যে রত। মহারাষ্ট্রের কর্মীদের সঙ্গে পুণার ঠাকুরসাহেবের ছিল যোগাযোগ। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। ঠাকুরসাহেব মহারাষ্ট্রের গুপ্ত সমিতিগুলি গোপনে পরিচালনা করতেন। যুবকদের অন্তরে স্বাধীনতা লাভের উদ্বেল উদ্দামকে উদ্দীপিত করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

১৯০২ সাল। ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে পাঠালেন বাংলায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুপ্তসমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। সর্বশ্রী রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ মুন্সী, ভুবনেশ্বর সেন, সতীশ বসু, শ্রীমতী সরলা দেবী প্রমুখ কয়েক জনের সহযোগিতায় দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠল

(১) The Tribune, dated 19-3-1903
(২) Ibid dated 12-11-1903

'আত্মোন্নতি সমিতি'। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক ও বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্যে বিপ্লবীদের সাফল্যের নবীন আশা উঠল প্রবল হয়ে। তাঁরা 'অনুশীলন সমিতি' নাম নিয়ে কাজে নামলেন। নেতৃত্ব পড়ল শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীপ্রমথনাথ মিত্রের উপর। সহযোগী হিসেবে এগিয়ে এলেন রাজা সুবোধ মল্লিক, সর্বশ্রী শশীভূষণ রায় চৌধুরী, মন্মথ মিত্র, হীরালাল রায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

১৯০৩ সনের ১২ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের সেক্রেটারী H. H. Risleyর বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে লেখা চিঠি, ভারত সরকারের গেজেটে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক বুঝতে পারল যে গোপনে বাংলাদেশকে দু'ভাগে ভাগ করার ব্যবস্থা সুব্ব পাকা হয়ে গেছে।(১) এই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতায় আপত্তি উঠল চারদিক থেকে। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তীব্র ভাষায় বেরুল প্রতিবাদ। বাংলা সরকার জানালেন যে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের দেশ ভাগে পূর্ণ সমর্থন আছে। ভারতসচিব এ ব্যাপারে সম্মত আছেন বলে জনশ্রুতিও শোনা গেল। নিঃস্ব জনের দুঃস্বপ্ন গেল ভেঙ্গে—বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' মহারাষ্ট্রের 'কাল' পত্রিকা ওজস্বিনী ভাষায় দিনের পর দিন এর বিরুদ্ধে লিখে চলল। কলকাতায় 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', ও 'বন্দেমাতরম্' বলে তিনখানা কাগজ প্রকাশিত হ'ল কিছুদিনের মধ্যেই। ১৯০৫ সনে শ্রীশ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে স্থাপন করলেন "ভারত হোমরুল সমিতি"—বের করলেন Indian Sociologist লেখা আরম্ভ হ'ল যুক্তিবিচারহীন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে। লণ্ডনে স্থাপিত হ'ল ইণ্ডিয়া হাউস—ভারতীয় ছাত্র ও পলাতক বিপ্লবীদের বিদেশে কর্মকেন্দ্র। এদিকে ২০শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের আদেশ হ'ল জারি

(১) The Gazette of India dated 12-12-1903

—১৬ই অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ভাগ হবে। ১৫ই অক্টোবর বাংলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভিনব পরিকল্পনা অনুযায়ী পালিত হ'ল রাখিবন্ধন উৎসব—দেশবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হল সুদৃঢ়। সরকার কিন্তু বদ্ধপরিকর—চলল অবিরাম নির্যাতন ও চণ্ডনীতি। ১৬ই নভেম্বর পূর্ববঙ্গের বহু সভ্রান্ত ব্যক্তি হলেন বন্দী। পৌরুষক্ষয়কর অপমানজনক ঘৃণ্য আদেশে কয়েকজনকে জোর করে করিয়ে নেওয়া হ'ল স্পেশাল পুলিশের কাজ। ১৯০৫ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে লর্ড কার্জন ভারতীয়দের বললেন মিথ্যাবাদী। সব কাগজে বেরুল এর প্রতিবাদ—অক্ষমের দুর্বল হাতিয়ার।

১৯০৬ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরে একটি পনের বছরের ছেলে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারিত ইস্তাহার বিলি করার সময় ধরা পড়লেন কিন্তু বলিষ্ঠ কনষ্টেবলের কঠিন হাত থেকে দুঃসাহসের আনন্দে কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে আত্মগোপন করলেন। এই বালকের নাম শ্রীক্ষুদিরাম বসু। গুপ্তচর শ্রীরামচন্দ্র সেন পুলিশকে গোপনে তাঁর নাম ও ঠিকানা বলে দিলেন। সেই অভিযোগে মাতাপিতৃহীন বালককে ভগ্নির আশ্রয় ছেড়ে এক বোর্ডিং হাউসে চলে যেতে হ'ল। পরের দিন পুলিশের কর্তারা কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করবার অছিলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় নিয়ে গিয়ে করলেন জঘণ্য ব্যবহার। একজন সরকারী কর্ম্মচারী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে করা হ'ল বরখাস্ত।

৩১শে মার্চ রাত্রি ১টার সময় দু'জন সাবইনেস্পক্টর কয়েক জন কনেষ্টবল নিয়ে শ্রীক্ষুদিরাম বসু ও অন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে চালান দেন। ৪ঠা এপ্রিল ক্ষুদিরাম জামিনে খালাস পেলেন বটে কিন্তু ১৭ই এপ্রিল তাঁকে দায়রায় সোপর্দ করা হ'ল—অপরাধ জেলের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে হীন প্রচার কার্য চালিয়ে তাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা—আর

ইংরেজবিরোধী ইস্তাহার বিলি করা। প্রমাণাভাবে ১৬ই মে এ মামলা তুলে নেওয়া হ'ল। শ্রীরামচন্দ্র সেনকে শাস্তির উদ্দেশ্যে একজন সন্ধ্যের পর তাঁর কাছে গিয়ে বললেন যে ব্যারিষ্টার মিঃ দত্ত তাঁকে ডাকছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে যখন রাস্তা দিয়ে আসছেন তখন একটা নির্জন জায়গায় তাঁর জন্যে কয়েকজন অপেক্ষা করে লুকিয়ে ছিলেন। পূর্বনির্দেশমত পথপ্রদর্শক হঠাৎ হাতের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসেনের পায়ে পড়ল লাঠির কয়েক ঘা। 'বাঁচাও বাঁচাও' চীৎকার করে উঠলেন তিনি। এ সময় দৈবক্রমে একটা মেলভ্যান এসে পড়ায় প্রাণে গেলেন বেঁচে।(১)

এই শ্রীক্ষুদিরাম বসু পরবর্তী সময়ে দেশের যে মহান্ কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন তারই প্রথম আরম্ভ এই সংক্ষিপ্ত বন্দী-জীবনের মাধ্যমে। মর্ত্যের বেদনার সঙ্গে মিশেছিল দেবতার অমৃত। এঁর জন্ম ১৮৮৯ সনের ৩রা ডিসেম্বর। কৈশোর জীবনে দুঃখ নির্যাতন, অভাব ও অপমানের ভেতর দিয়ে এসেছিলেন বিপ্লবীদের সংস্পর্শে। বৈরাগ্যকঠিন দারিদ্র্যগৌরব মাথায় করে গড়ে তুলে ছিলেন নিজের আদর্শময় কর্মজীবন। মাতৃস্নেহবঞ্চিত কিশোরের তরুণ হৃদয়ে ছিল না ক্ষুদ্রতার চাঞ্চল্য, বিরোধের বিচ্ছেদ, বিভীষিকার ব্যাকুলতা, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতা। সেদিন হয়ত তাঁর শূন্য হৃদয় পূর্ণ করেছিল আর এক মায়ের বন্ধন মোচনের পবিত্র সংকল্প। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে সংকল্প ছিল অটুট।

ঠিক এই সময়ে ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে আর একটি কিশোরের বৈপ্লবিক জীবনের দুঃসাধ্য সাধনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল —তাঁর নাম শ্রীপ্রফুল্ল চাকী। পিতা শ্রীরাজনারায়ণ চাকীর পাঁচ

(১) শ্রীবিভূতিভূষণ সরকারের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ]

পুত্রের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ। ফুলার গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজের শিক্ষকদের উপর অন্যায় গোপন 'লায়ন সারকুলার' আর 'কার্লাইল সারকুলারের' প্রতিবাদে তিনি স্কুল ছাড়লেন—দীক্ষিত হলেন দেশসেবার পবিত্র মন্ত্রে। দুরতিক্রম্য চরম নিয়তি অলক্ষ্যে তাঁকে বিঘ্নজয়ী রথে নিয়ে চলেছিলেন অজানা নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে—'দুরাশার দূরতীর্থ অনির্বাণ দেয় যে ইসারা।' শ্রীঈশান চক্রবর্তীর প্রিয় এই নির্ভীক নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছাত্র শুধু শরীরেই বলিষ্ঠ নয় মনেও ছিলেন অমিত সাহসের অধিকারী। প্রফুল্লকুমার বগুড়া ছেড়ে চলে এলেন চিরদিনের জন্যে রক্ত প্লাবনের পথে। ছাত্রেরা এই সারকুলারের প্রতিবাদে স্থাপন করলেন অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটি—সভাপতি শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু। স্থাপিত হ'ল ছাত্রভাণ্ডার। শাসনের সমস্ত রুদ্রতা হয়ে উঠল প্রসন্নতায় দীপ্যমান।

১৯০৬ সনের জুন মাসে শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর লণ্ডনে গিয়ে মিলিত হলেন শ্রীশ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও শ্রীহরদয়ালের সঙ্গে। : কাজের ভার দিয়ে গেলেন 'অভিনব ভারত সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা অগ্রজ শ্রীগণেশ দামোদরের উপর। ৭ই আগষ্ট বাংলার বয়কট দিনে ফেডারেশন হলে বর্তমানে যেখানে গ্রীয়ার পার্ক, সেখানে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তুললেন প্রথম জাতীয় পতাকা। সেই বছরেই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি শ্রীদাদাভাই নৌরজী বললেন "স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার।" বিপ্লবীরা তখন গোপনে কর্মপন্থা নির্ধারণে ব্যস্ত। পুস্তিকাকারে বেরুল "মুক্তি কোন্ পথে?" "বর্তমান রণনীতি" "ভবানী মন্দির" "স্বাধীনতার ইতিহাস", "দেশের কথা", "শম্ভু নিশম্ভু বধ," "অনলপ্রভা", ও "নব উদ্দীপন"। এগুলো বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারী হয়ে গেল। গোপন সারকুলারে বলা হ'ল যে স্কুলকলেজের ছাত্রেরা মুখে 'বন্দেমাতরম্' বললে বা সভাসমিতি বা শোভাযাত্রায় যোগ

দিলে স্কুল কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।(১)

সরকার পক্ষ থেকে উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার নিদর্শন হিসেবে অত্যাচারের কঠোরতা যতই বাড়তে লাগল, লোকের মনে বিদ্বেষের ভাব ততই উঠল প্রবল হয়ে। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটাকে বানচাল করে দেবার জন্যে বিপ্লবীরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। লর্ড কার্জনের উক্তি **Partition of Bengal is a settled fact**র প্রতিবাদে স্যার সুরেন্দ্রনাথ জোর গলায় বলে বেড়াতে লাগলেন **we shall unsettle the settled fact.** এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯০৬ সনের ১৪ই এপ্রিল হ'ল বরিশাল কনফারেন্স—সভাপতি মিঃ এ রসুল—উদ্যোক্তা শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত। পুলিশের নির্মম লাঠিচালনা সত্ত্বেও সেদিন দেশের লোক দেখিয়েছিলেন অহিংসনীতির নির্ভীকতম পরিচয়। দেশনেতা শ্রীমনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার পুত্র শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা লাঠির আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সে দিন স্যার সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা অবসাদহীন শক্তির বিপুল অগ্নিকুণ্ডের মতই ছিল জ্বালাময়ী।

রবীন্দ্রনাথ দুঃখে বলেছিলেন "যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙালীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন তারা অগত্যা বয়কট নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালা নির্মমভাবে তাঁদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই সঙ্গে দেখা গেল বাঙালী মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেই যুগেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হ'ল। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে বাংলা দ্বিখণ্ডিত

(১) Confidential Circular No. 1679 dt. 10-10-05 and letter No. T. 292 dt 25-10-05 by D.P.I.

হলে বাঙালীদের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুতঃ সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝাবার মত একাগ্রতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় এ কথাটা মনে রাখা দরকার। নিজেকে ভোলানোর জন্যে বিধাতাকে ভোলাতে পারব না।”

ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা ও রাজা সুবোধ মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করলেন—যাদবপুর বিদ্যায়তন হ'ল প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের লেঃ গভর্ণর মিঃ বামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা সফল হল না। যে মিঃ ফুলার বলেছিলেন “মুসলমান আমার সুয়োরাণী” তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়ে বিপদ বুঝে চুপ করে রইলেন। শ্রীহেমচন্দ্র দাস কানুনগো বোমা নিয়ে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে ফুলারের উদ্দেশ্যে ছুটেছিলেন। অকৃতকার্য ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে পরাজয়ের লজ্জা ও অবসাদের অপমানে দুঃসংবাদ দিলেন—বললেন ‘দাদা পালিয়েছে’। মিঃ ফুলার পূর্ববঙ্গে বি, এল, স্কুল পরিদর্শনে গেলে ছেলেরা বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়ায় তিনি বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে স্কুলটি বন্ধ করে দেবার জন্যে সুপারিশ করেন অন্যথায় তিনি পদত্যাগ করবেন। বড়লাট বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালে তদানীন্তন কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাতে অসম্মতি জানালেন। কাজেই বড়লাট মিঃ ফুলারের পদত্যাগ পত্রগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। সন্ধ্যাপত্রিকায় লেখা হল “ফুলার করলে হুকুম জারি, মা বলে যে ডাকবে তার, শাস্তি হবে ভারি”। তখন ইংরেজের অসম্ভব অত্যাচারে বিভীষিকার ছায়া সর্বত্র। শাসন শোষণ ও দমনের চণ্ডনীতি চলল অবাধে। দেশের সেই দারুণ

দুর্দিনে লেখক, কবি, সাহিত্যিক সকলেই সরকারের নিন্দে করে দেশবাসীকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানালেন। 'পুণা বৈভব', 'কেশরী', 'কাল', 'বিহারী', 'নবশক্তি', 'কর্মযোগীন', 'সহায়ক', 'হুঙ্কার', 'স্বরাজ', 'দেশসেবক', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' 'বেঙ্গলী', 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'পাঞ্জাবী', 'হিতবার্তা' প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির অবদান অসামান্য। তাঁদের লেখনী দেশপ্রেমের নবজাগরণের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে করে দিয়েছিল উদ্ঘাটিত।

তখন 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯০৭ সনের ১৬ই জুনের কাগজে "ভয়ভাঙ্গো" ও "লাঠৌষধি" বলে দু'টি প্রবন্ধের জন্যে সম্পাদক রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে ২৪শে জুলাই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। সে সম্বন্ধে "বন্দেমাতরমে" ২৬শে জুলাই এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যে ফৌজদারী মামলা আরম্ভ হ'ল। কোর্টে সরকারপক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সাক্ষী শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে আদালত অবমাননার দায়ে ১৯শে সেপ্টেম্বর ছ'মাস কারাদণ্ড নিতে হ'ল। সে সময় 'যুগান্তর', 'কেশরী' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার ওজস্বিনী ভাষা তরুণদের মনে এনে দিল নব উৎসাহের বন্যা, দুর্জয় সাহস ও অন্তহীন আকাঙ্খা। তাঁদের অন্তরে তখন আনন্দসৌন্দর্যের তরঙ্গ লীলা।

এই সব বিচারের সময় ১৯০৭ সনের ২৬শে আগষ্ট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে লোকের ভীড় সরাবার সময় শিরস্ত্রাণধারী পুলিশের নির্বিচারে লাঠি চালানোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন ন্যাশানাল কলেজের পনর বছরের ছাত্র শ্রীসুশীল সেন। এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টকে ঘুষি মেরে কাবু করলেন। পরের দিন পুলিশ সার্জেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে কিংসফোর্ডের আদালতে অভিযোগ করায়

গর্বোদ্ধত ম্যাজিষ্ট্রেট বিকৃতরুচি বর্বরতা ও নিলর্জ্জ নির্মমতায় কিশোর শ্রীসেনকে পনর ঘা বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। সে আদেশ পালনের সময় তাঁর কোনরূপ মুখ বিকৃতি দেখা গেল না। "বন্দেমাতরমে" প্রকাশিত হ'ল তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসা। ন্যাশানাল কলেজ তাঁর সম্মানে বন্ধ রইল একদিন। ২৮শে আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিরাট সভায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জন্যে একটি সোনার মেডেল পাঠালেন। সন্ধ্যা পত্রিকায় বেরুল "সুশীলের তুড়ি লাফ, ফিরিঙ্গীকে বলায় বাপ।" কিংসফোর্ডের এই নির্মম বিচারে দেশের লোকের ক্ষোভের সীমা ছিল না। গুপ্ত আদালত গঠিত হ'ল—বিচারপতি তিনজন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস ও রাজা সুবোধ মল্লিক। রায় হ'ল কিংস-ফোর্ডের প্রাণদণ্ড। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোর উপর দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করার ভার পড়ল। পথে ঘাটে গান শোনা গেল "বেত মেরে কি মা ভুলাবি, আমরা কি মা'র সেই ছেলে?" সরকার কিংসফোর্ডের নিরাপত্তার জন্যে চিন্তিত হয়ে তাঁকে পদোন্নীত করে পাঠালেন মজঃফরপুরের জেলা জজ করে। সেই বছরই শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো চলে গেলেন প্যারিসে বোমা তৈরীর প্রণালী ভাল করে শিখে আসবেন বলে।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ইংরেজ বিদ্বেষী আর ব্যঙ্গবিদ্রূপে মর্মভেদী প্রবন্ধ লেখার বিরাম ছিল না—দেশের সকল স্তরের লোক অধীর আগ্রহে সেগুলি পড়তেন ও ইংরেজবিরোধী শ্লেষের তীক্ষ্ণতা উপভোগ করতেন। দেশের আলস্যসুপ্ত যুবকদের দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করার জন্যে তিনি লিখতেন। ১৯০৭ সনের ৮ই আগস্ট ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের দণ্ডাদেশ উপলক্ষে লিখলেন "যুগান্তরের রক্তারক্তি, ফিরিঙ্গীদের ফাটল পিত্তি"। তার পরদিন বেরুল "ঢিলের বদলে পাটকেল।"

চারদিন পরে লিখলেন "কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা, একটা কালো একটা কটা।" ১৩ই বেরুল 'ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে।' ২০শে আগষ্ট পত্রিকায় দেখা গেল "সিডিশনের হুড়ুম দুড়ুম্, ফিরিঙ্গীদের আক্কেল গুড়ুম।" পরের দিন সরস রচনায় প্রকাশিত হ'ল "ফিরিঙ্গী পরম দয়ালু, ফিরিঙ্গীর কৃপায় দাড়ি গজায় শীতকালে খাই শাঁকালু।" গ্রেপ্তারের হিড়িকের সময় তীক্ষ্ণ বিদ্রুপে, শ্লেষশাণিত পরিভাষায় ২৩শে আগষ্ট লিখলেন "বাচ্ছা সকল নিয়ে যাচ্ছে শ্রীবৃন্দাবন।" "কারাগার স্বর্গমানি, মা বলে টানব ঘানি।" ৩০শে আগষ্ট সন্ধ্যার ছাপাখানায় খানাতল্লাসী হয়ে গেল। ৩রা সেপ্টেম্বর সম্পাদক গ্রেপ্তার হয়ে জামিনে খালাস পেলেন। ইংরেজের দুর্বিনয়ের স্পর্দ্ধা তাঁর কাছে অসহ্য। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলল। ২৩শে অক্টোবর বিচারের দিন তিনি আদালতে হাজির না হয়ে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিলেন। আদালতকে জানান হ'ল যে তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে শয্যাশায়ী। তা সত্ত্বেও ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর জামিন নাকচ করে হুকুম দিলেন যে একটু সুস্থ হলেই তাঁকে জেল হাজতে যেতে হবে। সংবাদ শুনে তিনি লঘুহাস্যে বললেন "অস্টরম্ভা ভবিষ্যতি—এ শর্মাকে জেলে নিয়ে যাবার সাধ্য কোন ফিরিঙ্গীর নেই।" ভগবান তাঁর দর্প খর্ব করলেন না। ২৭শে অক্টোবর সকাল ন'টার সময় তিনি ইহজগত থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলেন। একজন সত্যিকারের বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিকের তিরোধান হয়ে গেল—'তলোয়ারের চেয়ে লেখনী ঢের বেশী শক্তিশালী।' হিতবাদী সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদেরও রচনা ছিল এমনই ক্ষুরধার।

এ সময় লাহোরে ভূমিরাজস্ব ও ক্যানেল কর নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। ১৯০৭ সনের মে মাসে ছ'জনের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হ'ল—তার মধ্যে তিনজন উচ্চশিক্ষিত ব্যারিষ্টার। জামিনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করে পাঁচমাস বিচারাধীন

রাখার পর নির্দোষ প্রমাণে তাঁরা মুক্তি পেলেন। লালা লাজপত রায় ও শ্রীঅজিত সিংকে বন্দী করে রাখা হ'ল। পূর্ববঙ্গে ইংরেজের জঘন্য অত্যাচারের খবর পাঞ্জাবে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত অশান্তির আগুন উঠল জ্বলে।

বাংলায় তখন শ্রীসতীশ চন্দ্র বসু ও শ্রীপ্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে বিপ্লবীকর্মীর সংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়ে চলেছে। শ্রীযতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে, কঠোর নিয়মচর্য্যায় ও শ্রীবারীন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় তখন আসন্ন বিপ্লবের অনায়স আহ্বান। বিস্ফোরক জিনিসের ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কিত পুস্তকাদি গোপনে সংগ্রহ করে হচ্ছে শিক্ষানবিশীর দুঃসাধ্য সাধন। ফরাসী সরকারের অস্ত্রনির্মাণ কারখানা থেকে রিভলবার পিস্তল চন্দননগরে আমদানি চলেছে অবাধে। এসময় রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিপ্লবীরা উৎসাহিত হলেন। তিনি লিখলেন, "ইংরেজ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে জোর করে নিরস্ত্র করে দিয়েছে অথচ এর নিদারুণতা তারা অন্তরের মধ্যে একবারও অনুভব করেনি। ভারতবর্ষ একটা ছোট দেশ নয়। একটা মহাদেশ বিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাসীকে চিরদিনের জন্যে পুরুষানুক্রমে অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করে তোলা যে কত বড় অধর্ম, যারা এককালে মৃত্যু-ভয়হীন বীরজাতি ছিল তাদের সামান্য একটা হিংস্র পশুর কাছে শঙ্কিত নিরুপায় করে রাখা যে কেমন বীভৎস অন্যায়, সে চিন্তা এদের বিন্দুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিস্ফল—কারণ জগতে অ্যাংলোস্যাকসন জাতের মাহাত্ম্যকে বিকৃত ও সুরক্ষিত করাই এরা চরম ধর্ম বলে জানে, এজন্যে ভারতবাসীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করে এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষহীন হতে হয় তবে সে পক্ষে তাদের কোন দয়ামায়া নেই।"

১৯০৭ সনে ২৫শে মে হিন্দুধর্মসভার অধিবেশনে খুলনায়

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবেণীভূষণ রায় তাঁর ভাষণে বললেন 'আজ সিপাহী বিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হ'ল। এ শুভ দিনটিকে স্মরণ করে আমরা কাজে ব্রতী হব।(১) সরকার তাঁকে দণ্ড দিলেন পরে অবশ্য হাইকোর্ট থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। ৫ই নভেম্বর ঢাকার নিতাইগঞ্জে এক ডাকহরকরার কাছ থেকে বিপ্লবীরা টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিলেন। লেফটেনান্ট গভর্ণরের ট্রেণ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হ'ল দু'বার—একবার ৪ঠা অক্টোবর—সে চেষ্টা সফল হ'ল না। দ্বিতীয়বার ৬ই ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের কাছে রেললাইনের ধারে বোমা রাখা হ'ল। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলেন শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার ও শ্রীপ্রফুল্ল চাকী। ট্রেনে গভর্ণর যাচ্ছিলেন—বোমা ফাটল—এই সর্ব প্রথম বাংলাদেশে বোমার ব্যবহার হ'ল। একটা কামরার নীচে ফুটো হ'ল লাট সাহেব থাকলেন অক্ষত। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

তখনকার দিনে শ্রীরামসদয় মুখার্জী ছিলেন নামকরা পুলিশ অফিসার। তাঁর উপর তদন্তের ভার পড়ল। কয়েকজন নির্দোষ রেলকুলিকে সাজানো মিথ্যে সাক্ষীর জোরে জেলে পাঠালেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডে। হয়ে গেলেন রায়বাহাদুর—এ কাজের পুরস্কারে। আলিপুর বোমার মামলায় প্রমাণ হ'ল যে বিপ্লবীরা একাজ করেছিলেন এবং বন্দীদের পক্ষ থেকে দাবী করা হ'ল নির্দোষ কুলিদের মুক্তি। নিঃসন্দেহ সরকার কুলিদের মুক্তি দিলেন। ভাগ্যবান রামসদয়ের উপর ইংরেজ কিন্তু নির্দয় হলেন না মিথ্যে সাক্ষী সংগ্রহের জন্যে তাঁর কোন শাস্তি হল না বা রায়বাহাদুর খেতাব কেড়ে নেওয়া হ'ল না। কি মহৎ সুবিচার!

ঐ দিনই চিংড়িপোতা রেলষ্টেশন থেকে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীচন্দ্রভূষণ মিত্র প্রমুখ বিপ্লবীরা অর্থ সংগ্রহ করলেন। ধরা পড়লেন

(১) Calcutta Law Journal 699

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ইনিই পরে সি, এ, মার্টিন ও শ্রীমানবেন্দ্র রায় নামে পরিচিত হন। টাকা কিন্তু ধরা পড়ল না। রয়ে গেল সর্বশ্রী কালিপদ রায়, ইন্দ্রনাথ নন্দী, প্রভাসচন্দ্র দে প্রমুখ সহকর্মীদের কাছে। শিয়ালদহের ম্যাজিস্ট্রেট প্রমাণাভাবে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দিলেন মুক্তি।

এদিকে কংগ্রেসের মধ্যে মডারেট ও চরমপন্থীরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে রাজনৈতিক সম্মেলনে পরস্পরের বিভেদ আরও প্রকট হয়ে উঠল। ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে এক সভায় শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় লালা লাজপতরায়ের নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করলেন কিন্তু ইতিপূর্বে শ্রীরাসবিহারী ঘোষের নাম সমর্থিত হওয়ায় লালাজী তাতে সম্মত হলেন না। ২৭শে ডিসেম্বর সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশনও গোলমালে পণ্ড হয়ে গেল।

১৯০৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বর ঢাকা জেলার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যালেন আসছিলেন কলকাতায়। সিরাজগঞ্জ রেলস্টেশনে তাঁকে পিছন দিক থেকে গুলি করলেন শ্রীশিশিরকুমার গুহ। আহত হয়েও তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। সেই বছরই অন্বোন্নতি সমিতির গোপন সভা বসল রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে নেতারা এলেন—এলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। কাজের কোন নির্দিষ্ট ধারায় নেতারা একমত হতে পারলেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ঐক্যমত গঠনের চেষ্টা সফল হ'ল না।

১৯০৮ সনের ১১ই মার্চ চন্দননগরে মেয়র মঃ তার্দিভ্যালের ঘরে পড়ল বোমা। কিন্তু মঃ তার্দিভ্যাল রইলেন অক্ষত। তিনি নিস্প্রয়োজনের অধিকারে চন্দননগরে তখন সবরকম সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করেছিলেন তারই প্রতিবাদে এ আক্রমণ। ২রা এপ্রিল অর্থ সংগ্রহের জন্যে সাতজন তরুণ শিবপুরে একটি জায়গায় হানা দিলেন সংবাদটা ভুল ছিল পেলেন মাত্র চার টাকা।

ধরা পড়লেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু প্রমাণাভাবে পেলেন মুক্তি।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিবাস পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রামে। পিতা শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী সেযুগে ছিলেন সাবজজ। উচ্চশিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী দেশহিতব্রতে মনকে গড়ে তোলেন। শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্যে তিনি বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। তিনি যখন নারায়ণগঞ্জে মুন্সেফ তখন তাঁর বাড়ী তল্লাসী হয়ে তাঁর চাকরি যায়।

কয়েকদিনের মধ্যে শ্রীউল্লাসকর দত্তের ফরমুলায় তৈরী বোমা পরীক্ষার জন্যে দেওঘরে কয়েকজন গেলেন। পুরাণদহ অঞ্চলে শ্রীমনি বোসের বাড়ীতে একটি গোপন সংস্থা ছিল। দিঘিরিয়া পাহাড়ের এক জায়গায় একটা বড় পাথরের কাছে সেটা ফাটানোর বন্দোবস্ত হ'ল যাতে পরীক্ষার সময় এঁদের কোন ক্ষতি না হয়। স্থির হ'ল সকলেই বসে থাকবেন—যিনি ছুড়বেন তিনি ছুড়েই বসে পড়বেন। সর্বশ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, নলিনী গুপ্ত, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতিভূষণ সরকার, ও প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী গেছেন পরীক্ষার জন্যে। বোমা ছুড়লেন শ্রীউল্লাসকর দত্ত—অন্য সকলে বসেছিলেন শুধু দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। বোমাটা ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের সংস্পর্শে এসে মাটিতে পড়বার আগে সেটা ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হয়ে গেল। সঙ্গীরা গিয়ে দেখলেন যে শ্রীফুল্লর মাথার খুলিটা উড়ে গিয়ে প্রাণহীন নিশ্চল দেহ পড়ে আছে আর শ্রীউল্লাসকরের গলার শিরাগুলি ফেটে গুটিয়ে গেছে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পাঠানো হলো। ১৯০৮ সনের ১লা মে সন্ধ্যা ৬টার সময় একটি অমূল্য জীবন বলি পড়ে গেল—দেশ হারাল একটি কৃতী সন্তান। জীবনের সত্য অভিব্যক্ত হ'ল তাঁর তপস্যার ভেতর দিয়ে। মৃতদেহ দাহ করা বা কবর দেবার কোন ব্যবস্থা বন্ধুরা করতে না পেরে চলে এলেন। পরের

দিন দেখা গেল মৃতদেহ একই অবস্থায় পড়ে আছে কিন্তু তার পরদিন সে দেহের আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। নীরব কর্মী চিরদিনের জন্যে নীরব হয়ে গেলেন।(১) অনাস্বাদিত সাধনার জপমন্ত্র ছন্দ পেল অসীমের ধারায়। পিতা শ্রীঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী মেধাবী জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়েও রইলেন নির্বিকার।

পাঁচ

১৯০৪ সনের আগষ্ট মাস থেকে ১৯০৮ সনের মার্চ পর্যন্ত কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারের নামে যে চণ্ডনীতি চালিয়েছিলেন তাতে সকলেই তাঁর উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। তাঁকে মারবার জন্যে কলকাতার তাঁর গার্ডেনরীচের বাড়ীতে ১২০০ পৃষ্ঠার এক বইয়ের ভেতর একটি বোমা রেখে তাঁর চাপরাশির হাতে দিয়ে আসা হ'ল যাতে বইটা খোলামাত্র বোমাটা ফেটে যায়। চাপরাশি বইটা টেবিলে রাখল বটে কিন্তু মিঃ কিংসফোর্ড তাঁর কোন বন্ধু পুরানো বই ফেরৎ দিয়েছেন মনে করে বইটা আলমারীতে ফেলে রাখলেন।

তখন বাংলার তটে লেগেছে কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায় বিপ্লবের জোয়ার। এসেছে ইতিহাসের মহাযুগ। মিঃ কিংসফোর্ড মরল না দেখে তাঁকে মারবার জন্যে শেষ পর্যন্ত মজঃফরপুরে পাঠান হ'ল দু'টি তরুণকে—সর্বশ্রী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। তাঁরা বোমা ছুড়লেন কিংসফোর্ড ভ্রমে কেনেডীর গাড়ীতে। মারা গেলেন কেনেডী পত্নী ও দুহিতা। ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তাঁরা ফিরছিলেন ষ্টেসন ক্লাব থেকে। গাড়ীটা দেখতে ছিল ঠিক

(১) শ্রীবিভূতিভূষণ সরকারের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ।

কিংসফোর্ডের গাড়ীর মত। বোমা যখন পড়ল তখন রাত সাড়ে আটটা। ধরে দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এঁরা তখন রেল লাইন ধরে হেঁটে চলেছেন সমস্তিপুরের দিকে। এক রাতে তাঁরা হাঁটলেন ২৩ মাইল। নীরস বৈশাখের রিক্ততায় ক্ষুৎপিপাসাকাতর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বর্তমান লাখা ষ্টেশনের কাছে ক্ষুদিরাম গেলেন একটা মুড়ির দোকানে মুড়ি কিনতে। সেখানে ছিল পুলিশ কনেষ্টবল ফতে সিং আর শিওপ্রসাদ সিং প্রহরারত। সন্দেহে তিনি ধরা পড়লেন। তিনি গুলি চালাবার জন্যে রিভলবার তুলেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য —চালাবার আগেই ধরা পড়ে গেলেন। তাঁর দেহ তল্লাসী করে পুলিশের কর্তারা পেয়ে গেলেন দু'টি রিভলবার ও ৩০টি কার্তুজ। তাঁকে আনা হ'ল মজঃফরপুরে। অশ্রান্ত অজেয় শ্রীপ্রফুল্ল চাকী পালালেন। ক্ষুদিরাম বসু সহকর্মীকে বাঁচাবার জন্যে তাঁর সঙ্গীর নাম বললেন শ্রীদীনেশচন্দ্র রায়। বললেন তাঁরা দু'জনে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে এ কাজ করেছেন। অন্য কেউ তাঁদের এ কাজের ভার দেন নি। সমস্তিপুরে কোন বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে কিছুক্ষণ থেকে প্রফুল্ল চললেন কলকাতার দিকে। ট্রেনে ছিলেন পুলিশ সাবইনস্পেক্টর শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছুটি অন্তে কাজে যোগ দেবার জন্যে চলেছিলেন। সন্দেহ হতে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিয়ে মোকামাঘাট ষ্টেশনে প্রফুল্লকে ধরবার চেষ্টা করতেই প্রফুল্ল বললেন "বাঙালী হয়ে আপনি আমায় ধরবার চেষ্টা করছেন?" বলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালালেন। মাথা নীচু করে নন্দলাল আর তার দুই সঙ্গী কনেষ্টবল তখনকার মত প্রাণে বাঁচলেন। প্রফুল্লও পরপর দুটি গুলি চালিয়ে দিলেন নিজের দেহে। অতলস্পর্শ দেশপ্রেমে দেখিয়ে গেলেন মৃত্যুকে বিদ্রূপ করে সুদুর্গম গৌরবের পথে, বিপ্লবী জীবনের পরিপূর্ণ কৃতার্থতা—শাশ্বতের দীপশিখা। ফটো তুলে নেওয়া সত্বেও সনাক্তকরণের নাম

করে তাঁর মাথাটা কেটে আনা হ'ল মজঃফরপুরে।(১) বিচারের মানে কি নৃশংসতা। ফরাসী বিপ্লবের সময় হয়ত ঠিক এমনি করে 'M. Valaze'এর মৃতদেহ থেকে তাঁর মাথাটা কেটে আনা হয়েছিল।

মৃতদেহ সনাক্ত করলেন তহশীলদার খাঁ আর ফয়জুদ্দীন—দুই কনেষ্টবল কিংসফোর্ডের বাড়ীর সামনে পাহারা দেবার জন্যে বিশেষ করে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী আদালতের কনিষ্ঠ কেরানী শ্রীকেশবলাল চট্টোপাধ্যায়। পুলিশের শেখানো মিথ্যেকে সত্য বলে চালিয়ে পুরস্কার স্বরূপ হলেন রায়সাহেব—শেষ পর্যন্ত গভর্ণরের পার্শ্বচর। গোলামীর মূল্য পুরাপুরিই পেলেন। আর প্রফুল্লর অসমাপ্ত কাজ শেষ হ'ল কলকাতায় কিছুদিন পরে। তাঁর স্মৃতিতর্পণ হল নন্দলালের রক্তে ৯ই নভেম্বর সার্পেণ্টাইন লেনে। মৃত্যুবেদনার আর্তস্বর আজও ইতিহাসের বিপুল ধারার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। সাবাস বাংলার তরুণের দল। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি Brett ও Ryves মহোদয়গণ মজঃফরপুরের স্পেশাল জজ মিঃ H. W. Carndruff এর রায় বাহাল রাখলেন। অ্যাডভোকেট্ শ্রীনরেন্দ্র কুমার বসু রংপুরের শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ক্ষুদিরামকে বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। ১৯০৮ সনের ১১ই আগস্ট ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেল। অকৃপণ আত্মত্যাগের মাঝে মৃত্যুর নিরানন্দ নির্বাসন—অমরত্বের শাশ্বত সোপান। গণ্ডক নদীর তীরে তাঁর দেহ 'সৎকার করা হ'ল।(২)

উদ্যতস্পর্দ্ধা কিংসফোর্ড প্রাণে মরলেন না। কিন্তু তাঁর অন্তরে নামল অকালসন্ধ্যার নিকষ কঠিন কালো ছায়া। ভয়ে অসুস্থ

(১) 9 Calcutta Law Journal 55
(২) Roll of Honour—Kali Charan Ghose p. 166

হয়ে ২রা মে তিনি স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে পালালেন মুসৌরির অজ্ঞাতবাসে। বিপ্লবী দমনের মিথ্যা গর্ব, অদম্য প্রয়াস, বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি ও দুঃসহ অহংকারের উৎসাহ তাঁর নিভে গেল।(১) মজঃফরপুরের বোমার শব্দে সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরে জেগে উঠেছিল প্রাণের চাঞ্চল্য, এনেছিল কর্মোৎসাহের উদ্দীপনা। ভয়ার্ত ইংলণ্ডের কর্তারাও বিভীষিকাগ্রস্ত কিংসফোর্ডের অবস্থা দেখে প্রমাদ গুনেছিলেন।

মজঃফরপুরের ঘটনার পরই ৩২নং মুরারীপুকুর রোড মানিকতলার বাগানে ২রা মে খানাতল্লাসী হয়ে ধরা পড়ে গেলেন শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ নেতারা, ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীট থেকে শ্রীঅরবিন্দ ও আরও কয়েকজন। তল্লাসী হ'ল ৩৮।৪নং রাজা নবকিষণ ষ্ট্রীট, ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড আর দেওঘরে 'শীলস লজ্'। ধরা পড়লেন সর্বসমেত একচল্লিশ জন। ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড থেকে ধরা পড়লেন শ্রীঅশোক নন্দী, ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে শ্রীকানাইলাল দত্ত আর শ্রীরামপুর থেকে শ্রীনরেন গোঁসাই। আরম্ভ হ'ল আলিপুর প্রথম বোমার মামলা।

চন্দননগর গোন্দলপাড়ার নরেনদা শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাল্য সঙ্গী। উভয়েরই উদ্যমে গোন্দলপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানিকতলা বাগানের প্রথম শাখা। তাই মাষ্টারমশায়ের চোখে গোন্দলপাড়া তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। চন্দননগরের শ্রীচারুচন্দ্র রায়কে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে উপেনদার পরামর্শে বারীনদা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ সন্ন্যাসীবেশে চন্দননগরের রানীঘাটে এসেছিলেন। সেই সময় শ্রীকানাইলাল দত্ত বোম্বাই থেকে মামার বাড়ী চন্দননগরে

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose, p. 166

এসে ডুপ্লেক্স স্কুলে ভর্ত্তি হন। মামা শ্রীমাখনলাল দত্তের আশ্রয়ে থাকবার সময় কানাইলাল শ্রীচারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায়েরও বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে অবদান অসামান্য। এই ধরপাকড়ের সময় শ্রীচারুচন্দ্র রায়ও বাদ গেলেন না। পরে ফরাসী চন্দন-নগরের লোক বলে আইনের অজুহাতে পেলেন মুক্তি। শ্রীকানাই লাল বি, এ পরীক্ষা দেবার কিছুদিন পরে উপেনদার পরামর্শে কলকাতায় চলে আসেন। তখন অস্ত্রসংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যাপারের জন্যে কর্মীর বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীউল্লাসকর দত্ত সে সময় নিজস্ব ফরমুলায় বোমা তৈরী করতে আরম্ভ করেছেন। এঁদের তখন উৎসাহের অন্ত নেই। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভাই। বরোদা থেকে আসার পর তিনি মানিকতলা বাগানের সমস্ত কাজই পরিচালনা করতেন। তিনি নরেনদাকে গোন্দলপাড়া থেকে সরিয়ে এনে মানিকতলা বাগানে রাখবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফরাসী এলাকার লোক বলে ভবিষ্যতে কেন্দ্রের বহুকাজের নির্ভরের আশায় উপেনদা ও হেমদা তাতে রাজী হননি। গোন্দলপাড়ায় নরেনদার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'বান্ধব সম্মিলনী' কর্মী সংগ্রহের যন্ত্রস্বরূপ ছিল!

মুরারীপুকুরের বাগান বাংলার বিপ্লবীদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার তীর্থক্ষেত্র। প্রাচীন যুগের তপোবনের মত এখানের খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমের অজ্ঞাতবাসের নির্জন পরিবেশে বিপ্লবীরা অর্জন করেছিলেন অপরিমিত সংযম, অখণ্ড বিশ্বাস, নিষ্ঠাদৃঢ়িষ্ঠ ধ্যান ও মৃত্যুভয়হীন আত্মসমাহিত শক্তি। অনুভব করেছিলেন শান্তির মর্মগত বিপুল ঐশ্বর্য ও স্তব্ধতার আধারভূত প্রকাণ্ড কাঠিন্য—আয়ত্ব করেছিলেন লোকব্যবহারে কোমলতা আর স্বধর্মরক্ষার দৃঢ়তা। সেই বাগানের অক্ষয় স্মৃতি রক্ষে করার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীন সরকার করলেন না—এর চেয়ে

পরিতাপের বিষয় আর কিছু নেই।

আলিপুরের প্রথম মামলা চলার সময় শ্রীনরেন্দ্রনাথ গোস্বামী হয়ে গেলেন রাজসাক্ষী। অসংযত চরিত্র দুর্বলতার বিলাস। পুলিশ পেয়ে গেল বাগানের মাটির নীচে থেকে রাইফেল রিভলভার আর অন্যান্য বিস্ফোরক জিনিস। বিপ্লবীরা জেল থেকে পালাবার বন্দোবস্ত করে শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্করের এক ভাগ্নে শ্রীবালাজী পাড়ারকরের সাহায্যে উত্তরভারত পর্যন্ত যাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। জেল থেকে বের হবার জন্যে হাসপাতলের ডাক্তারের সাহায্যে শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চাবির ছাঁচ তৈরী করালেন। এ সময়ে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের অপর এক অস্ত্র আইনের মামলায় ১৯০৮ সনের ২৮শে জুন জড়িত হয়ে ৪ঠা জুলাই দু'মাসের দণ্ড পান আর পরে আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হয়। তিনি তখন হাসপাতালে। শ্রীরামপুরের জমিদার বংশীয় গোস্বামী রাজসাক্ষী হওয়ায় উপেনদা ও হেমদা বিচলিত হয়ে উঠলেন। কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে পৌরুষকে নিবিস্ট করে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম গোস্বামী হত্যার পরিকল্পনা করেন। নরমেধযজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ হতে দেরী হ'ল না। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগাযোগ করলেন বাইরে থেকে। শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় রিভলবার পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল। এ কাজে শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ আরও অনেকে সাহায্য করেছিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে কেউ কেউ যেতেন বন্দীদের খাবার দিতে। নরেনদা ক্ষীরের ভেতর একটি রিভলবার দিয়ে এলেন আর দ্বিতীয় যন্ত্রটা নিয়ে গেলেন শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্যের ভাই শ্রীউপেন্দ্রনাথ ওরফে কালো। তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন অনেকগুলি নারকেল নাড়ু— ইসারায় জানালেন যে তিনি যন্ত্র এনেছেন। হেমদা সেটা বুঝতে

পেরে সকলের সামনে বললেন "ওরে দিন ত আমাদের ফুরিয়ে এল, দিয়ে যা, নারকেল নাড়ুর হরির লুট।" সঙ্গে সঙ্গে শ্রীউপেন্দ্রনাথ নারকেলনাড়ু ছড়াতে লাগলেন—জেল কর্মচারিদের লক্ষ্য কোথায় নারকেল নাড়ু পড়ছে—সেই ফাঁকে যন্ত্রটা পাচার হয়ে গেল—কি আশ্চর্য তৎপরতা।(১) গোঁসাই হত্যার ষড়যন্ত্র হেমদা, উপেনদা ও সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ জানতেন না পরে জেনেছিলেন কানাইলাল। এমন কি শ্রীঅরবিন্দও জানতেন না। পরামর্শক্রমে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জেলজীবন অসহ্য হচ্ছে অছিলায় রাজসাক্ষী হতে প্রস্তুত এমন মনোভাব গোঁসাইকে জানান—ফলে সরকার উভয়ের ঘন ঘন সাক্ষাতের সুবিধে করে দেন। হাসপাতালের আইরিশ ডাক্তার সরল মনে শ্রীঅরবিন্দকে জানান যে বোধহয় সত্যেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হবেন। উপেনদা ও হেমদা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন বলে অভিনয় করলেন। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতে হুকুম জারী করলেন যে তাঁর হুকুম ছাড়া কেউ হাসপাতালে যাবেন না—হাসপাতালে থাকলে চলে আসতে হবে। সেদিন কানাইলাল 'শব সাধনায় নিযুক্ত আছি' বলে একটি কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন পরে পেটের যন্ত্রণার অস্থিরতার ভান দেখিয়ে গেলেন হাসপাতালে। পরদিন ১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর গোঁসাই হাসপাতালে এলে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে বারান্দার একধারে গিয়ে গুলি করলেন। গোঁসাই রক্তাক্ত অবস্থায় পালাতে আরম্ভ করা মাত্র দু'জন ফিরিঙ্গী প্রহরী এসে সত্যেন্দ্রনাথকে বাধা দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রহরীদের ধস্তাধস্তির সময় সত্যেন্দ্রনাথ একজনকে গুলি করলেন। সে সুযোগে কানাইলাল গোঁসাইকে তাড়া করেন। তাঁকে সে অবস্থায় দেখে ভয়ে প্রহরী হাসপাতালের ফটক খুলে পালিয়ে

(১) শ্রীবিভূতিভূষণ সরকারের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ।

যায়। বিশ্বাসঘাতকতার গহ্বর থেকে পাছে নরেন বেঁচে উঠে তাই তিনি শেষ গুলিটি পর্যন্ত ছুড়েছিলেন—তারপর দাঁড়িয়েছিলেন হাসিমুখে—যেন কিছুই হয় নি। আত্মবিস্মৃত সূর্যের সহস্র কিরণ তখন তাঁর মুখে পরিব্যাপ্ত। গোঁসাই ২৪শে, ২৫শে, ২৯শে জুন আর ৩রা জুলাই অনেক কথা বলে দেন। তাঁকে মারবার আর একদিন দেরী হলে পুলিশ আরও অনেক গোপন সংবাদ পেয়ে যেতেন। ফাঁসির হুকুম হ'ল দুজনেরই। বিপ্লবী জীবনের আনন্দ, মলিন পঙ্কশয্যা ছেড়ে ভারতবাসীর হৃদয়ের অনুতরঙ্গ সরোবরে শতদল হয়ে উঠল ফুটে। ১৯০৮ সনের ১০ই নভেম্বর কানাইলালের আর ২৩শে নভেম্বর সতেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়ে গেল। ১৯০৯ সনের সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীর ৺শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন—

"গোঁসাই হ'ল গুলি খোর কানাই নিল ফাঁসি
কোন্ চোখে বা কাঁদি বল কোন্ চোখে বা হাসি ?"

বিশ্বাসঘাতকের হত্যার সংবাদে বিপ্লবীদের মনে এনে দিল নতুন আশার বাণী। প্যারিসের 'ল্যামাচিতে' পত্রিকা বাংলার বিপ্লবীদের করলেন অকুণ্ঠভাষায় উচ্ছসিত প্রশংসা—দেশ পেল সর্বাঙ্গীন আনন্দের গৌরব।

শ্রীঅরবিন্দ একা থাকতেন একটি ভিন্ন সেলে। কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন সহকর্মী শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার। দেখলেন তাঁর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। সর্বাঙ্গে চুলকানি হয়েছে কিন্তু শরীরের ভেতর থেকে একটা আলো একটা জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। বিভূতিদা বললেন—"সেজদা আমার সেলে কার্বলিক সাবান আছে পাঠিয়ে দেবো—চুলকানি সেরে যাবে।" উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বললেন "মা যে কাল রাতে ধুইয়ে দিয়ে গেছেন—তিনি রোজ এসে স্নান করিয়ে দেন।" বিভূতিদা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন "বাসুদেব এসেছিলেন, আমার জন্যে চিন্তা করো না। বিশ্বজগৎ যে তাঁর অমৃতময় আনন্দ তাঁর প্রেম।" কর্মজীবনের সঙ্গী একই অপরাধে বিচারাধীন সহকর্মী বিভূতিদার সীমাহীন শ্রদ্ধায় চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। ভাবলেন এবার হয়ত শ্রীঅরবিন্দ অন্য জগতের মানুষ হয়ে যাবেন। তাঁর অন্তরের চৈতন্যগুহার অন্ধকারে পরম জ্যোতির তপস্যা চলেছে —নিশীথ রাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পাচ্ছে কলোচ্ছাস ধারায়। আজও সেদিনের স্মৃতি বিভূতিদার মনে জ্বল জ্বল করছে। 'পুষ্পের নৈবেদ্যসম চরিতার্থ জীবনের বাণী।'(১) ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

স্বল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কানাইলালের সহপাঠি শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডিচেরী যাবার আগে শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ী থেকে নিজের বাড়ীতে আনেন—পরে এক ভাড়া বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন। তখন শ্রীরায়ের বাড়ীতে আত্মগোপনের অনেক অসুবিধে হচ্ছিল বলে মতিবাবু নিজেই তাঁর নিরপত্তা রক্ষের জন্যে এব্যবস্থা করেন। নরেনদাই যোগাযোগ করে চন্দননগরের মেয়র মঃ ত্যার্দিভালের উপর বোমা ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। মানিকতলা বাগানের তৈরী বোমা নরেনদা আনলেন বারীনদা আর উপেনদার সাহায্যে। পড়ল মঃ ত্যার্দিভালের বৈঠকখানা ঘরে—ছুড়লেন শ্রীইন্দুভূষণ রায়—সঙ্গে ছিলেন শ্রীনরেন্দ্র গোস্বামী আর পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ (২) কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত R. I. C. 450 বোরের বড় রিভলভার আর 380 বোরের Osborne রিভলভার পাঠানোর ব্যবস্থা ও মঃ ত্যার্দিভ্যালের ঘরে বোমা ফেলা এদু'টি

(১) শ্রীবিভূতিভূষণ সরকারের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ।

(২) রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাপারকে কল্পনার সাহায্যে অনেকেই নানাভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। জেল কর্তৃপক্ষ ধারণাই করতে পারেন নি যে কেমন করে কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে রিভলভার জেলখানায় আসতে পারে। যে দু'জন আসামী ওভারসীয়ার Mr. Higgins ও Mr. Lilton এঁদের সঙ্গে বরাবর ছিলেন তাঁরাও কল্পনা করতে পারেন নি যে কেমন করে প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এঁরা যন্ত্র সংগ্রহ করলেন। কিন্তু অস্ত্র এসেছিল আর তা' দিয়ে বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড হয়েছিল এটা তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে কানাইলালের শেষকৃত্য করবার ব্যবস্থা হয়। কয়েক হাজার নরনারী সে বিষাদময় শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে নতশিরে বীরের প্রতি শেষ সম্মান দেখান। সরকার এসব দেখে জেল কোডের ৮৪০ ধারা সংশোধন করে শ্রীসত্যেন্দ্র নাথের মৃতদেহ আত্মীয় স্বজনের হাতে দিতে অসম্মতি জানান।

এ সময় চন্দননগর ও মানকুণ্ডু রেল ষ্টেশনের মাঝ বরাবর এক জায়গায় লাটসাহেবের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হ'ল কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হয়ে গেল। পরে আর একবার চেষ্টা করতে গিয়ে রাখার দোষে বোমাটা ফাটল না।

আলিপুর প্রথম বোমার মামলায় আলিপুরের সেসন্স জজ অ্যাসেসারদের সঙ্গে একমত হয়ে শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও শ্রীউল্লাসকর দত্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সর্বশ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, বিভূতিভূষণ সরকার, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, সুধীরকুমার সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাসকানুনগো, বীরেন্দ্র সেন, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ইন্দুভূষণ রায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আর পরেশচন্দ্র মৌলিক, শিশির কুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায়ের দশ বৎসরের ও সুশীল সেন ও বালকৃষ্ণ হরিকানের সাত বছরের ও কৃষ্ণজীবন কাঞ্জিলালের এক বছরের জেলের হুকুম

দেন। হাইকোর্ট আপীলে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীউল্লাসকর দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও শ্রীহেমচন্দ্র দাস কানুনগোর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার শ্রীহৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, শ্রীইন্দুভূষণ রায়ের দশ বছরের দ্বীপান্তর, শ্রীসুধীর কুমার সরকার, শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন ও শ্রীপরেশনাথ মৌলিকের সাত বছরের, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ ও শ্রীনিরাপদ রায়ের পাঁচ বছরের জেল হয়। শ্রীবালকৃষ্ণ হরিকানে মুক্তি পান। শ্রীসুশীল সেন, শ্রীকৃষ্ণজীবন সান্যাল ও শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দীর মামলায় দুই বিচারপতির মতভেদ হওয়ায় তৃতীয় বিচারপতি তাঁদের মুক্তি দেন। শ্রীসুশীল সেন ১৯০৮ সনের ১৫ই মে সিলেটের বেনিয়াচঙ্গ থেকে ধরা পড়েন। পিতা শ্রীকৈলাসচন্দ্র সেন ছিলেন সাবরেজিষ্ট্রার। শ্রীঅশোক নন্দী বিচারাধীন অবস্থায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯০৯ সনের ১৬ই আগষ্ট ইহলোক ত্যাগ করেন। ৩৭ জনকে নিয়ে বিচার চলেছিল। আঠারোজন আপীল করেন। ফরিয়াদী—পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ও বিচারপতি—আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বীচক্রফট্—শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী আর আসামী পক্ষের সমর্থক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা আইনজীবি।(১)

"ছাত্র ভাণ্ডার" নামে বিপ্লবীদের একটি দোকান ছিল—তাঁদের কর্মকেন্দ্র। পুলিশের চক্রান্তে সেটা নষ্ট হয়ে গেল। কড়া নজর রাখা হ'ল ৪নং হ্যারিসন রোড ও ২৩ নং স্কটস্ লেনের উপর। বাংলার এই আন্দোলন সেদিন সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল—তুলেছিল মানুষের প্রাণে নতুন আলোড়ন। সারা ভারতের দৃষ্টি তখন বাংলার দিকে। "একবার বিদায় দে মা ফিরে আসি" গান শুনে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক খুব কমই

(১) Indian Law Reprot 37 Calcutta 467.

ছিল। জনগণের সহানুভূতি ও বহুক্ষেত্রে বিত্তবানদের গোপন সাহায্যেই এ বৈপ্লবিক সংগ্রাম গড়ে উঠতে পেরেছিল। অন্যদিকে দুরপনেয় অবিশ্বাসে ও অসংযত শস্ত্রশাসনে সরকারের রাজদণ্ড যতই খরধার হতে আরম্ভ হ'ল ভারতবাসীর মন ততই বিষাদে ভারাক্রান্ত ও নির্বাক নৈরাশ্যে বিষতিক্ত হয়ে উঠতে লাগল। তাঁরা মনে মনে বুঝলেন যে অনুনয় বিনয়ের প্রদক্ষিণ পথে স্বাধীনতা কোনদিনই আসবে না। সে সময় ছাত্রদের মধ্যে প্রচার কার্যে অগ্রণী ছিলেন শ্রীঠহলরাম গঙ্গারাম ও মিঃ লিয়াকৎ হোসেন। শ্রীটহলরাম ডেরাইস্‌মাইলখাঁর লোক। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে নেমে পড়েন স্বদেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে।

১৯০৮ সনের ৮ই জুলাই মেদিনীপুরে ধরা পড়লেন কয়েকজন—একজনের বাড়ী থেকে পুলিশের কর্তা আবিষ্কার করলেন বোমা। কুড়ি জনের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বর মাসে মামলা আরম্ভ হ'ল। বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে কয়েকজন পেলেন মুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে চলল দমনের চণ্ডনীতি—দোষী নির্দোষ সকলেরই উপর পড়ল শনির দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত সতের জনের বিরুদ্ধে ৯ই নভেম্বর মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হ'ল। শ্রীজগজীবন ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখার্জী ও শ্রীসন্তোষ কুমার দাসের বিরুদ্ধে চলল মামলা। এ ব্যাপারটা কৃতিত্ব নেবার জন্যে সবটাই পুলিশের সৃষ্ট জিনিস। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই পুলিশের লোকেরা নিজেদের চাকরি জীবনের উন্নতির জন্যে আগে থেকে আগ্নেয়াস্ত্রাদি বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে রেখে কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করতেন। এটাও সেই ধরণের। বিচার চলাকালীন পুলিশের কারসাজির কথা প্রমাণ হয়ে গেল, গুপ্তচর রাখালচন্দ্র লাহার জেরায়। তা সত্ত্বেও মেদিনীপুরের অতিরিক্ত সেসন্স জজ Mr. H. Smither জগজীবন ঘোষ ও সন্তোষ কুমার দাসের দশ বছর ও সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জীর সাত বছর কারাদণ্ডের

আদেশ দিলেন। আপীলে তাঁরা মুক্তি পেলেন আর অপ্রয়োজনীয় অপকর্মের জন্যে রাখালচন্দ্র লাহার জেল হয়ে গেল সাড়ে তিন বছর। (১) পুলিশের বুদ্ধিভ্রষ্ট হীন প্রচেষ্টা হ'ল ব্যর্থ!

এ সময় বিপ্লবীরা অর্থ সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অর্থের অভাবে কোন কাজই সম্ভব হচ্ছিল না, তাই জেলায় জেলায় চলল তার প্রচেষ্টা ধারণাতীত বৈচিত্র্যে। (২) সরকারের তরফেও সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৯ সনের ৫ই জানুয়ারী গেজেটে প্রকাশ করে "ঢাকা অনুশীলন সমিতি", "বরিশাল স্বদেশ বান্ধব সমিতি", "ফরিদপুর ব্রতী সমিতি", "মৈমনসিং সুহৃদ্ সমিতি" ও "সাধনা সমাজ" বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করা হ'ল।

৩রা আগষ্ট নাটোর রোড মেল ডাকাতি সম্পর্কে ধরা পড়লেন শ্রীকালিচরণ ঠাকুর—জামিনের আবেদন অকারণে বারবার হ'ল অগ্রাহ্য। রোগে তাঁর স্বাস্থ্যের ঘটল দিন দিন অবনতি—শেষে বড় দিনের সময় জেলের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন। "শত লক্ষ সমুদ্র বেলায় মিলিয়ে গেল চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা।"

১৯০৮ সনের ৭ই নভেম্বর ওভারটুন হলে বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যার এনড্রুজ ফ্রেজারকে স্পর্ধিত নির্ভয়ে ও অসংকোচে গুলি করলেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। রিভলভারটা খারাপ ছিল—মন্দভাগ্য—ঘোড়াটা গেল আটকে। সাজা হয়ে গেল দশ বছরের। ৯ই নভেম্বর সার্পেণ্টাইন লেনে পুলিশ সাবইনসপেক্টর শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ করে বিপ্লবীরা প্রতিশোধ নিলেন প্রফুল্লচাকীর আত্মোৎসর্গের। তিনি চলেছিলেন আলিপুর বোমার মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী দিতে। যাতে তিনি কোন রকমে পালাতে না পারেন তার জন্যে রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন সর্বশ্রী যোগেশ চন্দ্র মিত্র, ননীগোপাল গুপ্ত, চারুচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র সেন, নরেন্দ্র

---

(১) Indian Law Report 36 Calcutta 808.

(২) বিশদ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বসু, ভূষণ মিত্র, রুক্মিণী রায়, রনেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ও শ্রীশচন্দ্র পাল। (১) আর সামনের একটি বাড়ীর দোতলার জানালায় সশস্ত্র দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী কি অবিচলিত সংকল্প, কি দুর্বার উত্তেজনা। কেউই ধরা পড়লেন না। শ্রীপ্রফুল্ল চাকীর অসমাপ্ত কাজ আর তাঁর স্মৃতিতর্পণ হ'ল নন্দলালের রক্তে। মৃত্যুবেদনার আর্তস্বর আজও ইতিহাসের বিপুল ধারার মধ্যে সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। সাবাস বাংলার তরুণের দল। ১৩ই নভেম্বর ঢাকা জেলার চন্দনহাল গ্রামের শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী নামে একটি কিশোরকে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার অপরাধে ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিতে হ'ল।

১৯০৮ সনের ১১ই ডিসেম্বর সংশোধিত ফৌজদারী আইন পাশ হয়ে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'আত্মোন্নতি সমিতি' বে-আইনী বলে ঘোষিত হ'ল। তার আগে থেকেই শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর গুপ্ত সমিতি 'মুক্তি সংঘের' কর্মীদের নিয়ন্ত্রিত করতে আরম্ভ করেন। ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট নেতা শ্রীপুলিন বিহারী দাসকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। প্রায় চোদ্দমাস পরে পেলেন মুক্তি। বিপ্লবীরা একে একে দু' দলে ভাগ হয়ে গিয়ে একদল যুগান্তর আর একদল অনুশীলন নাম দিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। ১৯০৮ সনে আলিগড় থেকে ধরা পড়লেন শ্রীহোতিলাল বর্মা— কলকাতার 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সংবাদদাতা। বিপ্লবের উৎসাহ-বাণী প্রচারের অপরাধে তাঁর দশ বছরের জেল হ'য়ে গেল। এলাহাবাদের স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশান্তিনারায়ণেরও দীর্ঘ দিনের কারাদণ্ড হ'ল—অপরাধ মজঃফরপুরের বোমার ব্যাপারকে পরোক্ষভাবে সমর্থন।

১৯০৯ সনের ১লা জানুয়ারী বিপ্লবীরা নববর্ষের সূচনা করলেন অসাধারণ নৈপুণ্যে কুমিল্লায় ঢাকার নবাবের মালখানা থেকে তিনটি

(১) 13 Calcutta Weekly Notes 593

রাইফেল সরিয়ে। কেমন করে তাঁরা এ কাজ করলেন আজও অনেকে তা' জানেন না। মুক্তি সংঘের কর্মীদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয়-ভাবে দেশের জন্য এগিয়ে চলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী শ্রীশ পাল, গুণেন ঘোষ, মাখন চক্রবর্তী, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, রাজেন গুহ, বিভূতি বসু, ক্ষিতিপতি মিত্র, ডাঃ সুরেন্দ্র বর্ধন প্রভৃতির অবদান অসামান্য। ১৯০৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর বোমার মামলার পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীআশুতোষ বিশ্বাসকে সুবার্বন পুলিশকোর্টের সামনে গুলি করলেন শ্রীচারুচন্দ্র বসু। কাজের শেষে বিকেল ৪-২০ মিনিটের সময় পূবদিকের ফটক দিয়ে যখন আশুবাবু দক্ষিণমুখে যাচ্ছিলেন তখন রুগ্নদেহ, ভগ্নস্বাস্থ্য, বিকলাঙ্গ এক কিশোর তাঁকে অব্যর্থ লক্ষ্যে গুলি করলেন। ভয়ার্তের বাণী 'বাপ্‌রে' বলেই তিনি ছুটতে গেলেন—মুখে তখন তাঁর আসন্ন মৃত্যুবিভীষিকার ছায়া—। কিন্তু চারুচন্দ্র তাঁকে পালাবার অবসর না দিয়ে তাঁর পিঠের উপর রিভলভারের নল লাগিয়ে দ্বিতীয় গুলি করলেন—সেটা তাঁর দেহ ভেদ করে চলে গেল। শ্রীচারুচন্দ্রের ডান হাত ছিল কব্জি পর্যন্ত—চেটো বা আঙ্গুল ছিল না। সেই ভাঙ্গা হাতেই রিভলভারটা ভাল করে বেঁধে বাঁ হাত দিয়ে ঘোড়া টিপ্‌ছিলেন। একজন কনেষ্টবল তাঁকে পিছন দিক থেকে জাপটে ধরা সত্ত্বেও তিনি তৃতীয় গুলি ছুড়লেন। আশুবাবু কোর্ট সাবইনস্পেক্টরের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন মারা। চারুচন্দ্রের মুখে তখন অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতা—যেন রুদ্রাণীর তৃতীয় নয়ন থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে প্রলয়ের আগুন। বিপ্লবীরা চিরদিনই নির্ভীক নিরাসক্ত। আরও দু'জন কনেষ্টবল এসে চারুচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে সেই রুগ্ন কিশোরের উপর চালানো হল নির্মম নির্যাতন। কিন্তু তাঁর মনে তখন আঘাত-সহিষ্ণু নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, অন্তর বিকারহীন। রসিকতা করে বললেন যে ঢাকার শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল কলকাতার বেনেটোলা থেকে তাঁকে জানিয়েছেন যে

একাজের জন্যে লটারীতে তাঁর নাম উঠেছে। শক্তির অজস্র অপব্যয় ও বিস্তর চেষ্টা করেও পুলিশ সেই কাল্পনিক পাঁচকড়ির কোথাও সন্ধান পেলেন না। (১)

২৪ পরগণার জেলাশাসকের প্রশ্নের উত্তরে নির্ভীক চারুচন্দ্র বললেন "বিশ্বেস মশাই দেশের শত্রু—নিজের উন্নতির জন্যে নির্দোষ লোকেদের শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করাই ছিল তাঁর পেশা। তাই দেশের একান্ত প্রয়োজনে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হ'ল। আমি অন্যায় কিছু করিনি।" তখন সেই কিশোরের সাধনা মৃত্যুর পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে সিদ্ধির আনন্দে উদ্বেলিত। তিনি মনে মনে বুঝলেন তাঁর ভাগ্যে আছে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান—বললেন "আমার জন্যে দায়রা বিচারের কোন প্রয়োজন দেখছি না। কালই আমি ফাঁসি যেতে প্রস্তুত। দেরী করে লাভ কি? আমার হাতে আশুবাবুর মৃত্যু আর তার জন্যে আমার ফাঁসি—এত কল্যাণময় ভগবানের নির্দেশ।" চেয়ে রইলেন ম্যাজিষ্ট্রেট চারুচন্দ্রের মুখের দিকে—দেখলেন কণা পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি প্রচ্ছন্ন। ১৯০৯ সনের ১৯শে মার্চ তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। দেশহিতব্রতে উৎসর্গ করা জীবনের সমস্ত মালিন্য মুছে গিয়ে ভেসে উঠল কর্তব্য নিষ্ঠা—মৃত্যুহীন বীজ নতুন তেজে হ'ল অঙ্কুরিত। অবিচলিত চারুচন্দ্র হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় নিলেন—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অমৃতে উত্তীর্ণ হয়ে অর্জন করলেন দেশবাসীর সীমাহীন শ্রদ্ধা। লে গেলেন চিরজীবনের গম্যস্থান অমৃত নিকেতনে।

১৯০৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি শ্রীবিনায়ক সাভারকর ইণ্ডিয়া হাউসের এক পাচক শ্রীচতুর্ভুজ আমীনের জিনিসপত্রের সঙ্গে কুড়িটি ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তল ও কিছু কার্তুজ পাঠালেন। শ্রীআমীন বোম্বাই পৌঁছুবার আগেই ২৮শে ফেব্রুয়ারী

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose 205

শ্রীবিনায়ক সাভারকরের দাদা শ্রীগণেশ সাভারকর ধরা পড়লেন। ৬ই মার্চ বোম্বাই পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীআমীনের মালপত্র তল্লাসী করে পুলিশ যন্ত্রাদি পেয়ে গেল কিন্তু শ্রীআমীনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে দু'একটা যন্ত্র সরে গেল। ৯ই জুন শ্রীগণেশ সাভারকর "লঘু অভিনব ভারত মেলা" পুস্তিকা প্রণয়নের অপরাধে রাজদ্রোহী বলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হলেন। কি সুন্দর বিচার!

১৯০৯ সনের ২রা জুন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার অপরাধে গোবেশ বলে একটি ছেলেকে মারতে গিয়ে অনুশীলন সমিতির সভ্যেরা ভুল করে তারই মত দেখতে তার ছোট ভাই প্রিয়মোহনকে শেষ করে দিলেন। একের দোষে অন্যজন পেলেন শাস্তি—প্রয়োজনে বিপ্লবীরা অন্তরে নির্দয় কর্তব্যেও নির্মম।

ইতিমধ্যে ভারতের বাইরে ১৯০৯ সনের ১লা জুলাই লণ্ডনে শ্রীমদনলাল ধীঙ্গড়া কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলিকে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের এক গ্যালারিতে কাছথেকে সুযোগ বুঝে গুলি করে মারলেন। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়া অফিসের পলিটিক্যাল এ. ডি. সি.। সেকালে ইংরেজরা লোকের মনে এই ধারণা জন্মাতে চেষ্টা করত যে কালা চামড়ার গুলিতে সাদা আদমি মরে না। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীধীঙ্গড়া প্রমাণ করতে চাইলেন যে ভারতীয়দের জীবনের সাধনা বিকারগ্রস্ত নয়—কালার গুলিতে সাদাও মরে। ওয়াইলিকে বাঁচাতে গিয়ে পার্শী ভদ্রলোক ডাঃ লালকাকাও নিহত হলেন। এই কারণেই শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমাধব রাওকে Inn of court থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। শ্রীকৃষ্ণবর্মা ও বীর সাভারকরের ব্যারিষ্টারির সনদ কেড়ে নেওয়া হ'ল। শ্রীমাধব রাও ও শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায় পালিয়ে এলেন প্যারিসে শ্রীমতী মাদাম কামার আশ্রয়ে। সঙ্গে এলেন শ্রীত্রিমূল আচারিয়া ও শ্রীআমীন। শ্রীআমীন পরে কোন

অজ্ঞাত কারণে করলেন আত্মহত্যা। শ্রীমদন ধীঙ্গড়ার ফাঁসি হয়ে গেল ১৯০৯ সালের ১৭ই আগষ্ট Pentonville জেলে। ধীঙ্গড়া মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে করলেন উদ্ভাসিত। মরণকে অগ্রাহ্য করে বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে তিনি মৃত্যুর পূর্বে বললেন "আমার পরাজয় নেই—রুদ্র, তোমার প্রসন্নতা অন্তহীন—আবার যেন ভাবতে জন্মে দেশের স্বাধীনতার জন্যে মিলে যেতে পারি মৃত্যুমহাসাগরসঙ্গমে—এই প্রার্থনা।" মিঃ চার্চিল তখন কলোনীর আণ্ডার সেক্রেটারী—বললেন "The finest ever made in the name of patriotism. গান্ধীজি বললেন "Those who believe that India has gained by Dhingra's acts and other similar acts in India make a serious mistake. Dhingra was a patriot but his love was blind. He gave his body in a wrong way, its result can only be mischievous." (১)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন সরকারি চাকরী করতেন—ছিলেন হুইলার সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র। কলকাতার পুলিশ কমিশনার যতীন্দ্রনাথের নামে হুইলার সাহেবের কাছে তাঁর কার্য-কলাপের নিন্দে করতেন—হুইলার সাহেব সে কথায় বিশ্বাস করতেন না। হাওড়া গ্যাং কেসে ১৯০৯ সনের ২৭শে অক্টোবর ধরা পড়লেন শ্রীললিত মোহন চক্রবর্তী আর তাঁর স্বীকারোক্তির ফলে ১৯০৯ সনের ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে ধরা পড়লেন ৪৬ জন। শ্রীযতীন্দ্রনাথও ধরা পড়লেন। পুলিশ কমিশনার ঠাট্টা করে হুইলার সাহেবকে বললেন "Your Jatin Wheeler is arrested in a gang case". মিঃ হুইলারের সে তামাসা সহ্য হ'ল না—টেবিল চাপড়ে বললেন "আমি বলছি যতীন বেকসুর খালাস পাবে।" এই ৪৬ জনকে নিয়ে আরম্ভ হ'ল হাওড়া গ্যাং কেস।

(১) Life of Mohondas Karamchand Gandhi—D. G. Tendulkar.

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডুভাল ১৯১০ সনের ২০শে জুলাই আসামীদের হাইকোর্ট স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে সোপর্দ করলেন। এই মামলায় সর্বশ্রীননীগোপাল সেনগুপ্ত, ভুবন মুখার্জী, বিভূপদ চ্যাটার্জী, যোগেশ চন্দ্র মিত্র, অতুল মুখার্জী, গণেশ দাস, নরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, শৈলেন্দ্র কুমার দাস, রজনী ভট্টাচার্য, ইন্দু কিরণ ভট্টাচার্য ওরফে চক্রবর্তী, তিনকড়ি দাস, চুনীলাল নন্দী, বিধুভূষণ বিশ্বাস, সুশীলকুমার বিশ্বাস, মন্মথনাথ বিশ্বাস, বিজয় চক্রবর্তী, শ্রীশচন্দ্র সরকার, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভূষণচন্দ্র মিত্র, বিমলাচরণ দেব, শরৎচন্দ্র মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দে, কালিপদ চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, দাশরথী চ্যাটার্জী, শিবু হাজরা, অতুল পাল, মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, কিরণ চন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী, চারুচন্দ্র ঘোষ, পুলিন বিহারী সরকার ওরফে মিত্র, রামপদ মুখার্জী, ভূপেন্দ্র রায়চৌধুরী, তারানাথ রায়চৌধুরী, কার্তিক চন্দ্র দত্ত, পবিত্র দত্ত, অন্নদা রায় ও নরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জী, হলেন আসামী। হরিদাস চক্রবর্তী, ললিত কুমার চ্যাটার্জী, হেমচন্দ্র সেন, নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, বিভূতি ভূষণ মুখার্জী, প্রকৃতি বিশ্বাস ওরফে মজুমদার ও কৃষ্ণপদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ না পাওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের ছেড়ে দিলেন। ললিত মোহন চক্রবর্তী ও শ্রীযতীন্দ্র দাস রাজসাক্ষী হওয়ায় খালাস পান এঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অভিযোগে বিচার চলল। ১৯১১ সনের ১৯শে এপ্রিল হাইকোর্টের রায়ে এঁরা মুক্তি পেলেন। ললিতের স্বীকারোক্তির ফলে হলুদবাড়ী ডাকাতি মামলায় ছ'জনের দণ্ড হয়ে গেল। এ দলে কেশব দে নামে এক গুপ্তচর পুলিশের হয়ে কাজ করছিল। কয়েকদিন তার উপর নজর রাখার পর হুকুম হয় তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। ললিত ও যতীন হাজরার স্বীকার-

উক্তিতে প্রকাশ পায় যে শ্রীভূষণ মিত্র ও শ্রীতিনকড়ি দাসের উপর এ কাজের ভার পড়ে। (১) ডায়মণ্ডহারবারের এক জঙ্গলে কেশবকে কৌশলে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে ভয়ে তার মুখ থেকে গাধার ডাক বেরুতে আরম্ভ হয়। (২) প্রাণের আতঙ্ক এমনি জিনিস। অপূর্ণতার অসংগতি বিচিত্র।

১৯০৯ সনের নভেম্বর মাসে লর্ড মিণ্টো ও লেডী মিণ্টো গেলেন আমেদাবাদ। একদিন তাঁদের গাড়ীর মধ্যে পড়ল দুটো বোমা। ক্ষমতাভিমানের আবর্ত উঠল ফেনিল হয়ে—সৌভাগ্যের জোরে তাঁরা বেঁচে গেলেন। আরম্ভ হ'ল গোয়ালিয়র ষড়যন্ত্র মামলা। পুলিশের অনুসন্ধানে প্রকাশ হ'ল যে অভিনব ভারত সমিতির ইতিমধ্যে বোম্বাই, পুনা, পেন, আওরঙ্গাবাদ, হায়দারাবাদ এমন কি গোয়ালিয়রেও বৈপ্লবিক সংগঠনের সমস্ত কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আরম্ভ হ'ল ধরপাকড়। অভিনব ভারত সমিতির উনিশ জন ও নবভারতের তিনজন এই বাইশজনকে নিয়ে চলল মামলা —অর্ধেকের বেশীর হয়ে গেল কারাদণ্ড।

ত্রিপুরার রাজার অভিষেক উপলক্ষ্যে বাংলার লাটসাহেব যখন আগরতলা যান তখন ১৯০৯ সনের ২৪শে নভেম্বর তাঁকে মারবার চেষ্টায় নিযুক্ত তিনজন সন্ন্যাসীবেশী বিপ্লবী ধরা পড়ে গেলেন।

শ্রীগণেশ সাভারকরের প্রবন্ধের জন্যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডে সকলেই বিচলিত হয়ে উঠলেন। অভিনব ভারত সমিতির সভ্য শ্রীঅনন্তলক্ষণ কানড়ে ছিলেন আওরঙ্গাবাদে। শ্রীবিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে তাঁকে ডেকে পাঠালেন নাসিকের জেলা শাসক মিঃ জ্যাকসন্‌কে হত্যার পরিকল্পনায়। অজ্ঞাতের আমন্ত্রণে অদৃশ্যের সংকেতে ছুটে এলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণগোপাল কার্ভে এ পরিকল্পনার পূর্ণ রূপায়ন করে কাজে নেমে পড়লেন। অন্ধকারময় জীবনের

(১) 13 Calcutta weekly Notes 593

(২) শ্রীবিমলা চরণ দেবের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ।

রুদ্ধ বাতায়নে বিরহী আত্মা উঠল কেঁদে—কল্পলোকের অদৃশ্য ইসারায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠল জ্বলে। আয়োজন হ'ল সম্পূর্ণ। মিঃ জ্যাকসন্ নাসিক থেকে পুণায় বদলি হচ্ছেন বলে তাঁর বিদায় সম্বর্ধনার জন্যে ১৯০৯ সনের ২১শে ডিসেম্বর বিজয়ানন্দ থিয়েটার হলে একটি অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। টিকিট সংগ্রহ করে শ্রীঅনন্তলক্ষণ একটি পিস্তল ও কিছু পটাসিয়াম সায়েনাইড সঙ্গে নিয়ে থিয়েটার হলে বসলেন। আর একজন মিঃ জ্যাকসনের জন্যে নির্ধারিত আসনের কাছে আসন নিলেন—উদ্দেশ্য অনন্ত লক্ষণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তিনি গুলি চালাবেন। আর শ্রীদেশপাণ্ডে নিজে তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে বসলেন—দুজনে না পারলে অত্যাচারী মিঃ জ্যাকসন্‌কে তিনি শেষ করবেন। এ যাত্রা মিঃ জ্যাকসন্‌কে ফিরতে দেওয়া হবে না বলে তাঁরা কৃত-সংকল্প—অপদেবতার মূর্তি চূর্ণ করতেই হবে।

মিঃ জ্যাকসন হলে ঢুকে যখন নিজের আসনের দিকে চলেছেন অনন্তলক্ষণ তখন ক্ষুধিত বাঘের মত লাফিয়ে উঠেই গুলি করলেন—উত্তেজনার অনবধানে প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দ্বিতীয় গুলিতে মাংসলপৃথুল দেহ প্রাণহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তবুও এগিয়ে এসে একটার পর একটা দারুণতম মৃত্যুবানে তিনি মিঃ জ্যাকসনের নিশ্চেতন দেহ জর্জরিত করে দিলেন। অন্তরের অশান্তির উন্মন্থন, অধৈর্যের আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। পাছে অনন্তলক্ষণ আত্মহত্যা করেন সেজন্যে সকলে তাঁকে ধরে ফেলতে তিনি সেই অহেতুক অধিকারকে অগ্রাহ্য করে বললেন "আমি যে কৃতকার্য হয়েছি এর চেয়ে সুখ আর কিছুতে নেই। আমাদের মধ্যে নেই বুদ্ধির দ্বিধা, মৃত্যুর পীড়া, স্বার্থের বন্ধন বা ক্ষতির আশঙ্কা। আমরা ত সব সময় মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান।" মুখে ফুটে উঠল আনন্দের অভাবনীয় বিকাশ নিঃশেষহীন নবীনতা, অমৃত-কলমন্দ্র-কল্লোলিত স্রোতস্বতীর মাধুর্য।

২৪শে ডিসেম্বর ধরা পড়লেন শ্রীকৃষ্ণগোপাল কার্ভে—তারপর অনেকে। ১৯১০ সনের ১৪ই জানুয়ারী অনন্তলক্ষ্মণ, বিনায়ক নারায়ণ ও কৃষ্ণগোপাল প্রমুখ সাতজনের বিচার আরম্ভ হয়ে ২৯শে মার্চ এই তিনজনের ফাঁসি, তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর একজনের দু'বছরের জেল হয়ে গেল। ১৯শে এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটায় বোম্বাইয়ের থানা স্পেশাল জেলে তিনজনের ফাঁসি হয়ে গেল। অজস্রধারার সেই জীবন হ'ল অবসাদহীন। চলে গেলেন ভারতের তিনটি কৃতি সন্তান মেঘমন্দ্র গর্জনে কর্মের বিজয়রথে। প্রমাণ করে গেলেন যে যাঁরা প্রাণ দিতে পারেন তাঁদেরই জীবন ধারণ সার্থক—চরম লক্ষ্যই পরম সত্য। ফাঁসির মঞ্চে অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে আকাঙ্খার কীর্ত্তিপ্রতিমায় অনন্ত-জীবনের পরম রহস্যের জ্যোতির্ম্ময় আভাসে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত উঠল ঝংকৃত হয়ে। জ্যাকসন হত্যার জন্যে ব্যবহৃত পিস্তলটি শ্রীবিনায়ক সাভারকর প্রেরিত যন্ত্রগুলির অন্যতম এই সন্দেহে এই হত্যার সাহায্যকারী হিসেবে তাঁকে ইংলণ্ডে গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠানোর বন্দোবস্ত হয়। ১৯১০ সনের ১৩ই মার্চ তাঁকে যখন ভারতে পাঠানো হচ্ছে তখন মের্সাই বন্দরে জাহাজ পৌছুলে তিনি শৌচাগারে যাবার নাম করে ফাঁকি দিয়ে লাফিয়ে সমুদ্রে পড়েন। তীরে এলে ফরাসী পুলিশ তাঁকে ধরে ইংরেজের হাতে তুলে দেন। মাদাম কামা বহু চেষ্টা করেও তাঁকে মুক্ত করতে পারলেন না।

কয়েকদিন পরেই আরম্ভ হ'ল নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা—বিচারাধীন ৩৮ জন। কয়েকজন রাজসাক্ষীর জবানবন্দী থেকে পুলিশ প্রমাণ করল যে শ্রীবিনায়ক সাভারকর প্রবর্তিত ১৮৯৯ সনের 'মিত্রমেলা' পরে 'অভিনব ভারত' নাম নিয়ে ১৯০৪ সন থেকে বৈপ্লবিক কর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত। লণ্ডন থেকে আসার পর বোম্বাইয়ে আমীন যে ব্রাউনিং পিস্তল দু'টি কৌশলে সরিয়ে ফেলেন তারই একটি মিঃ জ্যাক্সনের

হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে। সরকার শ্রীগণেশ বিনায়ক সাভার-করকেও এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে দিয়ে আর একবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দিলেন। শ্রীবিনায়ক সাভারকরেরও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

আলিপুর বোমার মামলার রায়ের বিরুদ্ধে তখন হাইকোর্টে আপীল চলছে। সরকার পক্ষের কর্ণধার সুযোগ্য ডেপুটি কমিশনার মিঃ শামসুল আলম। ১৯১০ সনের ২৪শে জানুয়ারী কাছারীর কাজ সেরে সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নামছেন আর তাঁর সামনে নামছেন অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল মিঃ জি. এইচ. বি. কেনরিক আর পিছনে একজন সশস্ত্র কনেষ্টবল। সেই অবস্থায় শ্রীবীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত মিঃ আলমকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি মিঃ শামসুল আলম কি না? তিনি উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদত্তগুপ্ত তাঁকে সামনা-সামনি গুলি করে হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে এলেন। সশস্ত্র কনেষ্টবল ভয়ে তখন থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছেন। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে অশ্বারোহী পুলিশ ও জনতার হাতে তিনি বাধা পেয়ে পুলিশকে গুলি করলেন কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে ৩৮০ বোরের রিভলভার পাওয়া গেল। দেখা গেল সেটা যাজপুরের সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট রায় পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বাহাদুরের খোয়া যাওয়া রিভলভার। রায় বাহাদুর কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়া এলে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার রিভলভারটি সরিয়ে ফেলেন। শ্রীদত্তগুপ্ত শুনলেন যে মিঃ আলম মারা গেছেন। সব অবসাদ দূরে গিয়ে জীবনের সমস্ত আনন্দ তখন উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। এর আগে দু'দুবার মিঃ আলমের প্রাণনাশের চেষ্টা বিফল হয়ে গেছে।

১৯১০ সনের ৩১শে জানুয়ারী শ্রীদত্তগুপ্তের বিচার আরম্ভ হয়ে ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। তিনি নির্বিকার চিত্তে সে কথা শুনলেন। ফাঁসির আগের দিন পুলিশ আর একটি ঘৃণ্যতম কাজের পরিচয়

দিলেন। একটি নকল খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দীর মাধ্যমে শ্রীদত্তগুপ্তের নামে নানা রকমের কুৎসার পরিচয় ছাপিয়ে মৃত্যুপথযাত্রীকে প্রতারণা করে দেখান হ'ল যেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় তাঁর বিরুদ্ধে একথা বলেছেন। তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হ'ল যে যদি তিনি বলেন যে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি একাজ করেছেন তবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে। বীরেন্দ্রনাথ শ্রীযতীন্দ্রনাথকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। তিনি এ ব্যাপারে কিছুক্ষণের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। মনে মনে বুঝেছিলেন যে এ পুলিশের কারসাজি। কি এক অশান্তিপ্রদ মর্মান্তিক পরিস্থিতি! তাঁর এ সাময়িক ভাবান্তর লক্ষ্য করে পুলিশ কৌশলে একটি সাদা কাগজে ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর নাম সই করিয়ে নিলেন। কিন্তু সে কৌশল কাজে লাগল না। এ স্বীকারোক্তি প্রমাণের জন্য তাঁর সাক্ষ্যের প্রয়োজন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে তাঁর জেরা হবে কিন্তু ফাঁসির দিন ২১শে ধার্য হয়ে গেছে। পুলিশের কর্তারা শেষ চেষ্টার জন্যে ছুটলেন গভর্ণরের কাছে যদি তাঁর অনুমতিতে দু'চার দিন ফাঁসি স্থগিত থাকে। পুলিশ গভর্ণরকে এ দুরভিসন্ধির কথা জানাতে পারলেন না। গভর্ণরও পুলিশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ না বুঝেই সরাসরি তা' প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন "হত্যাকারীকে একদিন বেশী বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়।" ১৯১০ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী আঠারো বছরের বীর্যবান দৃঢ়চিত্ত শ্রীবীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল। পুলিশের মিথ্যে সম্বলের স্বীকারোক্তি আপনা হতেই দেউলে হয়ে গেল। তা' সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ শ্রীযতীন্দ্র নাথের নামে পৃথক মামলা আনলেন ঐ স্বাকারোক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট ১৯১১ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী সে স্বীকারোক্তি আইন বিরুদ্ধ বলে রায় দিলেন।

১৯০৯ সনের ১৭ই মে ইংরেজ সরকার একটি গোপন সার্কুলার (Circular No 810 P-D) জারি করলেন তাতে রাজদ্রোহ ও

বিপ্লব আন্দোলন বন্ধ করবার উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হ'ল আর বলা হ'ল যে যদি কোন সরকারি কর্মচারীর আত্মীয় স্বজন এ আন্দোলনে লিপ্ত আছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

১৯১০ সনের ১৩ই আগষ্ট মালদহের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ অধিকারী ও ১২ই সেপ্টেম্বর রংপুরের শ্রীসুরেশচন্দ্র সান্যালের দু'বছরের জেল হয়ে গেল-- অপরাধ রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধাদি ছাত্রদের মধ্যে প্রচার। এ সময় এক অর্থ সংগ্রহের মামলায় ধরা পড়লেন ঘোষ নগরের শ্রীকালাচাঁদ বসু। পুলিশ হাজতে তাঁকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। তদন্তে কোন ফল হ'ল না—মৃত্যুর কারণ আজও অজ্ঞাত। ৫ই সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জে ধরা পড়লেন শ্রী ললিতচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর বাড়ীতে এগারটি বোমা আরও অনেক জিনিস পাওয়া গেল। হয়ে গেল যাবজীবন দ্বীপান্তর। এঁর সঙ্গে ধরা পড়লেন শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীহরকুমার ধর। তাঁরা অব্যাহতি পেলেন।

এ সময় সরকার বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধাদি প্রকাশ বন্ধ করবার জন্যে শামসুল আলমের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে জড়াবার চেষ্টা করতেই বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীবিজয় নাগের সঙ্গে নৌকোয় চলে এলেন চন্দননগর। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আত্ম-গোপন করে থাকার পর ভগিনী নিবেদিতার বার বার অনুরোধে পণ্ডীচেরী যাবার মনস্থ করে প্রথমে পাঠালেন শ্রীঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীকে। পরে নিজে চলে গেলেন গোপনে। অধ্যাত্মজীবনের আকর্ষণও কম ছিল না। তাঁর যাবার প্রায় সমস্ত বন্দোবস্ত ভগিনী নিবেদিতাই করে দিয়েছিলেন? ইংরেজ জানতে পেরে পণ্ডীচেরী থেকে তাঁকে অপহরণ করবার চেষ্টায় ফরাসী জাহাজের এক ষ্টিভেডোরের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কলহ ও আক্রোশে ষ্টিভেডোরকে মেরে বসলেন এক নাবিক। নাবিক পরে করলেন আত্মহত্যা। চক্রান্ত ব্যর্থ হ'ল।

ভগিনী নিবেদিতার নাম ম্যার্গারেট আলফ্রেড নোবেল। উত্তর সমুদ্রতীর আয়র্লণ্ড থেকে তিনি এসেছিলেন দক্ষিণসাগর উপকূল বাংলায়, ত্যাগী শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণ বাহু হয়ে। শুনেছিলেন বিশ্বের দরবারে মহিমাময় ভারতবর্ষের মহত্তমবাণী—ত্যাগ, দুঃখ, মৈত্রী ও আত্মার গৌরব। নবীন সিনফিন আন্দোলনের ধারক ও বাহক এসেছিলেন সনাতন অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের গৈরিক পরিখায়। দেখেছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ভারতবর্ষের অন্তরের গরিমাময় আলোক দীপ্তি, সত্যের ঐশ্বর্য। বেলুড়ের ক্ষুদ্র রামকৃষ্ণ মিশন সে শক্তিকে সেদিন আবৃত করতে পারে নি—তিনি ছড়িয়ে ও জড়িয়ে গেলেন মুক্তিমন্ত্র বিপ্লবের অগ্নিশিখায়। স্বামী বিবেকানন্দ বুঝে ছিলেন যে সাময়িক তমোগুণে আচ্ছন্ন ভারতবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হলে রজোগুণ সমৃদ্ধ কর্মীর প্রয়োজন। তাই তিনি যখন পরমানন্দে পাশ্চাত্যকে মোক্ষধর্মের অমৃত বাণী শোনাচ্ছিলেন তখন নিঃশেষহীন তপস্যার ভারতবর্ষের গৌরব উদ্ধারের জন্যে বিশুদ্ধ রজোগুণান্বিত কর্মী সংগ্রহ করতে গিয়ে লণ্ডনে সাক্ষাৎ পেলেন রক্তরাঙ্গা নোবেলের। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তিনি বুঝেছিলেন যে এ নারী সামান্যা নন—তিনি বিপ্লবী, দাবদাহের মত আকস্মিক, তিনি ধ্বংসের মশাল, তিনি শ্মশানের শবারূঢ়া কালিকা, কপালমালিনী, রক্তাম্বরা ভীষণা। সত্ত্বগুণে গুণান্বিতা হয়ে নিবেদিতা এলেন—আত্মপরিচয়ের সত্যে, আনন্দের বিদ্যুতে দেখলেন ভারতীয় জীবনে নতুন রক্তের জোয়ার। শ্রীচৈতন্য যে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলেন, উন্মুক্ত করেছিলেন হিরন্ময় পাত্রে যে সত্যের আবরণ, স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরের বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায় দেখিয়েছিলেন ভারতীয় জীবনের যে নবজাগরণ, ভগিনী নিবেদিতা তারই পরিচয়ে দেখলেন বিপুল শক্তির আধার, অধ্যাত্ম জগতের সহজঐশ্বর্যবান পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ সেই বিপ্লব, সেই সত্য, সেই নবজাগরণের কর্ণধার। আত্মহননের বহ্ন্যুৎসবে ইন্ধন

জোগালেন নিবেদিতা। তামসিকতার স্তূপিত তিমিরপুঞ্জে লাগল প্রদীপ্ত বহ্নির রঞ্জন—সেই অগ্নিপ্রবাহসত্ত্বের ধবল গঙ্গায় অবগাহন করে তিনি এগিয়ে এলেন সেই অসমাপ্ত পথের পরিক্রমায়—দারিদ্র্যের কঠিন বলে, মৌনতার স্তম্ভিত আবেগে, নিষ্ঠার কঠোর শান্তিতে ও বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্যে।

ভগিনী নিবেদিতা অনন্তকালের অনন্তজীবনের মানুষ—কর্ম ও আদর্শে সমর্পিত প্রাণ। নিরাবিল দৃষ্টিতে পরিস্ফুট লাবণ্যে তিনি দেখলেন ভারতজননীর অলক্ষ্য অন্তরের কল্যাণতম রূপ অন্তরতম সত্য। বুঝলেন ভারতের পরাধীনতার লৌহকপাট একদিন খুলবে—পাষাণ একদিন গলবে, মহাকালের দীর্ঘশ্বাস শেষ হবে। তাই তিনি সত্য সেবাব্রতী বিপ্লবীদের সবরকম সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর অনন্যদুর্লভ সেবাব্রতী তপোনিরত সুগভীর কল্যাণস্পর্শে সে যুগের বিপ্লবীরা হয়েছিলেন ধন্য। তাঁর বাণী একটি অখণ্ড জীবন দর্শন—অনন্ত আরতি দীপের কোনদিন নির্বাণ নেই।

এরপরে আর একবার শ্রীঅরবিন্দকে পণ্ডীচেরী থেকে সরাবার চেষ্টা হয়। লোক মারফত সরকার তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠান যে দার্জিলিং প্রকৃতির নিত্যবিলসিত আনন্দরূপের জগত। সেখানেই তাঁর সাধনার প্রকৃষ্টতম স্থান। শ্রীঅরবিন্দ সে কৌশলও বানচাল করে দেন।

১৯১০ সনের ১৮ই জুলাই হাইকোর্ট স্পেশাল ট্রাইবুনালে আরম্ভ হ'ল খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা—অভিযোগ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা, রাজদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। ৩০শে আগষ্ট সে মামলার রায়ে সর্বশ্রীঅবনীভূষণ চক্রবর্তী, বিধুভূষণ দে, অশ্বিনীকুমার বসু, নগেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, কালিদাস ঘোষ ও শচীন্দ্রলাল মিত্রের সাত বছর, নগেন্দ্রনাথ সরকার, সুধীর কুমার দে, প্রিয় ওরফে কিনু পয়ের পাঁচ বছর, ব্রজেন্দ্র কুমার দত্ত, সতীশ চ্যাটার্জীর তিন বছর জেল

হয়ে গেল। মোহিনীমোহন মিত্র ও মন্মথ নাথ মিত্র পেলেন মুক্তি। (১) নেতৃস্থানীয় শ্রীবিধুভূষণ বসু প্রভৃতি বিপ্লবীদের পিছনে পুলিশের চর ছায়ার মত লেগে রইল।

১৯১০ সনের ৮ই আগষ্ট পুলিশ ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধান আরম্ভ করে ২২শে নভেম্বর আসামীদের দায়রায় সোপর্দ করলেন। পুলিশপক্ষ প্রমান করতে চাইলেন যে এই অনুশীলন সমিতির সভ্যেরা বিপ্লবাত্মক কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরা দেখাতে চাইলেন যে দলের লোকেরা ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে সব রকম অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত—ডাকাতি, রাহাজানি, খুন জখম এঁদের প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার। অর্থ, অস্ত্র ও তরুণ বিপ্লবী সংগ্রহের জন্যে এঁরা না পারেন এমন কাজ নেই। পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক ডাকাতিগুলি এঁদেরই কীর্তি। এ মামলায় সর্বশ্রীপুলিন বিহারী দাসের সাতবছর, আশুতোষ গুপ্ত, জ্যোতির্ময় রায়, গুরুদয়াল দাস, ও বঙ্কিমচন্দ্র দাসের পাঁচবছর, ভূপতি মোহন সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, রাধিকা ভূষণ রায়, ক্ষীরোদচন্দ্র গুহ ও শান্তিপদ মুখার্জীর তিনবছর, ভূপেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, শশীভূষণ মিত্র, গোপীবল্লভ চক্রবর্তী ও প্রমোদ বিহারী দাসের দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

দেশের স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই তরুণেরা কোন দুর্গম কোন বিপদকেই কখনও ভয় পায় নি। অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে বারংবার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মত আত্মহননের বহ্নি-শিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করে নি। বাইরে থেকে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত স্বভাব, কর্তব্যে অটল কিন্তু অন্তর দেশপ্রেমে কমনীয়। এঁদের জীবনে আছে তরঙ্গ, আছে আবর্ত, আছে বিপর্যয়, তবুও এঁরা নির্ভীক। আনন্দময় মৃত্যুযজ্ঞের এঁরা সাগ্নিক পুরোহিত। প্রাণপণ সঞ্চয়ে এঁরা রচনা করেন মরণের অর্ঘ—দেশমাতৃকার

(১) 15 Calcutta weekly Notes 25

পাদপীঠতলে। দিগ্বলয়ের ইঙ্গিতলীন অজানা সংকেতে সংসার-ত্যাগী তবুও এঁরা বিধাতার ত্যাজ্যপুত্র—অন্তহারা কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত—সম্বল শুধু পরাধীনতার অন্ধকারে স্বাধীনতার আলোর অভাবিত স্বপ্ন। দুঃসাধ্য সাধনের দুরূহ পথের অনায়াস আহ্বানে আত্মবিস্মৃতির মধ্যে বিশ্বমর্মের নিত্যকালের বাণী—মৃত্যুর ভেতর দিয়ে এঁদের অমৃত লাভ করার ঐকান্তিক অভিলাষ—আর যিনি পরিপূর্ণ পূর্ণতা, সকল অস্তিত্বের যিনি অনন্ত উৎস—সেই ভগবানের উপর অখণ্ড বিশ্বাস।

ভারতের বাইরে আমেরিকায় সর্বশ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস, পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব খানখোঁজে, তারকনাথ দাস, অধরচন্দ্র লস্কর প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ ভারতীয় 'স্বাধীনতা সংঘের' কাজ পুরাদমে চালাতে লাগলেন। শক্তির আনন্দ সঞ্জীবিত হল বীর্যবান আনন্দের ঐশ্বর্যে।

১৯১০ সনের ১২ই নভেম্বর সতেরজনকে নিয়ে মুন্সীগঞ্জ ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনজনের বিরুদ্ধে চলে। ১৯১১ সনের ২রা মার্চ একজনের দশ বছরের সাজা হয়ে গেল।

১৯১১ সনে বিপ্লবীরা আরও বেশী সক্রিয় হয়ে উঠলেন. ১৯শে এপ্রিল ঢাকার রাউতভোগে শ্রীমনমোহন দে, নামে একজন স্বভাবনিষ্ঠুর অমানুষ গুপ্তচর নিহত হলেন। মনমোহন ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুন্সীগঞ্জ বোমার মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী। রাত্রি ১১ টার সময় একজন তাঁকে বাড়ীর বাইরে ডাকলেন। মনমোহন সন্দেহে দরজা না খোলায় তিনজন তাঁর দরজা ভেঙ্গে ঢুকে তাঁর স্ত্রীপুত্রের সামনে তাঁকে শেষ করে দিয়ে চলে এলেন।

এই সময় ১৯১১ সনের ১৭ই জুন মাদ্রাজ তিনেভেলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আশেকে, শ্রীভিঞ্চি আয়ার নামে এক যুবক রেলের কামরার মধ্যে গুলি করে মারলেন। প্রমাণ করলেন যে অত্যাচারীর পাড়নশক্তির দুর্জয়তায় মানুষকে অভিভূত করা যায়

না। শ্রীভিঞ্চি ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা করলেন। সর্বশ্রীনীল কান্ত ব্রহ্মচারী, শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার ও অন্যান্য এগারজনকে নিয়ে মামলা চলার পর ১৯১২ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টে ন'জনের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে গেল দীর্ঘদিনের। শ্রীভিঞ্চির পকেট থেকে একটি কাগজ পাওয়া যায় তাতে লেখা ছিল "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে ভিঞ্চি তার যথার্থ কর্তব্য করেছে।" বিচার চলাকালীন শ্রীভেঙ্কটেশ্বর আয়ার ও শ্রীধনঞ্জয় আয়ার ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসে আত্মহত্যা করেন। শ্রীসখারাম দাদাজী গোরে ১৯১৩ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী বন্দী অবস্থায় যক্ষ্মারোগে নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করলেন। (১) নির্মম অত্যাচারই এই আত্মহত্যা ও মৃত্যুর কারণ। শাসকদল এর নাম দিয়েছিলেন 'থার্ড ডিগ্রী মেথড্।'

১৯১১ সনের ১৯শে জুন মৈমনসিংএর সি, আই, ডি, পুলিশ সাবইন্‌স্পেক্টর শ্রীরাজকুমার রায়কে গুলি করে মারা হয়। তিনি যখন বাড়ী ঢুকছেন সে সময় একজন তাঁর কপাল লক্ষ্য করে গুলি করলেন—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে গেল। তখন বাংলার বিপ্লবীদের জীবনতরঙ্গ ঝরণার মত কলশব্দে নৃত্যের তরঙ্গে মেতে উঠেছে। ১১ই জুলাই ঢাকা সোনারংএ পিয়নকে জখম করা মামলায় সরকার পক্ষের সাক্ষী সর্বশ্রীরসুল দেওয়ান, আমেরি দেওয়ান ও কালী বিনোদ চক্রবর্তী শেষ হয়ে গেলেন। সন্ধ্যের সময় রসুলকে বাড়ীর বাইরে ডেকে এনে মারা হয় অন্য দু'জনেও ঠিক একই রকমভাবে প্রাণ হারালেন। কিন্তু কালীবিনোদ আহত হয়ে চারদিন বেঁচে ছিলেন। মুন্সীগঞ্জ হাসপাতালে ১৫ই জুলাই কালীবিনোদ মারা যান। কেউই ধরা পড়লেন না।

এ সময় বড়লাট লর্ড কার্জন ও প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনারের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলেছিল। প্রভুত্বের লড়াইয়ে পরাজিত লর্ড কার্জন অভিমানে পদত্যাগ করলেন। এলেন লর্ড মিণ্টো—ভারত-

(১) Englishman dt. 14. 2. 1913.

বাসীকে উপহার দিলেন তিনটি—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, লোক দেখানো সংস্কার আর নিরীহ স্বদেশী সরকারের সমর্থন।

অধীনতার অন্ধকূপে পঙ্গু মানুষের তখন আরম্ভ হয়েছে জীবনী শক্তির পূর্ণবিকাশ। শক্তির প্রাচুর্যেই মানুষের মুক্তি। ভগ্নমেরুদণ্ড নিষ্পেষিতপৌরুষ, তেজোহীন, আলোকবঞ্চিত উদাসীন, নতমস্তক ভারতবাসী দাঁড়িয়েছে স্বতঃ উৎসারিত আনন্দে অপমানের প্রতিশোধ নিতে। তাঁরা পরমানন্দে মৃত্যুর সুধা পান করতে কৃতসংকল্প। মানুষের সভ্যতা তার তপস্থার ভেতর দিয়েই অভিব্যক্ত।

১৯১১ সনের ২৩শে জানুয়ারী আরম্ভ হয় নাসিক দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা। সরকারের রাগ তখন শ্রীবিনায়ক সাভারকরের উপর। তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি ভোগ করতে। ছ' ভাই রইলেন আন্দামানের নিভৃত নির্জন কারাকক্ষে দীর্ঘদিন। নির্বিকার চিত্তে দণ্ডভোগ করতে লাগলেন—মেনে নিলেন সেটা ঈশ্বরের দান বলে। ইতিহাসের দেবতা ইতিহাসের ভেতর দিয়েই তাঁর পূজা নেন। বিপ্লবের অগ্নিশিখার আলোকই তাঁর সেই উৎসব।

এ সময়ে মৈমনসিংএর শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী কোন কাজের জন্যে ছ'জন সঙ্গীর সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় পড়ে যান বাঘের মুখে। সঙ্গী ছ'টির মধ্যে একটি বালক—তাকে রক্ষে করতে গিয়ে শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ প্রাণ দিলেন বাঘের হাতে। নীরব আত্মোৎসর্গের সাক্ষী হয়ে রইলেন ছ'জন। জঙ্গলের মধ্যেই তাঁকে সমাহিত করা হয়—কেউই জানল না। আন্দামান জেলে আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীইন্দুভূষণ রায় জেলারের অকথ্য অপমান ও ইংরেজ আবিষ্কৃত থার্ড ডিগ্রা মেথডের নিত্য নতুন নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ১৯১২ সনের ২৯শে এপ্রিল করলেন আত্মহত্যা। তদন্তের সময় জেলার নিজের দোষ গোপন করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হীনতায় দেখিয়ে দিলেন অন্য কারণ। মাতৃপূজার একটি বীর

পূজারী চলে গেলেন পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্যে। আজও এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান হ'ল না।

১৯১২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকার এক হেড্ কনেষ্টবল শ্রীরতিলাল রায় কয়েকজন বিপ্লবীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর সন্ধান পেয়ে তাঁকে ঝুলনবাড়ী লেনে গুলি করে শেষ করে সরে পড়লেন কয়েকজন তরুণ।

১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেল। রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে যাবার হ'ল সিদ্ধান্ত। বিহার ও উড়িষ্যা হ'ল স্বতন্ত্র প্রদেশ। গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্ট হ'ল আসামের অন্তর্ভুক্ত। দিল্লীতে রাজধানী হওয়ায় Indian Daily News লিখল—কাজটা ভাল হ'ল না। দিল্লী রাজবংশগুলির কবর স্থান—the grave of dynasties.

সে দিনের সে ভবিষ্যদ্বাণী যে ছত্রিশ বছর পরে বাস্তবরূপ নেবে তখন সেকথা কেউ কল্পনা করতেও পারে নি। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যেদিন কলকাতার প্রাসাদ ছাড়লেন সেই দিনই বাজ পড়ে ইউ-নিয়নজ্যাক্ পতাকা পুড়ে গেল—ছায়া পূর্বপথগামিনী। ইংরেজ সংস্কারমুক্ত জাত তাতে তাঁরা কিছুই মনে করলেন না।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবের আগুন জ্বলেছিল সে আগুন কিন্তু নিভল না। বিক্ষোভ তখন সারা দেশময় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার মত কোন অবস্থা ইংরেজ সৃষ্টি করতে পারলেন না।

১৯১২ সনের ২৮শে নভেম্বর শ্রীগিরীন্দ্রমোহন দাস নামে একজন তরুণ স্বীকারোক্তির অপরাধে প্রাণ দিলেন। এসময় মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য রাখবার জন্যে আব্দুর রহমান নামে একজন গুপ্তচরকে ১৩ই ডিসেম্বর মারার চেষ্টা হয়। তখন উত্তর-ভারতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যালের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'যুবক সমিতি।' শ্রীনলিনী মুখোপাধ্যায় ছিলেন দলের উদ্যোক্তা। ১৯১২ সনে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পেলেন মুক্তি আবার নতুন করে কর্ম-

প্রেরণা যোগাতে লাগলেন। শ্রীরাসবিহারী বসুও সৈন্যদের মধ্যে প্রচার কার্য আরম্ভ করলেন। সরকারের বুঝতে দেরী হ'ল না যে বিপ্লবীরা নতুন উদ্যমে কাজ করবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। জুন মাসে নোয়াখালী ফেনীতে এই সময় একজন যুবক বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড হিসেবে নিহত হ'লেন। তাঁর মাথাটা কেটে পুকুরে ফেলে দেওয়া হ'ল। অনুরূপ ভাবে শ্রীরজনীকান্ত দাস নামে একজনকে স্বীকারোক্তি করার জন্যে বিপ্লবীরা শেষ করে দিলেন। বহিঃশত্রু অপেক্ষা গৃহশত্রুর বিনাশ সর্বাগ্রে প্রয়োজন—এটা তারই আয়োজন ও নিদর্শন।

এদিকে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ছুড়লেন শ্রীবসন্ত বিশ্বাস—উত্তরপাড়ার শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে গড়া ছেলে। ১৯১২ সনের ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রা চলেছিল চাঁদনীচক্ ধরে। শ্রীরাস বিহারী বসুর নির্দেশে শ্রীবসন্ত বিশ্বাস সেই পথের ধারে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অলিন্দে অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেয়ে সেজে শ্রীমতী লীলাবতী নামে পরিচয় দিয়ে বসেছিলেন। ঠিক সময়ে দু'টি বোমা ছুড়ে সরে পড়লেন। বসন্ত বিশ্বাসের পূর্বপুরুষ শ্রীদিগম্বর বিশ্বাস ও শ্রীবিষ্ণুচরণ ১৮৬০ সনে নীলচাষের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক বিদ্রোহের করেছিলেন নেতৃত্ব। পিতা শ্রীমতিলাল বিশ্বাস পুত্র বসন্ত ও ভ্রাতুষ্পুত্র মন্মথকে স্কুলে পাঠালেন। মুড়াগাছা হাইস্কুলে বিপ্লবী শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন শিক্ষক। উপযুক্ত ছাত্র পেয়ে তিনি দু'ভাইকে করলেন অনুপ্রাণিত—লেখাপড়া ছেড়ে তাঁরা নেমে পড়লেন বৈপ্লবিক কাজে। শ্রীমন্মথ বিশ্বাস শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রমজীবি সমবায়ে" থেকে কাজ আরম্ভ করলেন। শ্রীরাসবিহারী বসুর অনুরোধে অমরদা বসন্তকে পাঠালেন দেরাদুন। সেখানে অজাতশ্মশ্রু বাঙালী যুবককে পুলিশ সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করায় আর্যসমাজের শ্রীবালমুকুন্দ তাঁকে লাহোর পাপুলার ফার্মেসীর কম্পাউণ্ডারের

কাজে শ্রীবিপিন দাস নাম দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। ১৯১২ সনের ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে যখন লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতীর পিঠে রাজকীয় সমারোহে চলেছেন তখন শ্রীরাস বিহারী বসু অপর দিক থেকে ইসারা করা মাত্র বসন্ত বোমা দু'টি ছুড়লেন। বোমা দু'টি বুকের কাছে লুকানো ছিল—মেয়ে বলে কেউ সন্দেহ করে নি। বসন্ত সরে পড়লেন। হাতীর মাহুত গেল মারা সঙ্গে সঙ্গে—লর্ড হার্ডিঞ্জ হলেন আহত—শোভাযাত্রা পণ্ড হয়ে গেল। আহত রক্তাক্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ বিষাদমনে প্রাসাদে ফিরলেন। বসন্ত দিল্লীতেই আত্ম-গোপন করে রইলেন কিছুদিন। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও কোন কিনারা করতে পারলেন না। ইংরেজ শাসনের প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল বোমার শব্দে। লেডি হার্ডিঞ্জের ভাষায় তাঁর স্বামীর ছ' জায়গায় আঘাত লাগে এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল ও কর্ণেল রবার্টস তাঁর শুশ্রুষার ভার নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বাংলায় ১৯১২ সালে জগদ্দল আলেকজাণ্ডার জুট মিলের অত্যাচারী ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রবার্ট-ও-ব্রায়ণকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়। মিলের কোন বাঙালী কেরাণীর তাঁর পদাঘাতে জীবনান্ত ঘটে। বিচারে মাত্র ৫০৲ টাকা জরিমানা হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল ইংরেজের কাছে ভারতবাসীর প্রাণের মূল্য মাত্র ৫০৲ টাকা। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে শ্রীহরিদাস দত্ত ও শ্রীখগেন দাস কুলির বেশে চটকলে কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব জানাজানি হ'য়ে গেল। ওব্রায়ন বেঁচে গেলেন। এঁদের দু'জনকে আত্মগোপন করতে হ'ল।

লর্ড হার্ডিঞ্জের আক্রমণকারীর সন্ধানের জন্যে ভারত সরকার ১৯১৩ সনের ২৪শে জানুয়ারী ঘোষণা করলেন যে যথার্থ অপরাধীর সন্ধান দিতে পারলে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। বসন্তও জুম্মা মসজিদের দেওয়ালে তার প্রত্যুত্তরে কাঠ

কয়লা দিয়ে লিখে রাখলেন "The bomb Thrower is still in Delhi. Anybody capturing him will be rewarded by twice the amount announced by Police."

১৯১৩ সনের ২৭শে মার্চ শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারে মিঃ গর্ডন নামে এক অত্যাচারী সিভিলিয়ানকে মারবার চেষ্টা হ'ল। মিঃ গর্ডন "অরুণাচল আশ্রমের" অধিবাসীদের উপর অকারণে অমানুষিক অত্যাচার চালান। বোমা বিস্ফোরণের সময় নিক্ষেপকারী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওরফে রামচন্দ্র মারা গেলেন। মিঃ গর্ডন রক্ষে পেলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্যে সরকার তাঁকে লাহোর জেলার কসুরে বদলী করে পাঠালেন।

বসন্ত এলেন লাহোরে। সেখানে লরেন্স গার্ডেনে পুলিশ অফিসারদের নৈশক্লাবে ফেললেন বোমা—মারা গেল একজন নিরীহ বেয়ারা। পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের যোগাযোগ প্রমান করা যায়। বাস্তবিকই তখন শ্রীরাসবিহারী বসু এ দু'জায়গার যোগ-সূত্র রক্ষে করছিলেন। ১৯১৪ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী শ্রীআমীর চাঁদের বন্ধু শ্রীআউধবিহারী ধরা পড়লেন। তাঁর ঘরে বিপ্লবাত্মক ইস্তাহার পাওয়া গেল। তখন তিনি লাহোর সেনট্রাল ট্রেনিং কলেজের ছাত্র কিন্তু থাকতেন দিল্লীতে। শ্রীআমীর চাঁদ আগে কাজ করতেন "কেম্‌ব্রিজ মিশন হাইস্কুলে"। ধরা পড়বার সময় তিনি ছিলেন চারখেওয়ালা সংস্কৃত স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর ঘর থেকে বিস্ফোরক পদার্থের ব্যবহার সম্বন্ধে ইস্তাহার ও পুস্তিকা পাওয়া গেল। শ্রীআমীরচাঁদ আর তাঁর আশ্রিত ভ্রাতুষ্পুত্র ১৯শে ফেব্রুয়ারী ধরা পড়লেন। পুলিশ তখন শ্রীরাসবিহারী বসুর খোঁজ করছেন। ১৪ই মার্চ তাঁর জন্যে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা হয়ে গেল। বসন্ত চলে এলেন নিজগ্রাম পরাগাছায়। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্যে যখন তিনি নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগরে বাজার

করতে এসেছেন তখন তাঁর এক জ্ঞাতিভাই সম্পত্তির লোভে থানায় খবর দিয়ে দিল। কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীমন্মথ মুখোপাধ্যায় এসে বললেন "এখনি পালাও আর দেরী করো না।" পুলিশের দয়াভিক্ষায় পালাবার লোক তিনি ছিলেন না। বিপদের মাঝে তাঁর আনন্দের সমারোহ, মৃত্যুর মাঝে তাঁর প্রাণের দীপ্তি, জীবনের চাঞ্চল্যে তাঁর অন্তরের অদ্বৈত সূত্র। ১৯১৪ সনের ২১শে মে দিল্লীতে দায়রা জজের আদালতে এঁদের বিচার আরম্ভ হয়ে ৫ই অক্টোবরের রায়ে শ্রীআমীর চাঁদ ও শ্রীআউধবিহারীর বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ২০ বৎসর দ্বীপান্তর ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে শ্রীবসন্ত বিশ্বাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর ষড়-যন্ত্রের অভিযোগে শ্রীআমীরচাঁদ, শ্রীআউধবিহারী ও শ্রীবালমুকুন্দের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। শ্রীআমীরচাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন তাঁরই অন্নে প্রতিপালিত সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র অকৃত্রিম আত্মীয়তার মূল্যে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত তিনজন ২২শে অক্টোবর আপীল করলেন। ফরিয়াদী তরফ থেকেও বসন্ত বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করা হ'ল। চারজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। ভারত সচিবের কাছে আবেদনও বিফল হ'ল। ১৯১৫ সনের ১লা মার্চ ভারত সচিব আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। ১৯১৫ সনের ১১ই মে আম্বালা জেলে দৈবহত চরিত্র চারজন বীরের ফাঁসি হয়ে গেল—মৃত্যু অঞ্জলিতে ওরা ভরে নিল অমৃতের ধারা। (১) বালমুকুন্দের ফাঁসির সংবাদ শুনে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রামরাখি অন্নজল ত্যাগ করে কয়েকদিনের মধ্যে স্বামীর অনুগমন করলেন। আত্মীয় স্বজনের অনুরোধ উপরোধে কোন ফল হ'ল না। নিঃসঙ্গ সম্পদের আহ্বানে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হলেন আকাঙ্খিত আনন্দনিকেতনের প্রাঙ্গণে। (২) এই মহীয়সী মহিলার চরিত্র অম্লান মহিমায় জ্যোতির্ময়।

(১) The Pioneer dt 14. 5. 1915
(২) The Roll of Honour—Kali Charan Ghose p 239

নিমেজের মন্দিরে অনেক সোনারূপা লুকানো আছে সংবাদ পেয়ে ১৯১৩ সনের ২০শে মার্চ শ্রীমতিচাঁদ চারজন সঙ্গী নিয়ে সে মন্দিরে হানা দেন। মোহন্ত বাধা দিতে গিয়ে মারা গেলেন। তখন সকলেই পালালেন পরে অন্য একটি মামলায় তাঁর নাম প্রকাশ হয়ে পড়ায় ১৯১৫ সনের ২৮শে জানুয়ারী শ্রীমতিচাঁদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। অন্যান্য সঙ্গীদেরও দণ্ড হয়ে যায়। প্রিভিকাউন্সিলে আপীলেও কোন ফল হ'ল না।

সরকার তখন দেশের লোকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে চাইলেন যে বিপ্লবীরা দেশের কাজের নামে ডাকাতি করে নিজেদের স্বার্থে তা' ব্যয় করে – তারা নির্দয় ও লোকের সর্বনাশ করতে কখনও পশ্চাদপদ হয় না। পুলিশের এ অপপ্রচার যে মিথ্যে তা' প্রমাণ হয়ে গেল কয়েকটি ডাকাতির সময়। ১৯১৩ সনের ৩রা এপ্রিল যখন এঁরা গোপালপুরে একটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছেন তখন একটি বিবাহিতা কন্যা তাঁর রোরুদ্যমান অবাধ্য শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। ডাকাতের চীৎকারে শিশুটিকে মাটিতে ফেলে মেয়েটি ভয়ে খাটের নীচে আশ্রয় নেন। ডাকাত দলের একজন শ্রীবামন চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে দুধ খাইয়ে শান্ত করলেন— বিনয় করে ভিক্ষে চাইলেন। মেয়েটি স্বেচ্ছায় আপন অঙ্গের অলঙ্কার খুলে দিলেন। শিশু ও মেয়েদের অঙ্গ স্পর্শ করে অলঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। (১)

১৯শে এপ্রিল কাউয়াখুড়ীর ডাকাতির পর আরম্ভ হয় ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলা। ধরা পড়লেন সাতাশী জন—শেষ পর্যন্ত সাতাশ জনকে দিয়ে মামলা চলে। শ্রীউপেন রাউথ রাজসাক্ষী হয়ে যান। আসামী পক্ষ সাক্ষী মানলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে। পরিহাসকুটিল আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর অশ্বিনী বাবু সমস্ত মামলার তদারক করছিলেন —তাঁর ডায়েরী গেল চুরি—। ঐ ডায়েরীতে এমন সব তথ্য ছিল

(১) বজ্রতীর্থ—শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী p 13—14.

যা' ম্যাজিষ্ট্রেটের অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অভাবে মোকদ্দমা তুলে নিতে হ'ল। (১)

১৯১৩ সনের ১৫ই মে শ্রীগিরীন্দ্র মোহন দাস, শ্রীসতীন্দ্র নাথ সেন প্রমুখ নেতারা বন্দী হলেন। চারদিকে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার চলল—ঢাকা, মানিকগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি থেকে সর্বসমেত ৪৪ জনের বিরুদ্ধে আরম্ভ হ'ল বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। ১৫ই মে থেকে ১৯শে মে-র মধ্যে হ'ল আরও অনেকের উপর অকর্মণ্য পুলিশের কাজ-দেখানো নির্যাতন। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করলেন। গভর্ণমেণ্ট সে লেখা বন্ধ করবার জন্যে পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকের নামে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করলেন—বিচারে কিন্তু সম্পাদক ও প্রকাশক পেলেন মুক্তি। ষড়যন্ত্র মামলায় অনেকের দণ্ড হয়ে গেল। সরকার থেকে অনুরূপ ভাবে মাদারীপুর ষড়যন্ত্র মামলা চালান হয়।

১৯১৩ সনের ১৬ই আগষ্ট মৈমনসিং কেদারপুরে পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের ফলে একটি তরুণ প্রাণ নষ্ট হ'ল। ২৯শে সেপ্টেম্বর কলেজ স্কোয়ারে হেড কনেষ্টবল শ্রীহরিপদ দেব নিহত হ'লেন। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর কাজ দেখবার জন্যে এক মেস থেকে মাঝুগ্রাম নিবাসী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামে এক নিরীহ ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে নানা রকম হায়রানির পর ছেড়ে দিলেন। পরে এ ঘটনার সঙ্গে গোন্দলপাড়ার শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়াবার বন্দোবস্ত হয় কিন্তু মানকুণ্ডু রেল ষ্টেশনের তখনকার ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীহরিসহায় প্রামাণিক পুলিশের হাজার জুলুম সত্ত্বেও মিথ্যে সাক্ষী দিতে রাজী হলেন না। (২) ষ্টেশনমাষ্টার দরিদ্র তবুও অর্থলোভ দেখিয়ে তাঁর চরিত্রকে মলিন করা গেল না। পুলিশের আয়োজন

(১) রক্ত-তীর্থ—শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী 15

(২) রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিফল হয়ে গেল। ৩০শে সেপ্টেম্বর মৈমনসিংএর অত্যাচারী পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে বোমা ফেলা হয়—মারা গেলেন ইন্‌স্পেক্টর।

১৯১৩ সনের ২১শে নভেম্বর ভোরবেলা পুলিশের কর্তারা ২৯৬/১ আপার সার্কুলার রোড তল্লাসী করে পেয়ে গেলেন বোমা ও বোমা তৈরীর মাল মশলা। তল্লাসী হ'ল সিলেট মৌলভী বাজারে ২৭শে মার্চের বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে। পুলিশের সন্দেহে ধরা পড়লেন শ্রীশশাংক শেখর হাজরা—নাম বললেন শ্রীঅমৃতলাল হাজরা। একে একে ধরা পড়লেন সর্বশ্রীদীনেশ দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে ও সারদা চরণ গুহ। ৬ই ডিসেম্বর সকালে ধরা পড়লেন শ্রীকালিপদ ঘোষ ওরফে শ্রীউপেন্দ্র লাল রায়চৌধুরী কলেজ ষ্ট্রীটে। আর বেনারসে ধরা পড়লেন শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৪ সনের ২৬শে জানুয়ারী ধরা পড়লেন শ্রীখগেন্দ্র নাথ চৌধুরী ওরফে সুরেশচন্দ্র চৌধুরী। পুলিশ প্রমাণ করতে চাইলেন বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র। শ্রীঅমৃত লাল হাজরার দ্বীপান্তর হয়ে গেল পনের বছর। (১)

তখন কলকাতায় শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রমজীবি সমবায়" নামে প্রতিষ্ঠান ছিল বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তার তত্ত্বাবধানে। পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি পড়ল সেখানে। অমরদাকে করতে হ'ল আত্মগোপন। বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে ১৯শে ডিসেম্বর বজবজে মারামারি ও দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হ'ল পুলিশের চক্রান্তে।

৩০শে ডিসেম্বর খবর পাওয়া গেল যে ভদ্রেশ্বর থানায় সেই রাতে অনেকগুলি পুলিশ অফিসার সমবেত হবেন। মাষ্টার মশাই-এর নির্দেশে নরেনদা ও তেলিনী পাড়ার শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

(১) Indian Law Reports 42 Calcutta 957.

থানার ভেতর বোমা ছোড়ার ব্যবস্থা করলেন—নিক্ষেপের দোষে সেটা ফাটল না।

প্রকৃতি ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর। ১৯১৪ সনের ১৯শে জানুয়ারী ঘুমভাঙ্গা মুমুক্ষু তরুণের দল প্রকাশ্য দিবালোকে চিৎপুর ও গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে গুলি করে মারলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষকে ট্রাম থেকে নামবার মুখে। (১) গুলি করে যখন তিনজন একটা গলির ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছেন তখন বাধা দিতে এসে প্রাণ হারালেন নিরীহ একজন। দু'জন সরে পড়লেন—ধরা পড়লেন শ্রীনির্মলকান্ত রায়। আইনের মার প্যাঁচে খালাস পেয়ে গেলেন। ২৬শে জানুয়ারী পুলিশ বরানগরের একটা বাড়ী তল্লাসী করে পেয়ে গেল রিভলভার আর অন্যান্য বিস্ফোরক জিনিস। ধরা পড়লেন দু'জন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চৌধুরী নাম বললেন শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ রায়। দু'জনেরই শাস্তি হয়ে গেল।

বহুদিন ধরে প্রবাসী ভারতীয় ও শিখেরা আমেরিকায় বসবাস করছিলেন। ১৯০৮ সনে শুধু কানাডায় শিখের সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার এবং অচিরে আরও বেশী আসার সম্ভাবনা ছিল। কানাডা-বাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে ও শ্বেতকায় জাতির স্বার্থের খাতিরে বিদেশীদের জন্যে নতুন এমিগ্রেসন আইন প্রণয়ন করার জন্য অসন্তোষ উঠল ঘনীভূত হয়ে। ভাঙ্কুবারের শিখেরাই বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ১৯১১ সনের ১৫ই ডিসেম্বর 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লীগ' ও 'খালসা দেওয়ান সমিতি' নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান ও গদর পার্টির লোকেরা ভারতীয়দের স্বার্থের জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁদের অভাব, অভিযোগ, দরবার কানাডা সরকার গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। গদর অর্থে বিদ্রোহ।

এ সময় শ্রীগুরুদিৎ সিং নামে এক ধনী ব্যবসায়ী ১৯১৩ সনে হংকং থেকে 'গুরু নানক নেভিগেসন কোম্পানির' নামে "কামা-

---

(১) Indian Law Report 41 Calcutta 1072.

গাটামারু” নামে একটি জাপানীজাহাজ নিয়ে ব্যবসার অজুহাতে ১৯১৪ সনের ৪ঠা এপ্রিল হংকং থেকে চললেন আমেরিকার দিকে। আসলে নতুন আইনের বিরুদ্ধে অভিযান তাই পথে কর্মী নিয়ে ২১শে মে ভিক্টোরিয়ায় ও ২৩শে মে ভাঙ্কুবারে পৌছুলেন। জাহাজে মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল তিনশ বাহাত্তর জন। কানাডা সরকারের মনে সন্দেহ জাগাতে এবং যাত্রীদের মধ্যে শিখের সংখ্যা বেশী জেনে তাঁরা সশস্ত্রপুলিশ দিয়ে জাহাজটি ঘিরে শুধু যাঁরা আমেরিকায় ফিরছিলেন এ রকম মাত্র ২১ জনকে নামবার অনুমতি দিলেন। জাহাজে তখন খাদ্য ও পানীয় সমাপ্ত প্রায়। যাত্রীদের আসল উদ্দেশ্য বুঝে তাদের সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ১৯শে জুলাই জাহাজটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম হ'ল। যাত্রীরা অনাহারে মরতে রাজী হলেন না, সরকারও জাহাজ হটাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। যাত্রীরা অনাহারে মরার চেয়ে লড়াই করে মরবার মনস্থ করায় সরকারের টনক নড়ল কেননা ভাঙ্কুবারের ভারতীয়েরা ভাঙ্কুবার জ্বালিয়ে দেবেন বলে জনরব শোনা গেল। কানাডা সরকার খাবার ও পানীয় দিয়ে জাহাজ ফিরিয়ে দিলেন ২৬শে জুলাই। কামাগাটামারু ১৬ই আগষ্ট ইয়াকোহামায় পৌছুল—। হংকং সরকার যাত্রীদের গদর পার্টির লোক মনে করে তাঁদের নামতে দিলেন না—শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার কলকাতায় আসবার অনুমতি দিলেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর কুলপির কাছে জাহাজ আটক করে যাত্রীদের ১৫ মিনিটের মধ্যে নেমে গিয়ে ট্রেনে চড়বার হুকুম হ'ল। ৬১ জন যাত্রী সঙ্গে সঙ্গে নেমে ট্রেনে চড়লেন—। সন্দেহ হ'ল ট্রেন কোথায় যাবে? যারা ঐ সময়ের মধ্যে নামতে পারলেন না তাদের লাথি মেরে ও বেওনেটের গুঁতোয় নামান হ'ল। যাত্রীরা ট্রেনে না চড়ে হেঁটে কলকাতা যেতে রাজী হলেন। তাঁরা প্রায় তিন মাইল এসেছেন এমন সময় কলকাতা থেকে পুলিশ রিজার্ভ ফোর্স গিয়ে তাঁদের ফিরে যাবার হুকুম দিল

এবং বজবজে পৌঁছুবার পর ষ্টীমারে চড়তে বলা হ'ল। তাঁরা তখন ট্রেনে চড়তে রাজী হলেন। কিন্তু সে অবস্থায় পুলিশের নির্যাতন সুরু হয়ে গেছে। চলল বেওনেট ও রাইফেলের গুলি। শ্রীটহল সিং ও অন্যান্য কয়েকজন শিখ সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা মরিয়া হয়ে খণ্ড যুদ্ধে নেমে পড়লেন সামান্য হাতিয়ার নিয়েই। কয়েকজন বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন—আর কয়েকজন পালিয়ে গেলেন। পুলিশের দলে মারা গেলেন সার্জেণ্ট মেজর ইষ্টউড, পাঞ্জাবী পুলিশ মাল সিং, কনেষ্টবল তরুণ সিং আর কয়েকজন সিপাই। ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ লোমাক্স ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। পুলিশ যাত্রীদের পিছন পিছন তাড়া করে গুলি চালাতে লাগল। ১২০ জন পাঞ্জাবী বন্দী হলেন। ৪০ জন হলেন নিহত।

আমেরিকার গদর পার্টি তখন কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কর্ম প্রস্তুত, কর্মীদল নিঃশঙ্ক নির্ভীক, ত্যাগের মহিমায় তখন তারা মৃত্যুজয়ী শক্তির অধিকারী, সত্যের দীক্ষায় তারা উদার, মৃত্যু ভয়ের চিহ্নমাত্রও তাদের মনে স্থান পায় না। তাঁরা বুঝেছেন যে সাধনার মাঝেই মানুষের ঐশ্বর্যের ভিত্তি, সুগভীর আনন্দের পরিপূর্ণতা। ১৯১৪ সনের ২৩শে মার্চ শ্রীহরদয়াল বন্দী হলেন। গদর পার্টির কর্মীবৃন্দ আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। কামাগাটামারুর শোকাবহ সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। শিখেরা দলে দলে ভারতবর্ষে বিপ্লব আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার জন্যে দেশে ফিরতে আরম্ভ করলেন। কামাগাটামারুর সংঘর্ষে আহত স্যার ফ্রেডারিক ও মিঃ হামফ্রীর জন্যে ও মিঃ লোমেক্সের মৃত্যুর প্রতিশোধে ইংরেজ ও কানাডা গভর্ণমেণ্ট গদর পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পুলিশের পুরাতন কর্মচারী মিঃ উইলিয়াম হপকিন্সকে ভার দিলেন।

মিঃ হপকিন্স বিচক্ষণ কর্মচারী। তিনি শিখদের সায়েস্তা করবার জন্যে শ্রীবেলা সিং নামে এক দেশদ্রোহীকে সহকারী নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে লাগলেন। শিখরাও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবেলা সিং-এর একজন অনুচরকে শেষ করে দিয়ে কয়েক দিন পরে প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রীঅর্জুন সিং নামে আর এক গুপ্তচরকে সরিয়ে দিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ শ্রীবেলা সিং মিঃ হপকিন্সের সহায়তায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন এবং মিঃ হপকিন্সও তাঁকে আনন্দে রাখবার জন্যে নানারকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বেলা সিং ১৯১৪ সনের আগষ্ট মাসে ভাঙ্কুবারের মন্দিরে ঢুকে প্রার্থনানিরত শ্রীভাগ সিং ও শ্রীরতন সিংকে গুলি করে মারলেন। শ্রীবেলা সিংএর বিরুদ্ধে নরহত্যার চার্জ ২১শে অক্টোবর গঠিত হ'ল কিন্তু মিঃ হপকিন্সের গোপন তদ্বিরে শ্রীবেলা সিং খালাস পেয়ে গেলেন। শিখ সম্প্রদায় মিঃ হপকিন্সকে মারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শ্রীসেওয়া ওরফে মেওয়া সিং নামে এক শিখ যুবক স্বেচ্ছায় সে কাজের ভার নিয়ে মিঃ হপকিন্সের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। মিঃ হপকিন্সও কোন রকমে তাঁর আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে রাজী হয়ে গেলেন। ১৯১৪ সনের ২১শে অক্টোবর আদালতে কর্মব্যস্ত মিঃ হপকিন্সকে শ্রীসেওয়া সিং সুযোগ বুঝে গুলি করে মারলেন। ১৯১৫ সনে ১১ জানুয়ারী তাঁর ফাঁসি হ'য়ে গেল। শ্রীসেওয়া সিংএর বহুদিনের চেষ্টা সফল হ'ল। জীবনের সত্য পরিচয় ও সমুজ্জ্বল আদর্শ রইল অম্লান হয়ে মহাকালের খাতায়।

১৯১৪ সনের ১৯শে জুন চট্টগ্রামে গুপ্তচর শ্রীসত্যেন্দ্র সেন খুন হলেন। বিপ্লবীরা জানতেন যে তাঁদের কাজের প্রধান অন্তরায় গুপ্তচর বিভীষণের দল। তাই তাদের সরাবার ব্যবস্থা তাঁরা সকলের আগেই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে নিধন করেছিলেন কিন্তু বিভীষণকে

অমর করেছিলেন। তাই আজও দেশে দেশে বিভীষণের জাতটা বেঁচে আছে ও চিরদিন থাকবেও।

তখনকারদিনে বাংলাদেশে গোয়েন্দা বিভাগে একজন ধুরন্ধর ছিলেন শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি উঠে পড়ে লাগলেন বাংলাদেশ থেকে বিপ্লববাদের মূল উৎপাটন করতে। বাংলার তরুণেরা খর্ব করতে চাইলেন তাঁর উদ্ধত কপটতা আর গালভরা আস্ফালন। ১৯১৪ সনের ১৯শে জুলাই ঢাকার বুড়ীগঙ্গার বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধের উপর সন্ধ্যে সাতটার সময় তাঁকে গুলি করলেন তরুণেরা। তিনি কোনরকমে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সে যাত্রা রক্ষে করলেন পৈতৃক প্রাণটা। মারা গেল তাঁর দেহরক্ষী কনেষ্টবল রামদাস। তার কিছুদিনের মধ্যে শ্রীরজনী দাস নামে একজনকে ও শ্রীসারদা চক্রবর্তী নামে আর একজনকে ১২ই জুন স্বীকারোক্তির ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণ দিতে হ'ল। এ সময় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় সর্বশ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মদনমোহন ভৌমিক ও আরও কয়েকজন অভিযুক্ত হন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও মদনমোহন ভৌমিকের দশ বছর, খগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সাত বছর ও অন্যান্য কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়ে গেল। নেতৃস্থানীয় একজন স্বীকারোক্তি করলেন। শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মৈমনসিংয়ের কাপাসাটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগারেই কাটে। এ সময় ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীমোহিনীমোহন বসুর আট বছরের দণ্ড হয়ে যায়।

১৯১৪ সনের আগষ্ট মাসের প্রথমেই ইউরোপে জ্বলে উঠল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা। তার দীপ্ত আলো এনে দিল ভারতের বিপ্লববাদীদের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা, নবজাগরণ জীবন মরণের তুচ্ছতাকে দূর করে। তাঁদের দুর্বার আশা, সুগভীর আদর্শ, মহান আত্মবিলয়ন তৃষ্ণা ও সংবেদনশীল মনের অভিব্যক্তি

পরিস্ফুট হয়ে উঠল রাজশক্তির বিরুদ্ধে। বিদেশস্থ ভারতীয় বিপ্লবীরা চাইলেন জার্মানদের সাহায্যে ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করতে। প্রসিদ্ধ লেখক বার্ণহার্ডি "Germany and the next war" নামে একখানি বই ১৯১১ সনের অক্টোবর মাসে প্রকাশ করেন। সেখানে ভারতের বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অনেক আশার কথা ছিল। তাতেই তাঁরা আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তখন আমেরিকায় শিখ শ্রমিকদের নিয়ে গদর পার্টি প্রচণ্ড সামর্থ্যে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বার্লিনস্থ ভারতীয়েরা জার্মানীর কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

১৯১৪ সনের ২৬শে আগষ্ট বাংলার বিপ্লবীরা পেয়ে গেলেন রডা কোম্পানীর কিছু মসার পিস্তল। ব্যাপারটা এই—রডা কোম্পানীতে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখার্জীর বিশেষ অনুগত শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু নামে একজন লোক কাজ করতেন, তাঁর বাড়ী হাওড়া জেলার রসপুর গ্রামে। তাঁর কাজ ছিল জেটি সরকারের অর্থাৎ জাহাজে মাল এসে পৌঁছুলে তা' খালাস করিয়ে আনা। খবর পাওয়া গেল তিব্বত সরকারের প্রয়োজন মত কিছু মসার পিস্তল ও অন্যান্য মাল এসে পৌঁছেছে রডা কোম্পানীর। হাবুকে যেতে হবে মাল খালাস করতে। অনুকূলদা ও সর্বশ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল, আশুতোষ রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন গোপনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন তাঁদের পরিকল্পনা। তা' শুনে সন্দেহ প্রকাশ করলেন প্রথমে শ্রীনরেন ভট্টাচার্য ওরফে শ্রীমানবেন্দ্র রায় পরে শ্রীনরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরীও বললেন "এ কাজ সম্ভব নয়।" শ্রীশদা তৎক্ষণাৎ বললেন "আপনাদের মনে যখন এ কাজ অসম্ভব বলে ধারণা হয়েছে তখন আপনাদের এ আলোচনায় না থাকাই উচিত।" নিয়মানুবর্তিতার জন্যে তাঁদের দু'জনকেই চলে যেতে হ'ল। ঠিক হ'ল মোষের গাড়ীতে যে মাল আসবে তার শেষের গাড়ীটিতে মসার পিস্তল ও কার্তুজ বোঝাই হবে। অন্য গাড়ীতে

অন্য মাল। পিস্তল দশ বাক্স ও পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ শেষের গাড়ীতে থাকবে।

শেষের গাড়ীর গাড়োয়ান আকবর দোসাদের সহযোগী হলেন শ্রীহরিদাস দত্ত। নাম নিলেন শ্রীঅতুলচন্দ্র নাগ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানদের মত চুল ছাঁটিয়ে গলায় কার দিয়ে তক্তি ঝুলিয়ে ছোট কোরাধুতি প'রে সাজলেন অবিকল গাড়োয়ান। সাহায্য করলেন হোষ্টেল নিবাসী একজন মাড়োয়ারী ছাত্র শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা। আকবর দোসাদের পিছনে বসলেন হরিদাসদা, কোমরে রিভলভার। আদেশ হ'ল আকবর কোন গোলমাল করলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ীর দু'পাশে ফুটপাথ ধরে পাহারা দিয়ে চললেন সশস্ত্র শ্রীশদা আর তাঁর একজন সহকর্মী শ্রীখগেন দাস।

মাল বোঝাই ক'খানা গাড়ী একে একে রডা কোম্পানীর অফিসের দিকে চলে গেল। শেষের গাড়ীখানা গলিতে না ঢুকে সোজা চলে এল মঙ্গলা লেনে অনুকূলদার প্রদর্শিত এক আস্তানায়, পঞ্চাশটি মসার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ নিয়ে। হাবু অন্য গাড়োয়ানদের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে মাল খালাস করে চিরদিনের মত অফিস থেকে নিঃশব্দে চলে এলেন। দৈত্যের লৌহ দুর্গের দ্বার গেল ভেঙ্গে। মালের খোঁজ পড়ল তিনদিন পরে, তখন লুটের মাল সরে গেছে অন্য জায়গায় আর হাবু আসামের কোন এক অজ্ঞাত জায়গায় আত্মগোপন করেছেন। ২৯শে আগষ্ট ধরা পড়লেন শ্রীকালিদাস বসু ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীভুজঙ্গভূষণ ধর আর ১১ই অক্টোবর শ্রীহরিদাস দত্ত ২১,২০০ কার্তুজ নিয়ে। কলকাতার বাঁশতলা লেনে এক মাড়োয়ারীর গুদামঘর ভাড়া নিয়ে হরিদাসদা ছিলেন। পুলিশ নতুন ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে জানতে পেরে আলি হোসেন নামে এক কনেষ্টবলকে গুদামঘরের উপর নজর রাখতে নির্দেশ দেন। শ্রীশদা

কোনরকমে এ সংবাদ জেনে হরিদাসদাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘরবদলের আদেশ দিলেন। হরিদাসদা সে উদ্দেশ্যে বাঁশতলায় যেতেই দারোয়ান শুকদেব তাঁকে নানা অছিলায় দেরী করিয়ে দেয়। আলি হোসেন এলে শুকদেব তাঁকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়। তাঁকে নিয়ে থানায় যাবার সময় এক জায়গায় একটা বালির গাদা দেখে হরিদাসদা কিছু কুড়ুবার অছিলায় এক মুঠো বালি নিয়ে অতর্কিতে আলি হোসেনের চোখে বালি ছুড়েই সরে পড়লেন। আলি হোসেনের চীৎকারে লোকজন হরিদাসদার পিছু নিয়ে ধরে ফেললেন তাঁকে। তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই গুদাম ঘরের চাবিটি একটা ম্যানহোলের মধ্যে ফেলে দেন। ধরা পড়লেন একে একে অনুকূলদা, সর্বশ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ রায়। পরে এঁরা মুক্তি পেলেন এবং শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস, শ্রীঅপূর্বদয়াল মাড়োয়ারী ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়া হ'ল। বিচারে শ্রীকালিদাস বসু, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীভুজঙ্গ ভূষণ ধরের দু'বছর করে ও শ্রীহরিদাস দত্তের চার বছরের জেল হয়ে গেল। হাবু ওরফে শ্রীশ্রীশচন্দ্র মিত্রকে শেষ পর্যন্ত আসামে চলে যেতে হ'ল—আত্মপ্রতিষ্ঠার চেয়ে আত্মত্যাগের পন্থাই মহত্তর। বহুদিন পরে তাঁর দেখা পাওয়া গেল পণ্ডীচেরী আশ্রমে।

১৯১৪ সনের ১৯শে নভেম্বর মাদারীপুরে তৈরী করবার সময় একটি বোমা ফেটে যায়। দিকে দিকে বিপ্লবীদের অর্থসংগ্রহ ও আত্মপ্রকাশে পুলিশের মাতব্বরেরা বিব্রত হয়ে উঠলেন। এই সময় মহারাষ্ট্রের শ্রীবিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে ও শ্রীসত্যেন সেন আমেরিকা থেকে কলকাতা এসে পৌঁছুলেন সালামিস জাহাজে নতুন কর্মসূচী নিয়ে। শ্রীসত্যেন সেন ১৫৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে থেকে গেলেন আর শ্রীপিঙ্গলে চলে গেলেন দেশে।

১৯১৪ সালের ২৫শে নভেম্বর শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বাড়ী ১০/৪/১ মুসলমানপাড়া লেনে দু'টি বোমা পড়ল। দেহরক্ষী রামভজন সিং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন আর অন্যান্য প্রহরী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী, সোমেশ্বর দত্ত ও হরবিলাস ঘোষাল অল্প বিস্তর আহত হলেন। বসন্তবাবু এবারেও বেঁচে গেলেন। ধরা পড়লেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র অক্সফোর্ড মিশনবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাঁকে সাজা দিতে পারল না। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ জেনকিন্স ও বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ হোমউড্ তাঁকে দিলেন বেকসুর খালাস প্রমাণের অভাবে। (১) পরে অবশ্য শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অকারণে গভর্ণরের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে এ কাজ তিনিই করেছিলেন।

পাঞ্জাবে ফিরোজপুরে এ সময় মগা গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী লুঠ করতে মনস্থ করে ১৯১৪ সনের ২৭শে নভেম্বর বেলা একটার সময় সর্বশ্রীজগৎ সিং, জিওন সিং, কাকসিস্ সিং, লাল সিং, ধেয়ান সিং, কাশীরাম যোশী ও রহমৎ আলি প্রমুখ পনরজন সদলবলে যখন টমটমে চলেছেন তখন পুলিশ সাবইনস্পেক্টর শ্রীবসরৎ আলি, শ্রীজোয়ালা সিং ও কয়েকজন ফিরোজপুর ক্যানেলের ব্রীজের উপর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এতগুলি লোককে একসঙ্গে যেতে দেখে বসরত আলির সন্দেহ হওয়ায় টমটমগুলি থামানো হলো। তাঁরা সরকারী কর্মচারী বলে পরিচয় দেওয়া সত্বেও যখন তাঁদের যেতে দেওয়া হ'ল না তখন চারজন হঠাৎ পিস্তল বের করলেন এবং শ্রীজগৎ সিংএর গুলিতে শ্রীবরসত আলি, ও অন্য একজনের গুলিতে শ্রীজোয়ালা সিং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। মিসরিওয়ালা গ্রামের লোকেরা গুলির শব্দ শুনে দেখলেন পুলিশের সঙ্গে যারা ছিল তারা সব প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। গ্রামের লোকদের দলবেঁধে আসতে

(১) 21 Calcutta Law Journal 396.

দেখে এঁরা সরে পড়বার বন্দোবস্ত করলেন কিন্তু গ্রামবাসীরা তখন তাঁদের প্রায় ঘিরে ফেলেছেন। খণ্ড যুদ্ধে শ্রীচন্দন সিং মারা গেলেন ও শ্রীধেয়ান সিং হলেন গুরুতর আহত। ফিরোজপুরের সেসন্স জজের আদালতে বিচার হয়ে ১৯১৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সর্বশ্রীজগৎ সিং, জীয়ন সিং, কাকশিস সিং, লাল সিং, ধেয়ান সিং, কাশীরাম ও রহমৎ আলির ফাঁসি আর তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হ'ল। ১৯১৫ সনের ২৫শে মার্চ মণ্টেগোমারি জেলে তিনজনের, ২৬শে মার্চ দু'জনের ও ২৭শে মার্চ দু'জনের লাহোর জেলে ফাঁসি হয়ে গেল। (১) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা দেখালেন দৃপ্তপৌরুষ, দেশের মঙ্গলের জন্যে সীমাহীন মহত্ব ও ত্যাগ। 'যারা মৃত্যুকে ভয় করে তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে।'

তখন বাংলার বিপ্লব ইতিহাসের গৌরব সূর্য মধ্যগগনে। মৃত্যু-পাগল তরুণ প্রাণের নবনব উন্মেষ, কর্মধারার দুর্বার অপ্রতিহতগতি শৈলভেদকারী নির্ঝরের মত অসাধ্যসাধনের জয়পতাকা হাতে। প্রলয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নেবার জন্যে বিপ্লবীরা তখন উন্মুখ। সে বিরাট বিপ্লবযজ্ঞের হোতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কাজের প্রয়োজনে কর্মী চেয়ে পাঠালেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ তখনকার মাদারিপুরের অবিসংবাদিত নেতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসের কাছে। তিনি পাঠালেন কয়েকজনকে। ১২ই ফেব্রুয়ারী মোটর ডাকাতি হ'ল গার্ডেনরীচে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশে প্রকাশ্য দিবালোকে বার্ড কোম্পানীর টাকা পাওয়া গেল। সর্বশ্রীমানবেন্দ্র রায়, পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায় ওরফে কাঙালদা, হীরালাল বিশ্বাস, সরোজভূষণ দাস, আর একজন ধরা পড়লেন। তখন শ্রীমানবেন্দ্র রায়কে বাটাভিয়া পাঠানোর একান্ত প্রয়োজন।

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose. 273—74

আর হীরালাল ও তার সঙ্গী ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর মাত্র। সরকার থেকে প্রস্তাব এল যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করে তবে অন্য কয়জনকে মুক্তি দেওয়া হবে। সে কাজ সত্যিই কঠিন—তবুও যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে করতে হবে। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস তখন ফরিদপুর জেলে—তাঁর কাছে এ সংবাদ গেল। প্রত্যুত্তর এল পত্রে—সে পত্র মর্মভেদী ও নিদারুণ; তাতে মৃত্যুর স্বাক্ষর ও দেশভক্তির চরমদাবী। শ্রীরাধাচরণ প্রামাণক ২০নং ফকিরচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট থেকে রিভলভার সমেত ধরা পড়ে ছু'বছরের জন্যে জেলে যান—পরে তাঁকে গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলায় আসামীভুক্ত করা হয়। তিনি বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণে সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে শেষ সময়ে করলেন মিথ্যা স্বীকারোক্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু—'মর্ত্যের প্রাঙ্গণ তলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।' নির্বিকার রাধাচরণের জেল হয়ে গেল সাত বছরের—অন্য সবাই পেলেন মুক্তি। সহকর্মী বিপ্লবীবন্ধুদের ঘৃণা আর বিদ্বেষ মাথায় নিয়ে তিনি দেখালেন অদ্ভুত মহত্ত্ব। নির্জন কারাকক্ষে বছর ছু'য়ের মধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ অজ্ঞাত কাহিনীর নীরব সাক্ষী হয়ে রইলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র। এ ডাকাতিতে বডা কোম্পানীর অপহৃত ছুটো মসার পিস্তল ধরা পড়ে যায়। পুলিশ এ সময় শ্রীযতীন্দ্রনাথের খোঁজে ব্যস্ত--তিনি কোথায় আত্ম-গোপন করে বাংলাদেশে অঘটন ঘটাচ্ছেন আর পুলিশ অকর্মণ্য দর্শক মাত্র হয়ে রয়েছে। শ্রীসরোজ ভূষণ দাস জেলের মধ্যেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন—জামিনে মুক্তি পাবার পরদিন ১৯১৫ সনের ২রা মার্চ তিনি মারা গেলেন।

এ সময়ে পাঞ্জাবে শিখদের মধ্যে ঘোর অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসে। ১৯১৫ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীঅর্জন সিং ওরফে শ্রীসজ্জন সিং ছু'জন সঙ্গী নিয়ে অনারকলি পোষ্টঅফিসের দিকে যখন সশস্ত্র চলেছেন তখন পুলিশ সাবইনস্পেক্টর শ্রীমহম্মদ মুসা সন্দেহ করে

তাঁদের থামানোমাত্র তিনি রিভলভার বের করে মুসাকে গুলি করলেন। হেডকনেষ্টবল মাস্তুম শাও গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে যাবার পথে মারা গেলেন। আশে পাশের লোকেরা শ্রীসজ্জন সিংকে ধরে ফেললেন। অন্য দু'জন পরে ধরা পড়লেন। ১৩ই মার্চ বিচার শেষ হ'ল। তখনকার দিনে বিচার মানেই মৃত্যুদণ্ড। লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ১৯১৫ সনের ২০শে এপ্রিল তিনি দেশহিতব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করলেন।

এর কিছুদিন আগে কাশীতে বিপ্লবীদের গোপন সভা ডাকা হ'ল। যাঁরা গেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহারাষ্ট্রের শ্রীবিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে, রাজপুতানার শ্রীপ্রতাপ সিং, বেরিলীর শ্রীদামোদর স্বরূপ শেঠ, বাংলার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়া অমৃতসর, লাহোর, দিল্লী, কানপুর, আজমীর ও বাঁকিপুর থেকে সদস্যেরা যোগ দিলেন। সৈন্যদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবার আহ্বান জানিয়ে কর্মসূচী হ'ল গৃহীত। দলে দলে কর্মীরা নেমে পড়লেন নতুন আকাঙ্খার উন্মত্ততা নিয়ে। গান্ধীজির আন্দোলন ছিল নেতিবাচক এ অন্দোলনও তার চেয়ে কোন অংশে কম বিপদসঙ্কুল নয়।

১৯১৫ সনের ৯ই জানুয়ারী নোয়াখালিতে গুপ্তচর শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী অজ্ঞাত বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের গোপন পরামর্শ চলতে লাগল কেমন করে বাংলাদেশের এই দামাল ছেলেগুলোকে একেবারে সায়েস্তা করা যায়। পুলিশের লোকের মধ্যে শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখার্জী ছিলেন ধূর্ত্ত ও নিজের উন্নতির জন্য সবরকম ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। তাঁর মাথায় নতুন নতুন পরিকল্পনা আসা সত্ত্বেও কাজে বেশীদূর এগুতে পারেন নি।

১৯১৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লাহোর ষ্টেশন ক্লাবের বাইরে ধরা পড়লেন শ্রীউধম সিং আর তাঁর এক সহকর্মী। সঙ্গে ছিল রিভলবার। পুলিশের অনুমান যে তাঁরা ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিচ্

ও পুলিশ সুপার মিঃ ব্রডওয়ের খোঁজে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলেন। জেল হয়ে গেল কয়েক বছরের। তখন বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের মধ্যে এক রকম প্রতিযোগিতা চলেছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী রংপুরের ডি. এস. পি. রায় সাহেব শ্রীনন্দকুমার বসুর বাড়ীতে যখন ডি. আই. জি. ও রংপুরের অতিরিক্ত পুলিশসুপার এক ষড়যন্ত্র মামলার অনুসন্ধানে রত ঠিক সেই সময় চারজন ঢুকে পড়লেন অতর্কিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের দেখেই অনির্দেশ্য আতঙ্কে সবাই ছুটে পালালেন কেবল বুলেটের আঘাত পায়ে লেগে বাড়ীর চাকর হ'ল আহত। এরা নির্বিঘ্নে চলে এলেন।

১৯১৫ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মীদের গোপন আশ্রয়ের জন্য ৭৩নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে শ্রীফণীভূষণ রায়—এই কাল্পনিক নামে একটি বাড়ী ভাড়া নেওয়া হ'ল। তখন শ্রীযতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতের বাইরের বিপ্লবীদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ। সারা ভারতবর্ষে তখন তাঁর বিরাট নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। বিদেশ থেকে অস্ত্র যে কোন মুহূর্তে এসে যাবে। প্রয়োজন শুধু অর্থের। ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটার ললিতমোহন বৃন্দাবান সাহার গদী থেকে সংগ্রহ হ'ল বাইশ হাজার টাকা। ২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীসুরেশ মুখার্জী এক গুপ্তচরকে পাঠালেন গোপনে ৭৩নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে। গুপ্তচর সেখানে ঢুকে শ্রীযতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের দেখে, আনন্দে লাফিয়ে উঠে ফিরতে যাবেন এমন সময় গর্জে উঠল রিভলভার—সংজ্ঞাহীন শ্রীনীরোদ হালদার পড়ে রইলেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা চলে এলেন সে বাড়ী ছেড়ে। তু'দিন পরে মেয়ো হাসপাতালে শ্রীনীরোদ হালদার ভব-যন্ত্রণা থেকে পেলেন মুক্তি। ক্ষেপে উঠলেন শ্রীসুরেশ মুখার্জী যেমন করে হোক্ যতীনকে ধরতে হবে এই তাঁর পণ। এঁরাও নিশ্চেষ্ট নন খুঁজতে লাগলেন কেমন করে সুরেশকে নিশ্চিহ্ন করা যায়।

১৯১৫ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের দিন। গভর্ণর আসবেন তাই কড়া পাহারার বন্দোবস্ত। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ। তিনি এ সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। তিনি জানতেন যে সুরেশ শ্রীযতীন্দ্রনাথের নিত্যসঙ্গী শ্রীচিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীকে চেনেন—কাজেই তাঁকে পাওয়া গেলে পুরুষ সিংহকেও পাওয়া যাবে এই ধারণায় সুরেশ ফাঁদে পা দেবে। স্থান ঠিক করে নেওয়া হ'ল হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষের পরিচালনায় শ্রীনীরেন দাসগুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত আর একজন লুকিয়ে রইলেন শ্রীচিত্তপ্রিয়ের আশে পাশে। পুলিশ কর্মচারী শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় চলেছিলেন ট্রামে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইনস্পেক্টর শ্রীসুরেশ মুখার্জী ও একজন দেহরক্ষী। তাঁরা দেখলেন যে শ্রীচিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী রয়েছেন—পুলিশ তাঁকে বহুদিন ধরে খোঁজ করছে। দেখতে পেয়েই বনবিহারী বাবুর নিষেধ সত্ত্বেও সুরেশ ও তাঁর দেহরক্ষী নামলেন। ফাঁদের বাঘকে আর বাড়ী ফিরতে হ'ল না। শেষ হয়ে গেলেন শ্রীসুরেশ মুখোপাধ্যায়—দেহরক্ষী হ'ল আহত। আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে শ্রীচিত্তপ্রিয়ের অব্যর্থ লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না। তিনি সুরেশের বুকের রক্তে রুমাল ভিজিয়ে নিলেন। তাঁর মনে তখন দ্রৌপদীর পণের মত নেতা শ্রীযতীন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞা। 'দুঃশাসনের রক্তে ভীম একদিন তাঁর প্রিয়তমার বিস্রস্ত করবী বিন্যাস করেছিলেন—আজ চিত্তপ্রিয়ও তাঁর প্রিয়নেতার প্রতিজ্ঞার উপদ্রুত চিন্তাজাল তেমনি প্রেমে সংহত করতে চাইলেন।' সত্যিই একদিন শ্রীযতীন্দ্রনাথ সুরেশের রক্ত চেয়েছিলেন আর চিত্তপ্রিয়ের কাছে তিনি গীতার পুরুষের মত আরাধ্য দেবতা তাই এ পরম শুভক্ষণ তিনি বিফলে যেতে দিলেন না। দেখা গেল বনবিহারী বাবু হেদুয়ার কোনে প্রাণের ভয়ে এক পানের দোকানের বাঁশের মাচার নীচে—খোঁচা লেগে রক্তাক্ত। হয়ে গেল তাঁর পদাবনতি।

৩রা মার্চ কুমিল্লার একটি স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীসনৎকুমার বসু খুন হলেন আর তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তিনজন হলেন আহত। তাঁর অপরাধ—সন্দেহভাজন ছাত্রদের সম্বন্ধে পুলিশের কাছে গোপনে সংবাদ দেওয়া। তখন বিদেশীর চেয়ে দেশী শত্রুদের নিধন শ্রেয়স্কর মনে করে বিপ্লবীরা এ কাজ করলেন।

কাশীর প্রস্তাব অনুসারে সৈন্যদের মধ্যে প্রচার কার্য চলতে লাগল। যুদ্ধের সময় যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদল সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন ও অন্যান্য জায়গা থেকে ফিরছিলেন তাঁদের সঙ্গে এঁরা যোগাযোগ করলেন। জলন্ধর, বান্নু, কোহাট, বৈদসেরা, রওয়ালপিণ্ডি, কর্পূরতলা, ফিরোজপুর, মীরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফৈজাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা প্রভৃতি অঞ্চলে কাজ চলল অপ্রতিহত গতিতে। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে থেকে অ্যাক্টিং ল্যান্সদফাদার শ্রীইসার সিং, দ্বাদশ পদাতিক বাহিনীর শ্রীহাজারা সিং আর কোয়ার্টারমাষ্টার হাবিলদার শ্রীবীবা সিং ও সিপাহী শ্রীফুলা সিং সৈন্যদের মধ্যে এ চিন্তাধারার উন্মেষের দায়িত্ব নিলেন কিন্তু কয়েকজনের বিশ্বাসঘাতকতায় এঁরা ২৩শে মার্চ ধরা পড়ে গেলেন। কোর্ট মার্শালে ২৬শে এপ্রিল মীরাট সিভিল জেলে এঁরা প্রাণ দিলেন। তবুও অন্যান্য সঙ্গীরা পরম আনন্দে জীবনের সাধনায় দেশমাতৃকার সেবায় করলেন আত্মনিয়োগ। ১৯শে ফেব্রুয়ারী লাহোর মুচি গেটের কাছে বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক জিনিস পাওয়া গেল। ২০শে অনেকগুলি রিভলভার বোমা ও কার্তুজ ধরা পড়ল। ২৪শে গুমতি বাজারে বোমা, বোমা তৈরীর মালমশলা পুলিশ বের করল। তবুও সৈন্যদের মধ্যে কাজের বিরাম রইল না। শ্রীরাসবিহারী বসু, শ্রীসতীন্দ্র চন্দ্র ওরফে মোটাবাবু ও শ্রীবিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে অমানুষিক পরিশ্রমে সৈন্যদলের এক অংশকে তৈরী করলেন। ১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক উত্থানের দিন ধার্য ছিল। ঠিক হ'ল বিদ্রোহ আরম্ভ হবে লাহোর ক্যান্টনমেন্ট

থেকে, পরিচালনা করবেন শ্রীরাসবিহারী বসু ও শ্রীবিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে। লাহোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠানের পোষাকে তুর্কীটুপি মাথায় প্রিয়দর্শন বীর যুবক শ্রীপিঙ্গলে দেখালেন মৃতুদমন শৌর্য, অপূর্ব সাহস ও সুনিপুণ কর্মদক্ষতা। কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্ট শ্রীকৃপাল সিং নামে এক সৈনিক শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। শ্রীরাসবিহারী বসু তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে পালিয়ে বাঁচল। উত্থানের দিন ২১শের পরিবর্তে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ঠিক হ'ল কিন্তু কৃপাল সিং তাও জানতে পেরে সব গোপন সংবাদ দিয়ে দিল পুরস্কারের লোভে। সাময়িক বিফলতায় ধৈর্যহীন না হয়ে তাঁরা আবার চেষ্টা চালালেন কিন্তু ২৩শে মার্চ শ্রীপিঙ্গলে ধরা পড়ে গেলেন মীরাট ক্যান্টনমেন্টের ভেতর বোমা সমেত। সে বোমা ফাটলে হয়ত ক্যান্টনমেন্টের আধখানা উড়ে যেত। শ্রীপিঙ্গলেকে সাহায্য করছিলেন শ্রীকর্তার সিং ও শ্রীহরনাম সিং। গুমতিবাজার, ওয়াচলি ও লাহোরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী করে অনেক অস্ত্র ধরা পড়ে গেল। ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে সব অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হ'ল। ৩রা এপ্রিল গুরুদাসপুরেও অনেক অস্ত্র ধরা পড়ে গেল। কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল প্রায় পঁচিশ বছর পরে। (১)

১৯১৫ সনের ২৭শে এপ্রিল লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী হ'ল ৮০ জনের বিরুদ্ধে—ষোলজন তখনও আত্ম-গোপন করে আছেন। ১৩ই সেপ্টেম্বরের রায়ে চল্লিশ জনের ফাঁসি ছাব্বিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়ে গেল। ১৪ই নভেম্বর গভর্ণর জেনারল সাতজনের মৃত্যুদণ্ড ও সতের জনের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন। সর্বশ্রী বকশিস সিং, সুরন সিং, সুরান সিং, হরনাম সিং, জগৎ সিং, কর্তার সিং ও বিষ্ণুগণেশ পিঙ্গলে ১৭ই

(১) বাংলায় বিপ্লববাদ ১৪৫।

নভেম্বর লাহোর সেনট্রাল জেলে চলে গেলেন হাসতে হাসতে ফাঁসি কাঠে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ মারাঠি ব্রাহ্মণ শ্রীপিঙ্গলের তখন বয়স মাত্র পঁচিশ। সীমাহীন জনতার মাঝে দেশ যেন শ্রীপিঙ্গলেকে কোনদিন না ভোলে। বিচারের সময় তাঁরা সমস্বরে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে "এটা ষড়যন্ত্র নয়—এ বিদেশী শত্রুকে প্রকাশ্য সংগ্রামে আহ্বান। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ অপরাধ নয়। ক্রীতদাসেরও বিদ্রোহ করবার অধিকার আছে।" ভাই পরমানন্দের হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শ্রীরাসবিহারী বসুকে ধরবার চেষ্টা হ'ল। তিনি সহকর্মী শ্রীবিনায়ক রাও কাপলের সাহায্যে মার্চ মাসে এলেন কাশী। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস—সেই অপরূপ সুন্দর যুবক বিনায়কই করে বসলেন বিশ্বাসঘাতকতা। লক্ষ্ণৌএ প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল ইহজগত থেকে। একদিনের নিষ্কলঙ্ক পূজারী আর একদিনের অশ্রদ্ধার অন্ধকার গহ্বরে মিলিয়ে গেলেন। 'কদর্যতাই মানুষের শক্তির পরাভব।' এর কিছুদিন পরে শ্রীরাসবিহারী বসু চন্দননগরের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে ১২ই মে চলে গেলেন জাপানে। সরকারের পুরস্কার ঘোষণা বিফলে গেল। তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতের বাইরে থেকে যুদ্ধের সুযোগ নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তিনি জন্মেছিলেন বর্ধমান জেলার রায়না থানার সুবলদহ গ্রামে। এখনও তাঁর জ্ঞাতিভায়েরা সেখানে আছেন। সে পবিত্রস্থান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এই সময় একদিন খবর পাওয়া গেল ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে একটি মালগাড়ীতে অনেকগুলি রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্র হুগলী জুবিলী ব্রীজ দিয়ে ব্যারাকপুর যাচ্ছে। সেটা লুট করার চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু কয়েক জনের বুদ্ধির দোষে তা সম্ভব হ'ল না।

বাংলার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবেও বিপ্লবের ধূমায়িত বহ্নি উঠতে লাগল প্রজ্জ্বলিত হয়ে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন তার

কর্ণধার। পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ পুলিশ কেমন করে জানতে পাচ্ছে তা বুঝতে না পেরে তাঁরা অনুসন্ধানে জানলেন যে শ্রীচন্দা সিং নামে নাঙ্গলকালানের জেলাদার সব খবর পুলিশে জানাচ্চেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল যে জন্মের মত শ্রীচন্দা সিংকে সরিয়ে দিতে হবে। ১৯১৫ সনের ২৫শে এপ্রিল সন্ধ্যের সময় একজন গেলেন খোঁজ নিতে তিনি বাড়ীতে আছেন কি না —আর তৈরী হয়ে গেলেন শ্রীবুতা সিং, শ্রীবাণ্টা সিং, আর একজন। শ্রীচন্দা সিং বাড়ীর বাইরে আসামাত্র পিস্তলের গুলিতে তাঁর ভবলীলা শেষ হয়ে গেল। ৬ই জুন চিতিগ্রামে শ্রীবুতা সিং আর একজন গ্রেপ্তার হলেন আর শ্রীবাণ্টা সিং ধরা পড়লেন ২৫শে জুন। ২৭শে জুলাই তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুকুম হ'ল আর ১৯১৫ সনের ১২ই আগষ্ট লাহোর জেলে তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল।

বৈপ্লবিক কর্মের প্রধান উপাদান কর্মী, অস্ত্র ও অর্থ। নিরস্ত্র ভারতবাসীদের কাছে অর্থ ও অস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন তাই অর্থ সংগ্রহ ছাড়া বাংলার তরুণদের তখন অন্য কোন উপায় ছিল না।

১৯১৫ সনের ২৮শে এপ্রিল দু'টো নৌকায় সর্বশ্রীআশুতোষ লাহিড়ী, ক্ষিতীশ সান্যাল, গোপেন রায়, বিশ্বমোহন সান্যাল, সুশীল সেন, ফণীভূষণ রায় ও আরও কয়েকজন গেলেন নদীয়া জেলার প্রাগপুরে। একটা বাড়ীতে ৩০শে এপ্রিল হানা দিলেন আর এক জায়গায় ২রা মে। গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে তাঁরা নদীপার হয়ে খলিলপুর গ্রামে এসে পৌঁছুলেন। এক জায়গায় তাঁরা খাবার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত এমন সময় কয়েকজন গ্রামবাসীর সন্দেহ হওয়ায় তারা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ দেখে এঁরা নৌকায় উঠে পড়েন। দু'পক্ষের গুলি বিনিময় চলল। এঁদের একজনের পা হঠাৎ পিছলে যেতে তিনি পড়ে গেলেন আর তাঁর রিভলভারের গুলি গিয়ে লাগল সহকর্মী শ্রীসুশীল সেনের মাথায়। নৌকার সঙ্গে

সঙ্গে তীরে তখন লোক ছুটছে এমন সময় আকাশে ঘনঘটা মেঘ বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হ'লো—এঁরা তখনকার মত পালালেন কিন্তু যে ক্ষতি স্বীকার করলেন তা' সত্যিই অপূরণীয়। শ্রীসুশীল সেন যাঁকে বেতমারার জন্যে কিংসফোর্ডকে মারবার চেষ্টা হয় তিনি আহত অবস্থায় সহকর্মীদের হুকুম দিলেন তাঁর মাথাটা কেটে শরীর থেকে বাদ দিতে যাতে সনাক্ত না হয়। দুর্যোগের চোখরাঙানীর কাছে মাথা নীচু করার অপমান তাঁর সহ্যাতীত। তাঁর সে শেষ অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হ'ল। ইনিই সেই সুশীল সেন যাঁর কথা বলতে গিয়ে একজন পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী বলেছিলেন "দুর্ধর্ষ পাঞ্জাবীদের বুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি আমি কিন্তু একটা বাঙালীর ছোট ছেলে বেতের পর বেত খেয়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বন্দেমাতরম্ বলে চীৎকার করেছে, পরাজয় স্বীকার করাতে পারি নি। তাঁকে আজও শ্রদ্ধা জানাই।"

৬ই মে খলিলপুরের চরে পুলিশ জলের ধারে একটা বাঁশ পোঁতা দেখে নেমে দেখল যে একটা নৌকা ডোবান রয়েছে। চারিদিকে জাল নামিয়ে অনুসন্ধান করা হ'ল কিন্তু খানিকটা টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। চলে গেলেন বাংলা মায়ের একটি কৃতী সন্তান মৃত্যুকে তুচ্ছ করে পরম আনন্দে। শ্রীসুশীল সেনের অগ্রজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনের আলিপুর বোমার মামলায় কারাদণ্ড হয়। বর্তমানে তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে। প্রাগপুর ডাকাতি মামলায় তিনজনের ১৭ বছরের ও একজনের ৮ বছরের জেল হয়ে গেল।

বিপ্লবীদের আশা কিন্তু ব্যর্থ হবার নয়। অনেক দিনের সঞ্চিত সাধনা, সহ্যাতীত দুঃখবরণ, দুর্জয় চেতনা ও নির্ভীক প্রত্যয়ের বাস্তবরূপ তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের আত্মপ্রকাশের এই ইতিহাস ঐতিহ্যসমৃদ্ধ, অন্তর্গূঢ় কামনার সহজ সার্থকতায় উদ্ভাসিত।

বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবপ্রচেষ্টার বিরাট যজ্ঞহোমের আগুন

সেদিন মহামঙ্গলসংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হয়ে একই আলোয় দেশকে রাঙিয়ে তুলেছিল কীর্তির সঞ্চয়ে।

লাহোরে ষড়যন্ত্র মামলার অন্ত ছিল না। সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ পেল যে সৈন্যদলের মধ্যে ২৩ নং ক্যাভালরি রেজিমেণ্টের অধিকাংশ যোদ্ধাই ইংরেজশাসন অবসানের কাজে লিপ্ত। আঠারো জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হ'ল। বলা হ'ল ১৯১৪ সনের ১৫ই অক্টোবর থেকে ১৯১৫ সনের ১৫ই মের মধ্যে তাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করেছেন—বোমা তৈরী, টেলিগ্রাফের তার কাটা, গোপন সভা ইত্যাদি কোন অভিযোগই বাদ রইল না। সন্দেহ তারা গদর পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৭ জনের ফাঁসি ও একজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়ে গেল। পরে পুনর্বিবেচনা করে সর্বশ্রী আবদুল্লা, ভগৎ সিং, বুধ সিং, বুটা সিং, গুর্জর সিং, ইন্দ্র সিং, ইন্দর সিং, জেঠা সিং, লছমন সিং, মোটা সিং, তারা সিং ও ওয়াদোয়ান সিং এই বারজনের ফাঁসি ও বাকি ক'জনের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ। ১৯১৫ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর আম্বালা সিভিলজেলে এঁরা ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। রেখে গেলেন অন্তহীন বীর্যের সম্পদ।

এত ফাঁসি সত্ত্বেও কাজের বিরাম রইল না। সর্দার বাহাদুর ইছরা সিং বলে জগৎপুরের একটি লোক গুপ্তচরের কাজ করছিলেন। ৪ঠা জুন প্রকাশ্য দিবালোকে সর্বশ্রীকালু সিং, আত্মা সিং, ছন্নন সিং ও বানটা সিং তাঁকে আক্রমণ করে শেষ করে দিলেন। ১২ই জুন প্রথম তিনজন ও শেষের জন ২৫শে জুন ধরা পড়লেন। ৬ই আগষ্ট লাহোর সেন্‌ট্রাল জেলে তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। ১২ই জুন অমৃতসরে ভালা রেল ব্রীজের কাছে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় বিপ্লবীরা প্রহরারত সৈন্যদের আক্রমণ করে বসলেন। একজন সিপাই শ্রীফুল সিং, একজন হাবিলদার শ্রীচিত্র নায়েক, রাইফেল ও পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিলেন। ছ'টা রাইফেল ও অনেক কার্তুজ

নিয়ে আক্রমণকারীরা সরে পড়লেন। যাবার পথে একজনের কাছে ঘোড়া চাইলেন। ঘোড়ার মালিক গোলাব সিং ঘোড়া দিতে অস্বীকার করায় তাকে প্রাণ দিতে হ'ল। তখন তাঁদের পিছনে পিছনে লোক ছুটছে, পুলিশের গুলিও চলছে। তাঁরা এক ফেরী-ঘাটে গিয়ে ফেরীওয়ালাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে নদী পার করতে বললেন। মালাঙ্গ নামে এক মাঝি ফেরীওয়ালাকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও প্রাণ দিতে হ'ল। পথে তু'জন ধরা পড়লেন আর চল্লিশ মাইল দূরে গিয়ে কপূর্রতলা রাজ্যে ঢোকবার মুখে সর্বশ্রী কালা সিং, ছন্নন সিং, হরমণ সিং ও আত্মা সিং ধরা পড়ে গেলেন। শ্রীবাণ্টা সিং পালালেন পরে একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় ২৫শে জুন গ্রেপ্তর হলেন। শ্রীবাণ্টা সিং বাদে বাকি চার জনের ১৯১৫ সনের ৯ই থেকে ১৪ই আগষ্টের মধ্যে ফাঁসি হয়ে গেল।

লাহোর যড়মন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষী দেয় পাদ্রী কালানের শ্রীকাপুর সিং। পরে তিনি পুলিশের গুপ্তচর বিভাগে চাকরি নেন। ১৯১৫ সনের ২রা আগষ্ট সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী শ্রীপ্রেম সিং, শ্রীকাপুর সিংকে গুলি করলেন। শ্রীকাপুর সিং কূয়ার জলে স্নান করে বাড়ী ফিরছিলেন। তিনি গুলি খেয় পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত তু'টো কেটে নেওয়া হ'ল। পনর জনের বিরুদ্ধে মামলা চলল। ১৯১৬ সনের ৭ই মার্চ শ্রীপ্রেম সিং ও শ্রীইন্দর সিং-এর ফাঁসির হুকুম হ'ল আর পাঁচজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

১৯১৫ সনের ২রা আগষ্ট শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তাঁর দলবল নিয়ে গেলেন আগরপাড়ায়। দলের কর্মী শ্রীমুরারীমোহন মিত্র করল চরম বিশ্বাসঘাতকতা। বিপিনদার রিভলভার থেকে তাঁর অজ্ঞাতে কাতুর্জগুলি খুলে নিয়েই সে ক্ষান্ত হয় নি—আগরপাড়া ষ্টেশনে বিপিনদা যখন দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীমুরারীমোহন পুলিশকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন তাঁকে। বিপিনদা গুলি চালাতে গেলেন

কিন্তু ধরা পড়ে জেল হয়ে গেল। ২৬শে আগষ্ট রাত্রে একজন মুরারীমোহনের বাড়ী গিয়ে তাঁকে ডাকলেন। মুরারীমোহন ও তাঁর বাবা বাইরে আসতেই তাঁকে পরপর ছ'টি গুলি মেরে বিপ্লবীরা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এসে একটি অপেক্ষামান মোটর গাড়ীতে সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হলেন। দু'জন কনেষ্টবল তাঁদের ধরবার জন্যে ছুটে এসে গুলির আঘাতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল।

ওদিকে ভারতবর্ষের বাইরে বার্লিনে ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি মঃ ভিনসেণ্ট ক্রাফট্ নামে একজন জার্মানকে বাটাভিয়ায় পাঠালেন। উদ্দেশ্য হ'ল আন্দামান আক্রমণ করে বিপ্লবীদের মুক্ত করে তাঁদের অস্ত্র সরবরাহ করা। কিন্তু যে জাহাজে অস্ত্র আসছিল ইংরেজ রণতরী H. M. S. Cornwall সেটা ডুবিয়ে দিল। ভিনসেণ্ট ক্রাফট্ ধরা পড়লেন সিঙ্গাপুরে—পরে পালালেন জেল থেকে। ইতিমধ্যে শ্রীঅবনী মুখার্জী ও শ্রীহেরম্ব গুপ্ত জাপানে শ্রীরাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে শ্যামস্থিত জার্মানরা ভারতীয়দের সঙ্গে একযোগে মৌলমীনের পথে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করবেন আর চীনস্থিত জার্মানরা দু'দলে ভাগ হয়ে একদল শ্যামের দলের সঙ্গে যোগ দেবেন আর একদল ব্রহ্মের নির্বাসিত রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে পুরোভাগে নিয়ে ভামোর পথে উত্তর ব্রহ্ম আক্রমণ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলার যুগপৎ বিপ্লব আন্দোলন আরম্ভ হবে। সেই সুযোগ বিদেশস্থ ভারতীয় বিপ্লবীরা আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের দিক দিকে ভারত আক্রমণের চেষ্টা করবেন। (১)

ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীরা স্থির করলেন যে পারস্যে জ্বালাতে হবে বিপ্লবের আগুন—তাতে ইরাণের ভেতর দিয়ে ভারতে আসার পথ পরিস্কার হবে। শ্রীআগাসে, শ্রীপাণ্ডুরঙ্গ খানখোঁজে ছদ্মবেশে চলে গেলেন ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে। শ্রীকেদারনাথ ও শ্রীচৈত

(১) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত।

সিং চলে এলেন বাগদাদে। শ্রীবসন্ত সিং, শ্রীমাণ্ডেয়ম্ ভয়ঙ্করম্ ত্রিমূল আচারিয়া, দাদা চানজী কেরসাস্প গেলেন আফগানিস্তানে। অধ্যাপক বরকতুল্লা, শ্রীতারকনাথ দাস ও কয়েকজন গেলেন স্তাম্বুলে। নতুন উৎসাহে মন তখন পূর্ণ। এদিকে প্রতিশ্রুতিমত জার্মানরা পাঠালেন কয়েক জাহাজ অস্ত্র, কক্সবাজার, সুন্দরবন ও বালেশ্বরের দিকে। (১)

ইতিমধ্যে আমেরিকায় চেকোশ্লোভেকিয়ার নবীন দেশপ্রেমিকরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে ও সহযোগিতার মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে। তাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্যে ফরাসী ও রাশিয়ার সাহায্যের আশায় ছিলেন। তাঁরা ফরাসী গুপ্তচর বিভাগে ব্যাপারটা জানিয়ে তাঁদের সহানুভূতি নেবার চেষ্টা করলেন—। কথাটা ইংরেজ জেনে গেল। (২)

জার্মানীর সহযোগিতার কথা ইংরেজ জানতে পেরে তখন আতঙ্কিত। জার্মান বাণিজ্যদূত মঃ হেলফেরিক প্রেরিত অস্ত্র সম্ভার নামিয়ে নিতে হবে রায়মঙ্গল নদীতে। জাহাজ আসবার কথা ১৯১৫ সনের ১লা জুলাই। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহযোগিদের কাজের সমস্ত ভার বুঝিয়ে দিয়ে বালেশ্বরে যাবেন স্থির করলেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী, শ্রীঅবনী মুখার্জী, শ্রীহেরম্বলাল গুপ্ত, ডঃ যাদুগোপাল মুখার্জী রইলেন কলকাতায়। স্থির হ'ল যে অস্ত্র পাওয়া গেলে যাতে বাইরে থেকে ইংরেজ বাংলায় সৈন্য আমদানী করতে না পারে তার জন্যে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ-কলকাতা রেললাইনটি অকেজো করে দেবেন। শ্রীভোলানাথ চাটার্জী চক্রধরপুর থেকে বেঙ্গল-নাগপুর রেল লাইন ও শ্রীসতীশ চক্রবর্তী অজয়ের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ব্রীজ উড়িয়ে দেবেন। শ্রীনরেন ঘোষচৌধুরী সশস্ত্র যাবেন হাতীয়ায় সন্দীপে—

---

(১) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।
(২) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩৮৮-৯

পূর্ববঙ্গের জেলাগুলো অধিকার করবেন বলে। আর শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর উপর ভার পড়ল ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করে কলকাতা দখল করার। পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীযতীন্দ্রনাথ রওনা হলেন বালেশ্বরের দিকে। যাবার আগে তিনি ছিলেন বাগনান্ স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীঅতুলচন্দ্র সেনের আশ্রয়ে। সঙ্গে চললেন শ্রীচিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন দাসগুপ্ত—পরে যান শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল। বালেশ্বরে গড়ে উঠেছিল ইউনিভারসেল এম্পোরিয়াম—একটা ছোট্ট সাইকেলের দোকান। মালিক শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী। দোকানের পরিচালনা ভার 'হ্যারি এণ্ড সন্স'-এর উপর। সেখান থেকে কাপ্তিপোদা প্রায় ৩০ মাইল। পুলিশ ইতিমধ্যে সমস্ত সন্ধান পেয়ে গেছে। যতীন্দ্রনাথ আর তাঁর সহকর্মীরা অপেক্ষা করতে লাগলেন ম্যাভারিক জাহাজের জন্যে। চলল শবরীর প্রতীক্ষা —। এল না জাহাজ, এল না বিশ হাজার রাইফেল, এল না আশি হাজার কার্তুজ, দু'হাজার মসার পিস্তল আর বহুপ্রত্যাশিত দু'লক্ষ টাকা, তার পরিবর্তে এল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সংযুক্ত সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী—পরিচালনা করছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ চার্লস টেগার্ট, বালেশ্বরের জেলাশাসক মিঃ কিলভি আর শোরব্যাটারীর অধিনায়ক মিঃ রাদারফোর্ড।

যতীন্দ্রনাথ সে খবর পেয়ে মহুলডিহার শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর আশ্রয় থেকে সঙ্গীদের নিয়ে ১৯১৫ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন নীলগিরির দুর্গম পর্বতমালার অন্তরাল দিয়ে বালেশ্বরের দিকে—রইল শুধু আকাশে ধ্রুব তারার অনিমেষ দৃষ্টি। ৮ই কাটল অনাহারে অনিদ্রায়—পরের দিন পৌঁছুলেন বুড়াবলঙ্গের পাড়ে উই পাহাড়ের আড়ালে নিভৃত প্রান্তরের একটি জলাশয়ের কোলে। খাদ খুঁড়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন শেষ সংগ্রামের অপেক্ষায়। যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় ও জ্যোতিষচন্দ্র রইলেন এক

পরিখায় আর তাঁদের দু'দিকে দু'পরিখায় নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন। শক্তির কি প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য, অন্তরের কি স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন!

মিঃ রাদারফোর্ডের নেতৃত্বে এগিয়ে চলল পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী গুলিবর্ষণ করতে করতে কিন্তু প্রতিপক্ষের দিক থেকে কোন শব্দ নেই। পুলিশ পিস্তলের পাল্লার মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল পাঁচ পাঁচটা মসার পিস্তল বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মত। সেই মৃত্যুর গহ্বরে কতজন পুলিশ ও সৈন্য যে মরল তার হিসেব পাওয়া গেল না। অনেকে আহত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাল। বাংলা মায়ের পাঁচটি সন্তান সেদিন পঞ্চপাণ্ডবের মতই দেখালেন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। সেদিন তাঁরা যে শৌর্য, যে আত্মত্যাগ দেখিয়েছিলেন, তা' মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকেও ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে। তাঁদের বিজয়ী প্রাণের ধারা গোমুখী নিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার মত অগণ্য জন্মমৃত্যুর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নতুন নতুন বৈচিত্র্যে জীবনের প্রকাশকে আজও উন্মথিত করছে।

সেদিন ৯ই সেপ্টেম্বর—দু'পক্ষের চলল অবিরাম যুদ্ধ। বহু চেষ্টায় ছত্রভঙ্গ সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠন করে অবশিষ্ট বাহিনী চলল সামনে আর অরক্ষিত পিছন দিয়ে চাষীর বেশে চলল ঘাতক। চিত্ত-প্রিয় আহত হয়ে যতীন্দ্রনাথের কোলে মাথা রেখে চাইলেন জল। যতীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করলেন নীরেন্দ্রকে। অন্তিম শয্যায় চিত্তপ্রিয় চেয়ে রইলেন নেতার মুখের দিকে—সেখানে সত্যে, মঙ্গলে, দয়ায় ও সৌন্দর্যে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত। গুরুশিষ্যের বুকের রক্তে তখন বইছে বিশ্বপাবন ধারা। চষাখণ্ডের অনুর্বর মাটি উঠল রাঙ্গা হয়ে। জল নিয়ে এলেন নীরেন্দ্র রুমাল ভিজিয়ে পিছনের পুকুর থেকে। সৌহার্দ্দের সুধারসধরায় নিংড়ে দিলেন মুমূর্ষু বন্ধুর মুখে। নিভে গেল একটি আত্মজয়ী বীরের বিশ্ববিজয়ী জীবন প্রদীপ। যতীন্দ্রনাথ নিজে আহত হয়েও সমানে যুদ্ধ চালাচ্ছেন। হয়ত তাঁর কানে

বাজছে তাঁর গুরুদেব স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ প্রদত্ত ধ্যানমন্ত্রের জ্যোতির্ময় সুরসপ্তকের বিশ্বসংগীত—ধ্বনিত হচ্ছে অন্তরস্থিত নিত্যচেতন মঙ্গল শক্তির রাগিনী।'

গুলি ফুরিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন সাদা রুমাল ওড়াও। বন্ধুশোকে মুহ্যমান, জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্যে মর্মাহত বিষণ্ণ নীরেন্দ্র পালন করলেন সে আদেশ। দর্পোদ্ধত প্রতাপের অবমানিত ভগ্নশেষ মিঃ টেগার্ট গ্লানিমলিন মুখে মাথার টুপি খুলে বীরের সম্মান দেখিয়ে যতীন্দ্রনাথকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন "আপনি কিছু বলবেন?" মৃত্যুশয্যা থেকে, 'সন্ধ্যামেঘের তিমির রন্ধ্রে দীপ্তরবির মত', জীবনবর্ষণযজ্ঞের সাগ্নিক পুরোহিতের উত্তর এল 'বাংলার জনসাধারণ যেন জানে যে আমরা বাংলা মায়ের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণ দিলুম।' ১০ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বর হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথ চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন—দিয়ে গেলেন বুকের রক্তে দেশজননীর পায়ে প্রথম পূজা, জানিয়ে গেলেন শেষ প্রণাম। নীরেন্দ্রনাথ ও মনোরঞ্জন প্রাণ দিলেন ফাঁসি কাঠে, পান করলেন মৃত্যুর সুবর্ণ পাত্রে জীবনের সুধারস। ২২শে নভেম্বর বালেশ্বর জেলে দু'জনের ফাঁসি হয়ে গেল আর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পালের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আন্দামান জেলে অত্যাচারে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন আর শেষ পর্য্যন্ত ১৯২৪ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর বহরমপুর জেলে মারা গেলেন। শহীদতীর্থ বুড়বলঙ্গেরতীর পঞ্চ তীর্থঙ্করের প্রশান্ত সুন্দর স্মৃতি বুকে নিয়ে প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। আত্মোৎসর্গের বিরাট মহিমা নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত সহ্য করে কালজয়ী হয়ে রইল। রক্ততীর্থ বালেশ্বর মুক্তিকামী ভারতের অপরাজিত থার্মোপাইলি।

বালেশ্বরে ইন্দোজার্মান চক্রান্তের ব্যর্থতার দুঃসংবাদে বাধ্য হয়ে জার্মানরা এক অজ্ঞাত দ্বীপে এক জাহাজ অস্ত্র নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। আর এক জাহাজ পেয়ে গেলেন ডঃ সান্ ইয়াৎ সেন।

জার্মানী থেকে পাঠানো হ'ল টাকা অন্য উপায়ে—আমাদের বহুদিনের সঞ্চিত পাপের পরিণামে যাঁর হাতে পাঠালেন তিনি করলেন আত্মসাৎ—পরে জানতে পেরে তাঁকে গুলি করে মারবার চেষ্টা হ'ল কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, স্বাধীন ভারতেও তিনি ছিলেন দেশের একজন কর্ণধার। সত্যকে স্বীকার ও কল্যাণকে গ্রহণের মাঝেই মানুষের যথার্থ ঐশ্বর্য—হতভাগ্য আমরা সে ঐশ্বর্যে বঞ্চিত।

১৯১৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর আমেরিকা ফেরত গদরপার্টির সভ্য শ্রীউত্তম সিং বন্দী হলেন—অপরাধ সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।

১৯১৫ সনের ৩১শে সেপ্টেম্বর শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা গেলেন নদীয়া জেলার শিবপুরে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায়। সহকর্মী শ্রীমন্মথ সমস্ত সন্ধান দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন কিন্তু বাড়ীতে ঢুকলেন না পাছে তাঁর মামার বাড়ীর লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলেন। বাড়ীতে ঢুকতে হ'ল ঢেঁকি দিয়ে দরজা ভেঙ্গে কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর যখন টাকা মিলল না তখন ডাক পড়ল মন্মথর। বিষণ্ণ মন্মথ থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ইসারা করে দেখালেন কোথায় টাকা পোঁতা আছে। সে সময় সে বাড়ীর এক বৃদ্ধা বলে উঠলেন "মন্মথ তোমার এই কাজ?" নরেনদার হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটল মন্মথর মাথা লক্ষ্য করে কিন্তু সতর্ক মন্মথ বসে পড়ে পালালেন। ফেরবার পথে মারা গেলেন একজন কনেষ্টবল, তিনজন পশ্চাদধাবমান গ্রামবাসী ও আহত হলেন এগার জন। এঁদের পিছনে ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছিলেন নদীয়ার এস. পি.। —নরেনদা তাঁকে প্রথম সতর্কবাণী দিয়ে গুলিতে মাথার টুপি উড়িয়ে দিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয় পেয়ে প্রাণভয়ে এস. পি. পালালেন। রাগে অভিমানে মন্মথ হয়ে গেলেন রাজসাক্ষী সব তথ্য ফাঁস করে দিলেন। ধরা পড়লেন একে একে সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ নন্দী,

সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিখিল গুহরায়, সানুকূল চ্যাটার্জী, সত্যরঞ্জন বসু ও আরো কয়েকজন। এঁদের আটজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল একজনের হ'ল দশ বছরের জেল। তখন এ শাস্তি শাস্তিই নয়—তাঁদের কানে বাজছে 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।' কাজের ভেতর দিয়েই এঁরা শতবর্ষ বাঁচবেন। তাঁদের কণ্ঠে তখন নতুন সুর, অন্তরে নতুন সত্যের মন্দাকিনী প্রবাহ, দৃষ্টিতে নতুন আলো। শিবপুরের এ অভিযান সারা বাংলার বিপ্লবীদের সফল প্রচেষ্টা। যে নৌকায় এঁরা পালিয়েছিলেন সেটা এখনও কৃষ্ণনগর কোর্টে নির্বাক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯১৫ সনের ৯ই অক্টোবর মৈমনসিংএর ডি. এস. পি. শ্রীযতীন্দ্র মোহন ঘোষ তাঁর ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন। সেখানে পাঁচজন তাঁকে আক্রমণ করে শেষ করে দিলেন। পিতার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুত্রকেও প্রাণ দিতে হ'ল। কর্তৃত্বের দম্ভ ও ক্ষমতার মত্ততা শেষ হয়ে গেল একসঙ্গে। ২১শে অক্টোবর মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে একজন পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষ্যে যখন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী তাস খেলায় ব্যস্ত তখন সেখানে অসীম দুঃসাহসে কয়েকজন ঢুকে পড়লেন—এস. পি. রায় সতীশচন্দ্র ব্যানার্জী বাহাদুর ও. বি. ই.কে শেষ করবার জন্যে। একজন দিলেন গুলিতে ঘরের আলো নিভিয়ে অন্য ক'জন অন্ধকারে বেপরোয়া গুলি চালালেন। মারা গেলেন সাব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীগিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আহত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে পালালেন শ্রীউপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গৃহস্বামী রায়বাহাদুর বেঁচে গেলেন। অন্তহীন বৈচিত্র্যের মাঝে অসংযত অমঙ্গলের প্রলয়োৎসব—উৎসবের মধুছন্দ বেদনায় হ'ল আত্মহারা।

১৯১৫ সনের ২৯শে অক্টোবর প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁরা পলাতক ছিলেন তাঁদের ও অন্য কয়েকজনকে নিয়ে মোট

(১) স্বামী কেশবানন্দ অভিনন্দন গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২

৭৪ জনের বিরুদ্ধে প্রথম আরম্ভ হ'ল অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯১৬ সনের ৩০শে মার্চের রায়ে ছ'জনের মৃত্যুদণ্ড, পঁয়তাল্লিশ জনের যাবজ্জীন দ্বীপান্তর, আটজনের বিভিন্ন মেয়াদের জেল— বাকি পনেরজন মুক্তি পেলেন। হয়ত দেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে এঁদের নৈবেদ্য পৌঁছুল না। শেষে একজনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ১৯১৬ সনের ১২ই জুন লাহোর জেলে হোসিয়ারপুরের শ্রীহেরসিং বহুয়াল, ভূদাকের শ্রীইসার সিং, খুরদাপুরের শ্রীরঙ্গ সিং ওরফে বড়া সিং, তলওয়াণ্ডির শ্রীরুর সিং ও লুধিয়ানার শ্রীউধম সিংএর ফাঁসি হয়ে গেল—সানেওয়াল, ছাবা, কর্পূরতলা, ফিরোজপুর প্রভৃতি স্থানের অর্থ সংগ্রহ ও বিদ্রোহের অপরাধে। মৃত্যুর অন্ধকারময় আবর্তের মাঝে শক্তিমানের সুমহৎ অধিকার। 'প্রাণতীর্থে চলে ওরা মৃত্যু করি জয়, শ্রান্তি ক্লান্তি হীন।'

কলিকাতায় ৭৭নং সার্পেন্টাইন লেনের বাড়ীতে কারা যাতায়াত করে জানতে পারলে অনেককে ধরে ষড়যন্ত্র মামলার সুবিধে হবে বলে সেই বাড়ীটাকে লক্ষ্য রাখবার জন্যে শ্রীকৈলাসনাথ পাঠক নামে একজন কনেষ্টবলকে রাখা হয়েছিল। ১৯১৫ সনের ৩০শে নভেম্বর তিনি বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারালেন। সে সময় সে পথ দিয়ে সেন্ট পলস্ স্কুলের পাচক যাচ্ছিল তাকেও পুলিশের লোক মনে করে এঁরা শেষ করে দিয়ে চলে এলেন।

এই সময় আন্দামান জেলে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অতিরিক্ত প্রহারের ফলে স্বাধীনচেতা শ্রীভান সিং মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে জেলার সম্পূর্ণ ভুল রিপোর্ট দিলেন সরকারকে—তদন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ১৯শে ডিসেম্বর শ্রীধীরেন বিশ্বাস নামে একজন কর্মীকে পুলিশের গুপ্তচরের কাজ করার অপরাধে মৈমনসিংএর শেষেরদিঘীতে জীবন শেষ করতে হ'ল অবুদ্ধির অজ্ঞতায়। পুলিশের কোন সন্ধানই কাজে লাগল না।

১৯১৬ সাল। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী। তাঁদের ও শ্রীপুলিন মুখার্জীর সহযোগিতায় ও ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা নব উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। তখন নিয়ম অটল, শক্তি অসীম, অন্তরের ঐশ্বর্য অনবদ্য। শিবপুর ডাকাতি মামলার বিচারাধীন আসামী শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী কাঠগড়া থেকে হঠাৎ বললেন "সর্দি হয়েছেরে, মধু চাই।" কর্মীরা বুঝলেন ইঙ্গিত— ১৯১৬ সনের ১৬ই জানুয়ারী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে আরপুলি লেনের কাছে বেলা দশটার সময় শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য নামে সেই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে শেষ করে দিয়ে দু'জন পরম নিশ্চিন্তে সরে পড়লেন। শালকের ডোমপাড়া লেনে শ্রীঅতুল ঘোষ কয়েকজন বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ সন্ধান পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার সময় দু'পক্ষেরই খণ্ডযুদ্ধে ধরা পড়ে গেলেন শ্রীযুগল দত্ত।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। পেশোয়ার থেকে লেখা কোন মহিলা কর্মীর গোপন একখানা পত্র আসে তাঁর নামে। সেটা বিলি করবার ভার পড়ে অক্সফোর্ড মিশনের ছাত্র, মুন্সীগঞ্জের শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের উপর। তাঁকে অতর্কিতে পুলিশ ধরে ফেলে সন্দেহে। ফলে পুলিশ চিঠি-খানি থেকে চন্দননগরে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সন্ধান পেয়ে যায়। সে সময় চন্দননগরে শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি কর্মীগণ আত্মগোপন করে ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রমোহনের বাড়ী নিরাপদ বিবেচনায় বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্যে কিছু কিছু জিনিস সেখানে রাখা হয়েছিল। সে সব জিনিসের ভেতর থেকে মাষ্টারমশাই ও নরেনদা সম্পর্কিত একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ধরা পড়ে। সেটা পেয়ে পুলিশ জানতে পারে যে সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক উত্থানের পরিকল্পনার কথা। রডা কোম্পানীর

অপহৃত অনেকগুলি মসার পিস্তল এখানে পাওয়া যায়। এঁদের দু'জনকে জড়িয়ে ষড়যন্ত্র মামলা করার চেষ্টা হয় কিন্তু পত্রে লিখিত নরেনদা যে 'বড়দা' শ্রীক্ষেত্রমোহনের চরিত্রগুণে ও বুদ্ধিবলে পুলিশ তা' প্রমান করতে পারলেন না। ষড়যন্ত্র মামলা করার চেষ্টা বিফল হ'ল। সে সময় ধরা পড়লেন বীরভূমের শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘটক ও তাঁর মাসীমা শ্রীমতী দুকড়িবালা দেবী দু'টি মসার পিস্তল সমেত। এই মহিয়সী মহিলা নিজবুদ্ধিবলে মসার পিস্তলের বিভিন্ন অংশের সংযোজন ও ব্যবহার শিখে ফেলেছিলেন। তখন কোন যন্ত্র খাবাপ হয়ে গেলে তাঁর কাছে পাঠানো হ'ত। চন্দননগরে পাওয়া কাগজপত্রে সক্রিয় কর্মীদের একটি তালিকা পেয়ে যান পুলিশের পদস্থ কর্মচারীরা। ১৯১৬ সনের ১৬ই জানুয়ারী আমার দাদা শ্রীহরিনারায়ণ চন্দ্র ধরা পড়লেন। চৌরঙ্গী দিয়ে চলেছিলেন দু'জন নেতৃস্থানীয়। তাঁরাও ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু সেই নেতৃস্থানীয় একজনের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি বেরিয়ে গেল। তিনি স্বীকারোক্তি করলেন উনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী। ক্ষণিকের দুর্বলতা অনিমেষ জাগ্রত শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এ দুর্বল মুহুর্তের সংকীর্ণতা না উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহ? যাই হোক্ আরও অনেকে ধরা পড়লেন। যিনি করলেন দায়িত্বহীন চাপল্যে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি, দিলেন অন্যকে জড়িয়ে বিপদের মাঝে, তিনিই আজ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের অন্যতম। বহুদিন পরে অন্য একজনের স্বীকারোক্তির সঙ্গে তাঁর জবানবন্দী মিল হওয়ায় বাংলার গভর্ণর স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন "আপনি এঁদের বিকৃত মস্তিষ্ক অপোগণ্ড বলে এঁদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পড়ে দেখুন এ কাগজখানা, বৈদেশিক সাহায্যে ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা। এবার এঁদের নিশ্চয়ই বিকৃত মস্তিষ্ক বলবেন না।" স্যার সুরেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। দুঃখে পরে বলেছিলেন "আজ আমার মৃত্যু হ'ল।"

এই সুরেন্দ্রনাথকে সে যুগের লোকেরা বলতেন "Surrender not—আপোষহীন-মুকুটহীন সম্রাট।"

তখন অমরদা শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মগোপন করে আছেন। প্রথমে চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ী, পরে গালাকুঠিতে ছিলেন কিছুদিন। তারপর গেলেন ঘোড়াপুকুরে শ্রীরামেশ্বর দের বাড়ী। সেখান থেকে শ্রীসতীশ কুণ্ডুর বাগান-বাড়ী। তারপর হরিদ্রাডাঙ্গার কারফরমার বাগানে কিছুদিন থাকবার পর এলেন লালবাগানে, সেখান থেকে কামারকুণ্ডু, শেষে এলেন শালকেয়।

লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে যে মহীয়সী মহিলা সে যুগের বৈপ্লবিক কর্মধারার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন আজ অনেকেই তাঁর পরিচয় জানেন না। তাঁর উপর যে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন পুলিশ করেছিল তা' অমানুষিক। এই মহিলার নাম শ্রীমতী ননীবালা দেবী। জন্ম ১৮৮৮ সনে হাওড়া জেলার বালিতে। পিতা শ্রীসূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আজও তিনি আত্মীয় স্বজনের অনাদর ও দারিদ্র্যের মাঝে পরিপূর্ণ মর্যাদায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন।

যুদ্ধের সময় পেশোয়ার থেকে ধরে আনা হয়েছিল শ্রীমতী ননীবালা দেবীকে। তিনি চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষে করে চলতেন। ইনিই ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত কর, শ্রীবিজয়ভূষণ দত্ত, শ্রীবিজয় চক্রবর্তী প্রভৃতি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গতিবিধি জানতেন। তারপর তাঁর নির্দেশে শ্রীমতী ক্ষীরোদা সুন্দরী চৌধুরী, এঁদের পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, ধুবড়ী, প্রভৃতি স্থানে ও শেষ পর্যন্ত আসামের বিন্নাখাটা গ্রামে আশ্রয় দেন। তখন যাদুগোপালদার নামে দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়ে হুলিয়া ঘুরছে।

শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়বার সময় বলে যেতে পারেন নি কোথায় যন্ত্রাদি রেখে গেছেন। সেটা জানবার জন্যে শ্রীমতী ননীবালা দেবী রামবাবুর নকল স্ত্রী সেজে জেলে দেখা করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে জেনে এলেন সব খবর। তিনি ধরা পড়বার পর অন্ধকার বাতাসহীন সেলে তাঁকে বন্ধ করে রেখে অপমান লাঞ্ছনা করেও যখন কিছু হ'ল না তখন কাশীর ডি. এস. পি. শ্রীজিতেন ব্যানার্জীর নির্দেশে তাঁকে বিবস্ত্রা করে খানিকটা লঙ্কা বাঁটা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েও তাঁর কাছ থেকে কোন কথা বের করতে পারল না পুলিশ। এ অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি রইলেন বিশদিন অনশনে।

শ্রীমতী ননীবালা দেবীকে প্রথমে পেশোয়ার থেকে কাশী জেলে আনা হয়। সেখানে হাজার রকম নির্যাতন সত্ত্বেও যখন কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা গেল না তখন তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হয়। ইলিসিয়াম্ রোতে তাঁকে জিজ্ঞাবাদ করার সময় তিনি স্পেশাল সুপার মিঃ গোল্ডির গালে মারলেন এক চড়—অসম্মানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে—মিঃ গোল্ডি তাঁর লেখা কাগজ ছিঁড়ে দিয়েছিলেন বলে। পরে মিঃ গোল্ডি তাঁর কাছে ক্ষমা চান কিন্তু আমাদের দেশী পুলিশ অফিসার শ্রীজিতেন ব্যানার্জীর অনুতাপের কোন চিহ্নও দেখা যায় নি। সেই কারণে সে যুগের বিপ্লবীরা বিদেশী শত্রুর চেয়ে দেশী শত্রুদের আগে মারবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের মতে যারা স্বাধীনতার পথে, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, সব সময় অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিকৃষ্টতম শত্রু। যাক্ শ্রীমতী ননীবালা দেবীই প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি ১৮১৮ সনের ৩ আইনে বন্দী থাকেন। অন্তরের মাঝে কি অক্ষুণ্ণশক্তির নিত্যবিকাশ।

শ্রীমতী ননীবালা দেবীর কথা মনে হলেই আর একজনের নাম মনে পড়ে তিনি শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী—শ্রীমহাদেব সরকারের

ঠাকুমা। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের কর্মীদের মধ্যমণি। ১৯২৮ সনে পুলিশ যখন শ্রীমহাদেব সরকারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে তাঁকে বাড়ী খানাতল্লাসী করতে এসেছে, সেই বৃদ্ধা নানান কথায় সোরগোল তুলে লোক জড় করে পুলিশকে দু'ঘণ্টা আটকে রেখে দেন এবং তারই মধ্যে ঠাকুরঘরের ভেতর থেকে অদ্ভুত সাহসে ও অসামান্য বুদ্ধি বলে কয়েকটা রিভলভার, কিছু কার্তুজ ও দক্ষিণেশ্বরের তৈরী একটা বোমা পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে অন্য ঘরে পাচার করে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধার এ সাহস সত্যিই বিস্ময়ের জিনিস।

১৯১৬ সনের ২৭শে জানুয়ারী গোয়াজেলে বন্দী বিপ্লবী শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মহত্যা করলেন—পুলিশের নির্মম অত্যাচারই তার কারণ বলে সকলেরই অনুমান।

১৯১৬ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে সপ্তম রাজপুত সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লবাত্মক কাজের উৎসাহদানের অজুহাতে ড্রিল হাবিলদার শ্রীজলেশ্বর সিং ও একজন নায়েকের কোর্টমার্শালে সংক্ষিপ্ত বিচার হয়ে গেল। দিল্লী সিভিল জেলে ২১শে মার্চ শ্রীজলেশ্বর সিং স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকের মতই হাসিমুখে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিলেন। চঞ্চলের অন্তরালে রয়ে গেল অচঞ্চল মৃত্যুর গরিমা। নায়েকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

১৯১৬ সনের ২৯শে জানুয়ারী ৬২/২নং হ্যারিসন রোডে ধরা পড়লেন শ্রীনিশিকান্ত লাহিড়ী—পিস্তলটা সরবার সময় পেলেন কিন্তু চল্লিশ রাউণ্ড গুলি সরাতে সুযোগ পেলেন না—হয়ে গেল দীর্ঘদিনের শাস্তি।

কিশোরগঞ্জের শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র রায় নামে একটি সাহসী অল্প বয়স্ক কিশোর তাঁর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে বিপ্লবী দলভুক্ত হন। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি পালিয়ে যান। কয়েকদিন পরে ধরা পড়লেন এমন

অবস্থায় যে রিভলভার ব্যবহার করতে সুযোগ পেলেন না—১৩ই জুলাই দু'বছরের জেল হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল আমাশয় রোগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত।

১৯১৬ সনের ২৩শে জুন শ্রীসুরেন্দ্রভূষণ মুখার্জী ও শ্রীরোহিণী কুমার মুখার্জী নামে দুই পুলিশের গুপ্তচরকে ঢাকার বৈরাগীতলায় সন্ধ্যের সময় গুলি করে শেষ করে দিয়ে দু'জন নির্বিঘ্নে সরে পড়লেন। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও তাঁদের সন্ধান পেলেন না।

দু-দুবার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মনে তখন ভয় ঢুকে গেছে। পাছে কেউ তাঁর মোটর গাড়ী আটক করে বোমা মারে সেই ভয়ে তিনি গাড়ী চড়া ছেড়ে দিলেন। দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে আরম্ভ করলেন সাইকেলে চলা-ফেরা যাতে প্রয়োজন হ'লে সহজে যে কোন রাস্তাদিয়ে পালাতে পারেন। আবার তাঁকে মারবার চেষ্টা হ'ল—কয়েকজন বিপ্লবী রাস্তায় বল খেলার ছল করে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

১৯১৬ সনের ৩০শে জুন তাঁকে পেয়ে গেলেন সামনে। পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর অবরুদ্ধ জীবনাকাশ। সঙ্গীরাও জীবিত রইলেন না। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে চলে গেলেন নিঃসংশয় মূর্তি শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী শ্রীঅতীন রায়, শ্রীশিশির ঘোষ প্রমুখ কর্মীরা। বসন্তবাবুর জায়গায় এলেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতি। বসন্তবাবুর ছেলেরা পুরস্কার স্বরূপ পেলেন চাকরি। যে সময় দেশের তরুণেরা প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত, গান্ধীজি কিন্তু সে সময় ইংরেজকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার জন্যে সাফল্যের সঙ্গে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত। গান্ধীজির সুখ্যাতিতে তখন ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি দেশ বিদেশে পঞ্চমুখ। গান্ধীজির ইংরেজ জাতের কৃতজ্ঞতার উপর আস্থা ছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে এ সাহায্যের প্রতিদানে ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতার পথ নিশ্চয়ই সুগম করে দেবে।

বাজছে তাঁর গুরুদেব স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ প্রদত্ত ধ্যানমন্ত্রের জ্যোতির্ময় সুরসপ্তকের বিশ্বসংগীত—ধ্বনিত হচ্ছে অন্তরস্থিত নিত্যচেতন মঙ্গল শক্তির রাগিনী।'

গুলি ফুরিয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথ হুকুম দিলেন সাদা রুমাল ওড়াও। বন্ধুশোকে মুহ্যমান, জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্যে মর্মাহত বিষণ্ণ নীরেন্দ্র পালন করলেন সে আদেশ। দর্পোদ্ধত প্রতাপের অবমানিত ভগ্নশেষ মিঃ টেগার্ট গ্লানিমলিন মুখে মাথার টুপি খুলে বীরের সম্মান দেখিয়ে যতীন্দ্রনাথকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন "আপনি কিছু বলবেন?" মৃত্যুশয্যা থেকে, 'সন্ধ্যামেঘের তিমির রন্ধ্রে দীপ্তরবির মত', জীবনবর্ষণযজ্ঞের সাগ্নিক পুরোহিতের উত্তর এল 'বাংলার জনসাধারণ যেন জানে যে আমরা বাংলা মায়ের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণ দিলুম।' ১০ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বর হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথ চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন—দিয়ে গেলেন বুকের রক্তে দেশজননীর পায়ে প্রথম পূজা, জানিয়ে গেলেন শেষ প্রণাম। নীরেন্দ্রনাথ ও মনোরঞ্জন প্রাণ দিলেন ফাঁসি কাঠে, পান করলেন মৃত্যুর সুবর্ণ পাত্রে জীবনের সুধারস। ২২শে নভেম্বর বালেশ্বর জেলে দু'জনের ফাঁসি হয়ে গেল আর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পালের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আন্দামান জেলে অত্যাচারে তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন আর শেষ পর্য্যন্ত ১৯২৪ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর বহরমপুর জেলে মারা গেলেন। শহীদতীর্থ বুড়বলঙ্গেরতীর পঞ্চ তীর্থঙ্করের প্রশান্ত সুন্দর স্মৃতি বুকে নিয়ে প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। আত্মোৎসর্গের বিরাট মহিমা নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত সহ্য করে কালজয়ী হয়ে রইল। রক্ততীর্থ বালেশ্বর মুক্তিকামী ভারতের অপরাজিত থার্মোপাইলি।

বালেশ্বরে ইন্দোজার্মান চক্রান্তের ব্যর্থতার দুঃসংবাদে বাধ্য হয়ে জার্মানরা এক অজ্ঞাত দ্বীপে এক জাহাজ অস্ত্র নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। আর এক জাহাজ পেয়ে গেলেন ডঃ সান্ ইয়াৎ সেন।

জার্মানী থেকে পাঠানো হ'ল টাকা অন্য উপায়ে—আমাদের বহুদিনের সঞ্চিত পাপের পরিণামে যাঁর হাতে পাঠালেন তিনি করলেন আত্মসাৎ—পরে জানতে পেরে তাঁকে গুলি করে মারবার চেষ্টা হ'ল কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, স্বাধীন ভারতেও তিনি ছিলেন দেশের একজন কর্ণধার। সত্যকে স্বীকার ও কল্যাণকে গ্রহণের মাঝেই মানুষের যথার্থ ঐশ্বর্য—হতভাগ্য আমরা সে ঐশ্বর্যে বঞ্চিত।

১৯১৫ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর আমেরিকা ফেরত গদরপার্টির সভ্য শ্রীউত্তম সিং বন্দী হলেন—অপরাধ সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।

১৯১৫ সনের ৩১শে সেপ্টেম্বর শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা গেলেন নদীয়া জেলার শিবপুরে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায়। সহকর্মী শ্রীমন্মথ সমস্ত সন্ধান দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন কিন্তু বাড়ীতে ঢুকলেন না পাছে তাঁর মামার বাড়ীর লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলেন। বাড়ীতে ঢুকতে হ'ল ঢেঁকি দিয়ে দরজা ভেঙ্গে কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পর যখন টাকা মিলল না তখন ডাক পড়ল মন্মথর। বিষণ্ণ মন্মথ থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ইসারা করে দেখালেন কোথায় টাকা পোঁতা আছে। সে সময় সে বাড়ীর এক বৃদ্ধা বলে উঠলেন "মন্মথ তোমার এই কাজ?" নরেনদার হুকুমে সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটল মন্মথর মাথা লক্ষ্য করে কিন্তু সতর্ক মন্মথ বসে পড়ে পালালেন। ফেরবার পথে মারা গেলেন একজন কনেষ্টবল, তিনজন পশ্চাদধাবমান গ্রামবাসী ও আহত হলেন এগার জন। এঁদের পিছনে ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছিলেন নদীয়ার এস. পি.। —নরেনদা তাঁকে প্রথম সতর্কবাণী দিয়ে গুলিতে মাথার টুপি উড়িয়ে দিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয় পেয়ে প্রাণভয়ে এস. পি. পালালেন। রাগে অভিমানে মন্মথ হয়ে গেলেন রাজসাক্ষী সব তথ্য ফাঁস করে দিলেন। ধরা পড়লেন একে একে সর্বশ্রী নরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ নন্দী,

সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নিখিল গুহরায়, সানুকূল চ্যাটার্জী, সত্যরঞ্জন বসু ও আরো কয়েকজন। এঁদের আটজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল একজনের হ'ল দশ বছরের জেল। তখন এ শাস্তি শাস্তিই নয়—তাঁদের কানে বাজছে 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।' কাজের ভেতর দিয়েই এঁরা শতবর্ষ বাঁচবেন। তাঁদের কণ্ঠে তখন নতুন সুর, অন্তরে নতুন সত্যের মন্দাকিনী প্রবাহ, দৃষ্টিতে নতুন আলো। শিবপুরের এ অভিযান সারা বাংলার বিপ্লবীদের সফল প্রচেষ্টা। যে নৌকায় এঁরা পালিয়েছিলেন সেটা এখনও কৃষ্ণনগর কোর্টে নির্বাক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯১৫ সনের ৯ই অক্টোবর মৈমনসিংএর ডি. এস. পি. শ্রীযতীন্দ্র মোহন ঘোষ তাঁর ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন। সেখানে পাঁচজন তাঁকে আক্রমণ করে শেষ করে দিলেন। পিতার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুত্রকেও প্রাণ দিতে হ'ল। কর্তৃত্বের দম্ভ ও ক্ষমতার মত্ততা শেষ হয়ে গেল একসঙ্গে। ২১শে অক্টোবর মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে একজন পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষ্যে যখন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী তাস খেলায় ব্যস্ত তখন সেখানে অসীম দুঃসাহসে কয়েকজন ঢুকে পড়লেন—এস. পি. রায় সতীশচন্দ্র ব্যানার্জী বাহাদুর ও. বি. ই.কে শেষ করবার জন্যে। একজন দিলেন গুলিতে ঘরের আলো নিভিয়ে অন্য ক'জন অন্ধকারে বেপরোয়া গুলি চালালেন। মারা গেলেন সাব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীগিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আহত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে পালালেন শ্রীউপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গৃহস্বামী রায়বাহাদুর বেঁচে গেলেন। অন্তহীন বৈচিত্র্যের মাঝে অসংযত অমঙ্গলের প্রলয়োৎসব—উৎসবের মধুছন্দ বেদনায় হ'ল আত্মাহারা।

১৯১৫ সনের ২৯শে অক্টোবর প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁরা পলাতক ছিলেন তাঁদের ও অন্য কয়েকজনকে নিয়ে মোট

(১) স্বামী কেশবানন্দ অভিনন্দন গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২

৭৪ জনের বিরুদ্ধে প্রথম আরম্ভ হ'ল অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯১৬ সনের ৩০শে মার্চের রায়ে ছ'জনের মৃত্যুদণ্ড, পঁয়তাল্লিশ জনের যাবজ্জীন দ্বীপান্তর, আটজনের বিভিন্ন মেয়াদের জেল— বাকি পনেরজন মুক্তি পেলেন। হয়ত দেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে এঁদের নৈবেদ্য পৌঁছুল না। শেষে একজনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ১৯১৬ সনের ১২ই জুন লাহোর জেলে হোসিয়ারপুরের শ্রীহেরসিং বহুয়াল, ভূদাকের শ্রীইসার সিং, খুরদাপুরের শ্রীরঙ্গ সিং ওরফে বড়া সিং, তলওয়াণ্ডির শ্রীরুর সিং ও লুধিয়ানার শ্রীউধম সিংএর ফাঁসি হয়ে গেল— সানেওয়াল, ছাবা, কর্পূরতলা, ফিরোজপুর প্রভৃতি স্থানের অর্থ সংগ্রহ ও বিদ্রোহের অপরাধে। মৃত্যুর অন্ধকারময় আবর্তের মাঝে শক্তিমানের সুমহৎ অধিকার। 'প্রাণতীর্থে চলে ওরা মৃত্যু করি জয়, শ্রান্তি ক্লান্তি হীন।'

কলিকাতায় ৭৭নং সার্পেন্টাইন লেনের বাড়ীতে কারা যাতায়াত করে জানতে পারলে অনেককে ধরে ষড়যন্ত্র মামলার সুবিধে হবে বলে সেই বাড়ীটাকে লক্ষ্য রাখবার জন্যে শ্রীকৈলাসনাথ পাঠক নামে একজন কনেষ্টবলকে রাখা হয়েছিল। ১৯১৫ সনের ৩০শে নভেম্বর তিনি বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারালেন। সে সময় সে পথ দিয়ে সেণ্ট পলস্ স্কুলের পাচক যাচ্ছিল তাকেও পুলিশের লোক মনে করে এঁরা শেষ করে দিয়ে চলে এলেন।

এই সময় আন্দামান জেলে নিষ্ঠুর অত্যাচার ও অতিরিক্ত প্রহারের ফলে স্বাধীনচেতা শ্রীভান সিং মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে জেলার সম্পূর্ণ ভুল রিপোর্ট দিলেন সরকারকে—তদন্ত বন্ধ হয়ে গেল। ১৯শে ডিসেম্বর শ্রীধীরেন বিশ্বাস নামে একজন কর্মীকে পুলিশের গুপ্তচরের কাজ করার অপরাধে মৈমনসিংএর শেষেরদিঘীতে জীবন শেষ করতে হ'ল অবুদ্ধির অজ্ঞতায়। পুলিশের কোন সন্ধানই কাজে লাগল না।

১৯১৬ সাল। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী। তাঁদের ও শ্রীপুলিন মুখার্জীর সহযোগিতায় ও ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা নব উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। তখন নিয়ম অটল, শক্তি অসীম, অন্তরের ঐশ্বর্য অনবদ্য। শিবপুর ডাকাতি মামলার বিচারাধীন আসামী শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী কাঠগড়া থেকে হঠাৎ বললেন "সর্দি হয়েছেরে, মধু চাই।" কর্মীরা বুঝলেন ইঙ্গিত—১৯১৬ সনের ১৬ই জানুয়ারী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে আরপুলি লেনের কাছে বেলা দশটার সময় শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য নামে সেই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে শেষ করে দিয়ে দু'জন পরম নিশ্চিন্তে সরে পড়লেন। শালকের ডোমপাড়া লেনে শ্রীঅতুল ঘোষ কয়েকজন বিপ্লবীকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। পুলিশ সন্ধান পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার সময় দু'পক্ষেরই খণ্ডযুদ্ধে ধরা পড়ে গেলেন শ্রীযুগল দত্ত।

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। পেশোয়ার থেকে লেখা কোন মহিলা কর্মীর গোপন একখানা পত্র আসে তাঁর নামে। সেটা বিলি করবার ভার পড়ে অক্সফোর্ড মিশনের ছাত্র, মুন্সীগঞ্জের শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের উপর। তাঁকে অতর্কিতে পুলিশ ধরে ফেলে সন্দেহে। ফলে পুলিশ চিঠিখানি থেকে চন্দননগরে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সন্ধান পেয়ে যায়। সে সময় চন্দননগরে শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রভৃতি কর্মীগণ আত্মগোপন করে ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রমোহনের বাড়ী নিরাপদ বিবেচনায় বাধ্য হয়ে কিছুদিনের জন্যে কিছু কিছু জিনিস সেখানে রাখা হয়েছিল। সে সব জিনিসের ভেতর থেকে মাষ্টারমশাই ও নরেনদা সম্পর্কিত একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ধরা পড়ে। সেটা পেয়ে পুলিশ জানতে পারে যে সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক উত্থানের পরিকল্পনার কথা। রডা কোম্পানীর

অপহৃত অনেকগুলি মসার পিস্তল এখানে পাওয়া যায়। এঁদের দু'জনকে জড়িয়ে ষড়যন্ত্র মামলা করার চেষ্টা হয় কিন্তু পত্রে লিখিত নরেনদা যে 'বড়দা' শ্রীক্ষেত্রমোহনের চরিত্রগুণে ও বুদ্ধিবলে পুলিশ তা' প্রমান করতে পারলেন না। ষড়যন্ত্র মামলা করার চেষ্টা বিফল হ'ল। সে সময় ধরা পড়লেন বীরভূমের শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘটক ও তাঁর মাসীমা শ্রীমতী দুকড়িবালা দেবী দু'টি মসার পিস্তল সমেত। এই মহিয়সী মহিলা নিজবুদ্ধিবলে মসার পিস্তলের বিভিন্ন অংশের সংযোজন ও ব্যবহার শিখে ফেলেছিলেন। তখন কোন যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলে তাঁর কাছে পাঠানো হ'ত। চন্দননগরে পাওয়া কাগজপত্রে সক্রিয় কর্মীদের একটি তালিকা পেয়ে যান পুলিশের পদস্থ কর্মচারীরা। ১৯১৬ সনের ১৬ই জানুয়ারী আমার দাদা শ্রীহরিনারায়ণ চন্দ্র ধরা পড়লেন। চৌরঙ্গী দিয়ে চলেছিলেন দু'জন নেতৃস্থানীয়। তাঁরাও ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু সেই নেতৃস্থানীয় একজনের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি বেরিয়ে গেল। তিনি স্বীকারোক্তি করলেন উনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী। ক্ষণিকের দুর্বলতা অনিমেষ জাগ্রত শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এ দুর্বল মুহূর্তের সংকীর্ণতা না উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহ ? যাই হোক্ তারও অনেকে ধরা পড়লেন। যিনি করলেন দায়িত্বহীন চাপল্যে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি, দিলেন অন্যকে জড়িয়ে বিপদের মাঝে, তিনিই আজ দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের অন্যতম। বহুদিন পরে অন্য একজনের স্বীকারোক্তির সঙ্গে তাঁর জবানবন্দী মিল হওয়ায় বাংলার গভর্ণর স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন "আপনি এঁদের বিকৃত মস্তিষ্ক অপোগণ্ড বলে এঁদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পড়ে দেখুন এ কাগজখানা, বৈদেশিক সাহায্যে ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা। এবার এঁদের নিশ্চয়ই বিকৃত মস্তিষ্ক বলবেন না।" স্যার সুরেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। দুঃখে পরে বলেছিলেন "আজ আমার মৃত্যু হ'ল।"

এই সুরেন্দ্রনাথকে সে যুগের লোকেরা বলতেন "Surrender not—আপোষহীন-মুকুটহীন সম্রাট।"

তখন অমরদা শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মগোপন করে আছেন। প্রথমে চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ী, পরে গালাকুঠিতে ছিলেন কিছুদিন। তারপর গেলেন ঘোড়াপুকুরে শ্রীরামেশ্বর দের বাড়ী। সেখান থেকে শ্রীসতীশ কুণ্ডুর বাগান-বাড়ী। তারপর হরিদ্রাডাঙ্গার কারফরমার বাগানে কিছুদিন থাকবার পর এলেন লালবাগানে, সেখান থেকে কামারকুণ্ডু, শেষে এলেন শালকেয়।

লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃশব্দে যে মহীয়সী মহিলা সে যুগের বৈপ্লবিক কর্মধারার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন আজ অনেকেই তাঁর পরিচয় জানেন না। তাঁর উপর যে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন পুলিশ করেছিল তা' অমানুষিক। এই মহিলার নাম শ্রীমতী ননীবালা দেবী। জন্ম ১৮৮৮ সনে হাওড়া জেলার বালিতে। পিতা শ্রীসূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আজও তিনি আত্মীয় স্বজনের অনাদর ও দারিদ্র্যের মাঝে পরিপূর্ণ মর্যাদায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন।

যুদ্ধের সময় পেশোয়ার থেকে ধরে আনা হয়েছিল শ্রীমতী ননীবালা দেবীকে। তিনি চন্দননগরের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষে করে চলতেন। ইনিই ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত কর, শ্রীবিজয়ভূষণ দত্ত, শ্রীবিজয় চক্রবর্তী প্রভৃতি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গতিবিধি জানতেন। তারপর তাঁর নির্দেশে শ্রীমতী ক্ষীরোদা সুন্দরী চৌধুরী, এঁদের পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, ধুবড়ী, প্রভৃতি স্থানে ও শেষ পর্যন্ত আসামের বিন্নাখাটা গ্রামে আশ্রয় দেন। তখন যাদুগোপালদার নামে দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়ে হুলিয়া ঘুরছে।

শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার ধরা পড়বার সময় বলে যেতে পারেন নি কোথায় যন্ত্রাদি রেখে গেছেন। সেটা জানবার জন্যে শ্রীমতী ননীবালা দেবী রামবাবুর নকল স্ত্রী সেজে জেলে দেখা করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে জেনে এলেন সব খবর। তিনি ধরা পড়বার পর অন্ধকার বাতাসহীন সেলে তাঁকে বন্ধ করে রেখে অপমান লাঞ্ছনা করেও যখন কিছু হ'ল না তখন কাশীর ডি. এস. পি. শ্রীজিতেন ব্যানার্জীর নির্দেশে তাঁকে বিবস্ত্রা করে খানিকটা লঙ্কা বাঁটা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েও তাঁর কাছ থেকে কোন কথা বের করতে পারল না পুলিশ। এ অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি রইলেন বিশদিন অনশনে।

শ্রীমতী ননীবালা দেবীকে প্রথমে পেশোয়ার থেকে কাশী জেলে আনা হয়। সেখানে হাজার রকম নির্যাতন সত্ত্বেও যখন কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা গেল না তখন তাঁকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হয়। ইলিসিয়াম্ রোতে তাঁকে জিজ্ঞাবাদ করার সময় তিনি স্পেশাল সুপার মিঃ গোল্ডির গালে মারলেন এক চড়—অসম্মানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে—মিঃ গোল্ডি তাঁর লেখা কাগজ ছিঁড়ে দিয়েছিলেন বলে। পরে মিঃ গোল্ডি তাঁর কাছে ক্ষমা চান কিন্তু আমাদের দেশী পুলিশ অফিসার শ্রীজিতেন ব্যানার্জীর অনুতাপের কোন চিহ্নও দেখা যায় নি। সেই কারণে সে যুগের বিপ্লবীরা বিদেশী শত্রুর চেয়ে দেশী শত্রুদের আগে মারবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের মতে যারা স্বাধীনতার পথে, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, সব সময় অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিকৃষ্টতম শত্রু। যাক্ শ্রীমতী ননীবালা দেবীই প্রথম বাঙালী মহিলা যিনি ১৮১৮ সনের ৩ আইনে বন্দী থাকেন। অন্তরের মাঝে কি অক্ষুণ্ণশক্তির নিত্যবিকাশ।

শ্রীমতী ননীবালা দেবীর কথা মনে হলেই আর একজনের নাম মনে পড়ে তিনি শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী—শ্রীমহাদেব সরকারের

ঠাকুমা। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের কর্মীদের মধ্যমণি। ১৯২৮ সনে পুলিশ যখন শ্রীমহাদেব সরকারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে তাঁকে বাড়ী খানাতল্লাসী করতে এসেছে, সেই বৃদ্ধা নানান কথায় সোরগোল তুলে লোক জড় করে পুলিশকে দু'ঘণ্টা আটকে রেখে দেন এবং তারই মধ্যে ঠাকুরঘরের ভেতর থেকে অদ্ভুত সাহসে ও অসামান্য বুদ্ধি বলে কয়েকটা রিভলভার, কিছু কার্তুজ ও দক্ষিণেশ্বরের তৈরী একটা বোমা পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে অন্য ঘরে পাচার করে দিয়েছিলেন। বৃদ্ধার এ সাহস সত্যিই বিস্ময়ের জিনিস।

১৯১৬ সনের ২৭শে জানুয়ারী গোয়াজেলে বন্দী বিপ্লবী শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মহত্যা করলেন—পুলিশের নির্মম অত্যাচারই তার কারণ বলে সকলেরই অনুমান।

১৯১৬ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে সপ্তম রাজপুত সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লবাত্মক কাজের উৎসাহদানের অজুহাতে ড্রিল হাবিলদার শ্রীজলেশ্বর সিং ও একজন নায়েকের কোর্টমার্শালে সংক্ষিপ্ত বিচার হয়ে গেল। দিল্লী সিভিল জেলে ২১শে মার্চ শ্রীজলেশ্বর সিং স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকের মতই হাসিমুখে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিলেন। চঞ্চলের অন্তরালে বয়ে গেল অচঞ্চল মৃত্যুর গরিমা। নায়েকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

১৯১৬ সনের ২৯শে জানুয়ারী ৬২/২নং হ্যারিসন রোডে ধরা পড়লেন শ্রীনিশিকান্ত লাহিড়ী—পিস্তলটা সরবার সময় পেলেন কিন্তু চল্লিশ রাউণ্ড গুলি সরাতে সুযোগ পেলেন না—হয়ে গেল দীর্ঘদিনের শাস্তি।

কিশোরগঞ্জের শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র রায় নামে একটি সাহসী অল্প বয়স্ক কিশোর তাঁর দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে বিপ্লবী দলভুক্ত হন। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করতে গেলে তিনি পালিয়ে যান। কয়েকদিন পরে ধরা পড়লেন এমন

অবস্থায় যে রিভলভার ব্যবহার করতে সুযোগ পেলেন না—১৩ই জুলাই দু'বছরের জেল হয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল আমাশয় রোগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত।

১৯১৬ সনের ২৩শে জুন শ্রীসুরেন্দ্রভূষণ মুখার্জী ও শ্রীরোহিণী কুমার মুখার্জী নামে দুই পুলিশের গুপ্তচরকে ঢাকার বৈরাগীতলায় সন্ধ্যের সময় গুলি করে শেষ করে দিয়ে দু'জন নির্বিঘ্নে সরে পড়লেন। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও তাঁদের সন্ধান পেলেন না।

দু-দুবার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মনে তখন ভয় ঢুকে গেছে। পাছে কেউ তাঁর মোটর গাড়ী আটক করে বোমা মারে সেই ভয়ে তিনি গাড়ী চড়া ছেড়ে দিলেন। দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে আরম্ভ করলেন সাইকেলে চলা-ফেরা যাতে প্রয়োজন হ'লে সহজে যে কোন রাস্তাদিয়ে পালাতে পারেন। আবার তাঁকে মারবার চেষ্টা হ'ল—কয়েকজন বিপ্লবী রাস্তায় বল খেলার ছল করে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

১৯১৬ সনের ৩০শে জুন তাঁকে পেয়ে গেলেন সামনে। পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর অবরুদ্ধ জীবনাকাশ। সঙ্গীরাও জীবিত রইলেন না। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে চলে গেলেন নিঃসংশয় মূর্তি শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী শ্রীঅতীন রায়, শ্রীশিশির ঘোষ প্রমুখ কর্মীরা। বসন্তবাবুর জায়গায় এলেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতি। বসন্তবাবুর ছেলেরা পুরস্কার স্বরূপ পেলেন চাকরি। যে সময় দেশের তরুণেরা প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত, গান্ধীজি কিন্তু সে সময় ইংরেজকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার জন্যে সাফল্যের সঙ্গে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত। গান্ধীজির সুখ্যাতিতে তখন ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি দেশ বিদেশে পঞ্চমুখ। গান্ধীজির ইংরেজ জাতের কৃতজ্ঞতার উপর আস্থা ছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে এ সাহায্যের প্রতিদানে ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতার পথ নিশ্চয়ই সুগম করে দেবে।

আমেরিকার গদর পার্টি তখন সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহ জাগাবার জন্যে তাঁরা তখন খুবই সক্রিয়। সিঙ্গাপুরেও শিখ সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। তাঁরা সাতদিন ধরে সহর নিজেদের দখলে রাখলেন। মুমূর্ষু জীবনীশক্তি হয়ে উঠল সচেতন ধৈর্যহীন উন্মত্ততায়। শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের অভাবে তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। এ সময়ে গদর পার্টির শ্রীযোধ সিং ছিলেন কালিফোর্ণিয়ায়। তিনি ধরা পড়ে হয়ে গেলেন রাজসাক্ষী, আর সিঙ্গাপুর থেকে লাহোর, ও বার্লিন থেকে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত গদর পার্টির বৈপ্লবিক পরিকল্পনার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলেন। সাক্ষী দেবার জন্যে তাঁকে সিঙ্গাপুর থেকে লাহোরে আনা হ'ল। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষী দেবার আগে তাঁকে মারবার চেষ্টাও পণ্ড হয়ে গেল। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। কিন্তু ভগবান শেষ পর্যন্ত তাঁকে শাস্তি দিলেন। অপমানিত জীবন অসহ্য দুর্ভর। দৈবের অযাচিত দান জড়তার গ্লানি তাঁকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেল উন্মাদ আশ্রমে।

১৯১৬ সনে ১১ সেপ্টেম্বর ললিতেশ্বরে অর্থ সংগ্রহের সময় ত্রিপুরায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন শ্রীপ্রবোধ ভট্টাচার্য। (১)

প্রভুত্বমদমত্ত ইংরেজের ভ্রুকুটির অপমানের প্রতিশোধে বাংলা পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত যুবকেরাই সেদিন আজন্মকালের দুরাশায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন পরিণতির অন্তহীন পথে। ব্রিটিশের শক্তির দম্ভ, 'উদ্যতমাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধ জাহাজের ঔদ্ধত্য', আইন শৃঙ্খলার নামে শাসকের রক্তচক্ষু, কোন প্রতিকূল অবস্থা তাঁদের পথরোধ করতে পারে নি। কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মত, স্বাভাবিক স্বাধীনতা সংগ্রাম স্পৃহা নিয়েই যেন তাঁরা জন্মে ছিলেন। অর্থের সম্বল নেই,—আত্মীয় স্বজনেরা বিমুখ—পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি সব সময়েই—তাতে কি আসে যায়? সেই অনবদ্য

(১) অগ্নিদিনের কথা—পাকড়াশী পৃঃ ৫৭

প্রয়াস, জীবনদানের সেই উন্মত্ত প্রতিযোগিতা ছিল তাঁদের জীবনের ঐশ্বর্য। তাঁরা জানতেন অভাব থেকেই পূর্ণতা, অসাম্য থেকেই সামঞ্জস্য।

এই সময় দক্ষিণ এশিয়ায় ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। এক-দিকে যুদ্ধ, অন্যদিকে দেশব্যাপী বৈপ্লবিক উত্থানের আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার ব্যতিব্যস্ত। দক্ষিণ এশিয়ার বিপ্লবীরা চলে এলেন চীনে। শ্রীফণী চক্রবর্তী ওরফে পাইন ধরা পড়ে গেলেন সাংহাইএ। তিনি, শ্রীঅবনী মুখার্জী ও শ্রীভূপতি মজুমদার রইলেন সিঙ্গাপুর জেলে। শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপ যখন বার্লিনে, তখন পরলোকগতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভাই শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। স্বয়ং কাইজার মহেন্দ্র প্রতাপকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং পরে ইণ্ডোজার্মান মিশনের নেতৃত্বের ভার দিয়ে স্তাম্বুলে পাঠালেন। এনভার পাশা মিশনকে অভ্যর্থনা জানালেন—মিশন কাবুলে এসে পৌঁছুল। আমীর হাবিবুল্লা খাঁ শ্রীমহেন্দ্রপ্রতাপকে মিশনের নেতা ও কাইজার ও সুলতানের সংবাদবহ বলে মুখে সম্মান দেখালেন কিন্তু কাজে কিছু করলেন না। যুদ্ধে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে সাহস করলেন না। (১)

ওদিকে জার্মান সৈন্যেরা তখন ভার্দুনের যুদ্ধে আটক পড়ে গেল। ভার্দুনের যুদ্ধে জার্মানরা জিততে পারলে ভারতের ইতিহাসের রূপ বদলে যেত। এক ভার্দুনের যুদ্ধই ভারতের ভাগ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রইল। নিয়তির পরিহাস—এই ভার্দুনে ভারতীয় সৈন্যসংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশী। ধরা পড়ে গেলেন শ্রীজিতেন লাহিড়ী, শ্রীসত্যেন সেন, শ্রীকেদার নাথ, শ্রীচৈত সিং এবং আরও অনেকে। অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রাণ দিলেন শ্রীকেদার নাথ। শ্রীকেদার নাথের বয়স তখন মাত্র বাইশ বৎসর। দুর্দান্ত সাহস ও

(১) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

অসীম ক্ষমতাবান এই যুবককে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই তিনি মরুভূমি পার হয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু কেরমানে ধরা পড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে গুলিতে প্রাণ দিলেন মধ্য পারস্যের লুট মরুভূমিতে ১৯১৭ সনে। শ্রীচৈত সিং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন। শ্রীদাদাজী কানজী কেরসাস্প ছিলেন বার্লিনে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। তিনি ইরানের ভেতর দিয়ে এলেন আফগানিস্থানে ভারতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হবে না জেনে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সিস্তানে ধরা পড়লেন। শ্রীবসন্ত সিং মেসোপোটেমিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে দেশের স্বাধীনতার চেতনা জাগাবার চেষ্টায় চললেন আফগানিস্তানের দিকে। পার্শীযুবক শ্রীকেরসাস্প ও শ্রীবসন্ত সিং ধরা পড়ে গেলেন কেরমান আফগানিস্তানের সীমান্তে। ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে তাঁদের গুলি করে মারা হ'ল কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে। সভ্য ইংরেজের পৌরুষের বীভৎসতা। পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে পারস্য সৈন্যদলে যোগদিয়ে ১৯১৯ সন পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। কেরসাস্প প্রথম পার্শী যুবক যিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিলেন। অম্বাপ্রসাদের ডান হাত ছিল না, বন্ধুদের তামাসা করে বলতেন যে ১৮৫৭ সনের সিপাই যুদ্ধে তাঁর হাতটা গেছে। পারস্য গভর্ণমেণ্ট সিরাজ থেকে তাঁকে ইংরেজের হাতে তুলে দিলেন। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তাঁর উপর চলল অমানুষিক নির্যাতন। শেষে হুকুম হ'ল কামানের মুখে বেঁধে তাঁকে উড়িয়ে দেবার; কিন্তু আগের রাত্রে তাঁকে তাঁর সেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। চলে গেলেন অম্বাপ্রসাদ। এই অম্বাপ্রসাদ কৈশোর থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স পঁচিশ তখন মোরাদাবাদ থেকে প্রকাশ করেন একটি সংবাদপত্র উর্দু ভাষায়; তার নাম দিলেন 'হালুম'। রাজদ্রোহের

অপরাধে হালুমে লিখিত প্রবন্ধের জন্যে তাঁর আঠারো মাস জেল হয়ে গেল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার প্রকাশ করলেন 'ভারতমাতা'। ১৮৯৭ সালে আবার ভারতমাতার সম্পাদক হিসেবে রাজদ্রোহের অপরাধে আঠারো মাস কারাদণ্ড হয়ে গেল। ১৯০৬ সনে যখন বাংলায় বিপ্লবীরা তৈরী হচ্ছেন তখন তিনি 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ইণ্ডিয়া পত্রিকা গুজরান-ওয়ালা থেকে প্রকাশিত হ'ত। অম্বাপ্রসাদ আবার ১৯০৭ সনে ২৪শে সেপ্টেম্বর কৃষক আন্দোলনে জড়িত অভিযোগে ধরা পড়লেন কিন্তু প্রমাণাভাবে পেলেন মুক্তি। মুক্তি পেয়েই পালালেন নেপালে—সেখান থেকে কাবুল হয়ে গেলেন ইরাণ। সুফী অম্বাপ্রসাদ বার্লিন কমিটির নির্দেশে গেলেন তুরস্কের আমীরের কাছে কিন্তু তিনি কোনরকম সাহায্য দিতে অস্বীকার করলেন। ধরা পড়ে গেলেন অম্বাপ্রসাদ আর ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিলেন।

সরকারী রিপোর্টে দেখা গেল যে বাংলায় ১৯০৬ সন থেকে ১৯১৬ সনের মধ্যে ২১টি ঘটনা ঘটেছে। ১০১টি প্রচেষ্টা পুলিশ আগে হতে খবর পেয়ে প্রতিরোধ করেছে। এসব ব্যাপারে ১৩০৮ জন বিপ্লবী জড়িত ছিলেন। ৩০টি মামলায় মাত্র ৮০ জনের দণ্ড হয়েছে। ১০টি ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২ জনকে জড়িত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদের দণ্ড পেয়েছেন ৬৩ জন। বিনা বিচারে আটক ৮২ জন—অস্ত্র আইনে দণ্ডিত ৫৮ জন। বিপ্লবীরা ২১টি ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছেন।

লাহোর স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিপ্লবীদের ন'টি দলে বিচার হয়। প্রথমবার ৬১ জনের—সরকারী সাক্ষী ৪০৪, এঁদের পক্ষের সাক্ষী ২২৮। দ্বিতীয়বার ৭৪ জনের—সরকারী সাক্ষী ৩৬৫, এঁদের সাক্ষী ১০৪২। তৃতীয়বার ১২ জনের—সরকারী সাক্ষী ৮৬, এঁদের সাক্ষী ৪৪০। এভাবে ৯ দলে বিচার হয়ে ২৮ জনের ফাঁসি ৯০ জনের

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ২৯ জনের মুক্তি হয়। কি ভয়ানক শাস্তি— দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি। কিন্তু সেখানে ছিল বিপ্লবীদের নির্ভীক বলদৃপ্ত দুর্জয় সাহসের আত্মঘোষণা, দুর্বল মানুষের হৃৎপিণ্ডের পঙ্গুতা নয়। লোকে ভুলে যায় যে বহুদিনের পুঞ্জীভূত ছোট ছোট বেদনা, অবিচার, অবিশ্বাস, অপমান, হঠাৎ একটা অজানা মন্ত্রবলে তুচ্ছ কারণে বিরাট আকারে আত্মপ্রকাশ করে—এরই নাম বিপ্লব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সমস্ত ভারতীয় বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে মরণপণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্বশ্রীঅবনী মুখার্জী, ডাঃ বিষ্ণুসুখতন কর, খাঁনচাদ বর্মা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পাণ্ডুরঙ্গ সদাশিব খানখোঁজে, বিনায়ক সাভারকর, শ্রীশচন্দ্র সেন, সুধীর বসু, আগাসে ওরফে মহম্মদ আলি, সর্দার অজিত সিং, সতীশচন্দ্র রায়, হৃষীকেশ লাট্টা, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, সুধীন বসু, পরন্তপে, চম্পক রাম পিল্লাই, বসন্ত কুমার রায়, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, নন্দনকার, মারাঠে. সদাশিব রাও, নরেন বসু, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ওরফে আলি হাইদার, মহেন্দ্র প্রতাপ, বীরেন্দ্রনাথ সেন, মীর্জা আব্বাস, বাপট, ধনগোপাল মুখার্জী, তারকনাথ দাস, সুরেন কর, কারন্তকর, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বাইরে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর যে সমস্ত বিদেশী মহিলা ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা, মাদাম কামা, ও শ্রীমতী অ্যাগনেস স্মেলডি সর্বাগ্রগণ্যা। দেশে বিদেশে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল কিন্তু রয়ে গেল আদর্শের চিহ্ন ইতিহাসের স্বষ্টিআসনে। যে আশা, যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা, যে দেশপ্রেম নিয়ে এঁরা কাজে নেমেছিলেন তার তুলনা নেই। যাঁরা এ কাজে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা সর্বদেশে সর্বকালেই প্রণম্য।

সানফ্রানসিসকোর প্রকাশ্য আদালতে পণ্ডিত রামচন্দ্রকে একজন শিখ গুলি করে মারলেন। তাঁকেও সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের এক বেলিফ

গুলি করে শেষ করে দিলেন। কারণ আজও অজ্ঞাত। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন গদর পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মৃত্যুতে পার্টির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল।

শ্রীঅবনী মুখার্জীর জন্ম জব্বলপুরে ১৮৯১ সনের ৩রা জুন। আদি নিবাস খুলনা জেলার সাতক্ষীরার বাবুলিয়া গ্রাম। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখার্জী, মাতা শ্রীমতী হরিমতী দেবী। প্রথমে কলকাতা মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়া শেষ করে যান আমেদাবাদ। চাকরি নেন একটা কাপড়ের কলে বয়নশিল্প আয়ত্ব করতে। ছাত্রাবস্থায় সখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীলিয়াকৎ হোসেন ও মায়ের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবের পথে পা বাড়ান। আমেদাবাদ থেকে জাপানে ওসাকা, শেষে লিপজিগ্। হলেন লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক।

১৯১২ সনে ফিরলেন স্বদেশে—চাকরি নিলেন খিদিরপুরে এনড্রু ইয়ুল কোম্পানির এক মিলে। কিছুদিন পরে গেলেন বৃন্দাবন প্রেমমহাবিদ্যালয়ে। এ সময় শ্রীসুরেন কর ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে। মনে তখন বিপ্লবী জীবনের রং ধরেছে। ১৯১৪ সনে মার্টিন কোম্পানীতে ইনস্পেক্টরের চাকরি নিয়ে ফিরে এলেন বাংলায়। এলেন যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে—বিপ্লবসাধনার যোগাসন পেতে বসলেন। ৬নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের উপর তলায় ছিল ইণ্ডিয়া ক্লাব। সেখানে ছিলেন শ্রীসত্যহরি বিষ্ণু। 'হলের স্পর্শে মনের অহল্যা-ভূমিতে হ'ল প্রাণসঞ্চার।' যতীন্দ্রনাথের পরামর্শে ১৯১৫ সনে গেলেন জাপান, শ্রীরাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীরাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হরিদ্বারের কনখলে ১৯১৪ সনে।

বিদেশস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে তিনি সাংহাইয়ে আয়োজন করলেন এক সম্মেলনের। সে সময় জাপানে

তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শ্রীভগবান সিং, লালালাজপত রায়, ডাঃ সানইয়াৎ সেন, শ্রীবিনয় কুমার সরকার, শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত আর চীনের শ্রীওয়েসির সঙ্গে। সম্মেলনের শেষে অতর্কিতভাবে পেনাং জাহাজের উপরে ধরা পড়ে গেলেন। তাঁর পকেটের একটি ডায়েরী থেকে পুলিশ বহু বিপ্লবীর পরিচয় ও অনেক গোপন তথ্যের সন্ধান পেয়ে যান। রইলেন সিঙ্গাপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সর্বশ্রীভূপতি মজুমদার, রাজা মতিচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণী চক্রবর্তী ও অন্যান্য কয়েকজন খ্যাতনামা বিপ্লবী।

১৯১৭ সনের মে মাসে তাঁর কোর্টমার্শালের দিন ধার্য হয়। কয়েকদিন আগে অন্যান্য জার্মান যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে সাঁতার কেটে পালিয়ে যান। (১) পুলিশ যখন জানতে পেরে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে তখন তিনি তাঁদের নাগলের বাইরে। দুর্লঙ্ঘ পথের যাত্রী অজানা তার পরিণাম। ছিল হয়ত দেবতার অনুগ্রহ—অসীম পথের পান্থ পেলেন একটি জেলেডিঙ্গী। মালিককে অনেক অনুরোধ উপরোধ করার পর তিনি দয়া করে তাঁকে সুমাত্রায় নামিয়ে দিয়ে যান। নানা বাঁকা পথে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানে এক রবার কারখানায় দু'বছর কুলীর কাজ করে করলেন পাথেয় সঞ্চয়। পরে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোকের চাকর সেজে "আর সহির" নাম নিয়ে পাশ-পোর্ট জোগাড় করে চলে যান ইউরোপে। অন্তরে চলেছে তখন নির্ঝরের নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা।

১৯১৯ সনে হল্যাণ্ড হয়ে গেলেন জার্মানী। চাইলেন বার্লিনস্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে কর্মসমুদ্রের মাঝে। কিন্তু তাঁরা প্রথম প্রথম তাঁকে দেখতে লাগলেন সন্দেহের চোখে। অধ্যাপক শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের

(১) Soviet Land No 15 August 1967 Page 18

সঙ্গে ছিল তাঁর বহুদিনের পরিচয়—অপরিচয় ও সন্দেহের বাধা হ'ল দূর। সেখান থেকে গেলেন মস্কো—'পৃথিবীতে যেখানে সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছে—ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গন দ্বারে যেখানে নির্ধনের শক্তি সাধনা আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রুকুটি কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।' জাগ্রত বুদ্ধির দেশে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনে তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টি গেল বদলে। মনে তখন নতুন জিজ্ঞাসা। ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে সাম্যবাদ মূলক বিজ্ঞানের চর্চা না করলে সত্যিকারের দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে না। বই লিখলেন India in Transition মস্কোস্থিত ইনষ্টিটিউট অফ কম্যুনিষ্টে চার বছর গবেষণার পর পেলেন ইতিহাসে ডক্টরেট উপাধি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সর্বশ্রীত্রিমূল আচারিয়া, আব্দুল রব প্রমুখ বিপ্লবীরা। তাঁরা বুঝলেন যে সোভিয়েট আর যাই হোক্ নিরুপায় মানুষকে নিয়ে ইংরেজের মত 'পুতুল নাচের ব্যবসা করে না।'

রাশিয়ায় থাকবার সময় তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী রোজা সোলেমনা ফিটিংগফের পরিচয় হয়। শ্রীমতী ফিটিংগফ লেলিনের সেক্রেটারী ফতেভিয়া লিটিভার সহকারীর কাজ করতেন এবং শ্রীমুখার্জী তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২০ সনের শেষের দিকে তাসখন্দে প্রথম ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে ওঠে। সেই পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হন সর্বশ্রীমানবেন্দ্র রায়, শ্রীমতী এল. উইন. রায়, অবনী মুখার্জী, শ্রীমতী মুখার্জী, মহম্মদ সাদিক, মাইসুদ আলি শা। সাদিক তার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশানাল কনফারেন্সে শ্রীমুখার্জী ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ১৯২১ সনে তাসখন্দে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কমুনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশানলের অনুমোদন লাভ করে। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁর কথা জানতে পেরে রুশ সরকারকে তাঁকে ভারতে পাঠাবার

জন্যে অনুরোধ করলে রুশ সরকার তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। (১)

এরপর কোন এক সহকর্মীর সঙ্গে আদর্শ, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি ও প্রবন্ধ রচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। সহকর্মী তাঁকে পুলিশের গুপ্তচর পর্যন্ত আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নি। (২) সেটা এতদূর গড়িয়ে পড়ে যে রাশিয়ার অভিজ্ঞ হস্তলিপি বিশারদরা তদন্ত করে সেই সহকর্মীকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। (৩) মহামতি লেনিন ১৯১৯ সনের ৭ই মে শ্রীমুখার্জীর সঙ্গে অভাবিত পরিচয়ে, আলাপ আলোচনায় ও তাঁর লিখিত ভারতীয় বিপ্লব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ে তার সম্বন্ধে খুব উচ্চধারণা পোষণ করেন। (৪) পরে নানা কারণে সেই সহকর্মীটি পার্টি হতে বিতাড়িত হন ১৯২৯ সনে। (৫) তার আগে থেকেই তিনি নানা দেশ হ'তে তাঁর পত্রিকা ভ্যানগার্ড প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯২২ সনে পার্টির নির্দেশে শ্রীমুখার্জী দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে গোপনে ভারতে আসেন ও বিভিন্ন জায়গায় আত্ম-গোপন করে থাকার সময় এদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা সফল হবে কি না তাবই পর্য্যালোচনার জন্যে তিনি এসেছিলেন। ভাগ্যের চক্রান্তে সেই পুরাতন সহকর্মীর প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজন তার বিরোধিতা করলেন। শ্রীমুখার্জী ভারতে থাকার সময় গয়ায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করলেন ডিসেম্বর মাসে।

(১) Soviet Land No. 15 August 1967 p. 18.
(২) Personalities of early twenties—Intelligence Bureau, Home Dept. Govt. of India. Chapt. 20 p. 281.
(৩) Link August 30, 1964 p. 33-35.
(৪) Ibid.
(৫) Communism in India by Gene. D. Overstreet & Marshall Wind Miller.

সর্বশ্রীসন্তোষকুমার মিত্র, প্রতুল গাঙ্গুলী, বীরেন গাঙ্গুলী, তমোহর গুপ্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল রেজাক খাঁ, সুরেন হালদার, নরেন সেন, শিবনারায়ণ পাল, অচ্যুতানন্দ সিংহ ও তপতী মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদের আশ্রয়ে কিছুদিন থাকার পর গেলেন নাভায়। এ সময় তিনি মঃ জিনোভিয়েভকে ভারতের অবস্থা সম্যক্ জানান। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার শুনানীর সময় পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁর হস্তলিখিত বলে কয়েকখানি পত্র দাখিল করা হয়। কিন্তু মহাফেজখানায় অনুসন্ধান করে তাঁর ভাই শ্রীতপতীনাথ মুখার্জী জানান যে সে হস্তলিপি অবনীবাবুর নয়। অন্য কেউ তাঁকে অপদস্থ করবার জন্যে এ হীন কাজ করেছেন। তাঁকে একবার মারবার চেষ্টাও চলে কিন্তু শ্রীনরেন সেনের সাহায্যে তিনি সে যাত্রা রক্ষে পেয়ে যান। নাভায় রাজা রিপুদমন সিংকে গদীচ্যুত করার পর প্রজারা রাজার হয়ে যে আন্দোলন চালান তাতে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। তারপর মাদ্রাজ থেকে সি-আই-ডির ফাঁস এড়িয়ে মরণশঙ্কিল পথে কলম্বো হয়ে ফ্রান্সে ফিরে যান। ভারতে থাকার সময় তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু জনৈক বিপ্লবী শ্রীহেমন্ত সরকার সেই আলোচনার সমস্ত তথ্য পুলিশের কানে তুলে দেন। ফলে সুভাষচন্দ্র বসুকে মান্দালয় জেলে বন্দীজীবন কাটাতে হয়। (১)

তিনি যে জাহাজে ফ্রান্সে যান সেই জাহাজে ছিলেন শিল্পী শ্রীঅতুল বসু। দীর্ঘবপু দৃঢ়বাহু আত্মশক্তিতে পর্যাপ্ত ছদ্মবেশী মুখার্জীকে তিনি চিনতে পারলেন না। ফ্রান্সের উপকূলে তিনি অপরিচিতের অভাবিত রহস্যের সন্ধান পেলেন যে মৃত্যুর পরোয়ানা গলায় ঝোলান ছদ্মবেশী তাঁর অগ্রজ পবিত্র বসুর বাল্যবন্ধু।

ফ্রান্স থেকে আবার মস্কো। ১৯২৫ সনে তিনি সমরখন্দ সোভিয়েটের সভ্য মনোনীত হন আর তার আগে ভারত সম্বন্ধে

(১) শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ।

কয়েকখানা বই লেখেন। বইগুলির মধ্যে 'Agrarian India,' 'ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ '১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ' সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অকুণ্ঠ সমর্থন পায়। (১) ১৯২৪ সনে জুলাই মাসে মস্কো থেকে তিনি অতুল বসুকে কয়েকখানি পত্র লেখেন ও কিছু বই পাঠান।

১৯২৯ সনে তিনি প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমিতির সভ্য ও কম্যুনিষ্ট একাডেমিতে বিজ্ঞান সভ্য নিযুক্ত হন। প্রাচ্য বিদ্যাপরিষদে অধ্যাপকের কাজ করবার সময় তিনি বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাচ্যশাখার শিক্ষা সচিব পদে উন্নীত হন। (২)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ট্রট্স্কী পন্থী সন্দেহে শ্রীমুখার্জী, শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হয়। শ্রীমতী মুখার্জী আজও জীবিতা। শ্রীমুখার্জীর পুত্র গৌর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ান ফ্রন্টে ভারতীয় নিহতদের মধ্যে প্রথম। কন্যা শ্রীমতী মায়া এখন লেলিনগ্রাদে যক্ষারোগ বিশেষজ্ঞ কৃতবিদ্য চিকিৎসক। পিতার আদর্শে আজও তিনি ভারতের কল্যাণের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং ভারতস্থিত আত্মীয়গণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। শ্রীমানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের ফলে বহু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কমরেড সৌমেন ঠাকুর পরে অবশ্য সে ধারণা অনেকাংশে নিরসন করেন।(৩) সম্প্রতি কায়রো থেকে কমরেড সৌকত ওসমানির একখানি পত্রে জানা যায় যে যাঁরা শ্রীমুখার্জীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছিলেন তাঁরা পরশ্রীকাতর ও অপরের কর্মদক্ষতায় ঈর্ষান্বিত। (৪) তিনি লিখেছেন Mukherjee was an important figure in Taskhent and what others could not do in respect to approach with the authorities Mukherjee was very much at home with the Soviet Commissars. To

(১) প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩৮—৩১শ ভাগ ১ম খণ্ড।

(২) New Times, Issue No. 14—1967.

(৩) Historical Development of Communist movement on India—Tagore.

(৪) Letter dt. 28-4-69 from Com. Saukat Osmani.

tell the least he became a sort of God-father to all the students and used to get them all their necessities from Soviet authorities—from winter clothings to the best of amenities. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নির্ভীক সৈনিক শ্রীঅবনী মুখার্জীর কর্মময় জীবনের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জীবনের বন্ধুর পথে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আজীবন চেষ্টা করেছেন তবুও তাঁর সহকর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অপপ্রচার করতে পশ্চাদপদ হন নি এবং কোন কোন বিশিষ্ট নেতাও তাঁকে ইংরেজের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছেন। অথচ তিনি যখন ভারতে আসবার অনুমতি চান তখন গভর্ণর জেনারল বা ভারত সচিব তাতে সম্মত হন না বরং ভারতে এলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আয়োজন করেন। (১)

১৯১৭ সনে আমেরিকায় শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, তারকনাথ দাস ও শ্রীমতী স্মেলডীর এক ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছরের জেল হয়। তবে ১৯১৯ সনে তাঁরা মুক্তি পান।

এদিকে বেনারসে শ্রীনলিনী মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল, আর তাঁর দু'ভাই সর্বশ্রীরবীন্দ্রনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ, নরেন ব্যানার্জী, দামোদর স্বরূপ শেঠ ও রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ত অনুচর নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু ধরা পড়লেন—আরম্ভ হ'ল বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা। রাজসাক্ষী শ্রীবিভূতি হালদার। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যালের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—তিনি ছিলেন বিপ্লবীদের মুকুট স্বরূপ। তাঁর অচঞ্চল প্রতিভা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। শ্রীনরেন ব্যানার্জীর হ'ল উনিশ বছর দ্বীপান্তর। বেরিলীর সৈন্যদলে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বালাবার প্রধান নায়ক দামোদর স্বরূপ শেঠের হ'ল সাত বছর, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্তের চার বছর,

(১) Telegram P. No. 1376. Pol. dt. 21-6-25 from Viceroy Simla to Secretary of States for India, London.

শ্রীনলিনী মুখোপাধ্যায়ের পাঁচ বছর আর শ্রীজিতেন্দ্রনাথের দু'বছর জেল হয়ে গেল। প্রমাণাভাবে শ্রীরবীন্দ্রনাথ পেলেন মুক্তি নগেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১৮ সনে আগ্রা জেলে আমাশয় রোগে মারা যান।

আজমীঢ়ে বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রধান নায়ক ছিলেন শ্রীপ্রতাপ সিং—দেখালেন নামের সার্থকতা। আধিপত্য লোলুপ পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন সত্বেও তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের করা গেল না। পাষাণময় স্বাতন্ত্র। নবজীবনের বিপুল ব্যাথার সেই দুঃসহবেদনা ও নির্যাতনই তিল তিল করে এনে দিল তাঁর মৃত্যু বেরিলীর নির্জন কারা প্রকোষ্ঠে। বাইশ বছরের তরুণ স্মৃতির আলেখ্যলোকে দিয়ে গেলেন অতি দুর্গম অন্তরের নবাঙ্কুর পুষ্পৈশ্বর্য—মুমুক্ষু যৌবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। সেদিন কারাগারের প্রত্যেকটি বন্দী অনশনে তাঁকে জানাল প্রণাম—আমরাও প্রণাম জানাই আর বলি—

"মরণ তোমার হয়েছে কে বলে মরণ সেত গো নয়
বরণ করিয়া লয়েছে তোমায় পরম করুণাময়।
তোমার তৃষিত হিয়া
স্বরগ তোরণে বিরাম লভিছে চরণ অমৃত পিয়া।"

বেনারসের মদনপুরায় শ্রীসুশীলচন্দ্র লাহিড়ী ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কৃতী ছাত্র। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে জড়াবার জন্যে বহু খোঁজ করেও পুলিশের কর্তারা সফল হন নি। ১৯১৮ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌএ ধরা পড়লেন। তাঁর বাসা তল্লাসী করে দু'টি রিভলভার ও পাশের ঘর থেকে দু'শো কার্তুজ পাওয়া গেল। তার ক'দিন আগে ৯ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ-এর ঘাসিয়ারী মণ্ডির রাজপথে দেখা গেল বিশ্বাসঘাতক বিনায়ক রাও কাপলে ওরফে সত্যেন ওরফে বড়বাবুর মৃতদেহ। ৬ই মে, শ্রীসুশীলচন্দ্র লাহিড়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলায় পাঁচ বছরের

জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। আপীল অগ্রাহ্য হয়ে গেল। ইতোমধ্যে পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কাপ্‌লের হত্যাকাণ্ড জড়িয়ে দিয়ে তাঁর ও অন্য একজন পলাতকের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা আনলেন। ১৯১৮ সনে ১৭ই জুলাই তাঁর ও সেই পলাতকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হল। বিচারে ১১ই আগষ্ট তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। তিনি গীতার শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে উঠলেন ফাঁসি মঞ্চে, মুখে শুধু হাসি।

১৯১৭ সনের ৩রা জানুয়ারী ভারতরক্ষা আইনে ধরা পড়লেন মাষ্টার মশাই দ্বিতীয় বার। প্রথম বার বন্দী হন ১৯১১ সনের ৫ই মার্চ। চেষ্টা চলল তাঁকে কোন ষড়যন্ত্র মমলায় জড়িয়ে দেবার —নিয়ে যাওয়া হ'ল, রাজসাহী জেলে। টেগার্ট সাহেবের নির্দেশ-মত আরম্ভ হ'ল তাঁর উপর অত্যাচার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে। তাঁরা বিফল মনোরথ হয়ে গেলেন—। খুলে গেল জীবনেতিহাসের নতুন অধ্যায়—অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রা। মাষ্টার মশাই যোগাভ্যাস দ্বারা ছ'দিন রইলেন সমাধিস্থ হয়ে—তার পর অবলম্বন করলেন মৌনব্রত। মৌনতা ভঙ্গ করবাব জন্যে আবার নতুন উদ্যমে আরম্ভ হ'ল নির্যাতন। শেষে ব্যর্থ আক্রোশে শক্তিমদে উন্মত্ত পুলিশের তরফ থেকে রটনা করা হ'ল যে তিনি মোকদ্দমা এড়াবার জন্যে ভয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতির ভান করছেন। নিজেদের দোষ ঢাকবার এই জঘন্য ও কুৎসিত প্রয়াসের বিরুদ্ধে মাষ্টার মশাই আরম্ভ করলেন অনশন। তাঁকে আনা হ'ল বহরমপুর পাগলা গারদে। সেখানে রইলেন দীর্ঘদিন সমাধিস্থ হয়ে। পরীক্ষার জন্যে তাঁর উপর সেই অবস্থাতেই উদ্ধত শক্তিমান রাজপুরুষদের কর্কশ সংকেতে পীড়ন ও যন্ত্রণার বিরাম রইল না। তাঁরা নগ্ন করলেন তাঁদের নির্লজ্জ অমানুষতা। চোখে সরষের তেল ঢেলে পরীক্ষা করা হ'ল—হ'ল অস্থিপঞ্জর চূর্ণিত। দুর্বৃত্ত কয়েদীদের লোভ দেখান হ'ল যে তারা যদি কোন রকমে তাঁকে কথা বলাতে পারে ত তাদের জেলের

মেয়াদ অনেক কম করা হবে। সেই লোভে তারাও আরম্ভ করে দিল দুর্ব্যাবহারের চূড়ান্ত। ডাক্তার এমন ইঁন্‌জেক্‌সন দিলেন যে শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। একজন ফিরিঙ্গী ডাক্তার চোখের ভ্রুর মধ্যে ধাতু নির্মিত ধারালো চাকতি ঘুরিয়ে দিয়ে শিরাগুলিকে জখম করে দিলেন যাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। কিন্তু সেই অতীন্দ্রিয় জগতের মানুষের নেই কোন পরিবর্তন—অমৃত-মন্ত্র-জপ করা ঋষির মত নেই কোন ভ্রুক্ষেপ—শুধু ছিল অন্তরের নিভৃত কন্দরে চৈতন্যের আভা। জোর করে খাওয়ানর চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। তিন বছর পরে ১৯২০ সনের জুলাই মাসে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হ'ল--তিনি প্রথম কথা বললেন। খবর পেয়ে বহরমপুরের তদানীন্তন সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. W. S. Adie ছুটে এলেন শ্রদ্ধা জানাতে—এ পরিপূর্ণতার প্রণতি না আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য। অস্তগমনোন্মুখ তপনের শেষ আলোর মত এই তাপসের মধ্যে তখন মৃত্যুবিজয়ের নতুন রহস্যের ইঙ্গিত—জ্যোতির স্তিমিতকেন্দ্রে মানুষের মহৎ স্বরূপ—অনির্বাণ জীবনকাব্যের আলেখ্য। বিস্ময়াবিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে জানালেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা ছিল না বা নেই, তিনি মুক্তি পেয়েছেন। পরাভবের লজ্জা দূর করে সাহেব নিয়ে গেলেন তাঁকে নিজের কুঠীতে। চেয়ে রইলেন অনিমেষ নয়নে সেই চিহ্নবিহীন দুর্গম পথের পথিকের প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রশান্ত মূর্তির দিকে। হয় ত দেখলেন তাঁর চোখে বিশ্বের ছায়া, বুকে অসীম আকাঙ্খা, মনে জীবনের জাগ্রত কল্লোল। কালের সীমারেখা নেই—সে মৃত্যুর সীমায় বদ্ধ নয়। তখন সাহেবের মনে হয়ত এই প্রশ্ন যে এও মানুষের জীবনে সম্ভব? এত কল্পনা নয়—প্রতিদিনের নিজের চোখে দেখা পরীক্ষিত বাস্তব জিনিস। কোথায় এই অত্যাশ্চর্য আত্মবিশ্বাসের নিশ্চিত মীমাংসা? হয়ত ঠিক এমনি করেই একদিন প্রাচীন মন্ত্র রচনার যুগে তপস্যারত ঋষি যজ্ঞাগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে

নিশ্চিত মীমাংসার আশায় প্রশ্ন করেছিলেন "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?"

মাষ্টার মশাইয়ের মুক্তির খবর পেয়ে সন্তোষদার ভাই শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র নিয়ে এলেন তাঁকে। মাকালপুরের জমিদার শ্রীমনমোহন সিংহরায় ও শ্রীঅমরেন্দ্র সিংহরায় তাঁকে নিয়ে গেলেন দেওঘরে। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্যে পরমযত্নে শুশ্রুষা করে তাঁকে কিছুটা সুস্থ করে তুললেন।

১৯১৭ সনের ৫ই জানুয়ারী পুলিশের এক গুপ্তচর শ্রীজ্ঞান ভৌমিককে মারবার চেষ্টা হতেই তিনি প্রাণভয়ে ছুটে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে গেলেন। সে সময় অনুশীলন সমিতির সভ্যেরা সিরাজগঞ্জে শ্রীরেবতী নাগ নামে এক পুলিশকে শেষ করে দিলেন। রক্ত পিচ্ছিল ইতিহাসের পথে অপরাধী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না।

শ্রীমথুরা সিং নামে এক পাঞ্জাবী তরুণ একদিন অন্তরের পরম প্রেরণায় ছুটেছিলেন ভারতের বাইরে বোমা তৈরীর বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ব করতে। অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন দেশে কিন্তু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধান পেয়ে পুলিশ তাঁর উপর নানারকম বিধি নিষেধ আরোপ করাতে তিনি গোপনে কাবুলে পালালেন—সেখান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে চেষ্টা করলেন রাশিয়ায় যাবার। অতিকষ্টে তাসখন্দে পৌছে সম্রাট জারের কাছে একখানা পত্র পাঠিয়ে চাইলেন দুর্দিনের আশ্রয়। যদিও সম্রাটের ভারতের বিপ্লবীদের জন্যে ছিল পূর্ণ সমর্থন তবুও তিনি প্রকাশ্যে কোন রকম সাহায্য করতে চাইলেন না। ব্যর্থ মনোরথ শ্রীমথুরা সিং বাধ্য হয়ে গোপনে ফিরে এলেন ভারতে। পাঞ্জাব তখন গুপ্তচরে পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি ধরা পড়ে গেলেন। ১৯১৭ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী তাঁর বিচার হয়ে হ'ল মৃত্যুদণ্ড। ২৭শে মার্চ লাহোর সেনট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। অবারিত মৃত্যুর

দ্বারে নৈরাশ্যসঞ্জাত দ্বিধাগ্রস্ত মন মুক্তি পেল শুভাশুভের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে।

শ্রীজোয়ান্দ সিং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী হিসেবে আত্মগোপন করেছিলেন বহুদিন—শেষে ধরা পড়লেন এক সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল যে তিনি অর্থসংগ্রহের জন্যে ১৯১৫ সনের ২৩শে জানুয়ারী সানিওয়ালে, ২৭শে জানুয়ারী মানসুরণে, ৩রা ফেব্রুয়ারী ছাবায় ও ১২ই জুন ভালাব্রীজে গুলি চালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৭ সনের ১০ই জুন লাহোর সেন্ট্রাল জেলে তিনি প্রাণ দিলেন—নিবেদন করে গেলেন দেশজননীর পায়ে পূজার অঞ্জলি।

১৯১৭ সনের ৭ই মে কলকাতা আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীটের একটি গয়নার দোকানে অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে দৌলতপুর কলেজের ছাত্র শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন কুশারী সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন। বাঁচবার আশা কম শুনে তিনি সহকর্মীদের অনুরোধ করলেন তাঁর মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে ফেলতে যাতে কেউ কোন রকমে সনাক্ত করতে না পারে বা তাঁর জন্যে অন্যান্য সহকর্মীরা ধরা না পড়েন। অকম্পিত আলোকজ্যোতিতে অবিনশ্বর সত্য উঠল উদ্ভাসিত হয়ে। সহকর্মীরা তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করে চলে গেলেন। মঙ্গলসঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ—কি বিরাট আত্মত্যাগ? এর কি কোন মূল্যই নেই? —আমাদের স্বাধীনদেশকে আজ শুধু এই প্রশ্ন।

১৯১৭ সনের ২৩শে জুলাই ঢাকা সহরে একজন গুপ্তচরকে মারবার চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীগিরীন্দ্র মোহন দাস হয়ে গেলেন রাজসাক্ষী। সে মোকদ্দমায় প্রধান আসামী শ্রীরমেশ আচার্য। আট বছরের দণ্ড হয়ে গেল একজনের। কিন্তু তখন বাংলা ও পাঞ্জাবের বীর তরুণদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। জীবনের অন্ধকার তখন হয়ত নবজীবনের নিভৃত

নিকেতনের মধ্যে আলোর সন্ধান পেয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলা ও পাঞ্জাব বিপ্লববাদের কোহিনূর।

রংপুরের শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে ছিলেন সুপরিচিত। ১৯১৬ সনের ২৪শে আগষ্ট পুলিশ তাঁকে বন্দী করেন। ১৯শে ডিসেম্বর তাঁর বাবার জামিনে তাঁকে নিজগৃহে অন্তরীণ করা হয়। তা সত্বেও তাঁর উপর এমন সব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় যে তাঁর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। সহ্য করতে না পেরে তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে ১৯১৭ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর আত্মহত্যা করে বসলেন। তাঁর মৃত্যুর মর্মান্তিক দুঃখে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে "ছোট ও বড়" বলে যে প্রবন্ধ লেখেন সেই প্রবন্ধই আত্মোৎসর্গকারী শচীন্দ্রনাথকে চিরদিন অমর করে রাখবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র শ্রীমনীন্দ্রনাথ শেঠ ১৯১৬ সনে দৌলতপুর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হন। ১৯১৭ সনের মে মাসে রংপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি সেই কলেজের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু সরকার তাঁকে কাজে যোগ দিতে দিলেন না এই অজুহাতে যে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের গোপন খাতায় রিপোর্ট আছে। জুলাই মাসে তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে ধমক দিয়ে বলা হ'ল "তোমার ভাগ্য ভাল যে তোমাকে তোমার ভাই শচীনের মত জেলখানায় আটকান হয় নি।" ছোট দু'টি ভাইকে প্রতিপালন ও নিজের জন্যে তাঁর চাকরি করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ১৯১৭ সনের ২৮শে আগষ্ট তাঁকেও গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠানো হ'ল। সেপ্টেম্বর মাসে জেল কর্তৃপক্ষ খবর পাঠালেন যে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। অক্টোবর মাসে জানান হয় যে তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত। ৪ঠা নভেম্বর তাঁকে তাঁর এক অনিচ্ছুক আত্মীয়ের

বাড়ীতে অন্তরীণ করা হ'ল। ৬ই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল মেডিক্যাল কলেজে আর ১৯১৮ সনের ১৬ই জানুয়ারী বাংলার সেই কৃতবিদ্য সন্তানের অমূল্য জীবন শেষ হয়ে গেল।

সে সময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দেশভক্তির আলোকে বাংলা দেশে কেবল যে চোর ডাকাতকে দেখলুম তা নয় বীরকেও দেখিছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করে দেখেছি এমন কোনদিন দেখি নি। এঁরা ক্ষুদ্র বিষয়-বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গভর্ণমেণ্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নেই তা নয়, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের বিরোধেও এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা এদের দেখে পুলকিত হয়েছি যে বাংলা দেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গমপথে তরুণ পথিকের অভাব নেই। উপরের দিক থেকে ডাক এল, আমাদের যুবকরা সাড়া দিতে দেরী করল না; তারা মহৎত্যাগের উচ্চ শিখরে ধর্মবুদ্ধির সম্বলমাত্র নিয়ে পথ কেটে কেটে চলবার জন্যে দলে দলে প্রস্তুত হচ্ছে। এরা কংগ্রেসের দরখাস্ত পত্র বিছিয়ে আপন পথ সুগম করতে চায় নি, ছোট-ইংরেজ এদের শুভ সঙ্কল্পকে ঠিকমত বুঝবে বা হাত তুলে আশীর্বাদ করবে এ দুরাশাও এরা মনে রাখে নি। অন্য সৌভাগ্যবান দেশে, যেখানে জনসেবার ও দেশসেবার বিচিত্র পথ প্রশস্ত হয়ে দিকে দিকে চলে গেছে, যেখানে শুভইচ্ছা ও শুভইচ্ছার ক্ষেত্র এ দু'য়ের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগ আছে, সেখানে এ রকম দৃঢ়সঙ্কল্প আত্মবিসর্জনশীল বিষয়বুদ্ধিহীন কল্পনাপ্রবণ ছেলেরাই দেশের সকলের চেয়ে বড় সম্পদ।"

১৯১৭ সনের ১৮ই জুলাই ডায়মণ্ডহারবারের শ্রীহরিদাস দাস অন্তরীণ অবস্থায় আত্মহত্যা করলেন। পুলিশের অত্যাচারই এর প্রধান কারণ। ১৯১৭ সনের সিরাজগঞ্জের তেনিজনায় শ্রীনিকুঞ্জ

পাল, শ্রীগোবিন্দ কর প্রমুখ পলাতক বিপ্লবীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। পুলিশ সন্ধান পেয়ে সেখানে হাজির হতেই আরম্ভ হ'ল দু'পক্ষেরই গুলিবর্ষণ। শ্রীগোবিন্দ কর সাতটি গুলিবিদ্ধ শরীরে ধরা পড়লেন আর শ্রীনিকুঞ্জবিহারী পাল আহত অবস্থায় এক পাট ক্ষেতে আত্মগোপন করেছিলেন—সেখানেই বন্দী হলেন। শ্রীগোবিন্দ করের ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী পালের দশ বছর করে কারাদণ্ড হয়ে গেল। অর্থসংগ্রহ মামলায় কুমিল্লায় সর্বশ্রীমথুর চক্রবর্তীর ও অতুলচন্দ্র দত্তের, শ্রীহট্টে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ও পাবনায় সুধীর মজুমদারের হয়ে গেল আট বছর করে জেল। ১৯১৮ সনের ২৫শে জুন অমৃতবাজার পত্রিকার সংবাদে জানা গেল যে ১৭ই জুন রাত্রি ১১টার সময় রাজসাহী জেলে একজন বিপ্লবী কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পাশ এ তরুণটির নাম শ্রীরসিক সরকার। মৃত্যুর কারণ জানা গেল না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সরকার যশোরের ঝাউগাছা গ্রামে অন্তরীণ থাকার সময় ১৯১৮ সনের মে মাসে তাঁকে কুকুরে কামড়ায়। চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। ২রা অক্টোবর তিনি জলাতঙ্ক রোগে মারা গেলেন।

রংপুরে নলডাঙ্গার এক বৃদ্ধ জমিদার শ্রীসারদাকান্ত চক্রবর্তী কর্ম থেকে অবসর নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে বেনারসে বাস করছিলেন। ১৯১৭ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে যশোরের আলফাডাঙ্গায় নজরবন্দী করে রাখা হয়। অপরাধ—কয়েকজন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে নিজের কাছে রেখে তাঁদের লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করছিলেন—সেই ছাত্রদের মধ্যে একজন ধরা পড়ায় তাঁর এই দুর্ভোগ। তাঁর আত্মীয় স্বজনকে তিনি জানান যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। সকলেই তাঁর মুক্তির চেষ্টা করলেন কোন ফল হ'ল না। ১৯১৮ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর এক চিঠিতে কর্তৃপক্ষ জানালেন যে তিনি

৩০শে নভেম্বর মারা গেছেন। ইংরেজের রাজত্বে পুলিশের হাতে বৃদ্ধেরও নিস্তার ছিল না।

১৯১৬ সনে শ্রীকুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য নামে একজন তরুণকে মেদিনীপুরের এগ্রা থানায় অন্তরীণ করে রাখা হয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘটল তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি। আশে পাশে কোন পাশ করা ভাল ডাক্তার ছিল না। চিকিৎসার জন্যে বারবার আবেদনে সরকার কর্ণপাত করলেন না। ১৯১৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। সরকারের ঔদাসীন্যই তাঁর এভাবে মৃত্যুর কারণ।

এ সময়ে পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় অনেকেই আশ্রয় নেন গৌহাটীতে। কিন্তু একজায়গায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাঁরা আতাগাঁয়ে আর ফাঁসিবাজারে দু'টো বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন! তাঁদের সন্ধান পেয়ে ১৯১৮ সনের ৭ই জানুয়ারী রাত সাড়ে তিনটের সময় পুলিশের অধিকর্তা মিঃ ফেয়ার-ওয়েদারের নেতৃত্বে আতাগাঁয়ের বাড়ীতে হানা দেওয়া হয়। মিঃ ফেয়ারওয়েদারের ধারণা ছিল যে আশাহীন দৈন্যজীর্ণ ক্ষুধিত ক্লেশক্লিষ্ট বাঙালী অভিশপ্ত জীবনের ভারে ক্লান্ত. তাই প্রভুত্বের অহংকারে হুকুম করলেন "দরজা খোল।" ভেতর থেকে উত্তর এল "খোলা আছে, আসুন।" ঢোকামাত্রই বিপ্লবীরা গুলি চালালেন। আরম্ভ হয়ে গেল দু'পক্ষের গুলি বর্ষণ। সেখানে ছিলেন দালান্দা হাউসের পুলিশ হাজত থেকে পলাতক সর্বশ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ দাশগুপ্ত, আর ছিলেন প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, নরেন ব্যানার্জী, মণীন্দ্র রায়, তারাপ্রসন্ন দে ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অমরদা মিশনারী পাদ্রীর পোষাকে ও সতীশ চক্রবর্তী থাকতেন বিভিন্ন ছদ্মবেশে। পুলিশ এ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাদের হঠতে হ'ল। সে সুযোগে এঁরা সরে পড়লেন— পুলিশের অভিযান বিফল হয়ে গেল। এঁরা আতাগাঁ থেকে আশ্রয়

নিলেন নবগ্রহ পাহাড়ে কিন্তু পুলিশ যখন একবার সন্ধান পেয়েছে তখন আর নিস্তার নেই। ১৩ই জানুয়ারী রাত দুটোর সময় সেখানে হানা দেওয়ামাত্র বেধে গেল খণ্ডযুদ্ধ—এখন আর আত্মসমর্পণ নয়। মরণসাগরের স্মৃতিদ্বীপের পথে সহস্র মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বাঁচার সঞ্জীবনী মন্ত্র তখন তাঁরা জেনেছেন। দুর্দাম সর্বনাশের বজ্রঝঞ্ঝনিত শব্দে গর্জে উঠল তাঁদের রিভলভার—শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ লড়লেন বীর বিক্রমে। এঁদের কার্তুজ ফুরিয়ে এসেছে এই অনুমানে পুলিশ বাড়ীটা ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করতেই অন্য সকলকে পালাবার সুযোগ দিয়ে নলিনীকান্ত একাই পুলিশকে বিব্রত করে তুললেন। পালাবার সময় ধরা পড়লেন আহত সর্বশ্রীনরেন ব্যানার্জী, তারাপ্রসন্ন দে ও মণীন্দ্র রায়। ১০ই জানুয়ারী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী ধরা পড়লেন কামাখ্যা মন্দিরে। নলিনী কান্ত ঘোষ শেষ পর্যন্ত লড়লেন—সংকল্পদৃঢ় শৌর্যে দিলেন দুর্লভের পরিচয়। গুরুতর আহত অবস্থায় নিঃশেষিতকার্তুজ রিভলভার হাতে ধরা পড়লেন। এ খণ্ডযুদ্ধে পুলিশের আহতের সংখ্যা ত্রিশ। এঁদের জেল হয়ে গেল দীর্ঘ দিনের।

মুর্শিদাবাদের শ্রীনলিনীকান্ত বাগচী ও তাঁর সহকর্মী কুমিল্লার শ্রীতারিনী প্রসন্ন মজুমদারকে পুলিশ বহুদিন ধরে খোঁজ করেও ধরতে পারে নি। কুমিল্লায় একবার তাঁর বাড়ী ঘিরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীতারিণীপ্রসন্ন একহাতে রিভলভার অন্যহাতে পিস্তল নিয়ে গুলি করতে করতে বেরিয়ে আসেন। বেতনভুক পুলিশ আর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত বিপ্লবীর মধ্যে অনেক পার্থক্য। পুলিশ প্রাণভয়ে গা ঢাকা দেয়। কলকাতাতেও তাঁকে দু'বার ধরবার চেষ্টা হয়—একবার কাঁসারি পাড়ায় আর একবার ভবানীপুরে কিন্তু প্রতিবারই পুলিশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি একবার বাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে পায়ে আঘাত পাবার পরই পরণের কাপড়খানা ছিঁড়ে পায়ে বেঁধে খোঁড়া ভিখিরী সেজে পুলিশব্যূহের ভেতর

দিয়ে ছদ্মবেশে সরে পড়েন। শেষে যান ঢাকার কলতাবাজারে সহকর্মী শ্রীনলিনীকান্ত বাগচীর আমন্ত্রণে।

১৯১৮ সনের ৮ই মে বগুড়ার সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টর কয়েক-জন কনেষ্টবল নিয়ে এক ভদ্রমহিলার বাড়ী তল্লাসীর জন্যে যান। তাঁব সন্দেহ যে কোন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। সাবইনস্পেক্টার শ্রীহরিপদ মৈত্র বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কপাল লক্ষ্য করে গুলি করলেন অধৈর্য চঞ্চল এক তরুণ। শ্রীমৈত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঘটল জীবনান্ত। পুলিশ তরুণটিকে ঘিরে ফেলা সত্ত্বেও তিনি গুলি চালাতে চালাতে চলে এলেন। সরকারের চেষ্টা বিফল হ'ল—দিয়ে যেতে হল একটি জীবন।

১৯১৮ সনেব ১৫ই জুন ঢাকার কলকাতাবাজারে পুলিশ একটা বাড়ীতে হানা দিলে—ভেতর থেকে গুলি বর্ষণে তার প্রতিবাদ জানানো হ'ল। সে বাড়ীতে তখন আত্মগোপন করে ছিলেন শ্রীতারিণীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্রীনলিনীকান্ত বাগচী আর একজন। পুলিশের সংখ্যা ছিল অনেক। শ্রীপতিরাম সিং বলে এক কনেষ্টবল সাহস দেখিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করতেই তাকে গুলি করা হয়। তার পিছনে ছিলেন একজন সাবইনেস্পেক্টর শ্রীবসন্ত মুখার্জী। তিনিও হন গুরুতর আহত। উভয় পক্ষের খণ্ডযুদ্ধে শ্রীতারিণী প্রসন্ন মজুমদার ওরফে দাড়িদা সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। পরদিন মারা গেলেন শ্রীনলিনীকান্ত বাগচী ও শ্রীকনেষ্টবল পতিরাম সিং একই হাসপাতলে। ধরা পড়লেন তৃতীয় জন—তাঁর দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হয়ে গেল। (১) শ্রীবসন্ত মুখার্জী সে যাত্রা গেলেন বেঁচে, হ'ল পদোন্নতি। বাংলার দু'টি বীর বিপ্লবী সন্তান যা' অনিবার্য তা' অক্ষুব্ধ মনে স্বীকার করে নিলেন। 'জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে অক্ষুণ্ণ শান্তির স্তিমিত নিভৃতে পেলেন

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose.

আশ্রয়'। আশ্রয়দাতা শ্রীহরিচৈতন্য দের হ'ল দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

তখন বাংলার অন্তরে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। বিপ্লবী জীবনের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে কলোচ্ছল ধারায়, আত্মাহুতির আগুন উঠেছে জ্বলে তেজের শিখায়, মনের লীলাচঞ্চল তরঙ্গপটে রক্তে দিয়েছে দোল। সে বিদ্রোহবহ্নির কর্ণধার ডঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিপ্লবীদের প্রাণে বাজছে—তারা অমৃতের পুত্র, তারা শুনেছে অন্ধকারের পার হতে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষের বাণী, মৃত্যু ভয়কে দূর করে দিয়েছে অনাদরে অবহেলায়। আতিশয্য ও উৎসাহের বন্যাধারায় বজ্রকঠোর বিধি নিষেধ নির্দেশের খরস্রোতে ভেসে গেল অনেকগুলো দেশদ্রোহী চাটুকারের প্রাণহীন দেহ অকৌলিন্যের গ্লানি নিয়ে। উত্তরবঙ্গে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে আর একজন বিপ্লবী অবলীলাক্রমে প্রাণ দিলেন—শ্রীসুনীল কুমার দত্ত। জুলাই মাসে আবার ঢাকায় শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষের অনুচরদের সঙ্গে চলল পুলিশের গুলি বিনিময়—ধরা পড়লেন দু'জন—পুলিশের মধ্যে আহতের সংখ্যা দশ বারোজন।

পুলিশের কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল মৈমনসিং-এর কিশোরগঞ্জ ষ্টেশনে। সন্দেহভাজন যুবকদের উপর নজর রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। ১৯১৮ সনের ৫ই মে একজন অপরিচিত যুবককে একটি প্যাকেট হাতে ট্রেন থেকে নামতে দেখে পুলিশ কনেষ্টবল শ্রীপ্রসন্ন নন্দী তাঁর মালপত্র তল্লাসী করতে চাইলেন। যুবকটি প্যাকেটটি তাঁর হাতে দিতে তিনি যখন সেটা খুলতে ব্যস্ত হঠাৎ কোমর থেকে রিভলভার বের করে গুলি করে যুবকটি সরে পড়লেন। শ্রীনন্দী হাসপাতালে মারা গেলেন। প্যাকেটের মধ্যে ছিল কিছু বিস্ফোরক পদার্থ।

আলমবাজারের স্থানীয় স্কুলের ছাত্র শ্রীমাখন লাল ঘোষ পনর বছর বয়সে ১৯১৬ সনের মার্চ মাসে এক অর্থসংগ্রহ মামলায় সন্দেহে জড়িত হন। মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে

প্রেসিডেন্সী জেলের নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হয়। কয়েক মাস পরে ভিন্ন ভিন্ন অস্বাস্থ্যকর গ্রামে আটক রাখার সময় তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়। জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি গ্রামে অসুস্থ হবার পর তাঁকে আলিপুর, হুগলী, মেদিনীপুর ও হাজারিবাগ জেলে কয়েকমাস পর পর পাঠানো হয়। শেষে বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা গ্রামে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও সাপের উপদ্রবে বাধ্য হয়ে তিনি অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে জেল না দিয়ে আবার সেখানেই আটক রাখেন। তিনি নিরুপায় হয়ে অনশন আরম্ভ করলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় অণ্ডালে। সেখানে যখন কলেরায় শয্যাশায়ী তখন তাঁর মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা হয়। পরে হলেন চট্টগ্রামের মহেশখালিতে অন্তরীণ। ১৯২০ সনের ৭ই জানুয়ারী সরকার তাঁর বাবাকে জানান যে ১৯১৯ সনের ২৯শে ডিসেম্বর মাখনলাল ঘোষ আত্মহত্যা করেছেন। এটা সত্যি করে আত্মহত্যা না সর্পদংশন না রোগভোগ অথবা পুলিশের অত্যাচার তা আজও জানা যায় নি। (১)

১৯১৭ সনে যুদ্ধের সময় সরকার মনিপুরে নাগা ও কুকীদের নিয়ে এক সৈন্যদল গঠন করে ফ্রান্সে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের বিরোধিতায় তাঁরা কৃতকার্য হন নি। ১৯১৭ সনের অক্টোবর মাসে মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট মবি গ্রামে নাগা নেতা শ্রীগুলকূপকে ধরবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হয়ে সমস্ত গ্রামটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মের বিদ্রোহীরা মণিপুরবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সরকারি দপ্তরখানা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। উখাগ্রামে কুকীদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরেজের বহুসংখ্যক সিপাই মারা গেল। এই জয়ের আনন্দে তাঁরা বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ ও পলিটিকেল এজেণ্টকে আক্রমণ করেন কিন্তু তাঁরা দু'জন অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। পরে প্রতিশোধ

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose.

নেবার জন্যে সমস্ত উখা গ্রাম ও আশে পাশের অন্য কয়েকটা গ্রাম ভস্মীভূত করে দেওয়া হ'ল। নিরাশ্রয় কুকীরা হতাশ না হয়ে মণিপুরের তেঙ্গনোপল থানা আক্রমণ করে হাবিলদার ও তাঁর সঙ্গীদের শেষ করে দিলেন। ইংরেজরা ভয়ে তাঁদের স্ত্রীপুত্রদের নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

সরকার তখন প্রমাদ গুনছেন—সৈন্যসংগ্রহ অপেক্ষা আত্মরক্ষার তখন বিশেষ প্রয়োজন। বড়লাট তখন আসাম রাইফেল বাহিনীর তু'দল সৈন্য ও ব্রহ্ম থেকে সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। কুকীরা এ সংবাদ পেয়ে আশ্রয় নিলেন গভীর জঙ্গলে। সৈন্যধ্যক্ষ গ্রামকে গ্রাম লুট করে বিদ্রোহীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করবার আদেশ দিলেন। কুকীরাও অন্য একজায়গায় একজন ক্যাপ্টেন ও তু'জন রাইফেলধারীকে শেষ করে দিলেন। ১৯১৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজ আরও সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে বিদ্রোহ দমনে তৎপর হলেন। নাগা ও কুকীদের সঙ্গে গরিলা যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য সুবিধে না করতে পেরে কেবল সৈন্যসংখ্যাই বৃদ্ধি করতে লাগলেন। নাগাদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে যাতে জমি চাষ তারা না করতে পারে তার ব্যবস্থা হ'ল। সাময়িকভাবে বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল বটে কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল। (১)

১৯১৮ সনে বাংলা দেশ চারচারটি কৃতী সন্তানকে হারালেন। জেলে—আত্মহত্যা করলেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, টাইফয়েডে মারা গেলেন শ্রীকেশবলাল দে, আর কলেরায় মারা গেলেন শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীধীরেন্দ্র মোহন মুখার্জী। (২) অমন্দ্র শঙ্খধ্বনিতে বিপ্লবীদের প্রস্তুত হবার তখন চলেছে আহ্বান। সে আহ্বানে রোগতপ্ত অভুক্ত নিরুপায় ভারতবাসী উঠেছে জেগে। প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মত দিকে দিকে তাঁদের আত্মপ্রকাশের অন্তহীন

(১) Government Communique dated 21. 2. 1918

(২) অমৃতবাজার পত্রিকা dt. 5. 7. 1918

প্লাবিত তরঙ্গউল্লোল ইংরেজের তখন হয়ে উঠেছে দুশ্চিন্তার কারণ। তাঁরা নতুন নতুন আইন ও অর্ডিন্যান্স পাশ করাতে লাগলেন। সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বিনা বিচারে আটক, অর্থহীন ফৌজদারী মোকদ্দমা, ফাঁসি, জেল, অন্তরীণ, জরিমানা চলল অবিরাম। বিডন-স্কোয়ার তখন ছিল সভাসমিতির প্রধান কেন্দ্র। সে সময় যিনি অদ্ভুত সাহস ও অসামান্য কর্মক্ষমতা দেখিয়ে বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলতেন তিনি হলেন মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন—এরকম একনিষ্ঠ কর্মী বিরল। দেশের লোককে বোঝাতে চাইতেন পরাধীনতার অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। এ সময় রাজাবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীখগেন রায় বেনারসে ও শ্রীঅনিল মৈত্র আন্দামানে মারা গেলেন।

ইংরেজ সরকার দেখলেন যে বিপ্লীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে বিচার শুধু ব্যয় সাপেক্ষই নয়—আইনের মার প্যাঁচে শাস্তি দেওয়াও সব সময় সম্ভব নয়, আর সেটা বিপ্লববাদ প্রচারের সহায়কও বটে। আর তখনকার দিনে প্রধান বিচারপতি বিপ্লবী-দের কঠোর শাস্তিদানের বিরোধী এরকম একটা ধারণা সরকারের মনে ছিল। তাই সব দিক চিন্তা করে তাঁরা আইন তৈরী করেছিলেন ভারত রক্ষা আইন Defence of India Act—যাতে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিনা বিচারে বা গোপন বিচারে আটক রাখা যেতে পারে। যুদ্ধারম্ভের প্রথম থেকে ভারতের সব জায়গায় বিশেষ করে বাংলায় শত শত যুবককে আইনের বেড়াজালে ফেলে আটক রেখে সরকার ভাবলেন যে বিপ্লব দমন করা যাবে। তদানীন্তন কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত এ বিষয়ে বহু আন্দোলন ও বাদানুবাদ করলেন। পরবর্তীকালে সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এবং এ আইন যে সময়োপযোগী হয়েছিল তা' প্রমাণ করবার জন্যে ইংলণ্ডের মাননীয় বিচারপতি মিঃ রাউলাটকে সভাপতি ও অন্য চারজন—দু'জন ভারতীয় ও দু'জন ইংরেজ সভ্যকে

নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হ'ল। বাংলার স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ছিলেন এর অন্যতম সদস্য। এই কমিটিকে লোকে মোটেই ভাল চোখে দেখলেন না। স্যার প্রভাসকে লোকে ব্যঙ্গ করে নাম দিলেন রাউলাট মিত্র। কমিটি "রাউলাট কমিটি রিপোর্ট" আখ্যা দিয়ে প্রচার পুস্তিকা ছাপালেন। সে রিপোর্টে কতকগুলো ঘটনা বিকৃত করে দেখিয়ে সরকার প্রমাণ করতে চাইলেন যে Defence of India (Criminal Law Amendment) Act IV of 1915, The Anarchical and Revolutionary Crimes Act XI of 1919, Martial Law Ordinance of 1919 ইত্যাদি আইন প্রয়োজনমত বিধিবদ্ধ আইন। সেই রিপোর্ট কিন্তু পক্ষান্তরে বিপ্লবীদেরই সাহায্য করল। তাঁরা পূর্বগামীদের কর্মতৎপরতার ইতিহাস জেনে আরও উৎসাহী হয়ে উঠলেন। এত শাসন ও শোষণ নীতির ষড়যন্ত্র করেও কিন্তু বিপ্লব দমন করতে পারলেন না ইংরেজ সরকার। বিকৃত ঘটনাবলী ও মিথ্যার বেসাতীতে অকল্যাণ ও শ্রীহীনতার বোঝা তোলা হ'ল স্তূপাকার করে। আবর্জনায় দুর্গম ও অক্ষমতার সঙ্গে রইল শুধু অসত্য ভাষণের দম্ভ।

সে যুগের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে যাঁরা দেশের যুবশক্তিকে আদর্শের পথে চালিত করেছিলেন, উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মৃত্যুসংকুল পথে দেশপ্রীতির মন্ত্রে আত্মত্যাগের বিরাট মহিমায়, তাঁরা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীপ্রমথ মিত্র, ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা, অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, সর্বশ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, হরিকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ভূপতি মজুমদার, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়দা) প্রভাসচন্দ্র দে, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, ইন্দ্রনাথ নন্দী, যতীন্দ্রনাথ রায়, সতীশ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র নাথ

শেঠ, পবিত্র বসু, পবিত্র দত্ত, সতীন্দ্রনাথ সেন, হেমেন্দ্র আচার্য চৌধুরী, নিখিল রায়ভৌমিক, কার্তিক চন্দ্র দত্ত, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্রনাথ বসু, সত্যরঞ্জন বক্সী, হেমচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল রায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, নারায়ণচন্দ্র দে, মানবেন্দ্র রায়, তারাক্ষেপা, জ্ঞানেন্দ্র সান্যাল, অনিলবরণ রায়, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন, মিঃ এ রসুল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, আশুতোষ কাহিলী, রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। এঁরা অফুরন্ত প্রেরণা যুগিয়েছিলেন দেশের যুবকদের মনে।

১৯১৯ সনে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তীকে সভাপতি মনোনীত করে দশজনের একটি কাউন্সিল গড়েন—মূল উদ্দেশ্য কংগ্রেস অধিকার। কিন্তু তাঁরা কোন বৈপ্লবিক কর্মসূচী দিতে পারলেন না। সে সময় যাঁরা কাজের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রীসুধীর কুমার আইচ, জগদীশ চ্যাটার্জী, বিনয়েন্দ্র রায়চৌধুরী, শচীন সান্যাল, সুধীর বসু, সতীশ পাকড়াশী, তারাপদ গুপ্ত, প্রতুল ভট্টাচার্য, অনিল বটব্যাল, সুধীর মজুমদার, নির্মল দাস, বিজয় ব্যানার্জী, বিজয়কৃষ্ণ রায়, হরিনারায়ণ চন্দ্র, সন্তোষ মিত্র এবং আরও অনেকে। অন্যভাবে কাজ আরম্ভ করলেন সর্বশ্রীঅনিল রায়, সত্য গুপ্ত, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, মনীন্দ্র রায় ও আরও কয়েকজন। ছাত্রদলের মধ্যে 'অলবেঙ্গল ষ্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' ও 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ষ্টুডেন্টস ফেডারেশন' নামে দুটি দল গড়ে উঠল।

১৯১৯ সন ভারতের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ। রাউলাট বিলের প্রতিবাদে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবেন বলে প্রথমে ৩০শে মার্চ, পরে ৬ই এপ্রিল হরতাল পালনের দিন ধার্য করলেন। দিল্লীতে ৩০ শে মার্চ পুলিশ ও সৈন্যদল গুলি করে মারলেন কয়েকজনকে—বহুলোক হলেন আহত। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

পঞ্চাশ হাজার লোক নিয়ে এক সভায় সভাপতিত্ব করলেন। হাসপাতালে ইংরেজ নার্স'রা ইংরেজ বিদ্বেষী আহতদের সেবা পর্যন্ত করতে চাইলেন না। দিল্লী আর অমৃতসরে ৬ই এপ্রিল আবার সভা ডাকা হ'ল। গান্ধীজির পাঞ্জাব যাওয়া ইংরেজসরকার বন্ধ করলেন। মাইকেল-ও-ডায়ার তখন পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্ণর। লাহোরে ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফয়সন দিলেন গুলি চালাবার হুকুম—ছ'তিনজন ছাত্র মারা যাবার পর ছাত্রনেতা পণ্ডিত শ্রীরামভুজ দত্ত, ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করে একটু সময় চাইলেন যাতে সকলে শোভাযাত্রা বন্ধ করে শান্তিতে চলে যেতে পারেন। তিনি দিলেন মাত্র দশ মিনিট সময়। দশ মিনিটেও সব ছাত্র চলে যেতে পারলেন না। শ্রীদত্ত আরও একটু সময় চাইলেন—এবার সময় দেওয়া হ'ল ছু'মিনিট। তারপর স্থানত্যাগকারী ছাত্রদের উপর বেপরোয়া গুলি চলল। এর প্রতিবাদে ১১ই এপ্রিল হ'ল সভার আয়োজন বাদশাহী মসজিদে। ত্রিশ হাজার লোক জমায়েৎ হলেন। শেষে দেখা গেল পুলিশ তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। শাস্ত্রী কলেজের ছাত্র লালা খুসীরামকে পর পর নয়টি গুলি করে মেরে পুলিশ বীরত্ব দেখাল। তাতেও কোন ফল হ'ল না। পঞ্চাশ হাজার লোক শোভাযাত্রা করে শ্মশানে চললেন মৃত্যুজয়ী বীরের সম্মানে। মৃত্যুর কি প্রসন্নসুন্দর মহিমাময় সমারোহ! এদিকে গভর্ণর মাইকেল ও-ডায়ার, ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুর উপর দেশত্যাগের নোটীশ জারি করালেন। সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বিগ্রেডিয়ার জেনারল হ্যারী ডায়ারকে প্রস্তুত থাকবার হুকুম দিলেন।

খবর পাওয়া মাত্র অশান্তির আগুন উঠল জ্বলে। পাঁচজন ইংরেজ ব্যবসায়ী খুন হলেন, বহুবাড়ী, টেলিফোন ভবন, ছুটি ব্যাঙ্ক, টাউনহল ও গীর্জায় লাগান হ'ল আগুন। ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ও চ্যাটার্ড ব্যাঙ্কের ছু'জন অফিসার হলেন নিহত। মিস্ শেরউড্

নাম্নী একজন মিশনারী ডাক্তার অশান্ত জনতার হাতে হলেন নির্মম-ভাবে লাঞ্ছিতা। ১২ই এপ্রিল থেকে আরম্ভ হ'ল ধর পাকড়—নিষিদ্ধ হয়ে গেল সব রকম সভাসমিতি। অশান্তির উন্মথনে বিধি-নিষেধ অমান্য করে ১৯১৯ সনের ১৩ই এপ্রিল বেলা সাড়ে চারটার সময় সভা ডাকা হ'ল জালিয়ানওয়ালাবাগে। সভা আরম্ভ হবার পরই মাইকেল-ও-ডায়ার সৈন্যাধ্যক্ষ বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হ্যারী ডায়ারকে গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। বেরোবার পথ বন্ধ করে গুলি করে শেয়াল কুকুরের মত মারা হ'ল নিরস্ত্র নিরীহ আবাল বৃদ্ধ বনিতা। নির্মম সে মৃত্যুর কি তাণ্ডব রূপ। সে মর্মন্তুদ বীভৎস কাহিনী অর্থহারা বোবার মত জীর্ণ-যুগের সঞ্চয়ে রয়ে গেল চিরদিন। ক্ষুধার্ত আত্মার নিঃশব্দ কান্নায় ক্ষমাহীন জালিয়ানওয়ালাবাগ ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত বেদনার রক্তে উঠল লাল হয়ে। সে পাশবিকতা অভাবনীয়। ইতিহাসের অগৌরব অধ্যায়ের অন্ধকার কোনে ইংরেজের কলঙ্ক রইল দুর্যোগের দুঃস্বপ্নের মত চিরদিনের জন্যে, ভারতবাসীর দুর্ভর অপমান ও দুর্মোচ্য শোনিত ধারায়। সামরিক আইন তখন জারি হয়ে গেছে। নির্দয় বর্বরতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ। মাইকেল-ও-ডায়ার হাণ্টারকমিটির সামনে সাক্ষী দেবার সময় বারবার বললেন জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা সঙ্গতভাবেই হয়েছে। গুলি চালাবার আগে জনতাকে সাবধান করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এ হত্যাকাণ্ডে চার পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারালেন। মাইকেল-ও-ডায়ার এই করেই শুধু ক্ষান্ত হলেন না। গুজরাণ-ওয়ালা, লাহোর ও অমৃতসরে ও কাসৌরে সামরিক আইন জারি করালেন। তাঁর নির্দেশে রেল ষ্টেশনে ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে নিরপরাধ লোকদের বিবস্ত্র করে নির্মম বেত্রাঘাত চলল অবাধে। চৈত্র-বৈশাখের খর রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকেদের দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল। এঁদেরই সভ্য পূর্বপুরুষ একদিন রাণী বোডেসিয়াকে

বেত্রাঘাতে মেরেছিলেন, এঁরাই জোয়ান অক আর্ককে পুড়িয়ে মারতে কুণ্ঠিত হন নি। মহাকাল তাও ত নীরবে সহ্য করেছেন। এও ত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। প্রহারের ফলে কয়েকজন মারা গেছেন বলে জনরব শোনা গেল। সরকার থেকে বলা হ'ল যে মাত্র বত্রিশজনকে বেত মারা হয়েছে তাও গড়ে মাত্র এগার ঘা করে। নির্বিচারে ছাত্র ও শিক্ষকদের বন্দী করা হ'ল। এক বিয়ের সভায় ঢুকে অকারণে প্রত্যেক নরনারীকে বেপরোয়া ভাবে প্রহার করা হ'ল। বিবাহ-উৎসব বাসরে রোল বয়ে গেল কান্নার। সাধারণ লোককে অপমান করবার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় খাঁচা তৈরী করে তার মধ্যে চিড়িয়াখানার জন্তুদের মত তাদের ভরে দেওয়া হ'ল। হাত বেঁধে পাঞ্জাবের দারুণ রৌদ্রে পনর ঘণ্টা করে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অসহায় লোকদের আটকে রেখে দেখান হ'ল তামাসা। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে ব্যঙ্গ করে কসৌরে দুই সম্প্রদায়ের লোকদের একসঙ্গে হাতকড়া লাগিয়ে চলতে লাগল নির্যাতন। আট'শ বাহান্ন জনের বিচার হয়ে পাঁচ'শ বিরাশী জনের সাজা হয়ে গেল। মাইকেল ও-ডায়ার ও জেনারেল ডায়ার ইংরেজ রাজত্বের স্পর্ধিত স্তম্ভ হয়ে রইলেন। ঘৃণ্য পাশবিকতার তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে ডায়ারদ্বয়ের এ নৃশংস ব্যবহার পাঞ্জাবের অধিবাসীরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। বহু শতাব্দী ধরে ব্যথিত• ক্ষতমুষ্টি বেদনা লাঞ্ছিত অপমানের ছাপ রয়ে গেল ভারতবাসীর অন্তরে।

আউরিয়ার দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীগেন্দালাল দীক্ষিত 'শিবাজী সমিতি' নামে এক সংঘ গঠন করে মাতৃভূমির অধীনতাপাশ মোচনের সংকল্পে দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে চলেছিলেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন গোয়ালিয়রের শ্রীলক্ষ্মণচাঁদ ব্রহ্মচারী। এঁরা দুজনে ১৯১৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে যখন এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে আলোচনায় রত সেই সময় এঁদেরই একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় পুলিশ জঙ্গল ঘিরে ফেলে

অপেক্ষা করতে থাকেন। সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতা সবচেয়ে অকরুণ। সেই সময় একজন কনেষ্টবলের অসতর্ক কাশির শব্দে এঁরা সচকিত হয়ে উঠেই গুলি চালাতে আরম্ভ করেন। দু'পক্ষের অনেকেই আহত হলেন। এঁদের আটজন মারা গেলেন আর আহত হলেন পঁচিশজন। শ্রীলক্ষ্মণচাঁদ ব্রহ্মচারী সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন —আর শ্রীদীক্ষিতের একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এঁরা পুলিশের বেড়াজাল থেকে বেরুতে পারলেন না, গুলি নিঃশেষ হতে ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু দীক্ষিত রাজসাক্ষী হবার অছিলায় কর্তৃপক্ষের কাছে ঘন ঘন যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে জন্মের মত সরে পড়লেন এবং তাঁর সহযোগী শ্রীশিউকিষণও বিচারের সময় কৌশলে সরে পড়লেন। কয়েকজন আত্মসম্মানকে পঙ্গু না করে লোহার গরাদ কেটে জেলের পাঁচিল টপ্‌কে চলে গেলেন। এঁদের অসাক্ষাতে অন্যদের বিচার শেষ হয়ে ১৯১৯ সনের ২৭শে জুলাই হয়ে গেল দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড।

শ্রীদীক্ষিত জীবনের অন্তিম সময়ে দিল্লীর এক মন্দিরে এসে তাঁর এক অনুচরকে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে সংবাদ পাঠান। ১৯২০ সনের ২৭শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় শ্রীদীক্ষিত চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। দিয়ে গেলেন আত্মবলি মহানিঃশব্দের পায়ে। একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক অজ্ঞাতবাসের অসহ্য কষ্ট সহ্য করেও কোনদিন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।(১) জীবনের শেষ অঙ্কে যখন যবনিকা আসন্ন, নির্বানোন্মুখ দীপ ক্ষীণ হয়ে আসছে তখনও তিনি সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন তাঁর সহধর্মিণীকে দেশের কল্যাণে আত্ম-নিয়োগের জন্যে। বললেন "বাঁচার অর্থ শুধু জীবনধারণ নয়, মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, ভয় লেশহীন মৃত্যুর সাধনাতেই জীবনের পরম প্রকাশ।"

(১) উত্তর প্রদেশের এক বিপ্লবী নেতার স্মৃতিকথা
—শ্রীযোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় যাঁরা লেখনী ধরেছিলেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, সখারাম গণেশ দেউস্কর, সত্যেন ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। দেশ এঁদের কাছে অনেক রকমে ঋণী। শুধু লেখায় নয়, কাজের মধ্যেও তাঁদের মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। জালিয়ানওলাবাগের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্বকবি তাঁর নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করলেন—সে ব্যাপারে ইংরেজরা তাঁদের রাজার অপমানে তুনিয়ার সামনে লজ্জা পেয়েছিলেন এবং সে অপমান ভুলতে তাঁদের অনেকদিন লেগেছিল। কে জানত যে 'অমৃতরসে জীবন পরিপক্ক মধুর ফলের মত নম্র' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এত তেজ, এত পৌরুষ, এত তীব্ররোষের বহ্নিশিখা।

১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর ভের্সাইয়ের সন্ধিপত্রে ভারতের তরফে বিকানীরের মহারাজা ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সিংহ স্বাক্ষর করলেন। ১৯১৯ সনের ২৩শে ডিসেম্বর রাজকীয় ঘোষণা বের হ'ল। 'ভারত সরকার আইন' রাজার অনুমোদন লাভ করল। রাজবন্দীরা মুক্তি পেলেন একে একে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। ইংরেজ যুদ্ধ জয় করে দেখাতে চাইলেন যে তাঁরা দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতায় কল্পতরু। একে একে বন্দীদের সর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হ'ল। চারদিক থেকে দলে দলে বহুদিনের আত্মগোপনকারীরা বেরিয়ে এলেন—আন্দামান থেকেও কিছু কিছু বিপ্লবী পেলেন মুক্তি। দীর্ঘদিন পরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পেয়ে অধিকাংশই যেন সাময়িকভাবে শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠলেন। যুদ্ধে ৫০০,০০০ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ১৬০০০ নিহত ও ৭০,০০০ আহতদের সম্বন্ধে রাজকীয় ঘোষণায় বিশেষ কিছুই রইল না—শুধু দিল্লীতে মৃত সৈন্যদের স্মরণে এক স্মৃতিস্তম্ভ উঠল বৃটিশের ঔদার্যের নিদর্শন হয়ে। কিন্তু মৃত সৈনিক

ও ভারতবাসীর বিরুদ্ধে উদ্ধত অবিবেচনা, অবজ্ঞাপূর্ণ কঠোরতার গভীরতম বেদনা ও অবিচলিত পক্ষপাতের বিরুদ্ধে কোন নেতাই প্রতিবাদ করলেন না। বরং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বিপ্লবীদের ক্ষান্ত থাকবার জন্যে অনুরোধ জানালেন মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিফরমের দোহাই দিয়ে। দেশের কিছু লোক রাজদরবারে পেলেন সম্মান, খেতাব ও চাকরি।

আমরা তখন ছোট—। বুড়া বলঙ্গের যুদ্ধের কাহিনী, ১৭৮২ সনের তমলুকের রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ ও অন্যান্য কাহিনীতে আমাদের কৈশোরের তরুণ মনে তখন অরুণোদয়ের উষারণদীপ্তি, উদ্যমের নবোদ্গত অঙ্কুর। ভাবতুম আমরাই ত নবযুগের দূত—ছুটব ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম পথে মৃত্যু-দূতের পিছনে পিছনে মরিয়া হয়ে। ইতিহাসের দীর্ঘচক্র পথে কত রাষ্ট্র, কত সাম্রাজের উত্থান পতন। কতযুগের বীরত্বের প্রয়াস ধূলার স্তূপে আজ স্তব্ধ বিলীন। তবুও ত মানুষের নবতম অধ্যায় সৃষ্টির চেষ্টার অন্ত নেই। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তে তাকে বারে বারে হাবুডুবু খেতে হবে। তার সত্য, তার বীর্য, তার গৌরব, অনিবার্য বেগে তাকে আদর্শের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে। সেই আদর্শ, সেই আত্মবিশ্বাসই ত তার অমোঘ শক্তি। দুঃখ বাধার নিরন্তর সংগ্রামে তার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত, সমস্ত সাধনা অভূতপূর্ব-প্রাণস্পন্দনে চঞ্চল। তার দেশপ্রেম ভয়কে অতিক্রম করে, বিপদকে তুচ্ছ করে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে দুর্দান্ত শক্তিতে ভাবী পরিণামের দিকে চলতে জানে।

এ সময় সদ্যমুক্ত বিপ্লবীদের অনেকেই জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের সুনাম রেখে তখন মন যেন তাঁদের গৃহকোণ প্রয়াসী। ইতিহাস বলে ক্ষুধাই বিপ্লবের অগ্রদূত। যদি বড়রা দৈন্য নিবৃত্তি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার দিকে মন দেন তবে

বিপ্লবের পরিণতি কোন্ দিকে? আবার অনেকেই তখন অহিংস নীতি স্বীকার করে কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছেন। সে সময় আমার দাদা ও চট্টগ্রামের শ্রীযোগেশ ভট্টাচার্য Student নামে একখানা পাক্ষিক পত্রিকা বের করলেন। ছাত্রগণকে বিপ্লবের পথে আগ্রহী করার জন্যে পুরাতন বন্দেমাতরম্ পত্রিকার কিছু কিছু পুনঃমুদ্রণও হতে লাগল। আমরা ছোটরা ছুটির সময় কলকাতায় এসে মাঝে মাঝে ফেরি করে সে কাগজ বিক্রী করতুম।

এ সময় মাষ্টার মশাই গেলেন সুদূর পাঞ্জাবে ডাঃ কিচলুর আহ্বানে। বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। তার আগে কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হবার সময় তিনি legitimate and peaceful means অংশটি কেটে বাদ দিয়ে হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভ্যভুক্ত হন। অমৃতসরে নতুন প্রতিষ্ঠিত "পাঞ্জাব স্বরাজ আশ্রমে" যাবার পর পাঞ্জাবের বিপ্লবী যুবসমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন আর বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে তাঁদের একটা সংস্কৃতিগত ও রাষ্ট্রনৈতিক যোগসূত্র গড়ে উঠতে থাকে। সেখানে বসে মাষ্টার মশাই যখন সংগঠন কাজে ব্যস্ত তখন পাঞ্জাবের কংগ্রেসকর্মীরা তাঁকে লাহোরে সরিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরে আশ্রমে হঠাৎ একদিন এলেন গান্ধীজি। এখানে বসে প্রাক্তন বিপ্লবী বাঙালী প্রফেসার কি করছেন তার কৌতূহল মেটানই বোধ হয় ছিল উদ্দেশ্য। তিনি মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন অনেকক্ষণ। তারপর যাবার সময় ডাঃ কিচলুকে জানিয়ে গেলেন যে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হ'ল না। ইনি অবাঞ্ছিত।

এদিকে বাংলার দুরবস্থার কথা কল্পনা করে মাষ্টার মশাই বিচলিত হয়ে উঠলেন। ১৯২২ সনের শেষের দিকে ফিরে এলেন বাংলায়। তখন বহুবাজারে চেরী প্রেসে আন্দামান ফেরৎ অনেকে এবং বাংলার নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আসতেন। মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে অনেকেরই

আলাপ আলোচনা হ'ল কিন্তু কেউই সময়োপযোগী কোন সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারলেন না। তখন বাংলার সত্যিই বড় দুর্দিন। একদিকে অর্থাভাব অন্যদিকে নেতৃত্বের অভাব।

কংগ্রেসের মধ্যে তখন স্বরাজ্য পার্টি গড়ে উঠেছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে। ১৯২০ সনে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজি স্বরাজের কোন ব্যাখ্যা দেন নি। ১৯২৩ সনে যখন বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স হয় তখন শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল স্বরাজের যে ব্যাখ্যা করেন তা' ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের নামান্তর। দেশবন্ধু কোন ব্যাখ্যা দেন নি তবুও তখনকার সংবাদপত্রগুলি তাঁরই বিরুদ্ধে লিখতে আরম্ভ করে। প্রতিবাদে তখন তিনি নিজে 'ফরওয়ার্ড' বলে একখানা কাগজ বের করলেন আর অল্প-দিনের মধ্যে তাঁর সমর্থকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। দেশবন্ধু চাইলেন Persistent and consistent obstructions in the Council.

মাষ্টার মশাইয়ের পরামর্শে বিপ্লবীদের মধ্যে আগ্রহী কর্মীরা নিজেরাই কর্ম ও পাথেয় সংগ্রহের ব্যবস্থায় কৃতসংকল্প হয়ে উঠলেন। শ্রীসন্তোষ মিত্রের নেতৃত্বে একদল, শ্রীসূর্যসেন, শ্রীনগেন সেন ও শ্রীচারুবিকাশ দত্তের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি দল—এভাবে সর্ব্বত্রই সক্রিয় কর্মীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। আমার দাদার উপর ভার পড়ল বোমা তৈরী করে সব জায়গায় পাঠাতে হবে। ওদিকে উত্তর প্রদেশ থেকে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ, আমার দাদার উপর বোমা তৈরীর ভার দিয়ে ফিরে গেলেন। নতুন পরিকল্পনার অনেক পরামর্শ চলল। ভিন্ন ভিন্ন দল থেকে কর্মপাগল কর্মীরা এলেন—নাম হ'ল Red Bengal Party. তাঁরা ইস্তাহার বিলি করলেন দিকে দিকে—জানিয়ে দিলেন তাঁরা কি চান।

ভের্সাই সন্ধির পর ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নতুন কর্মসূচী

নিয়ে আবির্ভূত হলেন গান্ধীজি। আরম্ভ করলেন অসহযোগ আন্দোলন—চাইলেন সারা দেশব্যাপী অহিংস গণ-আন্দোলন। এ আন্দোলনের মূলে ছিল শাসকবর্গের হাত থেকে চাপ দিয়ে কিছু ক্ষমতা আদায় করে নেওয়া, তবে সেটা বিপ্লববাদের সাহায্যে নয়—আপোষ আলোচনায়। গান্ধীজি প্রথম মহাযুদ্ধের আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সে স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাঁদের অনেক সাহায্য করেছিলেন, এই আশায় যে ইংরেজ ভারতকে সুনজরে দেখবে। তিনি স্বভাবতঃই আশা করেছিলেন যে ইংরেজ উপকারীর উপকার ভুলবে না—তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ইংরেজের হয়ে করেছিলেন সৈন্য সংগ্রহ। তিনি ঋষি টলষ্টয়ের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে অহিংসনীতি বিশ্লেষণ করে কাজে নেমে পড়লেন। সে আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবাসীর দেশাত্মবোধের চেতনা আশাতীতভাবে হ'ল উদ্বুদ্ধ, আকাশকুসুমপ্রত্যাশী কিছু লোক ছাড়লেন চাকরি, কিছু ছাত্র স্কুল-কলেজ, কিছু উকীল মোক্তার আদালত। দেশের লোকের মুখে ফুটল অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার বুলি: "বৃটিশ দ্রব্য বর্জন; হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই; তাদের ঐক্য ছাড়া স্বাধীনতা আসতেই পারে না"। গান্ধীজির নাম ছড়িয়ে গিয়ে মন্ত্রের মত কাজ হতে লাগল। ইংরেজও তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখাতে কুণ্ঠিত হলেন না।

বিশ্বের নিয়মানুসারে অনায়াসলব্ধ জিনিস একদিন অনায়াসেই হারিয়ে যায়। তাঁর আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল। বিপ্লবীরা এই সুযোগে কিন্তু দলে দলে কংগ্রেসে ঢুকে পড়লেন—অন্ততঃ কাজ করবার একটা জায়গা পেয়ে গেলেন। গান্ধীজি এটা পছন্দ করলেন না। তিনি চিরদিনই আমাদের সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তিনি ছুটে এলেন বাংলায়, ঘুরলেন জেলায় জেলায়, আলোচনা করলেন অনেক—কিন্তু বিপ্লবীরা তাঁর মতে মত দিতে পারলেন না।

আবার তাঁরা কাজে নেমে পড়লেন। জমে উঠল অপমানিত মঙ্গলের অভিসম্পাত। কিন্তু গান্ধীজির প্রতি বিপ্লবীদের কোন অশ্রদ্ধা কোনদিনই ছিল না। তবে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশ যে কিছুই পাবে না—তাঁদের এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। তাঁদের মতে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় রক্তের বিনিময়ে। ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা ভিত্তিহীন, এ ভিক্ষার উঞ্ছবৃত্তি তাঁরা মোটেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। চাপ দিয়ে ক্ষমতা আদায়ের পরিকল্পনা তাঁদের মনঃপূত হ'ল না বলে বৈপ্লবিক কর্মসূচী উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। গান্ধীজির প্রতিশ্রুতি "এক বছরেই স্বরাজ"-এর উপর অনেকেই আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। বুঝলেন মানুষকে উৎসাহিত করার জন্যে ওরকম উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলার সার্থকতা আছে।

১৯২২ সনের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স ডাকা হয়। এ সুযোগে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপ্লবীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণে বদ্ধপরিকর হন। এ সময় আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রবর্তক ও সারথী পত্রিকার মাধ্যমে বিপ্লবাত্মক কাজের চলতে লাগল পরোক্ষ উৎসাহ।

১৯২৩ সনের প্রথমেই শ্রীসন্তোষ মিত্রের নেতৃত্বে ও শ্রীদেবেন দের সহযোগিতায় হাওড়ার কোনা গ্রামে অর্থসংগৃহীত হ'ল। যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তাঁরা বিদ্বেষ বশতঃ তাঁদের প্রতিবেশী জ্ঞাতিশত্রুদের আসল দোষী বলে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দিলেন। রেড বেঙ্গল পার্টি প্রথম ইস্তাহারে জানালেন যে দেশদ্রোহী পুলিশ কর্মচারীদের নিধন করা হবে। দ্বিতীয় ইস্তাহারে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যুক্তি দিয়ে জানান হ'ল বিপ্লব আন্দোলনের সার্থকতা। স্থির হ'ল এখন হতে অর্থ সংগ্রহ হবে সরকারি অফিস থেকে। তারপর উল্টাডিঙ্গি ও গড়পার পোষ্টাফিস থেকে হ'ল অর্থ সংগ্রহ। ১৯২৩ সনের ৩রা আগষ্ট শাঁখারিটোলা পোষ্টাফিস থেকে অর্থ

সংগ্রহের সময় সাব-পোষ্টমাষ্টার মারা গেলেন গুলিতে। প্রধান আসামী শ্রীবরেন্দ্রকুমার ঘোষ। শেষ পর্যন্ত বরেনদা ফাঁসি হ'তে অব্যাহতি পেলেন—হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। আরম্ভ হ'ল আলিপুর দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা—বিচারাধীন সর্বশ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ বাগচী, অমিয় রায়, সুবোধ লাহিড়ী, নরেন সরকার, নৃত্যগোপাল দত্ত আরও কয়েকজন। নৃত্যগোপাল রাজসাক্ষী হয়ে বলে দিল কোনা ডাকাতির বিবরণ। জ্যোতিশচন্দ্ররা অকারণ নির্যাতন থেকে পেলেন মুক্তি। এই রাজসাক্ষীর এজাহারের সূত্র ধরে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে খানাতল্লাসীর সময় কিছু জাল নোট ধরা পড়ে। পালালেন শ্রীদেবেন দে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে। ধরা পড়লেন শ্রীকে. বি. সেন প্রমুখ কয়েকজন। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুচলেখা দিয়ে পেলেন নিষ্কৃতি।

শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র ও শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বাগচী পেলেন মুক্তি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষদাকে আলিপুর কোর্টের মধ্যেই সংশোধিত ফৌজদারী আইনে বন্দী করে আটক রাখা হ'ল। ইংরেজ সরকার বুঝলেন যে বিপ্লবীরা আবার তৎপর হয়ে উঠেছেন—গান্ধীজির অহিংস মন্ত্র অন্ততঃ বাংলাদেশে তখন কার্যকরী নয়।

১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে হ'ল কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন—মৌলনা আজাদ সভাপতি। পরিবর্তনশীলরা ও অপরিবর্তনশীলরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করলেন। ভোটে জিতলেন পরিবর্তনশীলরা। সেই সময় ২৩শে সেপ্টেম্বর হুগলী বিদ্যামন্দির থেকে মাষ্টারমশাইকে ১৮১৮ সনের ৩ আইনে বন্দী করে প্রথমে মেদিনীপুর জেলে পরে সুদূর বর্মায় পাঠান হ'ল। দিল্লীতে সেই অধিবেশন শেষ করে নেতারা কলকাতায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ১৮১৮ সনের ৩ আইনে দশজনকে গ্রেপ্তার করলেন—ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, সর্বশ্রীউপেন বন্দ্যোপাধ্যায়,

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, মনমোহন ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, রবি সেন, অমৃত সরকার ও রমেশ চৌধুরী। বিনা বিচারে সর্বসমেত ১৮৭ জনকে বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হ'ল। রেডবেঙ্গলের কর্মীরা আত্মগোপন করে কাজ চালাতে লাগলেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকেও বন্দী করে বর্মার মান্দালয় জেলে পাঠানো হ'ল। সেখানে তাঁকে থাকতে হল দীর্ঘদিন। তখন তিনি বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর মত একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষকে আটকে রাখায় বাংলার কর্মীরা অনেক অসুবিধায় পড়ে গেলেন সত্য, কিন্তু বিপ্লবের রথ প্রকাণ্ড, গতি দ্রুত, চাকা অনায়াসে ঘোরে কিছুমাত্র শব্দ করে না। মান্দালয় জেলে থাকবার সময় সুভাষবাবু মাষ্টার মশায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে তাঁর বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ইংরেজ সরকারের তখন ধারণা যে এই সমস্ত বিপ্লবী যুবকদের ধরে আটকে রাখলে বিপ্লববাদ আর মাথা তুলতে পারবে না। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল, তা বার বার প্রমাণ করে দিল বাংলার ছেলেরা। একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু তারা চায় না—উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও পরিস্কার।

১৯২৩ সনে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক গোয়েন্দা আই. বি. বিভাগ তুলে দিয়ে সেটা কেন্দ্রের অধীনে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে উঠতেই বাংলার পুলিশও কেন্দ্রের সে প্রচেষ্টার বিরোধীতা করলেন। শ্রীশিশির কুমার ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক আসলে ছিলেন কেন্দ্রের একজন গুপ্তচর। তিনি শ্রীসন্তোষ মিত্রের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন দলের কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় ও মেলামেশা আরম্ভ করেন। সকলের কাছেই বলতে থাকেন যে তাঁর সন্ধানে প্রচুর অস্ত্র আছে। শ্রীঅনুকূল মুখার্জী কোন সূত্রে শ্রীশিশির কুমারের সত্যিকারের পরিচয়

জানামাত্র আমার দাদাকে হুকুম দিলেন "এ লোককে সরিয়ে দাও পৃথিবী থেকে—বিশ্বাসঘাতকের বাঁচার কোন অধিকার নেই।" শিশিরকুমারের "স্বদেশী এজেন্সী" নামে কাপড়ের দোকান ছিল ২৫নং মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে। সঙ্গে সঙ্গে দাদার দু'জন অন্তরঙ্গ কর্মী সানন্দে এগিয়ে এলেন এ কাজের ভার নিতে— শ্রীশান্তি চক্রবর্তী ও শ্রীবসন্তকুমার ঢেঁকি। মরণোৎসব যজ্ঞবেদীতে কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান। শান্তিদার কাছে তখন কয়েকটি রিভলভার ও কিছু বিস্ফোরক পদার্থ ছিল। শিশিরকুমারের প্রাণনাশের চেষ্টায় অগ্রসর হবার আগে সেগুলো রেখে গেলেন তাঁর এক বন্ধু শ্রীঅম্বিকা খাঁর কাছে। তখন তিনি জানতেন না যে তিনি খানা থেকে ডোবায় পড়লেন। এক গুপ্তচরকে মারতে গিয়ে প্রাণসর্বস্ব অস্ত্রাদি দিয়ে গেলেন আর এক গুপ্তচরের হাতে। সে যুগে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশও সমান তালে চলেছিলেন। তাঁদের কর্মদক্ষতার গুণে বিপ্লবীদের অন্তরঙ্গ মহলে গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে তাই সম্ভব হয়েছিল। বিপ্লবীদের অনুমাত্র অসতর্কতার জন্যে কি বিরাট মূল্যই না দিতে হয়েছে—ভাগ্য নিপীড়িত পৌরুষের সংগ্রামে তাঁদের বার বার হয়েছে পরাজয়।

বোমা ছুঁড়লেন শান্তিদারা শিশির কুমারের দোকানের ভেতর। শিশিরকুমার লাফিয়ে দোকানের বাইরে এসে ছুটে পালিয়ে বেঁচে গেলেন। কিন্তু তাঁর কদর্য জীবনযাত্রার এক সহকর্মী গুপ্তচর শ্রীপ্রকাশ বণিককে প্রাণ দিতে হ'ল বোমার আঘাতে। হ'ল মীর্জাপুর বোমার মামলা। শ্রীশিশির কুমার প্রাণের ভয়ে পালালেন জীবনের মত বাংলাদেশ ছেড়ে। গভর্ণমেণ্টের পয়সায় কাপড়ের দোকান "স্বদেশী এজেন্সী" রইল পড়ে। তিনি পরে উত্তর প্রদেশে গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরি পেলেন।

এ সময় কিছু অস্ত্রশস্ত্র তুর্কি থেকে আফগানিস্তানে আসে। যুদ্ধের সময় যেমন বিপ্লবীরা জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন

তেমনি ডাঃ কিচলু ও আলিভ্রাতৃদয়ও বৈদেশিক সাহায্যের চেষ্টা করেন এবং মৌলানা আজাদও তাতে সক্রিয় অংশ নেন। শ্রীমহেন্দ্র প্রতাপ, শ্রীবরকৎউল্লা প্রভৃতি বিপ্লবীগণ কাবুলে যখন এক অস্থায়ী সরকার গঠন করেন সে সময় এ অস্ত্র আসে—সেই সঙ্গে অনেক বৈদেশিক টাকাও আসে। শ্রীআমানুল্লার শ্বশুর ছিলেন তুর্কী—তাঁরই সাহায্যে ঐ অস্ত্র ও টাকা সীমান্ত প্রদেশে আসে। বিপ্লবীরাও ঐ অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের জন্যে অনেক চেষ্টা করেন। মৌলানা আজাদ তখন রাঁচিতে অন্তরীণ। সে চেষ্টা ফলবতী হ'ল না।

দাদার অন্য আর এক বন্ধু শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষকে ধরিয়ে দিলেন আর একজন গুপ্তচর—নাম শ্রীসুরেশ বোস। তাঁকে মারতে গিয়ে দেখা গেল যে ভগবান তাঁকে দিয়েছেন রাজযক্ষ্মা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর দেওয়া গেল না। ইংরেজ গুপ্তচর রেখেছিল বটে কিন্তু বিপ্লবীদেব রুদ্র রোষবহ্নিতে গুপ্তচরেরা পদে পদে দগ্ধ হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে জীবনও দিতে হয়েছে নির্ম্মমভাবে। তাঁদেরও উপর যে বিপ্লবীরা চর রেখেছিলেন তা' প্রথমে তাঁরা বুঝতেই পারেন নি।

১৯২৪ সনের ১২ই জানুয়ারী মাষ্টার মশায়ের হাতে গড়া ছেলে শ্রীগোপীমোহন সাহা পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে মারতে গিয়ে ভুল করে মিঃ আর্ণেষ্ট ডে বলে এক সাহেবকে মেরে বসলেন। ফাঁসি হয়ে গেল। লোকে কোনদিনই ভাবতে পারে নি যে হুগলী বিদ্যামন্দিরের সেই শান্তশিষ্ট ছেলেটি এমন দামাল হয়ে উঠবে। এই হুগলী বিদ্যামন্দির ভূপতিদা'র হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান—এরই মাধ্যমে আমাদের রাজনীতির হাতে খড়ি।

আমার দাদা তখন আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছেন। তিনি ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে শ্রীগোপীমোহনকে চারদিক থেকে লোক ঘিরে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠেই দাদা ছুটলেন তাঁকে সেদিনের

জন্যে নিষেধ করতে। বন্দোবস্ত তিনিই সব করে দিয়েছিলেন; আর জুলুদা শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কয়েকদিন লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে ঠিক ভোর বেলায় মিঃ টেগার্ট প্রাতঃভ্রমণে বের হন। ১২ই জানুয়ারী ভোরবেলা দাদা গিয়ে দেখলেন যে গোপীমোহন তার আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। মৃত্যুজয়ী বীরের এভাবে পথরোধ সম্ভব হ'ল না। কথা ছিল শ্রীগোপীমোহন ও শ্রীদেবেন দে দু'জনে যাবেন একসঙ্গে। শ্রীগোপীমোহন ছাতুর নাড়ু খেতে ভাল বাসতেন—তিনি শ্রীদেবেন দেকে ছাতুর নাড়ু তৈরী করতে বলে বেরিয়ে গেছেন—কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবেন বলে—তিনি আর ফিরলেন না। বিপদের মধ্যে সহকর্মীকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে তাঁর হয় নি। একা না গেলে হয়ত এ ভুলটা তাঁর হ'ত না। কিলবার্ণ কোম্পানীর মিঃ ডে কে দেখতে অনেকটা স্যার চার্লস টেগার্টের মত ছিল তাই ভুল হয়ে গেল। দু'জনে গেলে বোধহয় মিঃ ডে মরতেন না। খবর পাওয়ামাত্র আমার দাদা শ্রীদেবেন দেকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন, নিজেরাও সাবধান হয়ে গেলেন।

লালবাজার হাজতে দেখা দিলেন মিঃ টেগার্ট। তখন শ্রীগোপী-মোহন ভুলটা বুঝে নির্দোষ একজনকে মারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাতেও কিন্তু দমবার পাত্র তিনি ছিলেন না। বিচারের দিন কাঠগড়া থেকে নিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে বললেন "মিঃ টেগার্ট মনে করতে পারেন যে তিনি এ যাত্রা বেঁচে গেছেন। কিন্তু আমার অসমাপ্ত কাজ অন্য কেউ সমাপ্ত করবে।" ১৯২৪ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। ফাঁসির আগে তাঁর শরীরের ওজন পাঁচ পাউণ্ড বেড়েছিল। ১৯২৪ সনের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্সী জেলে তিনি প্রাণ দিলেন। বলে গেলেন "আমার প্রতি রক্তবিন্দু ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে।" তাঁর আত্মোৎসর্গ তখন বাংলার ঘরে ঘরে এনে দিয়েছে নব জাগরণের

দুর্বার আহ্বান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব পাশ করান হ'ল। সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী দেশবন্ধুকে অনুরোধ করে সে প্রস্তাব পাশ করাতে চাইলেন। দেশবন্ধু ১৯২৪ সনের ১লা জুন কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজিকে সন্তুষ্ট করার জন্যে শেষে একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন "This committee, while denouncing and dissociating itself from violence and adhering to the principles of non-violence, appreciates Gopinath Saha's ideal of self-sacrifice, misguided though it is, in respect of the country's best interest and expresses respect for his self-sacrifice."

গান্ধীজির অনমনীয় মনোভাবের জন্যে আট ভোটে প্রস্তাবটি পাশ হ'ল না—বাদ দিতে হ'ল। এ ব্যাপার নিয়ে ভারতের তরুণদের সেদিন ক্ষোভের সীমা ছিল না। অন্তহীন বেদনার দুঃসহভারে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত অবমানিত ইতিহাসের অর্থলুপ্ত পরিণতি এ প্রচেষ্টার নীরব সাক্ষী হয়ে রইল।

ছয়

রাইফেল ও রিভলভার ছুড়তে শিখেছিলুম জুলুদার কাছে। দাদার বন্ধু শ্রীনগেন সেন, বাড়ী চট্টগ্রাম, প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক। প্রায় সাতফুট লম্বা মানুষ। অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর মত কাউকে দেখি নি। আর দেখি নি এমন প্রচ্ছন্ন শাসনের মাঝে নিখুঁত বন্ধুতার স্নেহচ্ছায়া, নির্ভীক সংগঠন প্রতিভা। বিপ্লবীদের বিভিন্ন দলের বিরোধ মেটাবার জন্যে ও তাঁদের মধ্যে সর্বাত্মক সংহতি আনবার জন্যে কি পরিশ্রমই না করেছিলেন তিনি।

সে সময় অর্থাভাবে কোন কাজই সম্ভব হচ্ছিল না। শ্রীঅনন্ত সিংরা ঠিক করলেন যে এ. বি. রেলওয়ের কিছু টাকা সরাতে পারলে কাজের অনেক সুবিধে হবে। আমার দাদার সঙ্গে চট্টগ্রামের অন্যান্য কর্মীরা পরামর্শ করে কাজে অগ্রসর হলেন। দাদা দিলেন কিছু বোমা তৈরী করে আর দিলেন তাঁদের সাহায্যের জন্যে একজন কর্মঠ ও সাহসী কর্মী শ্রীদেবেন দেকে। ১৯২৩ সনের ১৪ই ডিসেম্বর সর্বশ্রীদেবেন দে, অনন্ত সিং, অবনী ভট্টাচার্য পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপের গাড়ীতে যে টাকা যাচ্ছিল দিনের বেলা তাকে আটক করে পেলেন ১৭০০০ টাকা। অর্থ সংগ্রহ হ'ল সহজেই কিন্তু সত্যি-কারের বিপদ আরম্ভ হ'ল তারপর থেকে। সকলে এক জায়গায় একটা বাড়ী ভাড়া করে আছেন—বাড়ীটার নাম 'সুলুক বাহার'। পুলিশ কিছুতেই ধরতে পারছে না কাদের এ কাজ। একদিন শ্রীদেবেন দে একটা পুকুরে বাসন ধুচ্ছিলেন এমন সময় পুলিশের দারোগা তাঁর নাম ধাম জিজ্ঞেস করলে তিনি একটা মনগড়া উত্তর দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তিনি চট্টগ্রামের ভাষা বলতে পারলেন না বলে পুলিশের কি রকম সন্দেহ হ'ল। পুলিশ চলে যেতেই শ্রীদে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জানালেন মাষ্টারদা শ্রীসূর্য সেনকে।

তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রমাণাদি নষ্ট করে দিয়ে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তখন পুলিশের লোক 'সুলুক বাহার' ঘিরে ফেলেছে। সে ব্যূহ ভেদ করে দুঃসাহসে তাঁরা বেরিয়ে এলেন। কিছুদূর যাবার পর নগরখানা পাহাড়ের ধারে এঁদের সঙ্গে পুলিশের একটি খণ্ড যুদ্ধও হয়ে গেল। দু'জন সিপাই শ্রীবীর মোহন ও শ্রীআলিহোসেন হলেন আহত। যখন তারা 'বাজেদ বস্তান' নামে একটি মুসলমান তীর্থস্থানের কাছাকাছি এসেছেন তখন দেখলেন যে আরও কিছু পুলিশের লোক ও গ্রামবাসীরা তাঁদের ডাকাত বলে ধরবার জন্যে ছুটে আসছে। সঙ্গে আছেন চট্টগ্রামের এস. পি. মিঃ শ্যালো আর ডেপুটি সুপার মিঃ ব্রাউন

ও ইনেসপেক্‌টার মিঃ সেয়ার। মাষ্টারদা পরামর্শ দিলেন খুচরো টাকা ছড়িয়ে দিতে। গ্রামের লোকেরা টাকা কুড়ুতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—সেই অবসরে এঁরা গেলেন অনেক দূর এগিয়ে। যখন পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছেন তখন ধূম্রজাল সৃষ্টির জন্যে এঁরা একটা বোমা ফাটালেন—বোমা দেখেই গ্রামবাসী ও পুলিশ ভয়ে গেলেন থেমে। বোমা ফেটে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তখন এঁদের কয়েকজন গিয়ে পড়েছেন পাহাড়ের আড়ালে। সেখানে পাহাড়ের ভেতর একটা হ্রদের মত ছিল কিন্তু দেখা গেল তাতে কচ্ছপ ভর্তি। অন্যধারে খাড়াই পাহাড়। টাকার লোভে তখন গ্রামবাসীরা সেখানেও এসে পড়ছেন। পুলিশও নাগালের মধ্যে। কাজেই গত্যন্তর না দেখে মাষ্টারদার পরামর্শমত মাষ্টারদা নিজে, অম্বিকাদা, শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী ও আরও একজন পটাসিয়াম সায়ে-নাইড খেয়ে নিলেন। কিন্তু বাইরের হাওয়ায় বিষের তীব্রতা তখন অনেকটা কমে গেছে—আর বিষটাও ছিল খারাপ। পুলিশ বুঝতে পেরে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নাগারখানা পাহাড়ের একটা ঝর্ণার জলে অনবরত ডোবাতে আরম্ভ করার ফলে বিষের ক্রিয়া গেল কমে। রাজেন্দ্রনাথ দাস অজ্ঞান অবস্থায় গড়াতে গড়াতে এক গর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন দু'দিন। যখন জ্ঞান হ'ল তখন তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—আগের দিন বৃষ্টি হয়েছিল, একটা গর্তে একটু জল জমেছিল তাই খেয়ে বেঁচে উঠলেন ও পরে ধরা পড়লেন। আর শ্রীদেবেন দে ও শ্রীউপেন ভট্টাচার্য ওরফে অবনী ভট্টাচার্য অন্ধকারে পালাতে গিয়ে পথ হারিয়ে পড়ে গেলেন একটা সাপের সামনে। পাহাড়ে সাপ তখন বিরাট ফণা তুলে ধরেছে—ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে তাঁরা আবার পেয়ে গেলেন রাস্তা। একটা রাখাল ছেলে অযাচিত ভাবে এঁদের সাহায্য করলো। তাঁরা দু'জনে আর অনন্তদা—শ্রীঅনন্তলাল সিংহ পালালেন—টাকা কড়ি এঁদের কাছেই ছিল।

আসামীদের বিচার সুরু হ'ল সেসন্স জজ মিঃ স্টার্কের আদালতে স্পেশাল জুরীর সাহায্যে। শ্রীপ্রফুল্ল রায় নামে একজন গুপ্তচরের রাগ ছিল অনন্তদা'র উপর। তিনি অনেক খোঁজ করে অনন্তদাকে ধরে ফেললেন হাওড়ার শালকিয়া থেকে। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অ্যাডভোকেট শ্রীরজনী বিশ্বাস, শ্রীকামিনী দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরা করলেন আসামী পক্ষ সমর্থন। তাঁরা দেখালেন যে আসামীদের কাছে যে রাইফেল পাওয়া গেছে সেগুলি মিলিটারির ও রিভলভারটি কোন এক সাহেবের। তাছাড়া পুলিশের সাক্ষীদের সকলেই কৃতিত্ব নেবার জন্যে আসল কাজ তিনিই করেছেন বলে দাবী করলেন। ফরিয়াদী পক্ষ এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারলেন না যে এ রাইফেলগুলি বা রিভলভারটি চুরি গেছে বলে কোন পুলিশ ডায়েরী আছে। আসামীপক্ষ থেকে বলা হ'ল যে শ্রীসূর্য সেন স্কুলের হেড মাষ্টার। তিনি কয়েকজন ছাত্র নিয়ে পাহাড়ে পিক্‌নিক্‌ করতে গিয়েছিলেন—পুলিশ এঁদের অযথা হয়রান করবার জন্যে রাইফেল ও রিভলভারের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। যে সাহেবের রিভলভার তিনি দেশে চলে যাবার আগে মালখানায় জমা দিয়ে গেছেন ফিরে এসে নেবেন বলে। পুলিশ কোন লিখিত প্রমাণ দেখাতে পারলেন না যে এগুলি চুরি হয়েছে—তাছাড়া ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দীর মধ্যে কোনই ঐক্য ছিল না। কাজেই ব্যারিষ্টারের কৃতিত্বে ও আইনের ফাঁকে এঁরা বেঁচে গেলেন।

এদিকে শ্রীপ্রফুল্ল রায় অনন্তদা'কে ধরিয়ে দিয়েছেন এ খবরটা জানাজানি হয়ে যেতে শ্রীপ্রেমানন্দ দত্ত বলে এঁদের একজন বন্ধু ঠিক করলেন শ্রীপ্রফুল্ল রায়কে শাস্তি দেবেন। শ্রীরায়ের সঙ্গে শ্রীপ্রেমানন্দ দত্তের সদ্ভাব ছিল। একদিন প্রফুল্লকে ডেকে এনে বেড়াতে বেরিয়ে শ্রীপ্রেমানন্দ দত্ত তাকে পরপর তিনটি গুলি করলেন ১৯২৪ সনের ২৫শে মে চট্টগ্রামের পল্টন মাঠে। এই

ব্যাপার চাক্ষুষ কেউ দেখেন নি, কিন্তু কাছেই ছিল সরকারি উকিল রায় বাহাদুর শ্রীসতীশ সেনের বাড়ী—তিনি শব্দ শুনেছিলেন। প্রফুল্ল মরবার আগে জবানবন্দীতে বললেন, মানিকতলায় বোমা-সমেত শ্রীযশোদা পালকে আর হাওড়া থেকে শ্রীঅনন্তলাল সিংকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রেমানন্দ তাকে মেরেছে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রেমানন্দ লিখতে গিয়ে পরমানন্দ লিখে বসলেন। প্রফুল্ল সে রাত্রে বেঁচে ছিলেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে সরকার পক্ষ থেকে অনেক চেষ্টা হয়েছিল। পরের দিন চিকিৎসার জন্যে তাঁকে ঢাকা সহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হ'ল কিন্তু তিনি ট্রেণেই মারা গেলেন। প্রধান সাক্ষী রায় বাহাদুর শ্রীসতীশ সেন। তিনি যাতে খারাপ সাক্ষী না দেন তার জন্যে এঁরা ব্যবস্থা করলেন। একজন সরাসরি তাঁকে গিয়ে বললেন যে তিনি যদি সত্যি সাক্ষী দেন তা হ'লে তাঁর একমাত্র পুত্র ব্যবহারজীবি শ্রীচন্দ্রশেখর সেন যিনি হাইকোর্টে ওকালতি করছেন তাঁকে শেষ করে দেওয়া হবে। ভদ্রলোক একমাত্র পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সত্যি সাক্ষী দিলেন না। মৃত্যুর পূর্বে প্রফুল্লর বলা নামের সঙ্গে আসামীর নাম না মেলায় আর আসামীকে সনাক্ত করতে না পারার জন্যে প্রমাণাভাবে এবারেও দেশপ্রিয় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বুদ্ধিমত্তায় প্রেমানন্দ খালাস পেলেন। জুরীরা একবাক্যে বললেন আসামী নির্দোষ। তিনি প্রমাণে দেখালেন যে, যে সময় খুন হয়েছে তার অব্যবহিত পরেই দেখাগেছে শ্রীপ্রেমানন্দ নিরুদ্বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রেমানন্দ বেঁচে গেলেন। সরকার পক্ষ হাইকোর্ট করলেন, সেখানেও কিছু সুবিধে হ'ল না। পরে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে আর কিছুদিন আগে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

১৯২৪ সনের ৩০শে জুলাই একটা ঝাঁকা মুটের মাথায় রিভলভার বোঝাই একটা বাক্স চাপিয়ে চলেছিলেন শ্রীভবেশ চন্দ্র বসু রায়—হাতে সাইকেল কোমরে রিভলভার। দূরে দূরে পাহারা

দিয়ে চলেছিলেন শ্রীদেবেন দে ও শ্রীগণেশ ঘোষ। হঠাৎ পিছন থেকে পুলিশের লোক এসে ভবেশদা'কে জড়িয়ে ধরতেই আরম্ভ হ'ল ধস্তাধস্তি। ইসারা করলেন ভবেশদা' গুলি চালাতে—যাক্ না পুলিশের সঙ্গে নিজের জীবনটাও শেষ হয়ে। জীবনের কোন মূল্যই তখন আমাদের ছিল না। ছিল মৃত্যুর মধ্যে সর্বনাশের আনন্দ, দুর্গম অন্ধকারের মধ্যে সার্থকতার ইঙ্গিত।

যাঁরা পাহারা দিয়ে চলেছিলেন তাঁরা কিন্তু গুলি করতে পারলেন না—যে কারণেই হোক্। এই ফাঁকে ঝাঁকা মুটেও পড়ল সরে—ধরা পড়লেন ভবেশদা' রিভলভার ও সাইকেল সমেত। জেল হয়ে গেল ঢাকার শ্রীভবেশ চন্দ্র বসুরায়ের দু'বছর।

১৯২৪ সনের ১০ই অক্টোবর সর্বশ্রীঅনিলবরণ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পূর্ণ দাস প্রতুল গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্তী, অনুকূল মুখার্জী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি অনেকজনকে একে একে গ্রেপ্তার করে ১৮১৮ সনের ৩ আইন অথবা অর্ডিনান্সের বলে আটক রাখা হ'ল। ২৪শে অক্টোবর লর্ডলিটন Bengal Ordinance No 1 of 1924 জারী করলেন। গ্রেপ্তারের সময় বিপিন দা ফিরছিলেন ছদ্মবেশে বেলুড় মঠ থেকে সাইকেলে। ধরা পড়ে সাইকেলটা দিয়ে গেলেন শ্রীঅম্বিকা খাঁর কাছে যথাস্থানে পৌছে দেবার জন্যে। খবর পাওয়ামাত্র চাওয়া হ'ল শ্রীঅম্বিকা খাঁর কাছ থেকে শান্তিদা' ও বিপিনদা'র গচ্ছিত জিনিস। শ্রীঅম্বিকা খাঁ আজ দেবো, কাল দেবো বলে ঘোরাতে লাগলেন। শেষে একদিন ডেকে পাঠালেন শ্রীদেবেন দেকে তাঁরাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে একটা সিনেমা হলের সামনে গচ্ছিৎ জিনিসগুলো ফেরৎ দেবেন বলে। আমার দাদা যেতে দিলেন না তাঁকে—নিজে গেলেন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়। তাঁকে দেখে শ্রীঅম্বিকা খাঁ গেলেন ভড়কে। আম্‌তা আম্‌তা করে দু'দিন সময় চাইলেন। দাদা চলে আসছেন এমন সময় কয়েকজন লোক ছুটে এসে দাদাকে

জড়িয়ে ধরল শ্রীদেবেন দে মনে করে। পরে ভুল বুঝতে পেরেই ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাল।

পরিষ্কার বোঝা গেল অম্বিকার পরিচয়। এদিকে মীর্জাপুর বোমার মামলায় ব্যারিষ্টার শ্রীসুনন্দা সেনের কৃতিত্বে শান্তিদা' ও বসন্তদা' পেলেন মুক্তি। শান্তিদা' শুনলেন সব, যেতে চাইলেন অম্বিকার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। অনুকূলদা' নিষেধ করলেন। অম্বিকা খাঁ বলে পাঠালেন যে মামলায় মুক্তি পাবার জন্যে দমদমে তিনি একটা প্রীতিভোজের আয়োজন করেছেন—সেখানেই যাঁর জিনিস তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবেন বলে এতদিন দেননি। আমার দাদাও নিমন্ত্রিত হলেন। অনুকূলদা'র নিষেধ ছিল বলে দাদা গেলেন না—শান্তিদা' গেলেন একা—বুদ্ধির দারিদ্র্যে অশুভ লগ্নে বিশ্বাসের মন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। পরের দিন দেখা গেল শান্তিদা'র মৃতদেহ পড়ে রয়েছে রেল লাইনের ধারে সর্বাঙ্গ ছোরার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। নিয়তির দুর্নিবার আকর্ষণ। একজন প্রাণবন্ত কর্মী পৃথিবী থেকে চলে গেলেন জন্মের মত। আর একজন ঐশ্বর্য আড়ম্বরের প্রলোভনপাশে বদ্ধ হয়ে বসে রইলেন সৌভাগ্যের আশায়।

সরকার লোক দেখানো মোকদ্দমা করলেন। শ্রীঅম্বিকা খাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হ'ল। পরে ১৯২৫ সনে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় আমার দাদা যখন জেলে, দেখা হল অম্বিকার সঙ্গে তাঁর। দাদা তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গুলো করলেন তিনি তা' অস্বীকার করতে পারলেন না বটে তবে কারণ দেখাতে চাইলেন অন্য। তাঁর আসলরূপ নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ায় ও বিপ্লবীদের হাতে তাঁর নিষ্কৃতি নেই বুঝে সেই প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননায় তিনি সর্বাঙ্গে কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যা করলেন- মার্জনা চাইলেন মৃত্যুর হাতে। জীবনের সংকীর্ণ পরিধিতে জড় অদৃষ্টের সঙ্গে মানবাত্মার সংগ্রামে অম্বিকা চলে গেলেন বিপ্লব ইতিহাসের কলঙ্কিত ছায়ামূর্তি হয়ে।

মিঃ টেগার্টকে তার পরেও মারবার অনেকবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কি ভাগ্যবান লোক! প্রতিবারই বেঁচে গেছেন। একবার ধর্মতলার এক জায়গায় তাঁর আসবার কথা। খবরটা জানতে পেরে জুলুদা রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক মোতেয়ান রাখলেন। এমন কি রাইফেলও যোগাড় ছিল—যাতে কোন রকমে মিঃ টেগার্ট পালাতে না পারেন। কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হয়ে গেল। শ্রীঅনন্ত সিং-এর উপর ভার ছিল সমস্তটা পরিচালনার, কিন্তু শ্রীদেবেন দে'র পকেটে বোমার খানিকটা অংশ খুলে গিয়ে ধোঁয়া উড়তে আরম্ভ করল। তখন নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি বোমার ব্যবহার আর করতে পারলেন না। মিঃ টেগার্টও বেঁচে গেলেন। শ্রীদেবেন দে ইচ্ছে করে রাস্তার ধারে ঘোড়ার জলখাবার টবের মধ্যে পড়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

আর একবার ১৯২৩ সনে শ্যামবাজার অরফ্যানেজে মিঃ টেগার্টের আসবার কথা। আবার সব তৈরী। সভার ভেতরে বাইরে লোক থাকবার ব্যবস্থা পাকা। এমন সময় চট্টগ্রামের শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দাস হঠাৎ এসে হাজির হলেন এঁদেরই খোঁজে। তিনি জানতেন না যে এঁরা সেদিন এই বিশেষ কাজের জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। তাঁর পিছন পিছন পুলিশের লোক শ্রীপ্রফুল্ল রায় আসছিলেন। তাঁকে এই বাড়ীতে ঢুকতে দেখে শ্রীপ্রফুল্ল রায় ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউটের বাড়ীখানা তল্লাসীর ব্যবস্থা করে ফেললেন। কয়েকজন কৌশলে সরে পড়লেন। রাজেনদা'কে কাপড় দিয়ে ঝুলিয়ে দোতলা থেকে পিছনের দিকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। কি দুর্ভাগ্য ঠিক সেই সময়ে শ্রীউপেন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযশোদা পাল বোমাগুলির মশলা খোল থেকে বের করে রোদে শুকাতে দিয়েছিলেন—কোন প্রয়োজন ছিল না। ভরা থাকলে তাঁরা ব্যবহার করে সরে পড়তে পারতেন কিন্তু তা' আর হ'ল না—তাঁরা ধরা পড়ে গেলেন। সেবারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। মাণিকতলা

বোমার আর এক মামলায় এঁদের শাস্তি হয়ে গেল। তার কিছুদিন পরে শ্রীপ্রফুল্ল রায়কে এ কৃতিত্বের দেনা শোধ করতে হ'ল শ্রীপ্রেমানন্দ দত্তের হাতে। একথা আগেই বলেছি।

আর একবার গভর্ণর মিঃ লিটন ও স্যার চার্লস টেগার্টের অ্যালবিয়ন থিয়েটারে আসবার কথা—এঁরাও তৈরী হয়ে গেলেন। কিন্তু অতিবৃষ্টি সব পণ্ড করে দিল। তারপরেও তাঁকে মারবার চেষ্টা করা হয়েছে—ভিন্ন ভিন্ন দল চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রতিবারই বেঁচে গেছেন।

গভর্ণর মিঃ লিটন একবার ঢাকায় বাঙালী স্ত্রীলোকদের ইজ্জত নিয়ে একটা বিশ্রীরকমের মন্তব্য করেছিলেন। আমার দাদা তার প্রতিবাদ জানান—সেটা মুসুবিদে করে দিয়েছিলেন অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত। তিনি খুব ভাল বোমা তৈরী করতেও জানতেন। নরেনদা'—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সঙ্গে আমার দাদার পরিচয় করিয়ে দেন। মগরার ডাক্তার শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ, গোঁদল পাড়ার শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ও আমার দাদা তাঁর কাছ থেকে বোমা তৈরী করতে শেখেন। পরে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যালের অনুরোধে শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভূমেশ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুরের শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস আমার দাদার সঙ্গে যান দেওঘরে। দাদা শেখাতে লাগলেন বোমা তৈরীর প্রণালী। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন বিহার কলেজের জনৈক অধ্যাপক। আমার দাদা সে যুগে জার্মানীর নবাবিস্কৃত বোমার বহু ফরমূলা সংগ্রহ করেছিলেন।

শ্রীদেবেন দে সে সময় কিছুদিন আমাদের চুচুঁড়ার বাড়ীতে, তারপর কিছুদিন শালকিয়াতে থাকলেন আত্মগোপন করে। পরিচয় দিই লোকের কাছে "আমার মাসতুতো ভাই"—চোরে চোরের মত। অদ্ভুত মানুষ—ভালোয় মন্দয় সত্যেয় মিথ্যেয় তিনি সত্যিই অপরূপ। অকল্যাণ ও অসম্মানকে ভ্রুক্ষেপ না করে জীবনে এমন করে নিজের

লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করতে কম লোককেই দেখেছি। কি দুর্জয় সাহস, কি অসামান্য কর্মকুশলতা। পুলিশ তাঁকে বহুবার বহু জায়গায় ধরবার চেষ্টা করেছে—প্রতিবারই বিফল মনোরথ হয়েছে। কয়েকমাস পরে চলে গেলেন পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে ছদ্মনামে সিঙ্গাপুরে। অথচ পুলিশের গুপ্তচরেরা তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়ে চললেন যে তাঁকে কলকাতায় এ সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। এই রকম রিপোর্টের উপর নির্ভর করে অনেকের জীবন নষ্ট করে দেওয়া হয়।

১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে কানপুরে আবার গোপন সভা ডাকা হ'ল। সারা ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করে বিপ্লবীরা কাজে নামবার সিদ্ধান্ত করলেন। শ্রীরাম প্রসাদ বিসমিল ও শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ এ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করবার ভার নিলেন।

এই সময় হাওড়া ষ্টেশনে ধরা পড়লেন কুমিল্লার শ্রীযোগেশ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছ থেকে অনেক সন্দেহভাজন কাগজপত্র পুলিশ পেয়ে গেল। সেই সূত্রে খোঁজ পড়ল অনেকেরই।

বাংলার বিপ্লবীরা চিরদিনই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে এসেছেন যে অহিংসা বা সত্যাগ্রহের পরিণতি শেষ পর্যন্ত একটা ভিক্ষা-ভাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। অশ্রুবর্ষণে অগ্নিদাহ নিবারণের মত। বাহুবলে স্বকীয় মর্যাদায় প্রাপ্য আদায় তাতে অসম্ভব। আপন প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে জনগণকে উত্তেজিত করাই তার সংগ্রাম। দেশকে ডানামেলার যুগ থেকে গুটির যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য। পূর্ণস্বাধীনতা লাভ অহিংসার দ্বারা সম্ভব নয়—হ'লেও তার স্বরূপ আলাদা। তবুও প্রাক্তন বিপ্লবী নেতাদের কয়েকজন অহিংসা পথই ঠিক পথ মনে করে অহিংস পদ্ধতির মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

১৯২৪ সনের ১৯শে জুন এজেন্সী বিদ্রোহের নায়ক শ্রীমাল্লু

ডোরের ফাঁসি হয়ে গেল। দলনেতা শ্রীআলুরি সীতারাম রাজু ও শ্রীগৌতম ডোরের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিদ্রোহের আরম্ভ হয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধে শ্রীসীতারাম ও শ্রীগৌতম প্রাণ দেন। পুলিশের পক্ষের অনেক হতাহত হয়। গাঞ্জাম, ভিজেগাপট্টম, ও গোদাবরী জেলার বিভিন্ন জায়গায় এঁদের জন্যে সম্পূর্ণ আসাম রাইফেল বাহিনীকে নিয়োগ করতে হয়।

১৯২১ সনে জলন্দরের শ্রীকিষণ সিং গড়গাজ ও হোসিয়ার-পুরের শ্রীধন সিং-এর নেতৃত্বে বাবর আকালীদল বা চক্রবর্তী দল গঠিত হয়। তাঁরা অহিংসনীতিতে বিশ্বাস না রেখে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ করলেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁদেব গুপ্ত সমিতির শাখা। পুলিশও সচেতন হয়ে উঠলেন। ১৯২৩ সনের ১লা সেপ্টেম্বর এঁদের চারজন সভ্য সর্বশ্রীকরম সিং, উদয় সিং, বিষণ সিং ও মহেন্দ্র সিং যখন কর্পূরতলার বামেলির পথে চলেছেন, তখন পুলিশ তাঁদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। তখন তাঁরা ধরা দেওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করতে করতে আত্মবিস্মৃত আদর্শে—বিশ্বপাবন মৃত্যুবরণ করা শ্রেয় মনে করে পুলিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই চারটি প্রাণের বিনিময়ে পুলিশের অনেকগুলি প্রাণ দিতে হ'ল। হোসিয়ারপুরের শ্রীধন সিং ছিলেন দলের ডান হাত। বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে তিনি অদ্ভুত সাহসে নিজেকে পুলিশের হাত থেকে মুক্ত করে বোমা ফাটালেন—ফলে তিনি নিজে, পাঁচজন পুলিশ ও একজন ইউরোপীয়ান পুলিশের অধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে আরও দু'জন প্রাণ দিলেন- শ্রীজওলা সিং ও শ্রীবান্টা সিং কিন্তু শ্রীবরিয়াম সিং পালালেন। সরকার মোট ৯১ জনকে বন্দী করেন ও ১৯২৫ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিচারে পাঁচজনের ফাঁসি, এগার জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

যাঁদের ফাঁসির হুকুম হয় তাঁরা হলেন সর্বশ্রীকিষেণ সিং, করম সিং, সণ্ডা সিং, নন্দ সিং ও দলীপ সিং। তাঁরা ও অন্যান্য সকলে আপীল করলেন। কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য হয়ে শ্রীধরম সিং এর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের বদলে ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল। ১৯২৬ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। দুর্জয় প্রাণের সহস্র হিল্লোল নীরবে হ'ল সমাহিত। শ্রীদলীপ সিংয়ের বয়স তখন মাত্র আঠার কিন্তু অল্পবয়সেই তিনি বৈপ্লবিক কর্মে তাঁর যে যোগ্যতা দেখিয়ে ছিলেন তা অতুলনীয়।

১৯২৪ সনের ৯ই আগষ্ট বিপ্লবীরা করে বসলেন এক দুর্দ্ধর্ষ রেল ডাকাতি। কাকোরী ষ্টেশনের কাছ বরাবর চেন টেনে তাঁরা গাড়ী থামালেন। গার্ড ও ড্রাইভারের কাছে একজন করে গিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে বললেন "উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন—আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। উঠলেই মরবেন।" তাঁরা ভয়ে তাই করলেন। বিপ্লবীরা জানিয়ে দিলেন যেন কেউ ট্রেন থেকে না নামেন—এ টাকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে নেওয়া হচ্ছে। ট্রেনযাত্রী একজন ভদ্রলোক অহেতুক কৌতুহলের দেনা শোধ করলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে—অন্য একজন হলেন আহত। গার্ডসাহেব যক্ষের মৃত ধনের মত টাকার বাক্স আগলে ছিলেন—এঁরা তা নিয়ে নির্বিঘ্নে সরে পড়লেন। পরে একে একে ধরা পড়লেন চুয়াল্লিশজন তার মধ্যে পনর জনকে ছেড়ে দেওয়া হল। আরম্ভ হ'ল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা। সর্বশ্রীরামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, আস্‌ফাকউল্লা, রোসন সিং, গোবিন্দ কর ও অন্যান্য আসামীদের বিচার চলল। অতৃপ্ত জীবনের অসম্পুর্ণ সাধনায় এঁরাও তাঁদের শ্রেষ্ঠতা প্রমান করে চললেন।

বিপ্লববাদের জন্ম অভাবনীয় বিপদসঙ্কুল আবর্তের মাঝে। গতি গোপন হতে গোপনতর। ব্রত কঠিন, মন্ত্র দুর্লভ, কর্ম বিচিত্র, ত্যাগ দুঃসাধ্য। তার কর্মধারার মধ্যে নেই সমাপ্তি, নেই অবসান।

সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ্য আহুতির মত সমর্পন করে দেবার জন্যে যেন সব সময়েই সে মহানিষ্ক্রমণের পথের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবল, নির্যাতন ও অসম্মানের ভয়ে নিজের অস্তিত্বকে অভিশপ্ত করে না। সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে বিপ্লবীর জীবনের সুর মেলে না। তাঁদের সাধনা কালের মতই রূঢ়, মৃত্যুর মতই নিষ্ঠুর, নিয়তির মতই অনতিক্রম্য, তাই তাঁদের জীবন দ্রুত, মরণ দ্রুততর। দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে আত্মবিস্মৃত প্রাণের ধাবমান হিল্লোল। অন্তরে শুধু প্রচণ্ড বিদারণ শক্তি, বিকৃতিহীন নির্মল অনাবিলতার বাষ্প— কর্মের অর্ঘ আর ত্যাগের নৈবেদ্যের সমারোহ, অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের অকুতোভয় সংকল্প। তাদের অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে কর্ম সুনিয়ন্ত্রিত— কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ। নৈরাশ্যজয়ী মন, দীনতা তুচ্ছতার বহু উর্ধে—আত্মোৎসর্গের পরমৈশ্বর্যের মহৎ মহিমায় ও শক্তির গৌরবে ভাস্বর।

সাত

১৯২৪-২৫ সাল। সারা ভারতের বিপ্লবী তরুণেরা তখন কর্মোন্মাদনায় চঞ্চল। বহুদিন আগে যেমন ভারতের ভগবৎপিপাসু তত্ত্বানুসন্ধানীদের দৃষ্টি দক্ষিণেশ্বরের এক উদাসী সন্ন্যাসীর দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল তেমনি এ সময়ে সমস্ত তরুণদের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণেশ্বরে বাচস্পতি পাড়ার একটি জীর্ণ দোতালা বাড়ীর দিকে। এখানেই নাকি রয়েছে ইংরেজ-শাসন-অবসান-যজ্ঞের স্ফুলিঙ্গ। সেখানে তৈরী হচ্ছে সাংঘাতিক মারণাস্ত্র টি. এন. টি, বোমা— যাবে চট্টগ্রাম থেকে লাহোর পর্যন্ত। ভিন্ন ভিন্ন দলের বাছাই করা কর্মীরা Red Bengal নাম নিয়ে সেখানে কর্মব্যস্ত। আমার

দাদা তাঁদের শেখাচ্ছেন শক্তিশালী বোমা তৈরীর প্রণালী। শেষ পর্যন্ত হ'ল অর্থাভাব। এগিয়ে এলেন এক তরুণ শ্রীধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায়—তাঁর যথাসর্বস্ব এমন কি বসতবাড়ী খানাও বিক্রি করে এগার হাজার টাকা তুলে দিলেন আমার দাদার হাতে —যেমন একদিন দেশের একান্ত প্রয়োজনের সময় ভীমশা এনে দিয়েছিলেন তাঁর পুরুষানুক্রমে অর্জিত সমস্ত সঞ্চয় রাণা প্রতাপের হাতে। লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্রুবেশদা'র এ দান চিরদিনই অজ্ঞাত রয়ে গেল। সেই অর্থে পাঁচশতাধিক বোমা তৈরী হয়ে চলে গেল সারা ভারতে।

এই অর্থাভাব দূর করবার জন্যে যখন কৃষ্ণনগরের কর্মীদের উপর নির্দেশ আসে, তখন তাঁরা যে উপায় অবলম্বন করলেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅনন্তহরি মিত্র প্রমুখ কর্মীরা ঠিক করলেন যে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের আগে বিত্তশালী কর্মীরা নিজেদের সংসার থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন। এ কাজে অগ্রণী হয়ে এলেন সর্বশ্রীতারাদাস মুখার্জী (১) প্রমোদ সেনগুপ্ত (২) প্রফুল্ল কুমার বসু (৩) গোবিন্দ পদ দত্ত, আশুতোষ পাল, ধীরেন সরকার (ভুঁদু) প্রমুখ কর্মীরা। প্রফুল্লদা' সংসারের যাবতীয় সঞ্চিত অলঙ্কার এনে দিলেন, রটিয়ে দেওয়া হ'ল বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে। তেমনি নিজের বাড়ীর সমস্ত অলঙ্কার এনে দিলেন মঘাদা—শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত। এর পর অনন্তদা'র নির্দেশে অবশ্য একবার সরকারী অর্থ সংগ্রহের চেষ্টাও হয়েছে। নবদ্বীপ থেকে কৃষ্ণনগরে পোষ্টাফিসের টাকা যাচ্ছিল ঘোড়ার গাড়ীতে। সিমুলতার কাছ

(১) শ্রীতারাদাস মুখার্জী অন্তরাণ অবস্থায় আত্মহত্যা করেন।

(২) শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত Bengal Ordinance-এ ধরা পড়বার পর ইংলণ্ডে যান এবং ২০ বৎসর কাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সকল বামপন্থীদের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

(৩) শ্রীপ্রফুল্ল বসু ইনসিনে ১৯৪২ সনের ১লা ডিসেম্বর যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে মারা যান।

বরাবর গাড়ী আসামাত্র রিভলভার হাতে শ্রীতারাদাস মুখার্জী গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাতে বললেন। গাড়োয়ান সে কথা না শুনে জোরে গাড়ী চালাতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীতারাদাসের অব্যর্থ-লক্ষ্য-এক-সঙ্গী গাড়োয়ানকে পায়ে গুলি করলেন এমনভাবে যাতে সে প্রাণে না মরে। মেলব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরা নির্বিঘ্নে সরে পড়লেন। পুলিশের কাজে সহায়তা করতে ঘটনার প্রথম খবর থানায় পৌঁছে দিলেন একজন ভদ্রলোক, নাম শ্রীবসন্ত চৌধুরী। অদৃষ্টের পরিহাস। পুলিশ ও গাড়োয়ান তাঁকেই আততায়ী বলে সন্দেহ করল। মামলায় তাঁর সাজা হয় নি বটে কিন্তু পুলিশ এ ঘটনাকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলে কখনও জানতে পারে নি।

অনন্তদা'কে তখন গুপ্তচরেরা খোঁজ করে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণনগর থেকে কলকতা পর্যন্ত। তাঁকে চেনে এমন একজন পুলিশের লোককে কলকাতায় আনা হ'ল। তখন Red Bengal Party-র সব সভ্যদেরই সন্ধান চলছে।

১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে ধরা পড়লেন জুলুদা। কয়েকদিন পরে ৬ই নভেম্বর শোভাবাজার আর চিৎপুর রোডের মোড়ে সেই গুপ্তচর শ্রীনলিনীকান্ত রায় মোতেয়ান ছিলেন। বেলা পৌনে দুটোর সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে শ্রীঅনন্তহরি মিত্র একটা ট্যাক্সি নিয়ে শোভাবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে চলে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পরেই সেই ট্যাক্সিতে তিনি, শ্রীধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায় আর শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজন ফিরে উত্তরদিকে চলে গেলেন। ট্যাক্সির নম্বর নিয়ে ট্যাক্সিচালক হীরুকে ধরে শ্রীনলিনীকান্ত রায় জানতে পারলেন যে ঐ তিনজন যাত্রী বরানগর বাজারে নেমে ঠিকা গাড়ী নিয়ে চলে গেছেন। খোঁজ করে পরের দিন ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ান মোনাকে ধরে পুলিশ সন্ধান পান যে সে তিনজন বাচস্পতি পাড়ায় গিয়ে ঠিকা গাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন।

এঁরা তখন দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীটা বদল করে একটু ঠাঁইনাড়া হবেন বলে শ্রীচৈতন্য চট্টোপাধ্যায় ৯ই নভেম্বর এসেছিলেন বাচস্পতি পাড়ায়। কিন্তু তখন এঁদের সকলেই প্রায় জ্বরে অচৈতন্য। কাজেই সে রাতে যাওয়া হ'ল না। চৈতন্যদা সে রাতটা কাটালেন পাশের বাড়ীতে। ১০ই নভেম্বর ২৪ পরগণার অ্যাডিসন্যাল পুলিশ সুপার মিঃ ডাকফিল্ড একদল পুলিশ নিয়ে সেখানে হাজির হলেন এবং প্রথমে ভুল করে অন্য একটি বাড়ী ঘেরাও করেন। সে বাড়ীর লোকেরা বল্লেন যে পুকুরের ওধারের বাড়ীতে কয়েকজন বাঙালী বাবু আছেন, তাঁরা কারও সঙ্গে মেশেন না। মিঃ ডাকফিল্ড দলবল নিয়ে সেই বাড়ীতে হানা দিলেন। সে বাড়ীতে ছিলেন ন'জন —তার মধ্যে পাঁচজন জ্বরে অচৈতন্য আর চারজন অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁদের সেবা করছিলেন।

দরজা ধাক্কাধাক্কি করাতে গোয়ালা মনে করে দরজা খুললেন চট্টগ্রামের শ্রীরাখাল চন্দ্র দে। মিঃ ডাকফিল্ড তাঁকে জড়িয়ে ধরে উল্লাসে নৃত্য আরম্ভ করলেন। তাঁর বিশ্বাস তিনি শ্রীদেবেন দে ওরফে খোকাকে ধরেছেন। মনের আনন্দে পুরস্কারের স্বপ্ন দেখছেন। নাম জিজ্ঞাসা করায় রাখালদা বললেন শ্রীনিমাই চন্দ্র দেব। মিঃ ডাকফিল্ড বললেন "No you are Khoka" তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ দোতলায় উঠে দেখে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। যখন কেউই দরজা খুললেন না তখন পাশের বাড়ী থেকে কুড়ুল এনে সেই দরজা ভাঙ্গা হ'ল। সামনেই ছিলেন শ্রীরাজেন লাহিড়ী —কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। দোতলায় তিন-খানা ঘর ও একটা ঘেরা বারান্দা ছিল—মাঝের ঘরে তখন শ্রীধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশিবরাম চট্টোপাধ্যায় জ্বরে অচৈতন্য। শ্রীঅনন্তহরি মিত্র তাঁদের শুশ্রুষা করছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারের পর বারান্দায় শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ধরা পড়লেন। পূর্ব-দিকের ঘরে শ্রীহরিনারায়ণ চন্দ্র, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী আর

শ্রীনিখিলবন্ধু ব্যানার্জী জ্বরে অচৈতন্য। এঁদের কেউই নিজের নাম বললেন না। পরাভবের অগৌরবে তখন তাঁরা লজ্জিত।

একমাত্র দেবীদা প্রথমে নিজের নাম বলে বললেন যে তিনি বাড়ীর মালিক সাহিত্যিক শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়, ভাড়া আদায়ের জন্যে এসেছেন। পকেট থেকে ভাড়ার রসিদও বের করলেন। পুলিশ বাড়ী থেকে বোমা, রিভলভার কার্তুজ, এসিড ও টি, এন্ টি, বোমা তৈরীর অন্যান্য উপকরণ খুঁজে বের করলেন। দেবীদা' যখন দেখলেন যে তাঁদের কেউই নিজের নাম বললেন না—তিনি তাঁর নাম লেখা কাগজখানা মিঃ ডাকফিল্ডের হাত থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্লেন। মিঃ ডাকফিল্ড তাঁর দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে।

এদিকে চৈতন্যদা' এ ব্যাপার দেখে ছুটলেন শোভাবাজারের ৪নং বাড়ীতে। সে বাড়ীতে ছিলেন চট্টগ্রামের মাষ্টারদা শ্রীসূর্য সেন, শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী আর বরিশালের শ্রীঅনন্তকুমার চক্রবর্তী। পুলিশ যখন বাড়ী ঘিরে ফেলেছেন তখন মাষ্টারদা' পালালেন আর দু'জন ধরা পড়ে গেলেন। মাষ্টারদাকে নির্ব্বিঘ্নে সরিয়ে দেবার জন্যে প্রমোদদা' আর অনন্তদা' দরজা চেপে দাঁড়ালেন আর মাষ্টারদা বাথরুমের একটা জানলার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে জলের পাইপ ধরে তিনতলা থেকে নীচে নেমে চলে এলেন। তারপর দরজা খুলে পুলিশ ঢুকতেই প্রমোদা' কয়েকজন পুলিশকে ধরাশায়ী করে দিলেন। এই এগার জনকে নিয়ে আরম্ভ হ'ল দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা। সব দলের কর্মীদের—সম্মিলিত মহৎ প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হ'ল। দলের নেতা হিসেবে আমার দাদার, শ্রীরাজেন লাহিড়ীর আর শ্রীঅনন্তহরি মিত্রের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। কেউই রেহাই পেলেন না, অন্যান্য সকলেরই বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হয়ে গেল।

সেই রাতেই পুলিশ চুচুঁড়ায় আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে খানাতল্লাসী চালালো। পুলিশের তখনকার দিনের বড় কর্তা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে নিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রশ্ন হ'ল যে আমাকে সন্ধ্যেবেলা কলকাতার ময়দাপটিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল—আমি ইতিমধ্যে কখন চুচুঁড়ায় এলুম ও ওঁদের ধরা পড়ার খবর ক'জনকে বলে সাবধান করে দিলুম—কোথায় বোমাগুলো সরালুম। কখনও গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি কথা বলে, কখনও বা ভয় দেখিয়ে তিনি নানা রকমের প্রশ্ন করতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে আমি যখন শুধু এ কাজের জন্যেই সে রাতে কলকাতা থেকে এসেছি তখন আমি সমস্ত খবরই জানি। জানি কোথায় কি আছে? কে কে দলের অন্তরঙ্গ। তাই তিনি নানা ভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন। একবার বললেন "তুমি ত ভালছেলে, তোমাকে আরও ভাল করে লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে। বলত কাকে কাকে খবর দিলে?" বলেন আর মুখের দিকে চান—পরমাত্মীয়ের নিপুণ ছদ্মবেশ। পুলিশের চোখ বড় সাংঘাতিক—যা' দেখে তার চেয়ে ঢের বেশী আবিষ্কার করে।

আমার কিন্তু এক কথা 'দাদা ছাড়া আর কাউকে চিনি না, আমি কিছুই জানি না।' চাটুয্যে মশাই গেলেন চটে। অনেকক্ষণ পরে তীক্ষ্ণ কুটিল হাসিতে বললেন "জান, তোমাকে সারাজীবন অন্ধকার সেলের মধ্যে আটক রাখতে পারি— দরকার হ'লে গুলি করে মেরে ফেলতে পারি।" আমার কিন্তু এক উত্তর—ভদ্রলোকের এক কথার মত। সুবিধে পুলিশ কিছুই করতে পারল না। ভয় বলে তখন কোন জিনিস আমার ছিল না। পুলিশ সে রাতের মত বিদায় নিল। সন্ধ্যের সময় মাষ্টারদা শ্রীসূর্য সেনই আমাকে কলকাতা থেকে পাঠিয়ে ছিলেন চুচুঁড়ায় অন্যান্য বন্ধুদের সাবধান করে দিতে। জীবনে এই একটি মানুষ দেখেছিলুম শ্রীসূর্য সেনকে—যাঁর চিন্তায়

ছিল না ভীরুতা, কর্মে ছিল না দৌর্বল্য, ব্যবহারে ছিল না সংকোচ—অন্তরের মাঝে ছিল অক্ষুন্ন মাধুর্যের নিত্য বিকাশ।

পরের দিন পুলিশ আবার এসে খানাতল্লাসী চালালো দিনের বেলা। সাত-আট ঘণ্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাশোনার পর কিছুই পাওয়া গেল না। পুলিশের দল বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেল। যাবার সময় চাটুয্যে মশাই বিফলতার গাত্রদাহে বাবাকে বলে গেলেন "বড় ছেলে ত ফাঁসি কাঠে যাচ্ছে—ছোটটিকেও সাবধান করবেন। ওর এই বয়সেই এত?" বাবা শুধু আমার মুখের দিকে চাইলেন—বড় করুণ দৃষ্টি। পুলিশ চলে গেল বটে কিন্তু রেখে গেল সাধারণ পোষাকে কয়েকজন অনুচর, সবার অলক্ষ্যে বাড়ীটাকে লক্ষ্যে রাখবার জন্যে। বাড়ীর নাম হয়ে গেল বোমার বাড়ী। আমার এক খুড়তুতো ভাই তাদের দেখলেই ঠাট্টা করে বলত "এ বাড়ীতে বোমা তৈরী হয়।"

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় সকলেরই সাজা হ'ল বটে কিন্তু পুলিশের ভারি আফসোস যে এ মামলায় এত চেষ্টা করেও কারো কাছে কোন স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল না বা কাউকে রাজসাক্ষী করা গেল না। তখনও চেষ্টা চলতে লাগল যাতে কিছু গোপন খবর পাওয়া যায়। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের চাকরির উন্নতির জন্যে সব কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি জেলখানার ভেতর আসতে আরম্ভ করলেন পাশের ষ্টেট ইয়ার্ডে। সেখানে বন্দীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা জমাতে চাইলেন। কারো কারো কাছে নানা রকমের প্রলোভন দেখাতেও লাগলেন, ক্রমে জিনিসটা প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল।

যাঁদের কাছে তিনি আসতেন তাঁদের কেউ কেউ মুস্কিলে পড়ে গেলেন এবং তাঁদের ভাবভঙ্গী অন্য বন্দীদের কাছে দৃষ্টিকটু লাগতে লাগল। অনেকেই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন আবার কেউ কেউ এমন বুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন যে ঠাট্টা করে দক্ষিণেশ্বর বোমার

মামলার বন্দীদের ব্যঙ্গোক্তি করে বলতে লাগলেন "হাতের বোমা রইল হাতে।" বন্ধুরা দাদার কাছে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন "যদি একেবারে শেষ করে দিতে পার ত এ কাজে হাত দাও—আধমরা করে ফেলে রাখার চেয়ে কাজে হাত না দেওয়াই ভাল।"

তখনকার দিনে দলপতির হুকুম বেদবাক্যের মত—হুকুম মানেই কাজ। প্রশ্নের বা কারণ জিজ্ঞাসার কোন বালাই নেই। দু'একদিন পরামর্শ চলল। যাঁরা এ পরামর্শের মধ্যে ছিলেন না তাঁরা এর বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। চাটুয্যে মশাইকে গোপনে সবাই ব্যঙ্গ করে মামা বলে ডাকত। তাঁকে আসতে দেখলেই সকলেই এমন কি ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার সার্জেণ্ট পর্যন্ত বলতেন "মামা আসছে।" তিনি নিজেও একথা বোধ হয় জানতেন তবু চাকরীর এমন মোহ যে সমস্ত ব্যঙ্গ বক্রোক্তি সহ্য করেও তিনি আসতেন। শ্রীসুধাংশু চৌধুরী তাঁর নামে প্যারডি করে গান বেঁধেছিলেন এবং সুর করে গাইতেন।

"তোমায় নেয় না কেন যম?
এত লোকের গরু মরে—তোমার বেলা একি ভ্রম?
শীতলার বাহন তুমি
ধোবার প্রিয় ধন
তোমায় নেয় না কেন যম?"

তা সত্ত্বেও তিনি যেতেন। এই চাকরীর মোহই শেষ পর্যন্ত তাঁকে অতলে ডোবালো। তিনি গরুমরার মতই মরলেন। কয়েকদিন যেতে না যেতেই চাটুয্যে মশাই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ভেতর দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বন্দীদের হাতে প্রাণ হারালেন। আত্মরক্ষার সমস্ত সঞ্চয় সঙ্গে থাকতেও ব্যবহারের সুযোগ পেলেন না।

ব্যাপারটা এই—১৯২৬ সনের ২৮শে মে চাটুয্যে মশাইকে

আসতে দেখে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীনিখিলবন্ধু ব্যানার্জী সিপাইকে বললেন বাইরে একটা কাপড় পড়ে গেছে—শীগ্‌গির দরজা খোল।' সিপাহী সরল বিশ্বাসে দরজা খুলে দিল। কাপড় আনতে যাবার অছিলায় নিখিলদা' ছুটে গেলেন বাইরে এবং চাটুয্যে মশাইকে সামনে পেয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন। ভদ্রতার খাতিরে চাটুয্যে মশাই প্রতি-নমস্কার করা মাত্রই নিখিলদা' মারলেন তাঁর মুখে এক বিরাট ঘুসি—আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক্ থেকে শ্রীপ্রমোদরঞ্জন চৌধুরী এক শাবলের আঘাতে চাটুয্যে মশাইয়ের মাথার খুলিটা দিলেন গুঁড়িয়ে সেই সঙ্গে একটা চোখও উড়ে গেল। সেটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। 'হতাশ বনস্পতি ধুলোয় পড়ল উবুড় হয়ে।' সিপাইটা ধরবার জন্যে ছুটে আসছিল, প্রমোদদা শাবল নিয়ে তাকে তাড়া করতেই সে প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিল দৌড়। গোলমাল শুনে পাশের ওয়ার্ডের একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট চাবি খুলে বের হয়ে মামার অবস্থা দেখে মুচকি হেসে দরজা বন্ধ করে সরে পড়ল।

শাবলটার ওজন ছিল পনর সের। সমস্ত ঘটনাটা মিনিট দু'য়ের মধ্যে হয়ে গেল। দেখা গেল বন্দীরা যে যার ঘরে—শাবলটা মাটির নীচে আর চাটুয্যে মশাইয়ের চূর্নিত খুলি সমেত অচৈতন্য দেহটা মাটির উপর রক্তাক্ত। ভদ্রলোক একদিন আমাকে গুলি করে মারবার ভয় দেখিয়েছিলেন তা আর হ'ল না। অত্যাচারীর বলি ভগবান এমনি করেই নেন—দর্পোদ্ধত প্রতাপ করে দেন কীর্তি-নিঃস্ব। শাবলটা আবিস্কার হয়েছিল তিনদিন পরে।

সব চেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল যে যেখানে এতবড় কাণ্ডটা হয়ে গেল সে জায়গাটা জেলের অন্য কোন জায়গা থেকে সবটা দেখা যায় না। কাজেই এক সিপাই ছাড়া আর দ্বিতীয় সাক্ষী নেই—শুধু দূর থেকে একজন কয়েদী দেখেছিল। তার নাম মতি—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী। ডাকাতি ও খুনের

মামলায় তখন মাত্র সাত আট বছর জেল খেটেছেন। ঠিক হ'ল কেউ কিছু বলবেন না, যাঁর ভাগ্যে যে শাস্তি উঠবে তিনি তাই মেনে নেবেন। এখানেও কোন স্বীকারোক্তি নেই—চিরন্তন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সুনিশ্চিত মীমাংসা। সরকার পক্ষ থেকে মতিকে সাক্ষী দেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করা হয়। সিপাইটা চাকরির দায়ে মিথ্যে সাক্ষী দিল কিন্তু মতি দিল না হৃদয়ের দায়ে—বহু প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও। মনে প্রাণে সে স্বদেশী বাবুদের দেবতা বলে জ্ঞান করত—তাঁদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে সে রাজী হ'ল না। খুন জখম করা ডাকাতি মামলার নিরক্ষর আসামী প্রমান করে দিল যে তার মধ্যেও আছে হৃদয়ের অনুভূতি, দেশাত্মবোধ, আত্মমর্যাদা—কোন প্রলোভনই তাকে টলাতে পারল না। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে এ অসাধারণ মহত্ব—'আশ্চর্য মানুষের মন।'

কয়েকজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কয়েদীর শেখানো মিথ্যে সাক্ষীর উপর নির্ভর করে হুকুম হ'ল তিনজনের ফাঁসি, বাকি সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—একজনও মুক্তি পেলেন না। সর্বশ্রীঅনন্তহরি মিত্র, বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর হ'ল ফাঁসির হুকুম। আপীলে বীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জী মুক্তি পেলেন। প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী ও অনন্তহরি মিত্রের হ'ল ফাঁসি—আমার দাদা, নিখিলবন্ধু ব্যানার্জী ও আর দু'জনের হয়েছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আপীলে পেলেন মুক্তি—বিচারের প্রহসন।

রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই মরেছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীকানাইলালের গুলিতে প্রেসিডেন্সী জেলের ভেতর আর পুলিশের বড়কর্তা মরলেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ভেতর শ্রীনিখিলবন্ধুর ঘুষি আর শ্রীপ্রমোদরঞ্জনের শাবলের আঘাতে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাসের দুইটি পৃষ্ঠা রক্তরঙ্গে রাঙা হয়ে রইল।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাবার পর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীকানাইলালের দেহের ওজন বেড়েছিল। এমন কি ফাঁসির আগের দিনও

কানাইলাল আরামে ঘুমিয়ে হাসতে হাসতে ফাঁসি কাঠে ওঠেন। তাঁর সহকর্মী নরেনদা'র কাছে শুনেছি যে কানাইলালের নির্ভীক চরিত্র দেখে ইউরোপীয় সার্জেণ্ট পর্যন্ত শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে চোখের জল ফেলেছিল। শ্রীঅনন্তহরি ও শ্রীপ্রমোদরঞ্জনের ফাঁসির আগে শরীরের ওজন বেড়েছিল। তাঁদের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী দু'জনকেই একই সঙ্গে পাশাপাশি ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং ফাঁসি সেল থেকে দু'টি মৃত্যুসঙ্গী পাল্লা দিয়ে ছুটে ছিলেন ফাঁসি মঞ্চের দিকে মৃত্যুসাগরসঙ্গমে মহাজীবনের সহযাত্রী হতে। জীবন প্রবাহ এসে মিলল কাল প্রবাহের অখণ্ড ধারায়। ১৯২৬ সনের ৯ই আগষ্ট হাইকোর্টের রায় হয় আর ২৮শে সেপ্টেম্বর ভোরের অন্ধকার ভেদ করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল কেঁপে উঠেছিল সমস্ত বন্দীর সমবেত কণ্ঠের বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে। 'আত্মোৎসর্গের আদর্শবহ বিদ্যুৎজোতির্ময় শক্তিমন্ত্র বন্দে মাতরম্।' জীবনকে ভালবাসার পথে অনতিক্রম্য বাধা মৃত্যু—সেই মৃত্যুকেই তাঁরা জয় করেছিলেন— তাঁরা চিরজীবি জীবনযুদ্ধে তাঁরা মৃত্যুজয়ী।

শেষ হ'ল দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মের জন্যে দেশের নেতারা মুক্তি পেলেও একমাত্র মাষ্টার মশাই অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ছাড়া কারো কাছে কোন সাহায্য কর্মপাগল তরুণেরা পেয়েছে বলে শোনা যায় নি। তখন তাঁরই কর্মসূচীতে নতুন ভাবে সংগঠন সুরু করে সর্বশ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, অনুকূলচন্দ্র মুখার্জী, সন্তোষ মিত্র, সূর্য সেন, হরিনারায়ণ চন্দ্র, চারুবিকাশ দত্ত, শচীন্দ্র সান্যাল, নগেন্দ্র সেন (জুলু), চন্দ্রশেখর আজাদ প্রভৃতির সহযোগিতায় একটি সক্রিয় বিপ্লবী দলের অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল। নতুন ধরণের মারাত্মক বোমা, নতুন ধরণের একনিষ্ঠ কর্মী সংগঠনের দ্বারা চট্টগ্রাম থেকে লাহোর পর্যন্ত একসূত্রে গাঁথা বৈপ্লবিক কর্মসূচী রচিত হয়েছিল। এর আরম্ভ দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায়, জেলের

মধ্যে শ্রীভূপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হত্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাসের অনশন মৃত্যুতে, শ্রীভগৎ সিংএর ফাঁসিতে আর সমাপ্তি চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের যুগান্তকারী প্লাবনে। এই বৈপ্লবিক কর্মস্রোত অপ্রতিহত অপ্রতিরোধ্য। এরই মধ্যে ছিল ইতিহাসের নিঃসংশয় ইঙ্গিত—অঙ্কুরিত সফলতার বীজ—ইংরেজ রাজত্বের মূলে চরম কুঠারাঘাত—কর্মযোগের উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বরের কর্মীদের মধ্যে যাঁরা তখন বাইরে ছিলেন তাঁরা দক্ষিণেশ্বরের অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্যে কেন্দ্র স্থাপন করলেন দেওঘরে। সর্বশ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিজন কুমার ব্যানার্জী, তেজেশ ঘোষ, অতুল দত্ত, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ কর্মীগণও ধরা পড়ে গেলেন। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের সকলেরই শাস্তি হয়ে গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কামাগাটামারু জাহাজ সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র মামলায় যে বিয়াল্লিশ জনের যাবজ্জীন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয় তাঁদের কয়েকজন তখন ছিলেন হাজারিবাগ জেলে। ভাই পরমানন্দ ছিলেন লাহোর এ. ভি কলেজের অধ্যাপক। তিনি প্রেসিডেন্সী জেল থেকে গোপনে পাঠালেন সংবাদ। তাঁর পরামর্শে হাজারিবাগ জেল থেকে সর্বশ্রীগণ্ডার সিং, মোহন সিং, রুড় সিং, জগৎরাম সিং প্রমুখ বারজন সান্ত্রীদের অদ্ভুত কৌশলে কাবু করে পালালেন জেল থেকে। নিজেদের বন্ধ সীমানা চূর্ণ করে বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশের পথে। যে দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা পালালেন তা সত্যিই অদ্ভুত—দেখালেন শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য। হয়ত আর একটু সময় পেলে সকলেই পালাতে পারতেন।

১৯২৬ সনের ৮ই অক্টোবর চট্টগ্রামের মাষ্টারদা শ্রীসূর্য সেন চলেছেন কলকাতার রাস্তা দিয়ে, হঠাৎ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। অনেকের বিশ্বাস অর্থলোভে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

এরপর কলকাতায় মেছুয়াবাজারে ১৯২৯ সনের ১৮ই ডিসেম্বর বোমা সমেত ধরা পড়লেন কয়েকজন। পুলিশ বাড়ীটায় ফাঁদ পেতে রাখল। একে একে ধরা পড়ে গেলেন কর্মীরা। বিচারে সবশ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুধীরকুমার আইচ, মহেন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, শচীন করগুপ্ত ও মুকুলরঞ্জন সেনগুপ্তের সাত বছর, রমেন্দ্র বিশ্বাস, সুধাংশু দাশগুপ্ত, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, বিহারীলাল বিশ্বাস, রবীন্দ্র বসু ও দেবপ্রিয় চ্যাটার্জী, সুধাংশু মজুমদারের পাঁচ বছর, তারাপদ গুপ্ত ও পান্নালাল দাশগুপ্তের চার বছরের ও সত্যব্রত সেনেব তিন বছরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ফরিদপুরের শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস ছিলেন নির্ভীক সংগঠনশীল নেতা। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী ও সে যুগের বিপ্লবী নেতাদেব তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি বাংলার তেরটি জেলায় তাঁর শান্তিসেনা দল গঠন করেন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর ১৯২১ সনে তাঁর এ প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ফলপ্রসূ হয়। এই সেনাদল ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে যাঁরা বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বার বার কারারুদ্ধ ও নির্যাতীত হয়েছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, ফণীভূষণ মজুমদার, যতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কালী ব্যানার্জী, প্রফুল্ল চ্যাটার্জী, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, জনার্দন চক্রবর্তী, ইন্দুভূষণ মজুমদার এবং আরও অনেকে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এঁদের অবদান অতুলনীয়। পাকিস্তান হবার পর শ্রীফণীভূষণ মজুমদার পাকিস্তানেই ছিলেন। একবার এম. এল. এ.-ও হয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে বার বার কারাবরণ করতে হয়েছে। তিনি আট বছরের বেশী কাটিয়েছেন পাকিস্তান জেলে। স্বাধীনতার পূর্বে প্রায় ১৪ বছর ছিলেন কারাভ্যন্তরে। তাঁর অনুজ শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদারও ১৯৩০ সন থেকে ১৯৪৬ সনের মধ্যে প্রায় বার বছর জেলে

কাটিয়েছেন। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী মাদারিপুরের অবিসংবাদিত নেতা। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটেছে ইংরেজের বন্দীশালায়।

আট

বিনা বিচারে তখনও বাংলাদেশের বড় বড় নেতারা ১৮১৮ সনের ৩ আইনানুসারে বা সংশোধিত ফৌজদারী আইনে বন্দী। মাষ্টার মশাই জেলে যাবার আগে বলেছিলেন "আন্দোলনটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বীজটা যেন নষ্ট না হয়ে যায়।" কিভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাই নিয়েই তখন চিন্তা ছিল। মনে পড়ত বিশ্বকবির বাণী—

"নবীন প্রভাত লাগি
দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি
দীপ নিভিবে না।"

এ সময়ে চন্দননগরে 'শিল্প সমবায়' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দানবীর শ্রীদুর্গাদাস শেঠের প্রচেষ্টায়। সেটাই হয়ে উঠল আমাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। সেখান থেকে 'স্বদেশী বাজার' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হ'তে লাগল। পুলিশের দৃষ্টি তখন শিল্প সমবায়ের উপর ষোল আনা, তবুও আমাদের বেপরোয়া ভাব, যাতায়াতের বিরাম নেই। শিল্প সমবায়ে আসতেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী সাধকদের মধ্যে অনেকেই। অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমোহিতলাল চক্রবর্তী, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র নাথ বানার্জী, শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসতেন নিয়মিত। তাঁদের কাছে শুনতুম পুরাণো দিনের কথা—তাঁদের ত্রুটি বিচ্যুতির ইতিহাস। কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায় অচরিতার্থ সাধনা, অন্তর্গূঢ় সংকল্প, দলগত বৈষম্যের কাহিনী। শুনতুম সে

যুগে বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তির কেমন ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে কোন কিছু করবার আগে ঘরের শত্রু ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে পথের কাঁটা দূর করাই উচিত। নরেন গোঁসাই-এর কথা বাদ দিলেও অন্যদের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন ত্রুটিই হ'ত না।

শ্রদ্ধেয় শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র যখন মজঃফরপুরে পাঠাবার জন্যে শ্রীক্ষুদিরাম বসু ও শ্রীপ্রফুল্ল চাকীর নাম ঠিক করছিলেন তখন সে পরামর্শ শুনতে পান দরজার আড়াল থেকে বারীনদা'র আনা একটি কর্মী নাম শ্রীরজনী সরকার। বাড়ী বর্ধমান জেলার রায়না থানায়—ট্রাম কোম্পানীর কণ্ডাক্টার। সে গোপনে পুলিশকে খবর দেয় আর বলে যে বারীনদা'কে অনুসরণ করলেই সব সন্ধান ও কর্মকেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৯০৮ সনের ২০শে এপ্রিল কলকাতার পুলিশ সে কথা মজঃফরপুরের পুলিশ সুপারকে জানিয়ে দেন। কাজেই মিঃ কিংসফোর্ডের বাড়ীর সামনে পাহারা রাখা হয়—পুলিশ মজঃফরপুরে খুব সতর্ক হয়েই ছিল। যখন জানা গেল যে এ কাজ রজনী সরকারের তখন তাকে মারবার জন্যে তিন চারবার চেষ্টা করা হয়। নরেনদা'রা দু'বার—কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হয় নি। এ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে গভর্ণমেণ্ট তাকে একটি রিভলভার আত্মরক্ষার্থে ও গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কিছু মাসোহারার বন্দোবস্ত করে তাকে স্থানান্তর করে দেয়।

সে প্রাণের ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গ্রামে গিয়ে বাস করে। গ্রাম বললে ভুল হবে নিজের বাড়ীর সীমানার বাইরে সে যেত না। রিভলভারটি তার সব সময়ের সঙ্গী। গ্রামে কোন অচেনা লোক এসেছে শুনলেই সে আতঙ্কে শিউরে উঠত। আমি তাকে দেখবার কৌতুহল সামলাতে না পেরে গিয়ে দেখে এসেছি। এ রকম জীবন্মৃত বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

আর শুনেছিলুম বহুলোকের নিরভিমান নিঃস্বার্থ দানের কথা। সর্বশ্রী অবিনাশ চক্রবর্তী ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বহু অর্থ দিয়েছিলেন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী করতেন নিয়মিত অর্থ-সাহায্য। মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য, শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দন-নগরের শ্রীরূপলাল নন্দী ও তাঁর পুত্র শ্রীভোলানাথ নন্দীর সাহায্যের তুলনা হয় না। ব্যারিষ্টার শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীতুর্গাদাস শেঠ অকাতরে অর্থ সাহায্য করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন অনেকে—তার মধ্যে ছিলেন চন্দননগর হাসপাতালের ডাক্তার, মাহেনিবাসী খৃষ্টান ভদ্রলোক, নাম মঃ গোবিনে। আহত অথবা পলাতক বিপ্লবীদের ছদ্মনামে তিনি হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়ে এবং জানাজানি হবার আগেই তাঁদের নিরাপদে সরিয়ে দিয়ে যে সাহায্য করতেন তার তুলনা হয় না—অথচ তার জন্যে কোনদিন কোন পারিশ্রমিক নেননি। তাঁকে এ কাজে সাহায্য করতেন তু'জন রোমান ক্যাথলিক নান্—স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে হাসপাতালে কাজ করতেন। পরে একজন দেশী ধাত্রী পুলিশকে এ বিষয়ে খবর দেওয়ায় তাঁরা খুবই অসুবিধেয় পড়ে যান।

আর আমাদের দ্বিতীয় কর্মকেন্দ্র চুঁচুঁড়া ডাচভিলায় শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে—যেখানে বহুদিন আগে শ্রীঅরবিন্দ এসে ছিলেন। সেখানে অমরেন্দ্র লাইব্রেরীর মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের দেখাশোনা আলাপ আলোচনা চলত। কেমন করে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায় তখন সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকতুম। এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সর্বশ্রীকানাইলাল পাল, শশীশেখর রায় চৌধুরী, জয়পাল দাস ও সুধাংশু কুমার ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী। অনেকেই আকারে ইঙ্গিতে উৎসাহ দেখাতেন কিন্তু তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলত না। তাই গোপন পরামর্শের জায়গা ছিল অন্যত্র।

এর মধ্যে একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়ে গেল। আমরা কয়েকজন আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যের সময় ঘরের মধ্যে বসে গল্প করছি—তখনও আলো জ্বালান হয় নি। শশীশেখর উঠোনের লেবু-গাছে বাতাবী লেবু পাড়তে উঠেছে এমন সময় দেখে একটা লোক চুপি চুপি পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে—আমাদের কথা শোনবার জন্যে পিছনের বাগানের পথ দিয়ে। সেই লোকটা যেই উঠানে গাছের নীচে এসেছে, অমনি শশী উপরের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে পা দিয়ে তার গলাটা বেশ করে জড়িয়ে ধরে 'চোর চোর' বলে চীৎকার করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেললুম—চিনতে একটুও দেরী হ'ল না যে সে পুলিশের লোক। কিন্তু না চেনার ভান করে সকলে তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় করলুম। মুষ্টিযোগের মত চিকিৎসা আর নেই। তখন তাতেই আনন্দ। মারের মাত্রাটা কিছু বেশী হয়েছিল, তার সারাজীবন মনে থাকা উচিত।

সেই মারই হ'ল কাল। তারপর থেকে পুলিশের উদ্যম গেল বেড়ে। পৃষ্ঠব্রণের মত লেগে রইল সব সময়—আগে থাকত অলক্ষ্যে এখন এল সোজাসুজি পেছনে, অনেকটা জানিয়ে চলার মত—ভারি অস্বস্তিকর। একদিন পেছনে চলা পুলিশের লোকটিকে বিরক্ত হয়ে বললুম "এমন করে চলার বিপদ অনেক।" সে স্বীকার করলে, দেখলুম বড্ড ভীতু—পেটের দায়ে বেচারা চাকরি করতে এসেছে। বলেই ফেলল "ভয়ত করেই—পুলিশের বড় কর্তাকেই জেলের মধ্যে সাবড়ে দিল—আমরা ত চুনো পুঁটি।"

আর একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা। কয়েকজন শুয়ে শুয়ে গল্প করছি, শশীশেখর একটা রিভলভার নিয়ে নাড়া চাড়া করছে। সবাই একটি দিনের অপেক্ষায় দিন গুনছে সেটি হচ্ছে ৺কালীপূজার দিন। সেদিন রিভলভার ছুড়ে টিপ ঠিক করতে হবে। চারদিকে বাজী পুড়বে, পট্‌কা ফুটবে আর নানা রকম শব্দের

মধ্যে আমাদের রিভলভারের গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাবে। আমাদের সকলেরই ধারণা ছিল যে রিভলভারটায় গুলি ভরা নেই। আমি উবু হয়ে শুয়ে তখন কি একটা অঙ্ক কষছি এমন সময় শশী রিভলভারের ঘোড়াটা টিপেছে, একটা কার্তুজ কেমন করে ভেতরে রয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ের খানিকটা মাংস ভেদ করে গুলিটা বেরিয়ে গিয়ে দেওয়ালে লাগল। বেশ খানিকটা রক্ত পড়ল। শশী লজ্জা পেল বটে কিন্তু তার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সরে পড়লুম। শব্দটা খুব জোর হয়েছিল। আর একটু নীচু দিয়ে গেলেই জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যেতুম। সেদিনের ফাঁড়া কাটল কিন্তু শুকনো ফাঁড়ার বদলে চিরদিনের মত আমার পায়ে দাগ হয়ে রইল অসাবধানতার সাক্ষী হয়ে।

অথচ আশ্চর্য এই যে পুলিশ খবরটা ঠিকই পেয়ে গেল তবে কয়েকদিন পরে। তখন আমার পায়ের ঘা শুকিয়ে গেছে আর দেওয়ালের দাগটাও মুছে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল যে আমাদের কাছে রিভলভার আছে। দু'এক জায়গায় খানাতল্লাসীও হ'ল—ফল কিছুই হ'ল না।

মিঃ টুনী মির্জা তখন হুগলির পুলিশ সুপার। তিনি দু'দিন আমাকে ডাকলেন—ধমক দিয়ে বললেন 'তোমার বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে—তোমার চলাফেরা সন্দেহের। যদি এ সম্বন্ধে আর কোন রিপোর্ট পাই তবে তোমাকে হুগলী কলেজ থেকে তাড়াব।" তিনি অবশ্য পদাধিকার বলে কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য ছিলেন। আমি বলে ফেললুম "পুলিশ অনেক সময় কাজ দেখবার জন্যে মিথ্যে রিপোর্ট দেয়।" আর যায় কোথায়—মধুচক্রে লোষ্ট্রপাত—ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন, বললেন "পুলিশের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, লোকের নামে মিথ্যে রিপোর্ট দিতে যাবে। তোমার কলেজে এতগুলো ছেলে রয়েছে কারো নামে

বলে না—তোমার নামেই বা বলে কেন? তোমার সঙ্গে তাদের শত্রুতা আছে?”

আমি চুপ করে গেলুম—বেশী কথা বলার বিপদ অনেক। কিন্তু আমি চুপ করলে কি হয়—মির্জা সাহেব তখন চটে গেছেন, বললেন, “আমাদের লোককে সেদিন চোর বলে ঠেঙ্গিয়েছ—তোমরা তাকে চেন না?” আমি বললুম “কি করে জানব আপনাদের লোক—আমরা মনে করেছিলুম চোর।” এই বলেই নমস্কার করে চলে আসছি, ভদ্রলোক কি মনে করে জানি না হঠাৎ নরম হয়ে গেলেন, বললেন, “ভাল করে মন দিয়ে লেখাপড়া কর—ওসব হুজুগে মেতো না।”

বন্ধু জয়পাল শুনে বললে “দাও ব্যাটাকে শেষ করে।” মির্জা সাহেব খেলা দেখতে রোজ মাঠে আসতেন—একটা চেয়ার পেতে বসতেন। অনেক বুঝিয়ে জয়পালকে নিরস্ত করলুম। বহু আকাঙ্খিত ৺কালীপূজার দিন এসে গেল। আমরা ধরমপুরের বাগানে একটা গাছের ডালে থলে ঝুলিয়ে রিভলভার ছোড়া অভ্যেস করছি লক্ষ্য ঠিক করার জন্যে। পুলিশ কোন সূত্রে জানতে পেরে বাগান ঘেরাও করছে দেখে আমরা সরে পড়লুম। আমি ত একেবারে কলকাতায় পালিয়ে এলুম। কিন্তু মূক নীরব সাক্ষী হয়ে থলেটা গাছে ঝুলতে লাগল—সর্বাঙ্গে গুলির চিহ্ন নিয়ে। তাড়াতাড়িতে সেটা সরান হয় নি। পুলিশ অনুমানে বুঝল কাদের একাজ কিন্তু হাতে নাতে ধরতে পারল না।

আমি ত কলকাতায় এলুম—এখন যাই কোথা? রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি তখন বোধ হয় সাতটা হবে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বললেন “ছোকরা কি ভাবছ? কি কর?” মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—কাজ খুঁজছি। আমার জামা কাপড় ময়লা দেখে ভদ্রলোক ধরে নিলেন যে আমি চাকরের কাজ খুঁজছি। জুটে গেল কাজ তাঁর বাড়ীতে—

তখন যে কোন আশ্রয় আমার কাম্য। মনে আছে তেরদিন চাকরি করেছিলুম। একদিন সন্ধ্যেয় গুড় কিনতে বেরিয়ে একটি দলের ছেলেকে পেয়ে সব খবর পেলুম। পুলিশ কিছুই করে নি। যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—ওদিকে কলেজ কামাই হচ্ছে—। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলুম—মাইনে না নিয়েই। তাঁরা জানলেন না তাঁদের তেরদিনের চাকরের যথার্থ গোপন পরিচয়। এখনও মাঝে মাঝে বাড়ীটার সামনে দিয়ে যাবার সময় মনে মনে হাসি। মানুষের জীবন কত বৈচিত্র্যময়। আত্মগোপনের সহজ উপকরণ হয় দাসত্ব না হয় ছদ্মবেশে পাগলের অভিনয়।

১৯২৭ সনের ৭ই জানুয়ারী ৩৮।২ নং সুকিয়াষ্ট্রীটে থেকে পুলিশ পেয়ে গেল তেরটি বোমা, দু'টি রিভলভার ও কিছু কার্তুজ। পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট ও মিঃ গ্রানফিল্ড সদলবলে এসে দুজনকে ধরে ফেললেন—সর্বশ্রী রবীন্দ্রমোহন কর গুপ্ত ও কালীপদ চক্রবর্তীকে তার সেই সম্পর্কে কম্বুলিটোলা থেকে ধরা পড়লেন বিপিন বিহারী চৌধুরী। হ'ল সুকিয়াষ্ট্রীট বোমার মামলা। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারপতি মিঃ জি. সি. সেঙ্কি, শ্রীমতিলাল রায় ও শ্রীপি. সি. দে—সকলকেই শাস্তি দিলেন।

সরকার এ সময় কারসাজি করে লাগিয়ে দিলেন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। আমাদের জাতীয় জীবনে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমার মত ইতিহাসের পাতায় তা লেখা রইল। খিলাফতের ঠেকো দেওয়া সন্ধি-বন্ধন অসার প্রমাণ হয়ে গেল।

১৯২৭ সনের ২৭শে আগষ্ট বোমার মাল মসলা নিয়ে ১৯১ বাবুডাঙ্গা রোডে ধরা পড়লেন শ্রীগৌরচন্দ্র দাস আর ১৫ নং কলডাঙ্গা লেন থেকে শ্রীসতীশচন্দ্র ঢ্যাং। স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়ে দীর্ঘ-দিনের দণ্ড হয়ে গেল।

দীর্ঘদিন মামলা চলার পর ১৯২৭ সনের ৬ই এপ্রিল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার রায় বের হ'ল। সর্বশ্রীরামপ্রসাদ বিসমিল, রৌশন

সিং, আসফাকউল্লা ও রাজেন্দ্র লাহিড়ীর মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। গোবিন্দ করের বিশ বছর, চারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, চারজন পেলেন মুক্তি আর বাকি ক'জনের হ'ল ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের দণ্ড। কাকোরী রেল ডাকাতি বাদেও এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁরা ১৯২৪ সনের ২৫ শে ডিসেম্বর বামরৌলিতে, ১৯২৫ সনের ৯ই মার্চ বিচপুরিতে ও ১৯২৫ সনের ২৪শে মে দ্বারকাপুরের অর্থ সংগ্রহ এঁদেরই কীর্তি। আসফাকউল্লার কাকোরী মামলায় মৃত্যুদণ্ড ও বিচপুরী মামলায় মৃত্যুদণ্ড হয়। অন্যান্য অভিযোগের দণ্ড থেকেও নিষ্কৃতি পেলেন না তিনি। মৃত্যুদণ্ডাদেশ শোনার পর তাঁর ওজন বেড়েছিল ছ' পাউণ্ড। এঁদের বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চলল। সম্রাটের দরবারে দেশের লোক দয়াভিক্ষা চাইলেন সবই বিফল হ'ল।

১৯২৭ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মৃত্যুউদাসীন শ্রীরাজেন লাহিড়ীর গোণ্ডাজেলে ফাঁসি হয়ে গেল। ১৮ই ডিসেম্বর নির্ভীক রামপ্রসাদ বিসমিল গোরক্ষপুর জেলে ফাঁসি মঞ্চে উঠে চীৎকার করে বললেন "আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন কামনা করি।" ঐ দিনই ফৈজাবাদ জেলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আসফাকুউল্লা গলায় কোরাণ ঝুলিয়ে হাসতে হাসতে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়ালেন। গলায় দড়ি পরান শেষ হ'লে বললেন "আমি ভারতকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলুম—সে প্রচেষ্টা আমার জীবনের সঙ্গে শেষ হবে না।" ইংরেজ কর্মচারী বুঝতে না পেরে জেল কর্তৃপক্ষের মুখের দিকে চাইলেন—জেলার বাবু তর্জমা করে বললেন "I tried to make India free and the attempt will not end with my life." সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট রুমালে চোখ মুছলেন। ২০শে ডিসেম্বর মৃত্যুশঙ্কাহীন রৌশনলাল নৈনি-জেলে গীতা হাতে হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় নিলেন—মুখে বন্দেমাতরম্। দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা রইল

ইতিহাসের সেই করুণ কাহিনী—নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা। কেবলমাত্র চন্দ্রশেখর আজাদ রইলেন পলাতক।

১৯২৮ সনে বিনা বিচারে বন্দী বিপ্লবীদের একে একে মুক্তি দেওয়া হ'ল। মাষ্টার মশাইও মুক্তি পেলেন কিছুদিনের জন্যে। এ সময় ঢাকার শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সীর সহযোগিতায় সর্বশ্রীঅনিল রায়, সত্য গুপ্ত, জ্যোতিষ জোয়াদ্দার, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, রসময় সুর, প্রফুল্ল দত্ত, ললিত বর্মন, প্রমথ চৌধুরী, তেজোময় ঘোষ, শ্রীমতী লীলা নাগ, শ্রীমতী বেনু সেন, শ্রীমতী বীণা রায়, শ্রীমতী শকুন্তলা চৌধুরী প্রমুখ কর্মীগণ "শ্রীসঙ্গ" ও "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর" নাম নিয়ে নতুন ভাবে কাজ আরম্ভ করলেন। শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রই ছিলেন না তাঁর আদর্শ-রাজনৈতিক চিন্তাধার ও সংগঠন প্রতিভা ছিল অদ্ভুত। তিনি সুসাহিত্যিক, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, সুতার্কিক, শিল্পী ও বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, বলিষ্ঠ ভাবপ্রসারতা ও কর্মক্ষমতা ছিল অনবদ্য। ভগিনী শ্রীমতী লীলা নাগ (রায়) ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা ও তাঁর সংগঠন প্রতিভাও সুন্দর। জীবনে বহু নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন। ভারতের বীরাঙ্গনা বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এঁদের দান অতুলনীয়। ১৯৩০ সন থেকে ঢাকা, কুমিল্লা, ত্রিপুরা ও মেদিনীপুরে যে সমস্ত বৈপ্লবিক কার্য সংঘটিত হয় তার অধিকাংশই এঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত। শ্রীমতী লীলা রায় বাংলা নারী পুনর্জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত। দীপালি সংঘ, দীপালি স্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির ও শিক্ষায়তন প্রভৃতির তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বাধীন চিন্তাধারা, নির্ভীক পরিচালনা ও অভ্রান্ত নেতৃত্ব তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীললিত মোহন বর্মণ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অবিসংবাদিত নেতা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। সে যুগের নেতৃস্থানীয় সর্বশ্রীবিধুভূষণ দাস, সুরেশচন্দ্র দেব, রেবতী

বর্মণ, যোগেশচন্দ্র রায়, কামিনী কুমার দত্ত প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে তাঁর জীবনের কর্মারম্ভ। চা বাগান শ্রমিক ধর্মঘটে ললিতবাবুর দান অতুলনীয়। শুধু অসহযোগ আন্দোলনেই নয় চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার শ্রীকিরণচন্দ্র দের আদেশে শ্রমিকদের গুলি করে মারবার পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যখন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের তরফ থেকে রেল ধর্মঘট ঘোষণা করেন তখন ললিতবাবু গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে চাঁদা তুলে ধর্মঘটীদের সাহায্য করতে লাগলেন– ফলে তিনি বার বার কারারুদ্ধ হন। যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে যে আন্দোলন হয় কুমিল্লায় তিনি ছিলেন তার পুরোভাগে। ১৯২২ সনে আশুগঞ্জে কৃষক সম্মেলনে তিনি নিয়েছিলেন সক্রিয় অংশ। তাঁরই নেতৃত্বে বহু যুবক যুবতী বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন।

কুমিল্লায় 'কল্যাণ সংঘ' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৭ সনে ত্রিপুরা জেলা যুব সম্মেলনে, ১৯২৮ সনে কলকাতা কংগ্রেসে, ত্রিপুরার প্রতিনিধি রূপে ও ১৯৩০ সনে লবন আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। বহুবার কারাবরণ ও নির্যাতনের ভেতর দিয়ে তাঁর দেশপ্রেম ও সংগঠন প্রতিভা মূর্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুরধার বুদ্ধি দুর্জয় সাহসের অধিকারী কুমিল্লার এই বিপ্লবী নেতা ১৯৬১ সনের ১৯শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হয়ে গেল তা' অপূরণীয়।

১৯২৮ সনে ইংরেজ সরকার ভারতে পাঠালেন সাইমন কমিশন। ১৯২৮ সনের ৩০শে অক্টোবর লাহোর রেলষ্টেশনে স্যার জন সাইমনকে কৃষ্ণ পতাকা দেখিয়ে বলা হ'ল ফিরে যাও। সে শোভাযাত্রায় ছিলেন লালা লাজপত রায়। পুলিশের অধিকর্তরা নির্দয়ভাবে তাঁর উপর করলেন লাঠি চার্জ—ফলে ১৭ই নভেম্বর তিনি মারা গেলেন। এই পাশবিক অত্যাচারে পাঞ্জাবের যুবশক্তি দাঁড়াল মাথা তুলে।

শ্রীভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক পার্টি' নামে দু'টি দল গড়ে তুলেছিলেন। পরে অবশ্য দু'টি দল এক হয়ে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি নামে অভিহিত হয়। ১৯২৮ সনে দিল্লী সম্মেলনে নির্দ্ধারিত হ'ল দলের কার্যক্রম। এক একজন এক একটি প্রদেশের কর্মভার নিলেন। ফলে সর্বশ্রীভগৎ সিং ও শুকদেব পাঞ্জাবে, চন্দ্রশেখর আজাদ ও শিব বর্মা উত্তর প্রদেশে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেন ও বিহার, উড়িষ্যা ও রাজপুতানার দলের নেতৃত্ব ভিন্ন ভিন্ন কর্মীর উপর ন্যস্ত হয়। শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ সর্ব্বাধিনায়ক ও শ্রীভগবতী চরণ, শ্রীভগৎ সিংয়ের সহকারী মনোনীত হন।

১৯২৮ সনের শেষে কলকাতায় হ'ল কংগ্রেসের অধিবেশন। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। সভাপতি ও গান্ধীজি আনলেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (Dominion status)-এর প্রস্তাব। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর পেছনে তখন বাংলার সমস্ত বিপ্লবী দল। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ কর্মীরা সুভাষবাবুকে জানালেন তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়ালেন বিরুদ্ধে। শ্রীজহরলাল নেহরু অধিবেশনের আগে সুভাষ বাবুকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন কিন্তু ভোটের সময় তিনি সরে পড়লেন, কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না পি·া ও গান্ধীজিব বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস তখন তাঁর ছিল না। গান্ধীজি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন—বুঝলেন যে বাংলা দেশে এমন একজন মানুষ আছেন যিনি তাঁর বিরুদ্ধে অকুণ্ঠ ভাষায় নিজের মত বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করবার ঔদ্ধত্য রাখেন। গান্ধীজির দূরদৃষ্টি ছিল—তাঁর মনে জেগে উঠল অদূর ভবিষ্যতের সংশয় আর অতীতের স্বরাজ্য দল গঠনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কর্ম প্রচেষ্টা। ভোটে সুভাষ বাবু হেরে গেলেন কিন্তু তাঁর নৈতিক জয় অস্পষ্ট রইল না।

ঐ সময়ে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল যাতে করে আজ কংগ্রেসে সোস্যালিজিমের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কংগ্রেসে Subject কমিটীর অধিবেশন দিনে অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কয়েকজন কর্মঠ সহযোগীর সঙ্গে ত্রিশ হাজার শ্রমিক নিয়ে কংগ্রেস মণ্ডপে প্রবেশ করতে চাইলেন এই যুক্তিতে যে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকদের স্থান আছে। সুভাষ বাবু তখন G. O. C. সভাপতির আদেশ ছাড়া তিনি এদের মণ্ডপে ঢুকতে দেবেন না—তিনি একটু ভুল করে বসলেন—শ্রমিকরা যখন কংগ্রেস মণ্ডপে ঢুকতে বদ্ধপরিকর আর ঠেকান যায় না তখন করলেন পুলিশে ফোন। কিন্তু গান্ধীজি ও পণ্ডিত মতিলাল প্রবেশের অনুমতি দেওয়ায় শ্রমিকরা শান্ত হ'ল। ডাঃ কিচলুর আশ্রমের অবাঞ্ছিত ব্যক্তিটিকে নতুন চোখে দেখলেন গান্ধীজি। বুঝলেন সম্ভাবনার গতি কোন্ পথে।

কংগ্রেসের এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাঁদের কাজ চালিয়ে গেলেন। মেজর সত্য গুপ্ত, সর্বশ্রীযতীন দাস, পঞ্চানন চক্রবর্তী, প্রতুল ভট্টাচার্য, জগদীশ চ্যাটার্জী, বিনোদ চক্রবর্তী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, বিজয় বসু, ননী চৌধুরী, সৌরভ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা এই বাহিনীর রক্ষণে ও পরিপোষণে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। এই বাহিনীই পরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি. ভি. নামে পরিচিত হয়ে বিপ্লব চালিয়ে যান মেজর সত্য গুপ্তের পরিচালনায় ও শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। (১)

১৯২৯ সনে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন—এবার এল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব—অন্য কোন উপায় ছিল না। গান্ধীজি বুঝেছিলেন যে তাঁর নেতৃত্ব তখন টলমল করছে। সুভাষবাবু স্পষ্ট ভাষায় বললেন গঠন করতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় সরকার—যেমন করেছিল অয়র্ল্যাণ্ড।

---

(১) সবার অলক্ষ্যে—শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়।

ভারতের বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাজার রকম সুযোগ পেয়েও কোন কাজ করতে পারেন নি তাই নিয়ে তাঁদের দুঃখের আর অনুশোচনার সীমা ছিল না। অনেকের মতে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'বার মূলে দু'জনের ভুল অনেকাংশে দায়ী—একজন তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শী অবিসংবাদিত নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় আর অন্যজন শ্রীমানবেন্দ্র রায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্র রায় ওরফে সি. মার্টিন অল্প বয়েস থেকেই বিপ্লবীদের সাহচর্যে আসেন। প্রথম ধরা পড়েন চিংড়িপোতা রেল ষ্টেশন ডাকাতি মামলায়, মুক্তি পান প্রমাণাভাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে পাঠানো হয় ব্যাটেভিয়ার জার্মানী প্রেরিত অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্যে। যাদুদা' নিজেই স্বীকার করেছেন যে রায়কে তিনিই ব্যাটেভিয়ায় পাঠান।(১) অথচ যাঁকে এ কাজের জন্যে তাঁর পাঠানো উচিত ছিল, কেন তাঁকে পাঠালেন না সে সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে কোন কিছু বলেন নি। তিনি হচ্ছেন শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই ভোলানাথ অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দেশসেবার কাজে নেমে পড়েন। যাদুদা'র ভাষায় "সরল, সহজ, আন্তরিকতার প্রতিমূর্তি চোদ্দ বছরের ছেলে একা চলে গেল পিনাং।(২) ভোলানাথ চাষী মজুরের মধ্যে কাজ করবার জন্যে তাদের মধ্যে তাদের মত হয়ে মিশে পড়েন। কলের মিস্ত্রীর কাজ করবার সময় মাইনে পেতেন চল্লিশ টাকা—নিজের খরচের জন্যে পনের টাকা রেখে বাকিটা দিতেন দলের কাজে।" পিনাং এ গিয়ে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তোলেন বিপ্লবীদের গোপন

(১) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩১৮-১৯
(২) Ibid 390

কর্মকেন্দ্র। শ্যামদেশেও তিনি ও শ্রীননী বসু বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সফল করবার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করেন। (১) অথচ ব্যাটেভিয়ায় পাঠানোর সময় যাদুদা' শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করে পাঠালেন শ্রীমানবেন্দ্রকে। পরে ভোলানাথকে পাঠালেন গোয়ায়।

শ্রীমানবেন্দ্র ব্যাংককের কর্মী আইনজীবী শ্রীকুমুদ মুখার্জীর সঙ্গে করলেন তাঁর স্বভাবগত বিবাদ। এই মতান্তরের মূলে টাকা পয়সার হিসেব। ফলে শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পুলিশকে ষড়যন্ত্রের সমস্ত তথ্য জানিয়ে দিলেন—সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, ধরা পড়লেন অনেকে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনী কিশোর গুহ বলেছেন "এই বিরোধই ১৯১৬ সনের সর্বধ্বংসের কারণ।" (২) জাভা থেকে পূর্ব প্রতিশ্রুতমত কোন খবর না পেয়ে ও ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে জেনে ভোলানাথ গোয়া থেকে সতর্ক করে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন। পুলিশ টেলিগ্রামের সন্ধান পেয়ে খোঁজ করে ধরে ফেলল ভোলানাথ আর তাঁর সহকর্মী শ্রীবিনয় ভূষণ দত্তকে। শোনা যায় পুলিশ পেটে লাথি মেরে ভোলানাথকে মেরে ফেলে— রটিয়ে দেয় যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

যদি ভোলানাথকে ব্যাটেভিয়ায় পাঠানো হ'ত তা হলে হয়ত এ বিপর্যয় হ'ত না—শ্রীকুমুদ মুখার্জীও সে ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিতেন না। শ্রীমানবেন্দ্র কলহপ্রিয় জেনেও যাদুদা' তাঁকেই পাঠালেন। এ ভুলটা না করলে হয়ত ইতিহাস হ'ত অন্য রকম।

শ্রীমানবেন্দ্র রায় চীন হয়ে আমেরিকা পালালেন এবং সেখানে এক ইংরেজ বালিকাকে অপহরণের অভিযোগে ধরা পড়লেন। হাজতবাসকালে সেই বালিকা শ্রীমতী এলভিনকে বিয়ে করে তবে কোনরকমে অব্যাহতি পান। (৩) শ্রীমানবেন্দ্রের বহুকর্মতৎপরতা

(১) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৩৯১
(২) বাংলায় বিপ্লববাদ—শ্রীনলিনী কিশোর গুহ ১৫১
(৩) Ibid 145

সত্ত্বেও বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে অকারণে বা সামান্য কারণে বিবাদ তাঁর পতনের প্রধান কারণ। যাদুদা' বলেছেন "নরেনের মেজাজটি অপরূপ ধাতুর সংমিশ্রণে গড়া। কেমন করে যেন সে বন্ধুজনকে চটিয়ে ফেলত। দু'বার সে মারাত্মক রকমের মিত্রহন্তার কাজ করে বসেছিল।" (১) কলকাতায় থাকার সময় রডা কোম্পানীর অপহৃত মসার পিস্তল নিয়ে তাঁর সঙ্গে শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও অন্য কারণে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের বিবাদ চরমে ওঠে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে ঝগড়ার আসল কারণ তাঁর অর্থলিপ্সা। বিদেশে সর্বশ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখার্জী, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হেরম্ব গুপ্ত, ধীরেন সেন, আবদুল রব পেশোয়ারী, তিরুমল আচারিয়া, সুরেন কর, নৃপেন দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ও বিচ্ছেদ সর্বজনবিদিত।

১৯২৫ সনে চীনে বরোডিনের সঙ্গে ঝগড়া শ্রীরায়ের পতনের কারণ। (২) অথচ এই বরোডিন এক সময় তাঁর মুরুব্বি ছিলেন। ১৯৩০ সনে তিনি কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশানাল থেকে বিতাড়িত হলেন। অর্থ আত্মসাৎ তাঁর বিরুদ্ধে ছিল অন্যতম অভিযোগ। এমন কি জার্মান গভর্ণমেণ্টও তাঁর বিরুদ্ধে এই অর্থলিপ্সারই অভিযোগ আনেন। (৩) বিপ্লবী শ্রীযতীন মিত্রও তাঁকে পত্রযোগে জানান যে তিনি বিদেশে রাজারাজড়ার মত ঐশ্বর্যের ভেতর বাস করছেন অথচ ভারতের বিপ্লবীরা অর্দ্ধাহারে অনাহারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই তাঁর উপর পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও বাংলার বিপ্লবীদের কোন আস্থা নেই। (৪) শ্রীরায় তাঁর টাকার কোন হিসেব দিতে পারেন নি। কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশানাল থেকে বিতাড়িত

---

(১) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৪২৫
(২) Ibid 618
(৩) অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস—ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত ১৭৬
(৪) Communism in India—Gene Overstreet & Marshall Wind Miller 80.

হবার পর তিনি আক্রোশ বশে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস বিকৃত করে প্রকাশ করেন। তার প্রতিবাদে এদেশ থেকে একখানা বই প্রকাশ করা হ'লে তিনি তার কোন উত্তর দিতে পারেন নি। (১)

১৯২৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর লাহোর মোজাং হাউসে গোপন অধিবেশনে স্থির হয় যে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী মিঃ স্কটের মৃত্যু দণ্ড। এ গোপন অধিবেশন ও প্রস্তাবের সংবাদ জানতেন শুধু শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ। কয়েকদিন মিঃ স্কটের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার পর ১৭ই ডিসেম্বর তাঁকে শেষ করবার দিন ধার্য হয়। সর্বশ্রীরাজগুরু, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ আর ভগবতী চরণ সিনিয়র পুলিশ সুপারের অফিসের পাশে D. A. V. কলেজের কাছে সমবেত হলেন। তিনখানা সাইকেল পালাবার জন্যে কলেজের পিছনে মোতেয়ান রইল। বেলা সাড়ে চারটার সময় মিঃ সণ্ডার্স অফিস থেকে বেরিয়ে এসে যখন মোটর বাইকে উঠতে যাচ্ছেন তখন তাঁকেই মিঃ স্কট মনে করে প্রথম শ্রীরাজগুরু গুলি করলেন তাঁর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগৎ সিং এর রিভলভার মৃত্যু মাতাল হুহুংকারে গর্জে উঠল। ধরাশায়ী অচৈতন্য দেহের উপর পর পর ছ'টি গুলি মেরে তিনি চলে আসবার পথে এক-জন সার্জেণ্ট ও মিঃ সণ্ডার্সের দেহরক্ষী শ্রীচন্নন সিং এঁদের ধরবার জন্যে ছুটে এলেন। একজন সার্জেণ্টকে গুলি করলেন, অল্পের জন্যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু দুর্দাম সর্বনাশের আতঙ্কের কম্পনে সার্জেণ্টটি ধরাশায়ী হয়ে একটি হাত ফেললেন ভেঙ্গে। চন্নন সিং তখনও এগিয়ে আসছেন দেখে শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ কলেজ গেটের পাশ থেকে তাঁকে গুলি করলেন পেটে। তারপর এঁরা কলেজের ভেতর দিয়ে ঢুকে পাঁচিল টপকে সাইকেল নিয়ে সরে পড়লেন—। প্রতিহিংসার কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে ঢেলে দিল ক্ষুভিত

(১) Russian Revolution—How M. N. Roy distorts it. —G. N. Chandra.

আলোর বন্যাধারা। কি সুন্দর কর্মতৎপরতা। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও কোন সন্ধান খুঁজে পেল না। ২১শে ডিসেম্বর হাতে লেখা প্রাচীরপত্রে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দেখা গেল, লেখা আছে "আমাদের ধরতে পারলে আমরা পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো—আমাদের রক্তের তৃষ্ণা এখনও মেটে নি।"

পুলিশ তখন একে একে সমস্ত সন্দেহজনক জায়গায় হানা দিয়েও কুল কিনারা কিছু করতে না পেরে নির্দয় ভাবে ৭ই এপ্রিল নিরীহ লোকজনদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল। তখন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী চলছে। আসামী মিঃ স্প্রাট, সর্বশ্রীমুজাফর আহমেদ, সৌকত ওসমানি, ব্রাড্‌লি, শিবনাথ ব্যানার্জী, রাধারমণ মিত্র, কিশোরীলাল ঘোষ প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। আসামী পক্ষ সমর্থন করছেন স্যার তেজ বাহাদূর সপ্রু, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ, ডঃ কিচলু, ডঃ আলম্, নিশীথ সেন, মিঃ নরীম্যান প্রমুখ খ্যাতনামা আইনজীবীরা।

১৯২৯ সনের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর শাসন পরিষদে পড়ল বোমা। তখন স্যার জন সাইমন ঢুকেছেন কুখ্যাত Public Safety Bill পাশ হবে দেখবার জন্যে। শ্রীভগৎ সিং ও শ্রীবটুকেশ্বর দত্ত কাছেই বসেছিলেন। তাঁরা দুজনে মুখ চাওয়া চায়ি করলেন—মনে জেগে উঠল লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ—শিকার হাতের নাগালের মধ্যে। কিন্তু বিপ্লবীর জীবন ও কর্ম কঠোর নিয়ন্ত্রিত। দলপতি আজাদের আদেশ মত তাঁরা প্রতীক্ষা করে রইলেন।

প্রথমে Trade Dispute Bill পাশ হ'ল। তারপর প্রেসিডেন্ট শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল যেইমাত্র Public Safety Bill সম্বন্ধে রুলিং দিতে উঠেছেন শ্রীভগৎ সিং প্রতিবাদ জানালেন একটি বোমা এমন করে ছুড়ে যাতে কারো কোন শারীরিক ক্ষতি না হয়। পাঁচ সেকেণ্ড পরে শ্রীবটুকেশ্বর দত্ত দ্বিতীয় বোমা ফেললেন। দু'জনে কয়েকবার রিভলভার ছুড়লেন—কাউকে মারবার

উদ্দেশ্যে নয়। একজন ছুটে পালাতে গিয়ে সামান্য আহত হলেন। পালাবার যথেষ্ঠ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ধরা পড়বার পূর্ব মুহূর্ত্তে রিভলভার দিলেন ছুড়ে ফেলে। ৬ই জুন দু'জনে দিলেন যুক্ত বিবৃতি। বললেন "আমাদের এ প্রতিবাদ কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। মানুষের প্রতি ভালবাসার আমাদের অন্ত নেই। কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে আমাদের কোন দ্বেষ কোন ঈর্ষা নেই। আমাদের প্রতিবাদ এই আইন পরিষদের বিরুদ্ধে—শুধু এর অকর্মণ্যতার জন্যে নয় দেশের ক্ষতির জন্যে।" বললেন "we have been convinced that it exists only to demonstrate to the world India's humiliation and helplessness and it symbolises the overriding domination of an irresponsible and autocratic rule." শেষে বললেন "Utopian non-violence এর যুগ শেষ হয়েছে।" ছ'দিন পরে দু'জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়ে গেল। তাঁরা হাসিমুখে রায় শুনে চীৎকার করলেন, "ইনক্লাব জিন্দাবাদ—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্"। ভারতবাসীর কণ্ঠে এই সর্বপ্রথম বাণী ধ্বনিত হ'ল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

পুলিশ তখন মিঃ সণ্ডার্সের হত্যাকারীদের সন্ধান চালাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত কর্তারা সব গোপন সন্ধান পেয়ে গেলেন এক অপ্রত্যাশিত কেন্দ্র থেকে। যেখান থেকে বিপ্লবীদের ক্ষতির কোন আশঙ্কাই ছিল না সে রকম কোন বিশিষ্ট নেতার কাছ থেকে এঁদের সন্ধান এসে গেল। তাঁরা লক্ষ্য রাখলেন শ্রীশুকদেবের উপর। ৯ই এপ্রিল এক কারখানা থেকে তাঁকে বের হতে দেখে পুলিশ অনুসরণ করে পেয়ে গেল ভিন্ন ভিন্ন আস্তানার সন্ধান। ১৫ই এপ্রিল ম্যাকলিয়ড রোডের কাশ্মীর বিল্ডিংএর ৬৯ নম্বর ঘর থেকে তল্লাসী করে পাওয়া গেল এগারটি বোমা, চব্বিশটি কার্তুজ ও দু'টি পিস্তল। ঘরখানা মাসিক ১৩৲ টাকায় ভাড়া নিয়েছিলেন শ্রীভগবতী

চরণ। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় তিনি ছিলেন না। শ্রীশুকদেব সমেত তিনজন বন্দী হলেন। সেদিনই বিলাসপুর রেল ষ্টেশনে সাতটি বোমা নিয়ে একজন ধরা পড়লেন। ১৩ই মে সাহারাণপুরে পাঁচটি বোমা, পাঁচটি রিভলভার ও কিছু কার্তুজ পাওয়া গেল—দু'জন ধরা পড়লেন।

এ সময় রোশনাই গেটে একটি বোমা ফাটল। ওরিয়েণ্টেল কলেজের দু'জন নিরীহ প্রাক্তন ছাত্র সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা ধরা পড়লেন। কর্তৃপক্ষ প্রলোভন দেখিয়ে মিঃ সণ্ডার্সের হত্যাকারী-দের গোপন সংবাদ এঁদের দিয়ে সমর্থন করিয়ে নিলেন। আসল সংবাদদাতার পরিচয় পুলিশ প্রকাশ করতে চাইলেন না, কেননা তিনি তখন ভারতীয় জনগণের এক মহান্ নেতা। প্রমাণ করাতে চাইলেন যে শাসন পরিষদে শ্রীভগৎ সিং এর কাছে যে রিভলভার ছিল তার বোর, মিঃ সণ্ডার্সের দেহেপ্রাপ্ত গুলি একই বোরের।

১৯২৯ সনের ১৫ই এপ্রিল লাহোরি গেটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'ল "বধিরদের শোনাবার জন্যে আমাদের চীৎকার" Loud voice to make the deaf hear. সেই প্রাচীরপত্রে লেখা ছিল—"পুলিশের ৭ই এপ্রিল লাহোরে বে-আইনি কাজের জন্যে, সিমলার রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন আর্মির সর্বাধিনায়ক হুকুম জারি করেছেন যে লাহোর থানার দারোগাকে মিঃ সণ্ডার্সের মত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। ২০৩ ও ১৮২ নং সৈন্য যেন এ হুকুম কালক্ষেপ না করে তামিল করেন।" এ প্রচার পত্র দেখে পুলিশ হতভম্ব হয়ে গেল।

একে একে ধরা পড়লেন শ্রীশুকদেব, শ্রীকিশোরীলাল, শ্রীদেশরাজ, শ্রীআগিয়ারাম, শ্রীপ্রেম দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্র পাঁড়ে, শ্রীব্রহ্ম দত্ত, ঠাকুর বৈদ্যনাথ প্রসাদ, শ্রীফণীভূষণ ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাস প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। পুলিশ তখন ষড়যন্ত্র মামলা সাজাবার কাজে ব্যস্ত। লাহোরের এই ষড়যন্ত্র মামলায় শ্রীভগৎ সিং ও

শ্রীরাজগুরুকেও আসামীভুক্ত করা হ'ল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পাকালের আদালতে ৭ই মে প্রথম শুনানী হবার পরদিনই এঁদের সকলকে করা হ'ল দায়রায় সোপর্দ। জেলে বন্দীদের উপর অসহনীয় অত্যাচার ও মানুষের জীবনধারণোপযোগী আহার্য না দেওয়ার বিরুদ্ধে বন্দীরা আরম্ভ করলেন অনশন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল যে ১৯২৮ সনের ১৩ই জানুয়ারী তাঁরা বারাণসীর সি, আই, ডি পুলিশ ইনস্পেকটারকে হত্যার চেষ্টা করেছেন ; অর্থসংগ্রহ করেছেন ২৬শে জুন গোপালপুর জেলার বুরহলগঞ্জ পোষ্টাফিসে ; ৪ঠা ডিসেম্বর চেষ্টা করেছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লুঠের ; হত্যা করেছেন ১৭ই ডিসেম্বর মিঃ সণ্ডার্সকে আর ১৯২৯ সনের ৮ই এপ্রিল শাসন পরিষদে ফেলেছেন বোমা।

ইতিমধ্যে অনশনকারী বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলল। জোর করে খাওয়ানর চেষ্টা বিফল হ'ল। ১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর বোরষ্টাল জেলে শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস অনশনে প্রাণ দিলেন ৬৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে তিল তিল করে সংগ্রাম করে। ট্রিবিউন পত্রিকা লিখলেন "If ever a man died a hero and a martyr to a noble cause, that man is Jatindranath Das and the blood of the martyr has in all ages and countries been the seed of higher and nobler life, better social and political order. মৃতদেহ কলকাতায় আনা হ'ল। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের সে শোক শোভাযাত্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারী শ্রদ্ধায় যোগ দিলেন। মরণের সে কি অপূর্ব রূপ—সে দৃশ্য অতুলনীয়। ভারতের ম্যাক্‌সুইনী চলে গেলেন চিরদিনের জন্যে অমর হয়ে। তার এল আয়র্লাণ্ডের ম্যাক্‌সুইনী-পত্নী মেরির কাছ থেকে Family of Terence Mc. Swiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come. কি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি!

দশ

১৯২৯ সাল—তখন আমি হুগলী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। লেখাপড়ায় ভাল বলে অনেকেই জানেন আর যারা আমাদের বেশী করে চেনে তারা আমাদের দলের ছেলে—মাতৃপূজার যজ্ঞবেদীতে নিবেদিত প্রাণ তরুণের দল। আচারে ব্যবহারে কাজে কর্মে আমরা সকলেরই চোখে পড়েছি। অধ্যাপকেরা ভালই বাসতেন।

মনের দিক থেকে তখন ঘুরে বেড়াই দিগন্তহীন আকাশের উপগ্রহের মত। অন্তহীন দুর্ভাগ্যের অন্ধ অনুবর্তনায় মনের মাঝে পুঞ্জীভূত মেঘের গ্লানি। না পাই কোন বিশেষ কাজের ভার, না পারি নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে। কাজের কোন সুনির্দিষ্ট পথ পাইনে খুঁজে। কিসের যেন অভাব, কি যেন করা হ'ল না—কেমন একটা অস্বস্তি ভাব। আর্থিক দুরবস্থার সঙ্গে মনের দৈন্য—এ দৈন্যের ভারের মত ভার আর নেই। কলেজে যাই আসি, ভাল করে লেখাপড়ায় মোটে মন বসে না। কিছু একটা করতে হবে সব সময়েই মনে হয়—এমনি করেই দিন কাটে। অন্তর নিরলঙ্কার, মন নিরাভরণ।

মাষ্টারমশাই জেল থেকে বেরিয়ে নিলেন চুচুঁড়ায় দেশবন্ধু স্কুলের শিক্ষকের কাজ। "স্বদেশী বাজার" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দলের বন্ধুরা নতুন যোগাযোগের চেষ্টায় রইলেন। কিন্তু সে সময় যতই উৎসাহ নিয়ে কাজ করবার জন্যে এগিয়ে যেতে চাই ততই নিষেধ শুনে পিছিয়ে আসি। হুকুম হয় অপেক্ষা কর—মন দমে যায়।

এর মধ্যে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। পাড়ার বর্ষীয়সীরা কোন পুলিশ কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে কিছুদিন ধরে নালিশ করছিলেন আমাদের কাছে, লোকটার নাকি স্বভাব ভাল নয়। একদিন সন্ধ্যার পর সুযোগ সুবিধে হয়ে গেল। হকি খেলে ফিরছিলুম—

দিলুম মার কয়েকজন মিলে—নির্দয় অবহেলায়। খানিক পরে পাড়ায় গুজব রটে গেল লোকটা মরে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল—তাকে ত প্রাণে মারতে চাইনি। পরের দিন খবর পাওয়া গেল লোকটা মরে নি। আঘাতটা গুরুতর হয়েছে। প্রাণের ভয় নেই—যাক্ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল। ঘটনাটা তুচ্ছ হলেও মনে রইল অনেক দিন। পাড়ার লোকেরা অনুমান করেছিলেন যে এ আমাদেরই কাজ। তাঁদের স্নেহ, সহানুভূতি ও ভালবাসা চিরদিনই পেয়ে এসেছি। তাঁদের অন্ততঃ এটুকু ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে আমরা অন্যায় কিছু করি না।

এ সময় একদিন কলকাতা এলবার্ট হলে বক্তৃতা শুনতে এসেছি। সভা শেষ হ'ল অনেক দেরীতে। সঙ্গীদের সকলেই কলকাতায় থাকবে, আমি একলা চুঁচুড়ায় ফিরে যাব এ কথাই ছিল। হাঁটতে হাঁটতে হাওড়া ষ্টেশনে এসে দেখি শেষ ট্রেন চলে গেছে। কি করি এত রাতে কোথায় যাই? মনে পড়ল একজন পরিচিতের কথা। মামার বাড়ী বা পিসীমার বাড়ী এত রাতে গেলে কৈফিয়তের আর অন্ত থাকবে না। আমিও জানিনা যে এলবার্ট হল থেকে বেরুবার সময় পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে—হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুটির বাসায় গিয়ে দেখি যে সে কলকাতায় নেই। তার দাদা আমায় চিনতেন না--চিনতেন তার বৌদিদি। তিনি শুনে রাতের মত আশ্রয় দিলেন। আমার বন্ধুটিও পুলিশের নজর-লাগা ছেলে—তার দাদা সে খবরও রাখতেন না—তিনি করতেন এক কারখানায় চাকরি—ভোর বেলাতেই বেরিয়ে যেতেন। বৌদি জানতেন মাতৃহীন দেবরের গতিবিধি।

সকাল বেলা আমি হাতমুখ ধুয়ে বেরুব মনে করছি এমন সময় পুলিশের ছু'জন লোক খোঁজ নিতে এল—কে গতরাতে সেখানে এসেছিল। সর্বনাশ! দেখলুম বৌদির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। তাড়া-তাড়ি আমাকে একখানা পাটের কাপড় পরিয়ে বসিয়ে দিলেন

ঠাকুর ঘরে, সামনে কোশাকুশি। ব্রাহ্মণের বাড়ী কাজেই এ জিনিস হাতের কাছেই। সামনে দেবতা, আমি চোখ বুজে বসে গেলুম—মনে মনে ভাবছি যদি ধরে ফেলে কি বলব? দেবতার উদ্দেশ্যে থাকে নৈবেদ্য—আমিও ত আমার দেশ-মাতৃকার উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ নৈবেদ্য, দেবতা কি নিরাসক্ত থাকবেন?

নীচে গিয়ে বৌদি পুলিশের লোকদের বললেন 'কাল রাতে আমার দেওরের এক বন্ধু তার খোঁজ নিতে এসেছিল সে ফিরেছে কিনা। সে ত এখানে নেই, তাই তার বন্ধুটিও একটু পরেই চলে গেল। আমি তার নাম জানি না। তা' ছাড়া এখন বাড়ীতে কেউ নেই। আমার স্বামী গেছেন অফিস, ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট, পূজার ঘর পুরুতমশায়ের ছেলে পূজা করতে এসেছেন।' পুলিশের লোক দু'টি খোঁজ করতে এসেছিল মাত্র, তারা চলে গেল। মনে মনে বুদ্ধির তারিফ করলুম বৌদির। কে বলে আমাদের মেয়েদের বুদ্ধি নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মাষ্টার মশায়ের নির্দেশে শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় 'আত্মশক্তি' কার্যালয় ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম কেন্দ্র। একই বাড়ীতে ছিল ৺দেশবন্ধুর স্বরাজ কার্যালয়। আত্মশক্তি অফিসে তখন অমরদা, উপেনদা, বিপিনদা, সুভাষবাবু প্রভৃতি নেতারা প্রায়ই আসতেন। সন্তোষদা বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় সকলকে নিমন্ত্রন করলেন এক প্রীতিভোজে অক্রূর দত্ত লেনে। সেখানে সকলের কাছে তিনি তার প্রচেষ্টার কথা বললেন। বললেন সকল দলের নেতাদের নিয়ে একটা বিপ্লবী পরিষদ হোক্—তাঁদের নির্দেশে ছেলেরা কাজ করবে। নেতারা মুখে "বেশ ত বেশ ত" বললেন কিন্তু কোন নিশ্চিত কথা দিলেন না। তাপপরেও সন্তোষদা কিছুদিন শ্রীভবেশ চন্দ্র বসু রায়কে সঙ্গে নিয়ে নেতাদের সঙ্গে পৃথক্

পৃথক্ ভাবে দেখা করলেন—কোন ফলই হ'ল না। মাষ্টার মশাই উপদেশ দিলেন "তোমরা তোমাদের দলের কর্মীদের ভিন্ন ভিন্ন দলে কাজ করবার জন্যে পাঠিয়ে দাও। নামের চেয়ে, দলের চেয়ে কাজই বড়।" এ সময় সন্তোষদা কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট ও যুবআন্দোলন সমিতিগুলির মধ্যে থেকে সক্রিয় কর্মীদের নিয়ে গড়ে তুললেন সোস্যালিষ্ট পিপল্‌স লীগ।

দলের কর্মীরা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চলে গেলেন। কাজের মধ্যেই আনন্দ, ঔদাসীন্যে মঙ্গল নেই। তাঁরা কাজ করতে লাগলেন নিজেদের দলের পরিচয় গোপন রেখে। সর্বশ্রীভবেশ চন্দ্র বসু রায়, গজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, পান্নালাল মুখার্জী, নীরোদ বিহারী খাঁ, নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ধীরানন্দ গোস্বামী প্রমুখ কর্মীরা চলে গেলেন ভিন্ন ভিন্ন জেলায়। দল বা উপদল তখন বড় নয়—বড় কাজ। দলগত অহেতুক সাময়িক সংকীর্ণতা ও জড়তার গ্লানি কাজের পথ রোধ করে না। আত্মবিস্মৃত দুর্মদ নির্ভীক কর্মীরা। এই সময় একটা বোমা ফেটে একজন কর্মী গুরুতর আহত হলেন। শ্রীগজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী তাঁকে কলকাতায় আনছিলেন চিকিৎসার জন্যে। আহত কর্মীটি বার বার বলতে লাগলেন 'আমাকে নিয়ে গেলে সকলেই বিপদে পড়বেন তার চেয়ে আমাকে শেষ করে দিন—দলের লোকের বিপদ হবে না'। এই হচ্ছে বিপ্লবী জীবনের আদর্শ। মৃত্যুর জন্যে তপস্যা করে মৃত্যুকে জয় করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো গেল না। আর একজন অক্লান্ত কর্মীকে দেশ হারিয়েছেন তিনি হলেন ২৪ পরগণা জেলার বুড়ুল স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীঅনুরূপ সেন। বাড়ী চট্টগ্রাম। সংগঠনশীল প্রতিভার মানুষ—দক্ষিণেশ্বরের কর্মীগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অক্ষুণ্ণ।

১৯২৯ সনের ১০ই মার্চ বরিশাল টাউনহলে কংগ্রেসের এক সভা থেকে ফেরবার পথে বরিশাল বাণীপীঠ স্কুলের নবম শ্রেণীর

ছাত্র পুলিশ সাবইনেস্পক্টর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়কে ছুরিকাঘাতে মেরে ফেললেন। ২২শে এপ্রিল তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়—আপীলে মহামান্য হাইকোর্ট তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪। যেখানে মানুষের জীবনের সমস্ত আনন্দ কেবলই কাজের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে সেখানেই সে মহৎ। 'দুঃখের উর্ধে তার আসন, মৃত্যুর উর্ধে তার প্রতিষ্ঠা।'

তখন মাষ্টার মশাই দেশবন্ধু স্কুলের হেড্ মাষ্টার। প্রচার কর্মের জন্যে তখন তিনি 'সোস্যালিজিমের ধারা' নামে প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত। আমরা তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুনি। মনে মনে দুঃখ কোন কাজই হচ্ছে না এমন সময় একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এল কাজের ভার। কোনদিন কল্পনাও করিনি যে এত বড় দায়িত্বের কাজ আমাকে করতে দেওয়া হবে। আমার বয়েসের অনুপাতে সে কাজ আমার করার কথা নয়—তবুও মাষ্টারমশাই আমাকেই দিলেন সে কাজের ভার—। মনে আছে সেদিন আনন্দের সীমা ছিল না আমার।

"তোকে যেতে হবে বর্মায়"—বললেন মাষ্টার মশাই। আমি তাকালুম তাঁর মুখের দিকে। দেখলুম সেই বৈদান্তিক তেজস্বী নির্ভীক ত্যাগী বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী নিশ্চল গম্ভীর বৃদ্ধের মুখে নব যৌবনের প্রেরণা—ক্ষণেকের জন্যে স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলুম, তারপর বললুল—কবে? তিনি যদি বলতেন এখনই যেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার মত মন তখন তৈরী ছিল। মাষ্টার মশাই জানতেন আমাকে, বুঝেছিলেন এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়, ভয়ের মুখে এগিয়ে যেতে একবারও থামবে না। সহস্র-শীর্ষ বিপদের করাল কবলের মুখে দাঁড়িয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে দুঃসাধ্য কর্তব্য করে যাবে। বললেন "পরশু সকালে"। আর বললেন "চট্টগ্রাম হয়ে যাবি, তারা সব বন্দোবস্ত করে দেবে।" কয়েক-

দিন আগে চট্টগ্রামে যুবসম্মেলনের সভাপতিত্ব করে সেখান থেকে গ্রেপ্তার হয়ে ফিরেছেন মাষ্টারমশাই। জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি দিবসে চুচুঁড়ায় বক্তৃতা রাজদ্রোহমূলক এই অজুহাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার চলে কিন্তু শেষে মুক্তি পান।

বললেন একে একে সমস্ত কাজের কথা যেটা মুখ্য। আর বললেন লোকের কাছে গৌণ কথাটা বলতে হবে যে আমার দাদা মৌলমীন জেলে আটক আছেন তাঁকে দেখতে যাচ্ছি।

১৩৩৬ সনের ১লা আষাঢ় ইংরাজী ১৯২৯ সনের ১৫ই জুন—হোক্ না ১লা 'অগস্ত্য যাত্রা'—এই দিনটাই সবচেয়ে ভাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে। আমিও ত চলেছি মেঘেরই মত দৌত্য কাজে। বিপদের সঙ্কেত যেখানে নেই, সে কাজে প্রাণ নেই, নেই অবকাশ, নেই আনন্দ, নেই আস্বাদন, নেই পরম জিজ্ঞাসা। মনে ভয় নেই, কাজেই হোক্ না পয়লা। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন "তুই পয়লা নম্বরের ছেলে কিনা তাই পয়লা যাচ্ছিস্।"

ব্রহ্মদেশে তখন আবার নতুন করে জাগরণের প্রস্তুতি চলেছে—আসন্ন ব্রহ্ম বিদ্রোহের কর্ণধারগণ গোপনে প্রস্তুত হচ্ছেন। আমার যাবার আসল উদ্দেশ্য হ'ল সেখানে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর আলোচনা—আর বাইরের লোককে বলবার জন্যে যাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার দাদার সঙ্গে মৌলমীন জেলে দেখা করতে যাচ্ছি। সেখানেও একটু গোপন কথা ছিল যে তাঁর কাছ থেকে যদি কোন বিশেষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যাবার আগের দিন এলুম কলকাতায়—দলের নেতা সন্তোষদা'র সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। আজও মনে পড়ে স্নেহসিক্ত প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ সেই মুখ, তীক্ষ্ণধী, বন্ধুতায় উদ্দীপ্ত কর্তব্যবোধে অটল। ইনিই পরে হিজলী অবরোধ শিবিরে সরকারী সান্ত্রির গুলির

আঘাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। দেখা হ'ল না। দেখা হ'ল সুধাংশুদার সঙ্গে—শ্রীসুধাংশু চৌধুরী—শিল্পী, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র, সম্প্রতি ফিরেছেন বিলেত থেকে ইণ্ডিয়া হাউসে ছবি এঁকে। 'অনারকলি' ছবিতে সুনাম পেয়েছেন শিল্পী হিসেবে। তিনি শুনে উৎসাহ দিলেন, বললেন "কিন্তু দেখিস্ যেন রেঙ্গুনে ধরা পড়িস না—মেরে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেবে—আমার মত অবস্থা হবে।" সুধাংশুদা রেঙ্গুনে ধরা পড়েছিলেন—বিচার হয়েছিল 'গান রানিং চার্জে!' ভয় দেখালে কি হবে? তখন আমার মন চলে গেছে সেই সুদূর সমুদ্র পারে—'তমোঘন অন্তহীন অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।' মনে নেই সংশয়, চরণে নেই ক্লান্তি।

আমি তখন অন্য জগতের মানুষ। রহস্যময় ব্রহ্মদেশের ছবি তখন স্বপ্ন-লোকের মত আমার চিত্ত জুড়ে বসে গেছে। সেখানে আতঙ্কের চেয়ে আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের মৃদু শিহরণই বেশী। প্রাণের ঐশ্বর্যপুরীতে তখন উদ্দীপনার ভাণ্ডার অফুরন্ত, আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নেই। যদি পৃথিবীর বুক থেকে পরিচয়হীন খ্যাতিহীন বিস্মৃতির অন্তরালের পাণ্ডুবর্ণের দিগন্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই কোন ক্ষতি নেই।

চট্টগ্রাম হয়ে বর্মায় যাব—এর আগে কোনদিন বাংলার বাইরে যাই নি, দেশ দেখার সখ ছেলেবয়স থেকে। মাষ্টারমশাই চট্টল যুব সমিতির সম্পাদকের নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেন—তাতে লেখা ছিল "অনভিজ্ঞ সমুদ্রযাত্রীর যাবার সব বন্দোবস্ত যেন করে দেওয়া হয়" শিল্প সমবায় থেকে শ্রীসন্তোষকুমার নন্দী দিয়ে গেলেন কিছু টাকা—যাত্রা পথের পাথেয়।

বেরিয়ে পড়লুম সুদূর সমুদ্রপারের অনির্দিষ্ট পথের সন্ধানে। বাড়ীতে কেউ জানে না। বাবাকে বলে গেলুম—বেড়াতে যাচ্ছি, মিথ্যে কথা বলা হ'ল না কিন্তু প্রতারণা করা হ'ল। হয়ত নিষেধ করতেন না, মনে মনে দুঃখ পেতেন। আমার মেজদা তখন ডাক্তারী পড়তেন তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়ে গেলুম যে বর্মা

—১৪

যাচ্ছি। বন্ধু শশীশেখর আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে আসছিল—আমার পিছনে-চলা পুলিশের লোকটির সঙ্গে তার ঝগড়াও হয়ে গেল একচোট। পুলিশটি বারবার জানতে চায় কোথায় যাচ্ছি? আমি কথা বলি নি। শশী বিরক্ত হয়ে রাগের চোটে বলে ফেল্ল "জাহান্নামে, সুরেন, তুমি যাও ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে—ভারি ভালো জায়গা, খাবে দাবে স্ফুর্তি করবে—টিকটিকিগিরি আর করতে হবে না।" গাড়ী ছাড়বার ঠিক আগে সে শুধু বল্লে "তাহলে চাটগাঁ চল্লেন?" কোন উত্তর দিলুম না।

অচেনা পথের দূরত্ব, অনির্দিষ্ট যাত্রাপথের আশঙ্কা কিছুই মনকে পীড়া দেয় নি। শুধু ভাবছিলুম পারব ত? না শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসব? পিছিয়ে আসা মানে বিপ্লবী জীবনের অবসান, বন্ধু-বান্ধবের ঘৃণা আর করুণায় জীবন হবে অতিষ্ঠ—জীবনের সর্বপ্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য, যৌবনের অপমৃত্যু। না, হার মানতে রাজী নই। একটা অদ্ভুত নেশা যেন মনকে পেয়ে বসেছে—না পারি বাড়ীর কথা ভাবতে, না পারি চিন্তা করতে কেন যাচ্ছি। শুধু মনে হচ্ছে পারব ত? যাঁদের কাছে বিশেষ কাজে যাচ্ছি তাঁদের কোন ক্ষতি করে ফেলব না ত? এত বড় দায়িত্বের কাজ আমায় মাষ্টারমশাই দিলেন কেন? দুরাশামুগ্ধ তরুণ মনে এই কথাটাই বার বার ঘুরতে লাগল যে সে দেশের ভাষা বুঝিনা, আচার ব্যবহার আমার কাছে অজ্ঞাত কেমন করে কি করব! সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে সংগ্রাম ও সংঘাতের মেঘমন্দ্র ধ্বনি জয় পরাজয়ের আবর্তনের মাঝে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বানে বার বার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

গোয়ালন্দ ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে ষ্টীমারে চড়ে বসলুম কারো সঙ্গে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলি নি। যেখানে প্রথম বসেছিলুম সেইখানেই ছিলুম খেতে পর্যন্ত উঠি নি। সন্ধ্যের সময় এলুম চাঁদপুরে। এক ভদ্রলোক ষ্টীমারে ঠিক আমার কাছেই

বসেছিলেন কোন কথা বলেননি শুধু বই পড়ছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন "কিছুই ত খাওনি সারাদিন, এখানে এ, বি, রেলের একটা হোটেল আছে খেয়ে নাও। কোথা যাবে?"

আমি ভদ্রতার খাতিরে বললুম "আপনি খাবেন না?" তিনি বললেন "না পয়সা কম আছে।" এক রকম জোর করেই তাঁকে ধরে নিয়ে গেলুম। রেলের হোটেল, কাজেই আগে টিকিট করে ঢুকতে হয়—চার্জ ছ' আনা। কাঠের পিঁড়ে, পিতলের থালা গ্লাস, গরম ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল। সবই গরম—ষ্টীমারের যাত্রীদের জন্যে সময় বুঝে রান্না করা হয়। অল্প পরেই চীৎকার হয় ট্রেন ছাড়ছে—যাত্রীরা বেশী কিছু না চেয়েই উঠে পড়ে। হোটেলে খেয়ে সে কি বিপদ। সারাদিন খাইনি—সন্ধ্যের সময় ভাত আর ইলিশমাছের ঝোল—ক্ষুধাদগ্ধ পেটে ভালই লেগেছিল কিন্তু সে ঝোল হচ্ছে কাঁচা ইলিশ মাছ লঙ্কাগোলা লাল জলে নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করা। খাবার পরেই পেট জ্বলতে আরম্ভ করল। অত ঝাল খাওয়ার অভ্যেস নেই কোনদিন। দারুণ পেটের যন্ত্রণা, প্রাণ যায় আর কি? ভাবলুম কেন খেতে গেলুম।

সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে গেলুম লাকসাম পর্যন্ত। সেখানে আমাদের কামরায় উঠলেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক। উঠেই আমার সঙ্গীটিকে কুশল প্রশ্নাদি করতে লাগলেন। দু'চারটে প্রশ্নের ছাড়া ছাড়া উত্তর দেবার পর 'এখনি আসছি' বলে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। গাড়ী ছাড়তেও তিনি এলেন না দেখে আমি বাইরের দিকে তাকাচ্ছি। মুসলমান ভদ্রলোক বললেন "ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি—অন্য কোথাও খাবার জুটেছে বোধ হয়।" আমি ঠিক মানেটা ধরতে পারিনি মনে করে ভদ্রলোক বললেন 'পুলিশের লোক কারু পিছু নিয়েছে বোধ হয়।" শুনেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠল কিছু বলিনি ত? তার চেয়েও বেশী দুঃখ হ'ল তাকে নিজের পয়সায় খাইয়েছি বলে। মন অনুশোচনায় ভরে

গেল। আমার অপচয়ের খাতায় সেই ছ' আনা আজও লেখা আছে। মুসলমান ভদ্রলোকটি স্কুল-সাব-ইনস্পেক্টর। বেশ হাসিখুশী লোক, অনেক গল্প করলেন। আমি তাঁর মূক ধৈর্যবান শ্রোতা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম খেয়াল নেই। সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখি চারদিকে পাহাড়—এর আগে কোনদিন পাহাড় দেখি নি—পাহাড় দেখে খুব আনন্দ হ'ল।

চট্টগ্রাম পৌঁছুলুম। ষ্টেশনের বাইরে এসে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম কংগ্রেস অফিসটা কোন্ দিকে? তিনি চট্টগ্রামের নিজস্ব ভাষায় উত্তর দিলেন আমার কিছুই বোধগম্য হ'ল না। কি হ'ল? আমার আশে পাশের লোকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলে চলেছে আমি তার কিছুই বুঝি না। মুস্কিল হ'ল। সময়মত বুদ্ধিটা এসে গেল, একজনকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলুম 'দয়া করে বলবেন কংগ্রেস অফিসটা কোন্ দিকে? ভদ্রলোক হেসে ফেললেন —পরিস্কার বাংলায় বললেন 'সামনের দিকে এগিয়ে যান দেখবেন একটু আগেই পুকুর। বাঁ ধারে কংগ্রেস অফিস।' পরিস্কার বাংলা শুনে বললুম 'কিছু মনে করবেন না—একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলুম বাংলায়, তিনি কি বললেন বুঝতে পারলুম না, তাই আপনাকে ইংরেজীতে বলছি।" ভদ্রলোক হেসে চলে গেলেন।

কংগ্রেস অফিসে পৌঁছে দেখি তিন চারজন বসে আছেন। আমি একজনকে বললুম 'যুব সমিতির সম্পাদক কে?' যিনি বললেন 'আমি' তাঁকে আমি অনুমানে চিনতে পারলেও তিনি আমাকে চিনতে পারেন নি। মাষ্টার মশায়ের লেখা চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললুম "আমি হরিদার ভাই গঙ্গা।" সঙ্গে সঙ্গে তিন চারজনই লাফিয়ে উঠলেন। সম্পাদক গণেশদা, শ্রীগণেশ ঘোষ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন অন্তরঙ্গতার পাকা দাবী নিয়ে— করলেন পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সর্বশ্রীঅনন্ত সিং, লোকনাথ বল ও অম্বিকা চক্রবর্তী এঁরা আ

কিছুদিন আগে জেল থেকে বেরিয়েছেন আর এঁরাই কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের নায়ক—আমার দাদার পুরাতন বন্ধু। আমাকে পেয়ে তাঁদের খুব আনন্দ—আমারও মন উৎসাহে ভরে গেল।

গণেশদা আমাকে তাঁর সদরঘাট রোডের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাঁর মা আমাকে দেখে বল্লেন "বান্দু এ ছেলেটি কে?" গণেশদা বললেন 'মা হরিদার ভাই গঙ্গা—বর্মা যাবে।' বুঝলুম আমার দাদার সঙ্গে এঁদের বাড়ীর অনেকদিনের যোগাযোগ।

মা খুব আদর করলেন 'এতটুকু ছেলে কেমন করে বর্মা যাবে?' 'বর্মা কেন মা, যে কোন মুলুকে ওকে যেতে বল না ও চলে যাবে —কার ভাই দেখতে হবে?' বললেন—গণেশদা।

খাওয়া দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লুম সহর দেখতে আমি আর একটি ছেলে নাম হিমাংশু—ডাক নাম আন্দু। দু'জনে দুটো সাইকেল নিয়ে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সহর দেখলুম। ছবির মত সহর চট্টগ্রাম। আন্দু আজ আর ইহজগতে নেই। অস্ত্রাগার আক্রমণের সময় পেট্রোল ঢেলে আগুন দিতে গিয়ে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যায়। তার উপর যখন তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয় তখন সে বলে "আমার এ জ্বালা কিছুই নয়, পরাধীনতার জ্বালা তোমরা বুঝবে না। দুঃসহ তার দাহ। পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দ আমাকে দেখিও না। যেটুকু বলা দরকার আমি সেটুকুই বলব।' আন্দুর কচি কচি মুখটা এখনও মনে পড়ে অথচ মাত্র একদিনের পরিচয়। নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের মত সে মিলিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মল রিক্ততার গভীরতর ঐশ্বর্যে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে যখন ফিরে এলুম গণেশদার কাপড়ের দোকানে, তখন খবর পেলুম পুলিশ আমার খোঁজ করছে। সমস্ত আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। মনে হ'ল

কেন খোঁজ করবে? আমার প্রাণে তখন উচ্ছ্বাসের প্রবৃত্তি। মনে হ'ল হয়ত এমনই খোঁজ করছে, পুলিশ ত সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে তবে এত খোঁজারই বা প্রয়োজন কিসের? বললুম 'যেমন করে হোক্ আমাকে কাল সকালের জাহাজ ধরতেই হবে।' ওঁরা বললেন তাই হবে। পরের দিন সকালবেলা আন্দু টিকিট কিনে এনে বললে 'জাহাজ ঘাটে পুলিশের কড়া পাহারা।'

"ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে হবে—তবেই বুঝব হরিদার ভাই"—বললেন অনন্তদা। বললুম 'আমি ত পথের দাবীর সব্য-সাচী নই—আপনারা ব্যবস্থা করে দিন।" ব্যবস্থা হ'ল চমৎকার—আমার নাম গেল বদলে, ছিলুম গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, হলুম হরেন্দ্র নাথ সেন; আমার দাদা নিবারণ চন্দ্র সেন রেঙ্গুনে ই. এম. ডি. সুজা অফিসে কাজ করেন, তাঁর কাছে চলেছি।

নাম ত বদলাল, নবপরিচয়ের অন্তরালে চেহারা বা মনটা ত বদলাল না। এখন জাহাজে উঠব কেমন করে? ওঠবার মুখেই ত পুলিশের কড়া পাহারা। তার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। একটা সাম্পান অর্থাৎ নৌকোয় চড়ে জাহাজের অপর পাশে এসে থামলুম—সুবিধে হ'ল না। জাহাজ ছাড়ার সময় যত এগিয়ে আসে মনের মধ্যে দুঃসাহসের শিখা ম্লান হয়ে আসে। চাইলুম গণেশদার মুখের দিকে বড় করুণ দৃষ্টি। বললেন কিছু ভয় নেই। রেঙ্গুন ইনঞ্জি-নিয়ারিং কলেজের ছাত্র এঁদের একজন কর্মী যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দিলেন। আমি একটা পায়জামা ও মুসলমানের টুপি মাথায় দিয়ে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে চট করে সামনের পথ দিয়েই চলে গেলুম। তিনি থাকতেন কামায়ুটে। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই—আমাদেরও ছদ্মবেশের ও ছদ্মনামের অভাব ছিল না।

এ সমস্ত ব্যবস্থা এঁরাই করে দিলেন—আমাকে তার জন্যে কোন চেষ্টাই করতে হয় নি। পুলিশের লোকের চোখে ধুলো

দিয়ে জাহাজে উঠে সে যে কি আনন্দ তা' আর বলা যায় না। স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেললুম। সঙ্গীটি বললেন 'শুয়ে পড়ুন চাদর ঢাকা দিয়ে।' ভয় ছিল হয়ত জাহাজ ছাড়বার আগে খানাতল্লাসী হবে। তখন ধরা পড়লে সব পণ্ড হয়ে যাবে। আর যদি কোন রকমে রেঙ্গুনে পৌঁছুতে পারি ত নিরাপদ। শুয়ে পড়লুম চাদর মুড়ি দিয়ে। জাহাজ ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। আস্তে আস্তে বি. আই. এস. এন কোম্পানীর "চাকদারা" জাহাজ এগিয়ে চলল নিঃশব্দে বঙ্গোপসাগরের দিকে কর্ণফুলির মায়া কাটিয়ে। আমি উঠে চার-দিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম—কি সুন্দর সহর এই চট্টল! মধুর আনন্দে নির্মল কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

বেশ মনে পড়ে আকাশ তখন পরিস্কার সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। কেন জানি না হঠাৎ মনে এল গায়ত্রীর ব্যাহৃতি অংশ টুকু "ওঁ ভুর্ভবঃ স্বঃ।" ব্যাহৃতি মানে চারদিক থেকে জোগাড় করে আনা। সমস্ত উদার বিরাট বিশ্বজগৎকে মনের মাঝে এনে মনে করতে হয় আমিও বিশ্বভুবনের লোক—কোন বিশেষ দেশের লোক নই—নিখিল জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। একটা অদ্ভুত অনুভূতি—মনে হ'ল আমার চারপাশ থেকে সব যেন সরে গেছে আমি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছি। বাইরের সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখছি যেন পৌঁছে গেছি প্রশান্ত প্রসন্ন মাধুর্যের সৌরভ সম্পদভরা কোন্ নবযুগের প্রভাতে অন্তরের উদয়াচলের স্বর্ণ শিখরে। ভুলে গেছি নিজের সত্তা আনন্দিত উদাসীন্যে। জীবনে এই প্রথম অনুভব করলুম জ্যোতিরুন্মেষের একটা অদ্ভুত জিনিস যা পর্যাপ্তির ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না—। একটা অকারণ আনন্দ, একটি অনির্বচনীয়ের সংস্পর্শ—একটি আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—একটি বাঞ্ছিতের আহ্বানে মাধুর্যের প্লাবনে অন্তরের সব ফাঁকগুলো যেন ভরে গেছে—। তাও খুব সামান্য সময়ের জন্যে। মনে হ'ল এইটেই হয়ত বিশ্বমানবের

দিকে নিজেকে উদ্ঘাটিত করে দেবার একটা দুর্বার প্রয়াস। সমস্ত মানুষকে জানার ভেতর দিয়েই ত নিজেকে সত্যি করে জানা যায়। এই মন্ত্রে বাইরের সঙ্গে অন্তরের, অন্তরের সঙ্গে অন্তরতমের যোগ-সাধন—মানবমাহাত্ম্যের জ্যোতির্ময় কল্যাণ সূর্যের অভ্যুদয়। সেই বন্ধনহীন আবর্তের অদ্ভুত আনন্দধারায় আমার মন তখন নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত ঊর্ধ্বগামী—অনুতরঙ্গ মহাসমুদ্রের মত দশদিগন্তব্যাপী।

সঙ্গীটি পাশে এসে দাঁড়ালেন—বললেন "কি ভয় করছে?" বললুম "আমাকে দেখে কি তাই আপনার মনে হ'ল? আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র সংশয়ের ছায়া নেই। ভয়ের জন্ম ত আত্মসংশয়ের মাঝে। আজ আত্ম-বিস্মৃত আনন্দে আনন্দময় হয়ে আমার মন ভরে গেছে।"

ভদ্রলোক কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। লজ্জাপেয়ে তাকালেন অনেকক্ষণ মুখের দিকে। কি জানি হয়ত ভাবছিলেন যাদের সংসারের তাড়না নেই, প্রয়োজনের বাধ্যতা নেই, সে রকম ব্রাত্য মন্ত্রহীন পবিত্র নাস্তিকের জাত মারা গেল কেমন করে? অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "দেখছি সত্যিই একটা শান্ত সহজ নিরাসক্তির স্পষ্ট আভাস—না আছে প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা—না আছে বিড়ম্বিত জীবনের প্রমত্ততা।"

হেসে বললুম "আমাদের সাধনা রীতিবন্ধনের বাইরের নিষ্ঠুরের সাধনা—সংকল্প অবিচলিত—উৎসর্জন স্বতঃপ্রবৃত্ত।" জাহাজটা সমুদ্রে পড়বার আগে একবার কেঁপে উঠল।

আমারও যাত্রা হ'ল সুরু।

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আকিয়াব সহরের তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। আমরা যাদের মগ বলি সেই লোকই বেশী। তবে বন্দর বলে বাণিজ্য কেন্দ্র এক রকম গড়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ লোকই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সাধারণ সহর।

আরও দু'দিন পরে ইরাবতী নদীর মাঝখানে এসে জাহাজ দাঁড়াল, আমারও বিপদের মাঝদরিয়ায়—এবার খানাতল্লাসীর পালা। মদ গাঁজা আফিং কোকেন এ সবের চোরাই চালান বন্ধ করবার জন্যে এর ব্যবস্থা। তবুও চীনারা কেমন করে জুতোর ভেতর সুটকেশের চামড়ার ভেতর দিয়ে চালান দেয় ধরা শক্ত। চীনাদের গতিবিধি অদ্ভুত। জাহাজের এমন সব জায়গায় জিনিস লুকিয়ে রাখে যে কার সাধ্য তা' ধরে।

ছোট ছোট ষ্টীমলঞ্চে এলেন পুলিশের লোক। আরম্ভ হ'ল মালপত্র খানাতল্লাসী বেশী করে চীনাদের আর মগদের। পথ-হারানো বিশ্বাভিমুখী মন তখন অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবন ত আমাদের অভিধানে নেই। এক পুলিশ অফিসার বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন —শেষে জিজ্ঞাসা করলেন নাম। উত্তর দিলুম—হরেন সেন। মনে পড়ল সুধাংশুদার কথা তিনি বলেছিলেন যেন রেঙ্গুনে ধরা না পড়ি —পড়লে মেরে পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেবে। ভাবলুম কেনই বা ধরবে? বাড়ী থেকে বের হয়ে অবধি এমন কিছুই করিনি যাতে আমাকে ধরতে পারে। তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি তা বিপদ-সঙ্কুল। নিষ্কলঙ্ক আদর্শের দুরূহ সাধনায় হ'ল সিদ্ধিলাভ।

ছেলেমানুষ দেখে হয়ত তাঁর বিশ্বাস হ'ল না যে তিনি যাকে খুঁজছেন সে আমি। আমার চেহারা আমাকে বিপদের হাত থেকে অনেকবার বাঁচিয়ে দিয়েছে। অনেকের ধারণা হয়েছে এতটুকু ছোট্টছেলের এত সাহস হবে না। বয়েস বেশী হলেও দেখতে ছিলুম ছেলেমানুষ। মিল্টনের কবিতায় পড়েছিলুম

Perhaps my semblence
Might deceive the truth that I too manhood
Am arived so near .. ...

আমারও তাই। পুলিশের লোকটির হয়ত ধারণা ছিল যে আমি লম্বা চওড়া মানুষ। চোখে পড়ে গেল কি একটা কাগজ তাঁর হাতে—আমার নাম লেখা রয়েছে—বুঝলুম খোঁজ চলছে। চুপ-চাপ বসে আছি পরম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। চাটগাঁয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসা লোকটি যে আমি তা' তিনি সন্দেহই করতে পারলেন না। তখন আমার ভাবটা এমন নির্বিকার যে এই যাত্রাপথে আমার কোন দায়িত্ব নেই—নেই কোন বাধ্যবাধকতা। বহুবার পরিচিত পথের আমি যেন পুরানো পথিক। পুলিশের কর্তা অনেকক্ষণ ধরে খুঁজেও কোন কিনারা করতে পারলেন না। তাঁদের শেষপর্যন্ত ধারণা হ'ল যে গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র বলে জাহাজে কোন যাত্রী নেই। তাঁরা ষ্টীমলঞ্চে ফিরে গেলেন। জাহাজ ছাড়ল —পৌছুলুম রেঙ্গুন। মনে পড়ল ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট্ বাহাদুর শাহের দেহাবশেষ এখানেই সমাহিত করা হয়েছে— মনে মনে প্রণাম জানাই তাঁর উদ্দেশ্যে।

আমরা ডেকের যাত্রী মাত্র ছ'টাকা ভাড়ায় এসেছি। শরৎ চন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে মেলে—ঢুকতে হ'ল কোয়ারেণ্টাইনে— পরীক্ষা হবে শরীরের স্থান বিশেষ টিপে। সহযাত্রী বন্ধুটির পরামর্শে একটি টাকা বের করে রেখেছিলুম পকেটে। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেছি পরীক্ষা হচ্ছে আর নাম লেখান হচ্ছে। যাদের হয়ে যাচ্ছে তাদেরও ভীড় একপাশে, সঙ্গীটির পর আমার পালা। প্রশ্ন হ'ল কি নাম ? পরম-নিশ্চিন্তে বললুম হরেন সেন। যিনি লিখছিলেন তিনি লিখলেন হোরেন সেন। বাড়ী ? চট্টগ্রাম সদর ঘাট। সরে দাঁড়ালুম।

হঠাৎ সাপ দেখলে লোকে যেমন চমকে ওঠে তেমনি চমকে উঠলুম পাশের সাহেবী পোষাক পরা একটি লোককে দেখে।

আমার বিশেষ পরিচিত মুখ—পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার শ্রীভট্টাচার্য অতি সুন্দর সুপুরুষ চেহারা—হাজার লোকের মধ্যে তাঁকেই প্রথমে চোখে পড়বে। আমাদের বাড়ী খানাতল্লাসীর সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি। মনে আছে আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। মানুষ যে এত সুন্দর হতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। তিনি বলেছিলেন "ছোক্‌রা কি দেখছ?" ছেলে বয়েসে ভারি দুর্মুখ ছিলুম—এর জন্যে বড়দের কাছে অনেকবার বকুনি খেতে হয়েছে তবু তাঁরা আমাকে কোনরকমে শোধরাতে পারেন নি—ওটা ছিল আমার স্বভাবের মধ্যে মজ্জাগত। উত্তরে বলেছিলুম "দেখছি আপনাকে আর ভাবছি ভগবানের শক্তির অপব্যয়। আপনাকে তিনি রূপ দিয়েছেন কিন্তু গুণ দেন নি। অমন অপরূপ সুন্দর দেহের মধ্যে অত নীচু ছোট মন কেমন করে বাসা বেঁধে আছে তাই মনে মনে ভাবছি। গোলাপেও পোকা থাকে—মানুষের বাইরেটাই সব নয়।" মনে আছে সেদিন তিনি খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন। রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। একটা ছোটছেলে তাঁকে এ ভাবে অপমান করতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি হয়ত। তখন দুর্জয় জেদ ছিল মজ্জায়।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়লুম ভীড়ের মধ্যে। সঙ্গীটির পরামর্শ মত দু'জনে একধারে একটি কনেষ্টবলের হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে এলুম কোয়ারেণ্টাইন থেকে। হিন্দুস্থানী কনেষ্টবল দুনিয়ায় বোধ হয় ঐ জিনিসটাই চেনে। রেঙ্গুন রেল-ষ্টেশন সহরের মাঝখানে। ট্রেন ধরে চলে এলুম সঙ্গীটির বাসা কামায়ুটে। তখনও মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী টলছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিয়ে সন্ধ্যের দিকে ফিরে এলুম রেঙ্গুনে। দাদার বন্ধু শ্রীরাজেন দাস তখন সেখানে টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন। উঠলুম তাঁর ওখানে। তিনি সকাল বেলা

জাহাজঘাটে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দেখতে পান নি। তিনি মনে করেছিলেন যে আমি কেবিনে আসছি। সবে মাত্র এসে দাঁড়িয়েছি দেখি পিছন দিক থেকে পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীভট্টাচার্য উঠছেন সিঁড়ি দিয়ে। সর্বনাশ! তাঁকে দেখতে পেয়েই রাজেনদা আমাকে অন্য সিঁড়ি দিয়ে অন্যধারে নামিয়ে দিয়ে বললেন ৪৯নং ষ্ট্রীট ১৭ নং বাড়ী ৫নং ঘর।

গেলুম সেখানে। সে ঘরের বাসিন্দারা সব চট্টগ্রামের লোক। তাঁরা যেন আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন—বুঝলুম চট্টগ্রাম থেকেই এ ব্যবস্থা হয়েছে। যেতেই একজন বল্লেন "আপনি গঙ্গা-বাবু ত? চলে আসুন আমার সঙ্গে।" শোয়েদাগন প্যাগোডার কাছে কোথায় নিয়ে গেলেন জানি না। শ্রীভট্টাচার্য সকাল বেলা আমাকে বোধ হয় ঠিক চিনতে পারেন নি। পরে হয়ত যখন খেয়াল হয়েছে তখন ঠিক করেছেন যে রেঙ্গুনে আমি একমাত্র আমার দাদার বন্ধুর কাছেই উঠতে পারি—তাই খোঁজ নিতে এসেছিলেন। সন্ধ্যের সময় রাজেনদা এলেন. বল্লেন 'ভটাচার্য তোর খোঁজ করছিলেন, মনে হয় ধরবে না, গতিবিধি শুধু নজর করে যাবে।' বললুম 'চাটগাঁয়েও পুলিশ খোঁজ নিয়েছিল।' তিনি বল্লেন 'বোধ হয় লক্ষ্য রাখতে চায়। হোক্ তবু সাবধানের মার নেই।' রাজেনদা এতক্ষণে শুনলেন আমার আসার আসল উদ্দেশ্য।

আমাকে সে রাতেই নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—সুন্দর লোক তাঁরা নিরভিমান। পরিচয় পেয়ে খুসী হলেন। অবশ্য বেশী কথা রাজেনদাই বললেন বর্মী ভাষায়। এ রকম স্বদেশপ্রাণ কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে খুবই আনন্দ হ'ল। আজ তাঁদের অনেকেই ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিয়েছেন —কয়েকজনের মাথা কেটে সভ্য ইংরেজ টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছিল। তাঁদের মধ্যে সেয়াসান ও অংহ্লা সবচেয়ে কাজের

কথা বললেন। সেয়াসান, বাংলায় অনেকে তাঁকে ছায়া সেন বলত, ছিলেন ব্রহ্ম বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। বাইরে নিরভিমান সহজ শান্ত মানুষটি, অন্তরে বিস্ফোরন্মুখ বারুদের স্তূপ—শক্তির বিপুল অগ্নিকুণ্ড। মনে পড়ে সেদিন জীবনকে ধন্য মনে করেছিলুম। দেখেছিলুম মনের মানুষকে অন্তরতম আনন্দে। তারই স্মৃতিতে বার বার আজ মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের কথা :—

"মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হইনি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃত বাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।
জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞ মনে।"

কবির ভাষায় আমার জীবন সরোবরের গভীর অগোচরে স্বল্প অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত দরজায় ঠেকেছে মন, কখন গেছি পাশ কাটিয়ে কখন গেছি থেমে অকারণে। সেদিন মনে হ'ল কোন চরমের সংস্পর্শে এসে পৌঁছুলুম।

রাজেনদা আমাকে রাতের জন্যে রেখে এলেন একজন ইঙ্গবর্মী মেম সাহেবের বাড়ী। নামটা ঠিক মনে নেই, বোধহয় পামেলা। অনুমান করলুম রাজেনদার কোন সহকর্মীর স্ত্রী। অপ্রত্যাশিত অপ্রার্থিত আতিথ্য গেল জুটে ভাগ্যের জোরে—। মহিলাটি স্বল্পভাষিণী কিন্তু সব সময় মুখে স্নিগ্ধ অতিথিবৎসল হাসি। কাজ করেন যন্ত্রচালিতের মত। এমন ব্যবহার করলেন যেন আমি কতকালের পরিচিত তাঁর ছোট ভাইটি। খেতে দিলেন পরমাত্মীয়ের মত। ইংরেজীতেই কথা বলেছিলেন, বাজে কথা বলবার লোক তিনি নন। ভূমিকা না করেই বললেন "মৌলমীন যাবার দু'টো ট্রেন, একটা ছাড়ে ভোরে—সন্ধ্যেয় পৌঁছয় মার্তাবান সেখান থেকে ষ্টীমারে রাত দশটায় মৌলমীন; আর একটা ছাড়ে সন্ধ্যেবেলা, ভোরে মার্তাবান, সকাল দশটায় মৌলমীন। কোন্‌টায় যাবে?" আমি কিছু বলবার আগেই বললেন "পুলিশ

যখন এত খোঁজ করছে ভোরের ট্রেনেই যাও, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। শুয়ে পড় আমি তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসব।” এমন নির্ভয়ে কথা বলতে খুব কম মেয়েকেই দেখেছি। কত আর বয়েস হবে? আমার চেয়ে বড় জোর ছ’সাত বছরের বড়। এমন ভাবে কথা বললেন যে না বলার অবকাশ নেই। শুধু মনে হ’ল এরকম মেয়ে বাংলা দেশে পেলে আমাদের কাজের কত সুবিধে হ’ত। শুয়ে পড়লুম, ঘুমে তখন চোখ জড়িয়ে আসছে।

ভোরবেলা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। টিকিট কিনে ট্রেনে চাপিয়ে দিলেন শুধু বললেন “মেয়েছেলে জায়গা চাইলে ছেড়ে দেবে।” কথাগুলো বললেন উত্তরের অপেক্ষা না করেই। এমন নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য করে গেলেন যে বড্ড ভালো লাগলো। তাঁকে দেখলে মনে হয় তাঁর কাছে জীবনের চেয়ে অন্তরের দাম বেশী। তাঁর নিঃশব্দ প্রকৃতি যেন সকলকে ধরে মুখ বুজিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। যেন কারো কাছে কোন উপদেশের প্রয়োজন নেই। গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন—গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না—কর্মশালার অনির্বান স্ফুলিঙ্গ। ট্রেনের যাত্রীরা অধিকাংশই বর্মী, চুপচাপ চলেছে। আমার দেশের লোকের মত গায়ে পড়ে নাম, ধাম, চাকরি, উপরি, হাঁড়ির খবর নেয় না। তারা বড় উদাসীন বড় আগ্রহহীন। মেয়েরা বরং দু’চারটে কথা বলে নিজেদের মধ্যে তাও সংযত ও পরিমিত।

আমার বয়েসের অনুপাতে আমি দেখতে ছেলেমানুষ—এক-দিক দিয়ে খুব সুবিধে। মনের দিক থেকেও আমার আনন্দের পরি-পূর্ণ তৃপ্তি—অবসাদের চিরনির্বাসন—কোন ক্লান্তি নেই, নেই পথ ফুরোবার ঔৎসুক্য। বাড়ী ছেড়ে এসেছি, সঙ্গে আছে অনবদ্য কর্ম-স্পৃহা আর আমার রাষ্ট্রগুরুর সর্বদেহব্যাপী কল্যাণময় অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

ট্রেন চলেছে। দু’ধারে কি অপূর্ব শোভা। দু’দিকেই পাহাড়

মাঝে মাঝে দু'চারটি কলনাদিনী ঝর্ণা, দু'একটি শ্বেত পাথরের বিরাট বুদ্ধমূর্তি, দু'একটা প্যাগোডা—কাঠের মন্দির, মাথাটা সোনার পাত দিয়ে মোড়া—সূর্যাস্ত দীপ্ত সৌম্য গম্ভীর দিনাবসনানের স্নিগ্ধ আলোকের মত। শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ—কোলাহলমুখর জীবন যেন এখানে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। শুধু আছে শালমহুয়ার দিগন্ত-ব্যাপ্ত শ্যামল অপর্যাপ্ত আত্মপ্রকাশের গন্ধ—নানা রংএর পুষ্প পল্লবের সলজ্জ নিত্যনিবিড় আবেদন, কলকণ্ঠী ঝর্ণার নিস্বন—বনচ্ছায়াঘন আলোর সমীরণ। পাহাড়ের ওপর বনপত্র পল্লবের মর্মে মর্মে বসন্তের হাওয়া—সজল স্তব্ধব্যাকুল আসন্ন বর্ষণের ছায়া। প্রকৃতির সুন্দরের নিত্য ভাণ্ডারের যেন সাজিয়ে রাখা জিনিস। প্রকৃতির এমন সুন্দর দৃশ্য আর কোনদিন চোখে পড়ে নি। মনে হ'ল যেন চলেছি কল্পান্ত কালের যাত্রায় মহাকাল আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন কিন্তু আমি ত মন্ত্রবর্জিত পংক্তিহারা—দেবালয়ের পবিত্র মন্দির দ্বারে পৌঁছুবার আমার অধিকার নেই।

সন্ধ্যের সময় এলুম মার্তাবান। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ছোট্ট ষ্টেশনটি, একদিকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে রেল লাইন, অপর পাশে প্লাটফর্ম আর তার গায়েই সমুদ্র—ষ্টিমার দাঁড়িয়ে আছে যাত্রী নেবে বলে। ভাবছি অজানা অচেনা জায়গায় রাত্রে গিয়ে লাভ কি? ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমেই থাকব। কিন্তু থাকতে দেবে কি? কি করব ভাবছি এমন সময় এক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। চেহারাখানি পোড়া কাঠের মত নীরস ও কুৎসিত, সারা মুখে বসন্তের গভীর দাগ। দেখেই মনে পড়ল অভয়ার স্বামীর কথা—"বর্মার কোন দুর্ভেদ্য জঙ্গল হইতে বন্য মহিষটা উঠিয়া আসিল।" আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মিঃ চন্দ্র? কাল্পনিক বিভীষিকার কুজ্ঝটিকায় অন্তর তখন সমাচ্ছন্ন। মনে হ'ল পুলিশের লোক, আর কোন উপায় নেই—ভাবলুম তীরে এসে বোধ হয় তরী ডুবল। বললুম হ্যাঁ।

'আসুন আমার সঙ্গে, ভয় নেই, রাজেন খবর পাঠিয়েছে।' গেলুম তাঁর বাসায়। তিনি রেল কর্মচারী, নাম মিঃ দত্ত, পুরো নামটা মনে নেই। দু'টি বর্মী স্ত্রী তাঁর। বললেন 'খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন, আমি সকাল বেলা আপনাকে মৌলমীন পৌঁছে দিয়ে আসব।' এত ঘুম কোথায় ছিল জানি না। বর্মা পৌঁছে অবধি খুব ঘুমুচ্ছি। সকালবেলা দত্ত সাহেব আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মৌলমীন পৌঁছে দিলেন। উঠলুম একটি বাঙালীদের মেসে—নোয়াখালির লোকই সেখানে বেশী। শ্রীগুহ ছিলেন ম্যানেজার, তিনি বুঝলেন আমি দেশ বেড়াতে এসেছি। বললুম 'বড় জোর পাঁচ ছয় দিন থাকব।' তিনি আদর করে জায়গা দিলেন —১২নং ব্লণ্ডেল ষ্ট্রীট মেসের ঠিকানা—বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

যাক্ শেষ পর্যন্ত মৌলমীন এসে পৌঁছুলুম। মেসের পাশে এক বর্দ্ধিষ্ণু বর্মী পরিবার ছিলেন। তাঁদের একটি ছেলে আমার সমবয়সী আই, এ, পড়ত। বন্ধুত্ব হয়ে গেল—বেশ হাসিখুশী মুখখানি। আমার নিজস্ব বন্ধুত্ব বর্মা মুলুকে এই প্রথম। পরের দিন জেলে দাদার সঙ্গে দেখা করবার দরখাস্ত করে দিয়ে দুই বন্ধুতে মিলে সাইকেলে বেরিয়ে পড়া গেল সহর দেখতে। মৌলমীনের অল্প পূর্বেই শ্যাম দেশের সীমানা, মধ্যে একটা খরস্রোতা নদী মেনাং। যে জায়গাটা শ্যামের সবচেয়ে কাছে, লোকে বলে তার নাম কক্কারক্। সেখান দিয়ে দুদান্ত প্রকৃতির লোকেরা প্রয়োজন হলে শ্যামদেশে পালায়। মনে হ'ল এইত ছোট্ট নদীটি, পার হ'লেই ত ভারতবর্ষের বাইরে চলে যেতে পারি। বন্ধুটি বললেন 'নদীতে খুব হাঙ্গর আর under current-এ যদি কোন রকমে কেউ ডুবে যায় ত জলের তলায় পাহাড়ের গায়ে শরীর চূর্ণ হয়ে যাবে।' বিপদের পথে অধ্যবসায়ের নেশা চিরদিন। তাই মনে মনে ঠিক করে ফেলি আচ্ছা দেখা যাক্ কি রকম জল আর কি রকম স্রোত। জলে নামবার চেষ্টা করতে যাচ্ছি বন্ধুটি

কোন রকমে তা' করতে দিল না—দুঃসাহসের তপস্যায় পড়ল বাধা। জীবনের পদে পদে নতুন পরিচয়—পদে পদে নিত্য নতুন অন্তরায়।

পরের দিন একলা গেলুম সেখানে কাউকে কিছু না বলে—তখনও দাদার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাই নি। অন্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি তার কিছু কিছু কাজ রেঙ্গুনে সেরেছি। মোট কথা, ব্রহ্মবিদ্রোহের কর্ণধারগণ সামনা সামনি লড়তে চান ইংরেজের বিরুদ্ধে। বাংলার বিপ্লববাদের সঙ্গে তাঁদের কর্মপন্থার পার্থক্য অনেক। সবলের সঙ্গে দুর্বলের লড়াই নয়। সমকক্ষ হয়ে বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধ চালনা করবেন—তবে বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি তাঁদের আছে পূর্ণ সমর্থন।

যাই হোক্ জামাটা কোমরে বেঁধে আর কাপড়টা গুটিয়ে সাঁতারের উপযোগী করে ভাবছি দেখা যাক্ চেষ্টা করে যদি পারি ত বহুৎ আচ্ছা, চলে যাব ভারতবর্ষের বাইরে আর না পারলে ফিরে আসব, কোনদিকেই লোকসান নেই। কিন্তু পারব নাই বা কেন? যেমন মনে করা সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছি লাফাবার জন্যে। এমন সময় সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যেয় হঠাৎ বুটপরা পায়ের শব্দ রাইফেল হাতে ছুটে এল দু'তিনজন—বললে 'হাত তোল।' আমিও কি জানি কেন জলে লাফ না দিয়ে হাত তুললুম। তুললুম বলা ভুল হবে কে যেন হাত দু'টো তুলে দিল।

'কি করছিলে এখানে?' উত্তর দিলুম—গরম লেগেছে তাই জল দেখে স্নান করবার জন্যে নামছিলুম। আমার দিকে চেয়ে সীমান্তরক্ষীরা কি ভাবলে জানি না, বললে 'তুমি কি কর?' বললুম 'ছাত্র বিদেশে বেড়াতে এসেছি।' আমার চেহারা দেখে তাদের ধারণা হ'ল আমি চোর ডাকাত নই, ভদ্রলোকের ছেলে, বিদেশী—জানি না তাই জলে নামতে যাচ্ছিলুম। বললে 'না নেমে ভালই করেছ আমরা তোমাকে গুলি করতুম। চল আমাদের সঙ্গে।' নিয়ে গেল ফাঁড়িতে নাম ধাম লিখিয়ে ছেড়ে দিল।

আমার ধারণা ছিল না যে সীমান্তরক্ষীরা এখানে এমন করে পাহারা দেয়। আমার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। যাক্ মনকে সান্ত্বনা দিলুম এক পক্ষে ভালই হ'ল। দাদার সঙ্গে দেখা এখনও হয় নি—সেটা করা দরকার। ফিরে এলুল মেসে। কিন্তু ঐ কক-রিকের অজানা আকর্ষণ কমল না। ঠিক করলুম কাজ শেষ হলে রাতের অন্ধকারে একবার শেষ চেষ্টা করব—অন্য জায়গা দিয়ে। চেষ্টা ব্যর্থ হলেও মনকে প্রবোধ দিই এই বলে যে বাধা ত মানুষকে এগিয়ে দেবার জন্যে। ভগবান দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন ভক্তের ভক্তির মাপকাঠি। মৃত্যু যাদের ললাটে নিজ হাতে জয় তিলক পরাবার জন্যে সব সময় প্রস্তুত—তাদের দুঃখ—দুঃখই নয়।

বারো

মৌলমীন সহরটি ছবির মত সুন্দর; পথ ঘাট বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ে দেশ তাই রাস্তাঘাট কোথাও নীচু হয়ে নেমে গেছে আবার কখনও উঁচু হয়ে উঠে গেছে। একদিকে মার্তাবান উপসাগর অন্যদিকে খরস্রোতা স্যালউইন আর মেনাং তারপরেই শ্যামদেশের সীমানা। আমার দরখাস্তের উত্তরে তিনদিন দেখা করবার সুবিধে দেওয়া হবে বলে অনুমতি এল। দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম মৌলমীন জেলে। তিনি প্রথমেই বললেন --'আমি তোকে আসতে বারণ করেছিলুম, চিঠি পাস নি?' আমি সত্যিই চিঠি পাই নি। পাঁচ বছর পর দাদাকে দেখলুম। অনেকক্ষণ গল্প করলেন--বললেন আগে বেতের কাজ করতে হ'তো এখন কাঠের কাজ। নানা রকমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য শিখেছেন আর শিখেছেন বর্মী ভাষা—বলতে পারেন চমৎকার। আভাসে ইঙ্গিতে জানালুম আমার আসার উদ্দেশ্য। কাল আবার আসব বলে সময় হতেই চলে এলুম। জেলার বাবুর নাম ছিল ডি ক্যাস্ট্রো।

দেখা করে বাইরে আসার পর পুলিশ তৈরী হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এল। সেদিন ২৭শে জুন ১৯২৯ সাল। মনে হ'ল রেঙ্গুন আসার উদ্দেশ্য আমার কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে। দাদার সঙ্গে দেখাও হ'ল এখন ধরা পড়লে বিশেষ কোন ক্ষতি নেই।

হিপাটন পুলিশ ষ্টেশন। দারোগা সাহেব একজন বর্মী। তিনি আমাকে একটি টুল দিলেন বসতে। লোকটি ভদ্র, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম 'আমাকে ধরা হয়েছে কেন?' আমাকে ছেলে-মানুষ দেখে দারোগা সাহেবের কিছু মায়া হ'ল। বললেন 'এটা আমাদের ব্যাপার নয়, অন্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে ধরেছে। এখনি তাদের লোক আসবে।' খানিক পরে আই. বি. দপ্তরের একজন লোক এলেন, সঙ্গে একজন ইউরেশিয়ান সার্জেণ্ট ও একজন দোভাষী। আই. বি. অফিসার নানা রকমের প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। দোভাষী তার বাংলা করে আমায় বলতে লাগল। আমি দেখলুম দোভাষী যে রকম বাংলা বলছে সে রকম ইংরেজী বললে ত মুস্কিল। আমি বললুম 'আমি ইংরেজী জানি, দোভাষীর প্রয়োজন নেই।'

অফিসারটি আমায় বললেন 'কি জন্যে এসেছো এদেশে আর কে পাঠিয়েছে?' আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলুম 'দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' বললেন 'তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলেছেন তিনি কিছুই জানেন না।" বোঝা গেল এটি সম্পূর্ণ বানানো কথা। হঠাৎ মনে হ'ল উত্তর আর কিছু না দেওয়াই ভাল। জানি না কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় হঠাৎ আমার মনে এই কথাটাই জেগে উঠল। জানি না তখন মনে বুদ্ধি ও কর্মনিষ্ঠার সমাবেশ কিনা—সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে বললুম 'যা বলেছি এর বেশী আর কিছু বলব না।' তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক আমাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যেতে

লাগলেন। আমি চুপ করে বোবার মত বসে রইলুম—যেন কোন কথাই আমার কানে যাচ্ছে না। শেষে বললেন "young man you shall have to pay for your costly mistake" আমি কিন্তু নির্বিকার।

আমার দুঃসাহস আর মুখের অপরিমিত স্পর্ধার কথা পুলিশ সার্জেণ্টটির বোধ হয় পদাভিমানে ঘা দিল, তার আর সহ্য হ'ল না। হঠাৎ বিরাশি সিক্কার ওজনে চড় মেরে বসল—হুঙ্কার দিয়ে উঠল 'আমি তোমাকে কথা বলাবই।' আমি সে অতর্কিত আঘাতের চোট সহ্য করতে পারলুম না, সঙ্গে সঙ্গে টুল থেকে ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম। আমি তখনও নির্বাক্। সার্জেণ্টটি তখন নির্লজ্জ অমানুষতায় গলাফাটানো চীৎকারে গর্জন করতে লাগল 'বলবে কিনা বল?' বোবার শত্রু নেই—আমি ত বোবা নই, একটু আগেই কথা বলেছিলুম। আর তার ধৈর্য সইল না। সে লাথির পর লাথি বুট সমেত চালাতে লাগল। আমি যখন একবার ঠিক করে ফেলেছি যে কথা বলব না—কার সাধ্য কথা বলায়। হোক্ না শক্তির পরীক্ষা—পশুবল আর মনোবলের লড়াই। কোথায় সে অসামান্য শক্তি অক্ষুব্ধ সাহস পেলুম জানি না। কিন্তু সে বর্বরের বোধ সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে, পরাজয়ের গ্লানি তাকে এড়াতেই হবে, তাই ধৈর্যহীন উন্মত্ত পশু তার বীভৎস স্বভাবের মূল্য পুরোপুরিই দিয়ে চলল।

আমার দুঃসাহসের তখন অন্ত ছিল না—সে প্রয়োজনাতীত দুঃসাহস বুদ্ধির ও আকাঙ্খার। এই দুঃসাহসের অভ্রভেদী চিরন্তন শক্তি মানুষকে এনে দিতে পারে হয় অন্তহীন দুর্ভাগ্য, না হয় নিয়ে যায় তাকে মহৎ থেকে মহীয়ানে। দুঃসাহসের মধ্যেই পৃথিবীর বড় বড় সভ্যতার সৃষ্টি। হঠাৎ পাঁজরের কাছে একটা বুটের ডগা লাগতেই খটাস্ করে শব্দ হ'ল। মনে হ'ল হাড়টা ভেঙ্গে গেল —যন্ত্রণায় আমিও জ্ঞান হারালুম। তারপরেও খানিকক্ষণ চলেছিল

নির্যাতন। কিছু পরে ওরা যখন দেখলে আমি নড়ছি না তখন ওদের ধারণা হ'ল হয়ত আমি মরে গেছি। দারোগার কাছে পরে শুনেছিলুম যে পাশের একজন মাদ্রাজী ডাক্তারকে আনা হয়েছিল দেখবার জন্যে আমি মরে গেছি কিনা। যখন জ্ঞান হ'ল বুঝলুম আমার একটা চোখ ব্যাণ্ডেজ করা, বুকে ও চোখে অসহ্য যন্ত্রণা, বুটের ডগা আমার চোখের কোনে লেগে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল ---জামা কাপড়ে রক্তের দাগ---আমি পুলিশ হাজতে শুয়ে আছি। মাথা হেঁট করি নি কোনদিনই---মাথা হেঁট মানে অস্তিত্বের চরম দুর্গতি। দুর্বলের ধর্মনীতি বা মমূর্ষুর সান্ত্বনা আমাদের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে সামনে রয়েছে দুঃসাধ্য সাধনের কণ্টকিত পথে ধ্রুব নিষ্ঠার একাগ্রতা।

তখন বোধহয় রাত্রি এগারটা। দেখি মেসের দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ভাল করে জ্ঞান হবামাত্র তাঁদের বাংলায় একটা ঠিকানা বলে খবর দিতে বললুম। তাঁরা আমার সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না—জানতেন শুধু আমি বেড়াতে এসেছি। যাই হোক্ তাঁরা কিন্তু আমার খুব উপকার করেছিলেন সেদিন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় খবর পাঠিয়েছিলেন, ফলে আমার জামিনের বন্দো-বস্তটাও তাড়াতাড়ি হ'ল। তখনও কিন্তু আমার মনে দুর্জয় অহংকারের গৌরব, উত্তেজনার বিরামহীন উন্মাদনা, বহুদুঃখসঞ্চিত গোপন তপস্যার অমলিন উন্মত্ততা। এত শাস্তিতেও আমি অচঞ্চল উদাসীন, এ যেন আমার নিত্যকালের পাওনা জিনিস! এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে যেন বহুদিন ধরে সাধনা করেছি।

রাত্রে দারোগা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন 'কিছু খাবেন কি?' বললুম 'না'। 'না' শুনে হয়ত তাঁর মনে একটু সহানুভূতি হ'ল —বললেন 'ওরা মানুষ নয়, আমার সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে— বলেছি মারতে হয় অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে মারো, আমার থানার ভেতর নয়—মরে গেলে কে দায়ী হবে? আমরা ত ভেবেছিলুম

শেষ হয়ে গেছেন।' সে বেচারী ত জানে না যে আসন্ন বিপ্লবের উৎসাহ মানুষকে করে তোলে নির্ভীক, তখন মানুষ হাজার নির্যাতন ও বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করতে কুণ্ঠিত হয় না। তার আদর্শ, স্থিরবুদ্ধি, কর্মোৎসাহ তাকে এনে দেয় অসামান্য শক্তি—কর্মসাধনার সর্বপ্রধান অঙ্গ। বিশ্বাসহীন দুর্বলতা, দৈন্যপীড়িত অবসাদ, তার ধারে কাছেও ঘেঁসতে পারে না। নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা নির্মম দলনের আতঙ্ক তখন তার কাছে মরীচিকা মাত্র।

শ্রীযুক্তা সন্তোষকুমারী গুপ্তার বাবা মৌলমীনে ওকালতি করতেন, তিনি তাড়াতাড়ি জামিনের ব্যবস্থাটা করে ফেললেন। সেই মাদ্রাজী ডাক্তার ভদ্রলোক নিজে হতেই নিলেন আমার চিকিৎসার ভার। নির্যাতন ও প্রহারের নমুনা যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা ভাবতেই পারেন নি যে আমি আবার বেঁচে উঠব। ডাক্তার বাবুর কাছেও শুনেছিলুম যে ওদের খুব ভয় হয়েছিল বোধহয় আমি মরে গেছি। সে দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে।

আমার ধরা পড়ার পরই সহরে গুজব রটে গেল যে একজন ভয়ঙ্কর বিপ্লবী বাংলাদেশ থেকে লুকিয়ে এসেছিল বর্মায়। পুলিশ তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে—অনেক জিনিস নাকি তার কাছে পাওয়া গেছে। সারারাত্রি আমি যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারি নি। সকাল বেলা দেখি আমাকে দেখার জন্যে বাইরে বহুলোক জমায়েৎ হয়েছে। ভিড়ের ভেতর থেকে দু'একজন মহিলা থানার মধ্যে ঢুকে প্রহরীকে আমার সম্বন্ধে কি জিজ্ঞেস করে চলে গেলেন। পরে দারোগার কাছে শুনলুম যে সহরে ইতোমধ্যে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা রটে গেছে—তাই ওরা দেখতে এসেছে যে কে সেই লোক এত মার খেয়েও কথা বলে নি। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার মারের ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত করে রটিয়েছিল। তাই ওদের আগ্রহ, জানতে চায় যে কে সেই লোক। আমি যন্ত্রণার মধ্যেও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলুম যে অতগুলি লোকের সহানুভূতি আমার জন্যে।

আমার নাম জানে না, জানে না পরিচয়, কেবল তারা শুনেছে আমার কথা আর পুলিশের নির্যাতনের সাক্ষী আমার চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, আর জামা কাপড়ে রক্তের দাগ।

জীবনে এই প্রথম সম্মান পেলুম অপরিচিতের দেশে অনাত্মীয়ের মাঝে। নিষ্ঠুরতম নির্যাতন ও অকুণ্ঠ সম্মান দুইই পেলুম পাশাপাশি একই সময়ে। সে দেশের লোকেরা সেদিন দাঁড়িয়েছিল মনুষ্যত্বের সম্মানকে শ্রদ্ধা দিতে, অহেতুক খেয়াল খুসীর আনন্দে নয়। তারা অন্ততঃ এটুকু বুঝে ছিল যে দুঃখে, বিপদে, প্রবাসে, দুর্গমে, নির্যাতনে দুরন্তপনায় যে লোক সংকল্পে অবিচলিত আছে, হতশ্রী হয় নি, সে আর যাই হোক্ সাধারণ শ্রেণীর নয়। সে বৃহত্তর আদর্শকে কেন্দ্র করে জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে। তারা তাই সেদিন জানিয়ে গেল তাদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও নীরব বিস্ময়। আমার বাংলাদেশ কিন্তু সেদিন জানল না যে তার দেশের ছেলেকে অনাত্মীয়েরা এমন করে অন্তরের মাঝে আপন করে নিল। জীবনে অভিজ্ঞতার মূল্য কম নয়। দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম 'কারণ কিছু শুনলেন?' তিনি বললেন যা' শুনেছি তা' মোটামুটি এই যে লাহোরে সণ্ডার্স খুন হবার পর বিপ্লবীরা ভারতের বড় বড় সহরে প্রচারপত্র বিলি করে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রাণের ভয় দেখিয়েছে। পুলিশের ধারণা আপনি তার সঙ্গে জড়িত। সে জন্যে আপনাকে ধরেছে, আর ওদের ধারণা হয়েছে যে আপনি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন সন্দেহভাজন লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। তিনি যা' শুনেছিলেন তাই বললেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই জামিনে খালাস পেলুম। ক্রমেই সহরে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলুম। রাস্তায় বেরুলে লোকে আমাকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলে। আমি ভেবে পাইনা তাদের সম্মানের কি মর্যাদা দেবো? মনে তখন আমার সত্যদীক্ষার রুদ্র দীপ্তি ও

বরাভয়রূপ প্রকট হয়ে উঠেছে—উদয়োন্মুখ সূর্যের মত আশার আলো, কত আকাশকুসুম স্বপ্ন—নিঃসম্বল ভিখারীর কুবেরের ভাণ্ডারের অভাবনীয় মণিমাণিক্যের স্বপ্ন দেখার মত। দুঃখের অপরিসীম বেদনার মাঝে, দারিদ্র্যের ঐশ্বর্যের অন্তরালে অন্তরের আনন্দ তখন বাধাবন্ধহীন, চিত্তসম্ভূত মানসিক আভিজাত্য তখন অমলিন।

তেরো

জামিনে মুক্তি পাবার পর আমার মেসে এসে বহুলোক দেখা করে গেছেন—জানিয়ে গেছেন তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, আন্তরিক সহানুভূতি। আমার বাংলা দেশ হ'লে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁরা আসতে পারতেন কিনা সন্দেহ। পুলিশ অত তৎপর ছিল না তখন বর্মায়। আমার খুব সুবিধে হয়ে গেল—ঘোরা গেল অনেক জায়গায়। পরিচয় হ'ল অনেকের সঙ্গে। আজ তাঁদের অনেকেই ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিয়েছেন। দেশকে যেমন করে ভাল-বাসতে হয় তাঁরা দেখিয়ে গেছেন ব্রহ্মবাসীদের।

ভারতবর্ষের তুলনায় ব্রহ্মদেশের পরাধীনতা অল্পদিনের—হয়ত মাত্র ষাট সত্তর বছর হবে। এই ক'বছরে স্বচ্ছল ব্রহ্মদেশের যে দুরবস্থা ইংরেজ (বো-কালা) করেছে সেটা অনেকেরই চাক্ষুষ দেখা। শাসন ও শোষণ নীতির ভয়াবহরূপ তাঁরা নিজ চোখে দেখেছেন -- সহ্য করেছেন অনেক অপমান লাঞ্ছনা। যে ছল ও কপটতার আশ্রয়ে লালসার লুব্ধ হস্ত ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল তা' সকলেই জানেন। ইংরেজ কেমন করে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করে পরাধীনতার অন্ধকূপে দেশবাসীকে পঙ্গু করে তুলেছিল তা' তাঁদের অজানা নয়। তাই পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের প্রথম প্রয়াস জুলুন বা মাইওকার সশস্ত্র বিদ্রোহ।

১৯১২ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর জুলুন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্রোহীরা যখন প্রস্তুতি চালাচ্ছেন তখন ইংরেজ সরকার গুপ্তচরের সাহায্যে জানতে পেরে, ভগ্নমেরুদণ্ড নিস্পেষিতপৌরুষ নতমস্তক বর্মীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে করলেন সৈন্য-নিয়োগ। প্রকাশ্য যুদ্ধে দু'পক্ষেরই অল্পবিস্তর ক্ষতি ও লোকক্ষয় হবার পর ইংরেজ আরও বেশী সৈন্য আমদানী করতে বাধ্য হলেন। বুঝলেন যে এঁদের সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল—পরাধীন নিরস্ত্র হলেও এঁরা অক্ষম নন। বিদ্রোহীরাও তৎপরতার সঙ্গে সরকারী অস্ত্রাগার ও গুদাম দিলেন ভস্মীভূত করে। বিদ্রোহীদের দু'জন নেতা শ্রীগামো ওরফে পো মায়া ও তাঁর সহকর্মী শ্রীমায়া হরোঞ্জি ওরফে ইউ বেথেডা বন্দী হলেন। এঁদের দুজনের ও অন্যান্য পনর জনের ফাঁসি হয়ে গেল। অন্য আর একদলে কয়েকজন ধরা পড়লেন—তাঁদের সাতজনের ফাঁসি ও আট জনের হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। কিন্তু তখন বীরত্বের অভিষেক-স্নানে শুচি মানুষের মনে জেগেছে মুক্তির সংগ্রাম—ফাঁসি বা দ্বীপান্তরের ভয় তাঁদের সংযত করতে পারে না। তাঁরা জানেন যে দেশহিতব্রতে মৃত্যুই তাঁদের জীবনকে করবে সুন্দর, করবে মঙ্গলময়, করবে পবিত্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীদলের এক অংশ ইংরেজ সৈন্য দলভুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টায় ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয় ও অন্যান্য জায়গায় উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন আমেরিকা থেকে গদর পার্টির সভ্যেরা এসে। ব্যাংককে এঁরা স্থাপন করেন হেড্ কোয়ার্টার্স। সেখান থেকে 'গদর পত্রিকা' ও 'জাহান-ই-ইসলাম' পত্রিকার মাধ্যমে সৈন্যদের মধ্যে প্রচার কার্য চালান হ'তে লাগল। ১৯১৪ সনের ২০শে নভেম্বর সে পত্রিকায় মিশরের এনভার পাশার এক বিবৃতি প্রচার করা হ'ল যে স্বাধীনতার যুদ্ধে আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। তুরস্ক সরকারও গোপনে এ

আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন। রেঙ্গুনে সৈন্যদের মধ্যে বিশেষ করে ১৩০ নম্বর বেলুচি সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন উঠল জ্বলে। ১৯১৫ সনের জানুয়ারী মাসে তাঁদের এক অংশ ধ্রুব নিষ্ঠার একাগ্রতায় ইংরেজের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রকাশ্য সংগ্রামে। মালয়ের পঞ্চম নেটিভ লাইট পদাতিক সৈন্যদলও যোগ দিলেন। সরকার কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহকে করলেন দমন—দু'শোর বেশী লোকের দণ্ড হয়ে গেল। তবুও বিদ্রোহীরা অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ পুরোদমে গেলেন চালিয়ে।

১৯১৫ সনের অক্টোবর মাসে ঈদের দিন সারা ব্রহ্মদেশব্যাপী সামরিক উত্থানের দিন ধার্য ছিল। তার আগেই সিঙ্গাপুরে পঞ্চম নেটিভ লাইট পদাতিকদের ন'শ জনকে অধ্যক্ষ হংকং যাবার আদেশ করলে তাঁরা তা' অমান্য করে বসলেন। ১৯১৫ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ছিল চীনের নববর্ষের দিন—সেদিনই ওয়াংওয়াং এ বিদ্রোহের আগুন উঠল জ্বলে। দু'পক্ষের চলল প্রচণ্ড সংগ্রাম। ইংরেজ, সৈন্যসংখ্যাধিক্যের জোরে দমন করলেন বিদ্রোহ। ১৯১৫ সনের ৩রা মার্চ তিনজন ও ৮ই মার্চ শ্রীরসুল্লা, শ্রীইমতিয়াজ আলি ও শ্রীরাখমুদ্দীন কোর্ট মার্শলে গুলিতে প্রাণ দিলেন।

১৯১৫ সনের ১৩ই মার্চ পঞ্চম নেটিভ লাইট পদাতিক বাহিনীর পঁয়তাল্লিশ জনের বিচার হ'ল সিঙ্গাপুরে। হাবিলদার সর্বশ্রী সুলেমান, নায়েক মুন্সী খাঁ, জাফর আলি ও ল্যান্সনায়েক আব্দুল রাজেক খাঁর হ'ল ফাঁসি। সাতজন শিখ সৈন্যও অভিযুক্ত হলেন। সর্বশ্রীবাগত সিং, আতর সিং, টানার সিং, রুলা সিং, হাজরা সিং, তামার সিং ও বীর সিং এর ফাঁসি হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা তখনও এগিয়ে চলেছেন অবসানহীন প্রাণের স্রোতে মৃত্যুর হাতের মার্জনা নিতে।

বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী শ্রীকাশিম ইসমাইল সিঙ্গাপুরে ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। বিদ্রোহে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ আছে সন্দেহে

১৯১৫ সনের জুনমাসের প্রথম সপ্তাহে সিঙ্গাপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। মালয় ষ্টেট গার্ডের এক অংশকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করাতে তাঁরা নিজেরাই বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করে অস্ত্রপ্রত্যর্পন করতে অস্বীকার করে বসলেন। ১৯১৫ সনের ২৬শে মার্চ বিচার হয়ে এঁদের নেতা হিসেবে সুবেদার সর্বশ্রীডাঙ্গে খাঁ, জমাদার চিস্তি খাঁ, হাবিলদার রমহৎ আলি, ২৩১১ নং সিপাহী হাকিম আলি ও ২১৮৪ নং হাবিলদার আব্দুল গনি গুলিতে প্রাণ দিলেন। পরের দিন আরও সতের জনকে অনুরূপভাবে প্রাণ দিতে হল। (১) মৃত্যুর ইসারায় তখন দুঃসাহসের আনন্দ।

৯১৫ সনে শ্রীনা পো থেকের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা আবার আক্রমণ চালালেন। সরকার দু'জন ইংরেজ ক্যাপ্টেনের অধীনে ৬৪ নং পাইওনীয়ার আর্মিকে এঁদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করলেন। ওয়াং-ওয়াং এ দু'পক্ষের চলল প্রচণ্ড সংগ্রাম। শ্রীথেকের সহকারী শ্রীনা কাই এ সংগ্রামে দেখালেন অদ্ভুত বীরত্ব। একে একে আহত অবস্থায় অনেকে বন্দী হলেন। ১৯১৫ সনের ১লা সেপ্টেম্বর বিচারে শ্রীনা পো থেক, শ্রীনা কাই, শ্রীনা নি ও শ্রীনা সি বনের ফাঁসির হুকুম হ'ল। কাসিয়াংয়েও বিদ্রোহ করার অপরাধে আরও কয়েক-জনের হ'ল মৃত্যু দণ্ড। নামনি শান্ ষড়যন্ত্র মামলায় তিনজন প্রাণ দিলেন। (২) অসহনীয় বেদনার বহ্নিরাশি উঠল পর্বত প্রমাণ হয়ে।

ইতোমধ্যে ভারতীয় বিপ্লবী শ্রীসোহনলালের নেতৃত্বে ও জার্মান অফিসারদের সহযোগিতায় মান্দালয় অঞ্চলে বিদ্রোহের প্রচেষ্টা নতুন করে দানা বেঁধে উঠল। মেমিওতেও চলল ব্যাপক প্রস্তুতি। কিন্তু শ্রীসোহনলাল ধরা পড়ে গেলেন। ১৯১৫ সনের ১৪ই ডিসেম্বর মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর বিচার হয়ে ১৯১৬ সনের জানুয়ারী মাসে মান্দালয় জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়। আর

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose

(২) Ibid.

কয়েকদিন পরে ৩১ শে জানুয়ারী গদরপার্টির সর্বশ্রী হরণাম সিং, চালিহারাম, নারায়ণ সিং, বসওয়া সিং, নরিঞ্জন সিং, পাল্লা সিং, আর একজনের ব্রহ্মষড়যন্ত্র মামলায় হ'ল মৃত্যুদণ্ড। আর অন্যান্য বন্দীরা পেলেন বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। (১) বিভীষিকার তাড়না ও প্রতিপক্ষের প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাস তখন অর্থহীন।

তবুও বিপ্লবীরা অফুরন্ত মৃত্যুর উৎসাহে অক্লান্তভাবে কর্ম প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। জয়পুরের সর্বশ্রী মূল চাঁদ ওরফে মুজতাবা হোসেন ওরফে মহম্মদ জাফর, লুধিয়ানার অমর সিং, হোসিয়ারপুরের রামরাখা ও সাহাজাদপুরের আলি আহম্মদ সাদিক, সিঙ্গাপুর, হংকং ম্যানিলা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে লাগলেন। সৈন্যদের মধ্যে কিছু সমর্থকও পেয়ে গেলেন। অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করে একজন সুবেদার কোর্ট মার্শেলে গুলিতে প্রাণ দিলেন। পরে অধ্যক্ষ মারা গেলেন তাঁর আর্দালীর গুলিতে—সঙ্গে সঙ্গে আর্দালীও সে কারণে প্রাণ দিলেন। সিপাহীরা জেল ভেঙ্গে বিদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত বন্দীদের মুক্ত করে আনলেন। গত্যন্তর না দেখে সরকার প্রচুর সৈন্য আনতে বাধ্য হলেন—দেশব্যাপী উত্থানকে ভয়ংকর লৌহযন্ত্রে চূর্ণ করার আশায়। কয়েকজনকে নিয়ে আরম্ভ হ'ল মান্দালয় অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা ১৯১৭ সনের ২৮শে মার্চ।

৬ই জুলাই এই ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে তিনজনের হ'ল মৃত্যুদণ্ড আর শ্রীরামরাখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। তাঁকে পাঠানো হ'ল আন্দামান কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারে ১৯১৯ সনে তিনি রক্ত বমন করতে করতে মারা যান। (২)

এই বিপজ্জনক অচলায়তনের মাঝে প্রতিবেশী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিপ্লবীদের জীবনোৎসর্গ ব্রহ্মদেশবাসীদের

(২) Roll of Honour—Kali Charan Ghose.

(১) Ibid.

প্রাণে এনে দিল জাতীয়তাবোধের নতুন উন্মেষ। সৈন্যদের মধ্যে প্রচার কার্য ছেড়ে দিয়ে নিঃসহায় নিরস্ত্র অকিঞ্চনতার মাঝে নবজাগরণের প্রস্তুতির ক্ষেত্র তৈরী করবার জন্যে ভিক্ষু শ্রমণেরাই সবার আগে এগিয়ে এলেন। সর্বত্যাগী সন্যাসীরা করুণাময় তথাগতের অহিংসা মন্ত্র ত্যাগ করলেন—ধর্মের চেয়ে দেশ বড় —স্বাধীনতা আরও বড়। স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম ও আসক্তিহীন সন্ন্যাস বিসর্জন দিয়ে যে যুঞ্জী সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন আত্মোৎসর্গের হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী নিয়ে তিনি ভিক্ষু উত্তমা। স্বাধীনতা যুদ্ধের নির্ভীক সৈনিক এই জ্ঞান-তপস্বী অজেয় শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে জীবনজোড়া আক্রোশ নিয়ে নিষেধ জর্জরিত মোহমুগ্ধ জাতকে উদ্বোধিত করতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তিনি আরম্ভ করলেন আন্দোলন। ইংরেজ তাঁকে নির্বাসিত করে রাখলেন বাংলার জেলে। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলও তাঁর পূতপাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে।

তারপর যে দলের উদ্ভব হ'ল তার তার নাম "হ্লাই-পু-জো।" উস্‌হ্লাইয়ের হ্লাই, উপু-র পু আর উঠয়াঞ্জোর জো অর্থাৎ এই তিন নেতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দল গড়ে উঠল। কিন্তু শাসকেরা তখন সতর্ক হয়ে গেছেন। সে দলকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিলেন অন্তহীন গোপন দমননীতির সুনিপুণ কঠোর খড়গাঘাতে। এরপর এগিয়ে এলেন শ্রীসেয়া সান। সামান্য স্কুল মাষ্টার—স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর অর্থ সংগ্রহের জন্যে আরম্ভ করলেন গোপনে বে-আইনী লটারী। কিছু অর্থ সংগ্রহ হ'ল কিন্তু ধরা পড়ে জেল হয়ে গেল। অতৃপ্ত ক্ষুব্ধ দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার অনিকেত লক্ষ্যের পথে কর্মবেষ্টনের মাঝে পেলেন আত্মসমাহিত প্রচুর অবসর—করলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ। দেখলেন বিদেশী সরকার এনেছে দেশের মধ্যে অগ্নিগিরির আগ্নেয়স্রাব—অবরুদ্ধ পাপের বাধামুক্ত

উৎস, দিগদিগন্তকে রাঙিয়ে তুলে দগ্ধ করে দিয়েছে দেশের সমস্ত শস্যশ্যামলতাকে।

বর্মীদের অধিকাংশ লোকই জ্যোতিষ ও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী। শ্রীসেয়া সান তারই সুযোগ নিয়ে কাজে এগিয়ে এলেন। প্রচার আরম্ভ করলেন যে ইংরেজের রাশিচক্রে যে গ্রহের প্রাধান্য তার প্রতীক হচ্ছে সাপ বা নাগ—বর্মী ভাষায় 'মুঁই'। কাজেই সেই রাহুকে পরাস্ত করে স্বাধীনতা কেড়ে আনতে হ'লে এমন প্রতীক চাই যা সাপের শত্রু। সাপের শত্রু গরুড়—বর্মী ভাষায় গলোঁ। তিনি বন্ধুদের ও দেশের বলিষ্ঠ উৎসাহী যুবকদের বোঝালেন এবং তাঁরাও শেষপর্যন্ত স্থির করলেন যে প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাঁদের হাতে গলোঁ-এর চিহ্ন এঁকে নিতে হবে। এ চিহ্ন হাতে আঁকা থাকলে জয় সুনিশ্চিত এমন কি শত্রুর গুলি পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করবে। তাঁর বজ্রমন্দ্রিত আহ্বানে সাড়া দিলেন শত শত যুবক—মরণের ডাকের মত সে ডাক বিশ্বব্যাপী। এঁদের প্রথম কাজ হ'ল অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করা—সামনাসামনি লড়াইয়ের উপকরণ নিয়ে প্রস্তুত হওয়া। দেশের বড় বড় লোকের বাড়ী থেকে কেড়ে আনা হ'ল রাইফেল বন্দুক ও অন্যান্য হাতিয়ার আর সংগ্রহ করা হ'ল যোদ্ধাদের জন্যে রসদ। সরকারী গুদাম লুট করা আরম্ভ হয়ে গেল। দেশ উঠল নতুন উন্মাদনায় পাগল হয়ে। দলে দলে ভিক্ষু শ্রমণেরাই নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন—গ্রামে গ্রামে গিয়ে চালাতে লাগলেন প্রচারকার্য। ব্রহ্মদেশের সেই নবজাগরণের প্রভাতে শ্রীসেয়া সান মূর্ত করতে চাইলেন তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন। দূর করতে চাইলেন দেশজোড়া অসংগত অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ংকর বোঝা মানুষের মাথা থেকে। কর্মপ্রেরণার সুগভীর মন্ত্রে তিনি অখণ্ড বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজের মধ্যে। মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করা যায় না।

মহাকালের অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গশিখরে গর্জে উঠল মানুষের অন্তরের শেষ আকুতি। আরম্ভ হ'ল গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় তার তাণ্ডব-নৃত্য। অনেকেই প্রাণ হারালেন সেই সব খণ্ডযুদ্ধে। ইংরেজ নিষ্ঠুর নির্মমতার সঙ্গে বিদ্রোহদমনে বদ্ধপরিকর হয়ে আবার আমদানি করলেন বেলুচী আর ডোগরা রেজিমেণ্ট। নিষ্ঠুরতায় তাদের কার্যকলাপ কংসকেও হার মানায়। দলে দলে বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়া আরম্ভ হ'ল পাইকারী হারে। থারওয়াড়িতে একসঙ্গে বাহাত্তর জনের ফাঁসি হয়ে গেল। অনেকের মাথা কেটে লোককে আতঙ্কিত করার জন্যে সভ্য ইংরেজ তার ছবি তুলে সকলকে দেখাতে চাইলেন তাঁদের শক্তির মাহাত্ম্য -- নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকা। তখন তাঁদের ক্ষমতার রুচি বিকৃত। কিন্তু এত ফাঁসি দিলে কি হবে—তখন জ্বলে উঠেছে ধ্বংসের মশাল রুদ্রের হোমকুণ্ডে। তার বিধ্বংসী আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় বিশহাজার বর্গমাইল জুড়ে। বিপ্লবীরা পরাধীনতার নাগপাশ বন্ধনমোচন যজ্ঞে চলেছেন দলে দলে আত্মাহুতি দিতে। সুশিক্ষিত রণনিপুণ ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁদের এ অভিযান একমাত্র অপূর্ব দেশপ্রীতি ও মানসিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সরকারী অর্থসংগ্রহ থেকে আরম্ভ করে অসতর্ক শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চলতে লাগল অবাধে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এমন কি প্রকৃতিদেবী যেন নিজে এগিয়ে এলেন স্বাধীনতাকামীদের সাহায্যে—মাঝে মাঝে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, কোথাও উন্নত পর্বতমালায় বিপ্লবীদের আত্মগোপনের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে দিলেন।

থারওয়াড়ির দক্ষিণ-পূর্বে ১৯৩০ সনের ২২শে ডিসেম্বর কয়েক-জন বিপ্লবী মাত্র পাঁচটি বন্দুক নিয়ে আত্মবিস্মৃত শক্তিতে আক্রমণ চালিয়ে দু'জন সরকারি পদস্থ কর্মচারি ও কয়েকজন কনেষ্টবলকে শেষ করে দিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর ওয়েঅ বাংলোয় আগুন লাগিয়ে একজন ইংরেজ ফরেষ্ট ইনজিনিয়ারকে মেরে তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র

দখল করে নিলেন। পরদিন আরম্ভ হয়ে গেল খণ্ডযুদ্ধ। ২৯শে ডিসেম্বর একদল পাঞ্জাবী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলেন দু'শো বিদ্রোহী—এগারজনের প্রাণের বদলে হটিয়ে দিলেন পুলিশের দলকে। এ সময় নিঃশঙ্ক দুর্জয় দেশপ্রেমিকেরা জেল ভেঙ্গে সরকারী অস্ত্রাগার লুট করে স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের মুক্তিদেবার পরিকল্পনা করলেন। এ ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন থারওয়ার্ডি জেলের জেলার ছিলেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ। তিনিই দিলেন কথাটা জানিয়ে—অথচ তাঁরই এক নিকট আত্মীয় শ্রীনিখিল ব্যানার্জী তখন বাংলাদেশে বোমার মামলায় সাজা নিয়ে জেল খাটছেন। মৃত্যুর তাণ্ডবলীলার রেখাপাত হ'ল কৃষ্ণকঠিন নিকষ পাথরে। বিদ্রোহীদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়ে গেল। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় তাঁরা জানিয়ে গেলেন যেখানে সহস্র দেশপ্রেমিকের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত সেই ব্রহ্মদেশে তাঁরা যেন আবার জন্মে এই প্রকাশ্য অবমাননার প্রতিশোধ নিতে পারেন। অনস্বীকার্য্য ত্যাগের মহিমা। মানবজীবনের সেই বিলুপ্ত স্মৃতি আজও অস্ফুট ভাষায় ব্রহ্মদেশের আকাশে বাতাসে মর্মাহত—অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী।

হাজার খানেক লোকের ফাঁসি, দ্বীপান্তর ও জেল দিয়েও বিপ্লব হ'ল না শান্ত, পৌরুষ হ'ল না শতদীর্ণ। ১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারী ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহীদের ঘাঁটি আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও বীরবিক্রমে সংগ্রামে নেমে পড়লেন। আলাংতাং-এর গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক জীর্ণ রাজপ্রাসাদে ছিল এঁদের গোপন কেন্দ্র। অন্য সকলকে নিরাপদে সরিয়ে দেবার জন্যে সাতজন বিপ্লবী ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুসৈন্যের উপর। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও তাঁরা পশ্চাদ-পদ হলেন না। দলনেতা শ্রীপো লুইন প্রাণ দিলেন। তাঁর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করতে গিয়ে আরও দু'জনকে প্রাণ দিতে হ'ল। অন্যান্য সহকর্মীরা পেগু অঞ্চলে মীনহায় এলেন চলে। ৩রা জানুয়ারী

এক সাক্ষাৎ সংগ্রামে বিদ্রোহীদের পনর জন করলেন মৃত্যুবরণ। ইয়ামেথিনে ফুঙ্গীদের নেতৃত্বে এক খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ দিলেন ৩৯ জন। পেগু, মিনলাং, লামাডো, ওখো, তানবিংটন, মীনহা প্রভৃতি অঞ্চলে সরকার নাজেহাল হয়ে গেলেন বিদ্রোহীদের কর্মকৌশলে। রচিত হ'ল রুদ্রমানুষের আত্মপরিচয়ে ইতিহাসের নবীন অধ্যায়।

উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় অপরূপ গৌরবে বিদ্রোহীরা ১৯৩১ সনের ৭ই জানুয়ারী অবিচলিত নিষ্ঠার রক্ত পিচ্ছিল পথে আবার নতুন আক্রমণ আরম্ভ করলেন মরণপণ করে। বেলুচী ও ডোগরা সৈন্যরা এগিয়ে এল—দু'পক্ষের সে প্রচণ্ড সংগ্রামে প্রাণ হারাতে হ'ল অনেককেই। বন্দী হলেন নেতা শ্রীঅংহ্লা। তাঁকে নিয়ে আঠারো জনের ফাঁসি হয়ে গেল – যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'ল ছাপান্ন জনের। শ্রীসেয়া সান তখনও নির্ভয়ে আনন্দিত উদাসীন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন—কি বলিষ্ঠ বুদ্ধি! কি অপরিম্লান প্রতিভা!

থিনটোয়া জঙ্গলে, দেদেওয়া, ইয়েমেথিন, গাংগালে, দাচং, খাগং, জিগং ও গাংদা অঞ্চলে সংগ্রামের তীব্রতা বেড়ে চলল ধারণাতীত রূপে। ১৯৩১ সনের ১লা মার্চ হতে বিদ্রোহীরা ব্যবহার আরম্ভ করলেন ডিনামাইটের। ব্রীজ ও রেললাইন দিলেন উড়িয়ে সরকারী অফিস হ'ল ভস্মীভূত। থারো ব্রাঞ্চ লাইনে এক ষ্টেশন-মাষ্টার বাধা দিতে গিয়ে অযথা প্রাণটা হারালেন। ৩১শে জানুয়ারী থারওয়াড়ি অঞ্চলে ও ইনসিনে বিদ্রোহীরা সরকারী সৈন্যদের দিলেন হটিয়ে। ইংরেজ লক্ষ্য করলেন মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝরের বিশাল আয়োজন। বাধ্য হলেন নতুন করে অর্ডিনান্স জারি করতে। গোপনে বাংলার বিপ্লবীদের কয়েকজন এগিয়ে এলেন সাহায্যের জন্যে। অন্তহীন দুঃখ বা পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধা তাঁদের পথরোধ করতে পারল না।

১৯৩১ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী সম্মুখ সংগ্রামে থারওয়াড়ির লাপটাডাং-এ তিনজন প্রাণ দিলেন, কয়েকজন হলেন আহত।

২০শে ফেব্রুয়ারী ৪৪ জন গ্রামবাসী চল্লিশজনের এক সৈন্যদলকে অতর্কিত আক্রমণে করে দিলেন বিপর্যস্ত। ফেব্রুয়ারী ও মার্চে, সংগ্রামের তীব্রতা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। রাস্তার উপর গাছ ফেলে সৈন্য চলাচলের পথ বন্ধ করে ধৈর্যহীন উন্মত্ততায় চলতে লাগল সরকারী কর্মচারিদের উপর আক্রমণ ও সরকারী অফিস ও গুদামে অগ্নিসংযোগ। ২৫শে মার্চ কাম্পাডির যুদ্ধে বাইশজন তরুণ মৃত্যু বরণ করলেন—সরকার পক্ষের ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। পেগু ও থারওয়াড়ি অঞ্চলে চলল বিভীষিকার রাজত্ব। ৬ই এপ্রিল বিদ্রোহীরা ওথাংনের থানা আক্রমণ করে সকলকে শেষ করে দিলেন নিজেদের একটি প্রাণের বিনিময়ে। সরকারের সন্দেহ হ'ল যে পেগু ও টঙ্গু অঞ্চলে এদেশীয় সিভিলিয়ানরা গোপনে গোপনে এঁদের সাহায্য করছেন। এপ্রিল মাসে ইস্তাহার বিলি করার অপরাধে একজন বাঙালী যুবকের তিনবছরের জেল হয়ে গেল।(১) এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে লেপিড়িন, থারওয়াড়ি ও ইনসিনে বহু বিদ্রোহী, বহু সৈন্য ও পুলিশ প্রাণ দিলেন। ব্রহ্মদেশের সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন শ্রীসেয়া সান।

বিদ্রোহবহ্নি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ল। ১১ই মার্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পেল যে সরকারী মতে সে পর্যন্ত এক হাজার জন বিদ্রোহী নিহত, দু'হাজার বন্দী ও আহতের সংখ্যাও কয়েক হাজার। সরকার পক্ষের ক্ষতির হিসেব রইল অপ্রকাশিত। ৬ই মে একজন ইংরেজ পুলিশসুপার ও তাঁর দেহরক্ষী কনেষ্টবল সহ কয়েকজন প্রোমে বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিলেন। নির্মম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাঁরা ইংরেজ অফিসারদের নিহত করতে লাগলেন। সার্ভে বিভাগের একজন ইংরেজ অফিসার ১৮ই মে মোমিওতে হলেন নিখোঁজ। পরে দেখা গেল তাঁর দেহ বুলেটের আঘাতে জর্জরিত। ১৯শে মে সেখানের সৈন্যশিবির ও নতুন

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose 437

পুলিশ ফাঁড়ি হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন। ইংরেজ অধিনায়ক বন্দী বিদ্রোহীদের উপর আরম্ভ করলেন বর্বরোচিত ব্যবহার। ২৬শে মে বিদ্রোহীদের একটি ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ও চারজন সেখানে প্রাণ দিলেন। অজানার সংঘাতে গর্জন করে উঠল অন্তরাত্মার অবরুদ্ধ বাণী।

মে মাসের শেষে সরকারকে স্বীকার করতে হল যে থারওয়াড়ি অঞ্চলের অবস্থা সরকারের পক্ষে ভয়াবহ। ব্রিটিশ সৈন্যেরা বিদ্রোহীদের ও নিরীহ নরনারীর প্রতি অত্যাচারের সীমা লঙ্ঘন করার পরই বিদ্রোহীরাও প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করলেন নাশকতার মেঘপুঞ্জে আকাশ গেল ছেয়ে, নৃশংসতার ধূম্রপুঞ্জে দেশ হ'ল আচ্ছন্ন। ৩১শে মে রেঙ্গুন মান্দালয় গামী সৈন্যবাহী মেল ট্রেন ব্রীজ সমেত উড়িয়ে দেওয়া হ'ল। দু'পক্ষই তখন প্রবল সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত। বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শে তখন বর্মী যুবকেরা অনুপ্রাণিত। ১৯৩১ সনের ১লা জুন কুইঙ্গি ইনিয় ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের ৫০০ জন ওয়েটিংগান থানা ধূলিসাৎ করে দিলেন। ২রা জুন প্রোম জেলার ওয়েটোর যুদ্ধে সরকারকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। উপায়ান্তর না দেখে সরকার কয়েক ডিভিসন সৈন্য আমদানী করলেন—তারা গ্রামবাসীদের উপর চালাতে লাগল অকথ্য নির্যাতন। ৬ই জুন উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘূর্ণিত দেশপ্রেমিকেরা থালজে পাতুং থানা আক্রমণ করে সকলকে শেষ করে দিলেন। ইংরেজের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসীরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বিদ্রোহীরা তখন এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগে অসীম দুর্লঙ্ঘ্যের দিকে। তাঁদের অবলম্বন গেরিলা যুদ্ধের নীতি। সৈন্যদল সহর ছেড়ে গ্রামের দিকে মন দিল।

১৯শে জুন ভারত সরকার সিমলা প্রাসাদ থেকে গোপন নির্দেশ দিলেন যে বন্দী বিদ্রোহীদের পরিবারবর্গের উপর নির্যাতন চালিয়ে

তাঁদের গোপন কেন্দ্রগুলির সন্ধান নিতে। চলল নিরপরাধের উপর অমানুষিক অত্যাচার। ১৩ই জুন ওয়েটোও এক খণ্ডযুদ্ধে বাইশ জন তরুণ প্রাণ দিলেন। অত্যাচারের কবল হ'তে রক্ষে পাবার জন্যে আহত বন্দীরা হাসপাতাল থেকে পালাতে আরম্ভ করলেন। আশ্রয় দাতা সন্দেহে বহু লোক হলেন বন্দী। স্বভাবপাপিষ্ঠ অমানুষ ইংরেজ টমীরা ভিক্ষুণী ও নারীদের বিবস্ত্রা করে পাশবিক অত্যাচারের পর বেত্রাঘাতে বিদ্রোহীদের সন্ধান দেবার জন্যে নিষ্ঠুর আখ্যায়িকার সৃষ্টি করে নিত্যনতুন উৎপীড়ন চালাতে লাগল। এ সংবাদে শ্রীসেয়া সানের ধৈর্য্যের সীমা গেল ভেঙ্গে। ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে জননী ও ভগিনীর সেই নিদারুণ দুঃখ, মর্মান্তিক লজ্জা, দূরপনেয় গ্লানি ও দীপ্তজ্বালা মর্মনিঃস্রাবের সঙ্গে সরকারের নিষ্ঠুর গুপ্ত সংকেতে বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুর চিত্ত হ'ল আরও নির্মম আরও কঠোর। এতকাল বিদ্রোহীরা শ্রীসেয়া সানের কঠিন নির্দেশে ইংরেজ নারীদের সঙ্গে কোনরকম অসদাচরণ করেন নি।

বেসিন, হেনজাদা, টংগু, থেটমো, পেগু, প্রোম, তাইকি, পাপন ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহীরা অসাধারণ বিক্রমে সংগ্রাম চালালেন। কিন্তু তাঁদের পরিবারবর্গের উপর ইংরেজ সৈন্যের অত্যাচারের ফলে সহর অঞ্চলে প্রতিহিংসার বশে তাঁরাও ইংরেজ নারী ও শিশুদের উপর আরম্ভ করলেন জঘন্যতম অত্যাচার। তখন সরকার নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার আদেশ দিতে বাধ্য হলেন বটে কিন্তু মার্শল আইন জারী করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

১২ই জুলাই পেগুর ২১ মাইল উত্তরে এক যুদ্ধে পনরজন বিদ্রোহী নিহত—তাঁদের ছ'টি বন্দুক কেড়ে নেওয়া হ'ল। রেঙ্গুনের আটাশ মাইল দূরে চারজন বিদ্রোহী প্রাণ দিলেন—রেখে গেলেন পরাধীন জাতির ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণচিহ্নের স্বাক্ষর। নেতৃস্থানীয় লোকেরা একে একে ধরা পড়লেন—এল অর্থের অভাব। ক্রমেই এঁরা হীনবল হয়ে পড়তে লাগলেন। তা' সত্ত্বেও শ্রীসেয়া সান

তাঁদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। ২৭শে অক্টোবর দু'জন বিশিষ্ট নেতা শ্রীসায়া চিট ও শ্রীইয়ানগী আং হলেন নিহত। ১৯৩২ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী কয়েকজন নেতা সম্মুখ সংগ্রামে বীরের মত প্রাণ দিলেন।

ফুঙ্গী ওয়াজিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ থারওয়াড়ি ও বেসিন অঞ্চলে সরকারকে সবচেয়ে ত্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছিল। ফুঙ্গী ওয়াজিয়ার ছিলেন একজন ভিক্ষু শ্রমণ। দেশের যুবকদের স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করার অপরাধে ও অন্যান্য রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তাঁর কুড়ি মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯২৮ সনের ৪ঠা এপ্রিল মুক্তি পাবার পরই আবার তাঁকে ৬ই এপ্রিল বন্দী করা হয় এবং বিচারে ছ' বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আপীলআদালতে তিন বছরের দণ্ড যায় কমে। রাজবন্দীর প্রতি সদ্‌ব্যবহার, ভাল আহার্য ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্যে তিনি ৯ই এপ্রিল থেকে আরম্ভ করেন অনশন। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা' রক্ষা করলেন না। ধর্মপ্রাণ ফুঙ্গী মানসচক্ষে দেখলেন নিশীথ রাত্রির আকাশ পৃষ্ঠায় জীবনের রহস্য। আবার আরম্ভ করলেন অনশন। ১৬৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৯২৯ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর অনশনে চলে গেলেন ব্রহ্মদেশের ম্যাক্‌সুইনী অমরলোকে সেই আনন্দে যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্ক লোকের শিখায় শিখায় আন্দোলিত।

অসংকোচে ও অক্লান্ত গতিতে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন শ্রীসেয়া সান। ১৯৩১ সনের ৩০শে জুলাই সরকার গোপন সূত্রে তাঁর আশ্রয় স্থানের সন্ধান পেয়ে তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি পূর্বাহ্নে জানতে পেরে আহত অবস্থাতেই সরে পড়লেন। ২রা আগষ্ট মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। ১৯৩১ সনে ৩০শে আগষ্ট বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। ২৮শে নভেম্বর ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দিলেন ব্রহ্মদেশের চিরবরেণ্য বিদ্রোহী—সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ-

প্রেমিক। ব্রহ্ম বিদ্রোহের রক্তলাঞ্ছিত রণদুর্মদ মৃত্যুবিজয়ী বীরদের এই অবিসংবাদিত ও গৌরবময় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—ত্যাগ ও কর্মপ্রেরণার মহিমায় স্বুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত বর্ণাঢ্য। বিশ্বই সেই দেশপ্রেমিকদের নিকেতন, সত্যই তাঁদের আশ্রয়, প্রেম তাঁদের চরমগতি, ত্যাগ তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক, আত্মোৎসর্গ তাঁদের পক্ষে সহজ, তাঁদের মৃত্যু নেই।

আজও মনে পড়ে ব্রহ্মের সেই বিপ্লবী বীরদের ফাঁসিমঞ্চে যাবার সময় বন্দীশালায় ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে শেষ বিদায় সম্ভাষণ বাণী 'বাবুরং তোয়ারমে তোয়ারমে—বাবুরা আমরা চললুম, আমরা চললুম'—বিষাদ করুণ সাশ্রুনেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রত্যুত্তর আসত 'তাড় তাড় —সাধু সাধু।'

১৯৩৩ সনের বর্মা সরকারের হোম মেম্বার ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিবৃতি দিলেন যে, একমাত্র থারওয়াডিতে তখন পর্যন্ত ২৭৪ জনের ফাঁসি ও ৫৩৫ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে। (১)

যাক্ আমার বিচার আরম্ভ হ'ল মৌলমীনের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে। নাম শ্রীমঙ্ অঙ্ থিন কিংবা শ্রীমঙ্ অঙ্ চিট—ঠিক মনে নেই। মিঃ মিল ছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ইতোমধ্যে সহরে জানাজানি হয়েছে যে যে বাঙালী ছোকরা ধরা পড়েছে আজ তার বিচার হবে। কাছারী লোকে লোকারণ্য। এখানে এর আগে কোন রাজনৈতিক মামলা হয় নি। লোকেরা এসেছেন আমাকে দেখতে আর বিচার শুনতে। উকীলবাবুর নির্দেশমত আমি একটি চেয়ারে চুপচাপ বসে আছি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গম্ভীর প্রকৃতির লোক—কথা কম বলেন। আদালতের কাজ আরম্ভ হ'ল। আসামীর তলব হতেই আমার উকীলবাবু মিঃ গুপ্ত আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন 'এই যে সণ্ডার্সের হত্যাকারী।' সবাই আমার মুখের দিকে চাইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose p. 458.

তাকালেন আমার দিকে—বোধহয় আমাকে দেখে তাঁর মনের ভাবটা এই হ'ল যে—এ যে নিতান্ত ছেলে মানুষ। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'কি কর?' বললুম 'ছাত্র'। 'কোন্ ক্লাসে পড়?'—প্রশ্ন করলেন তিনি। বললুম 'সিনিয়র আই, এ ক্লাস।' রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী—সিনিয়র আই, এ ক্লাস।

ফরিয়াদী পক্ষ থেকে মিঃ ঘোষাল আমার বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত করে নানারকমের লোমহর্ষক বিচিত্রকাহিনী শোনালেন। তাঁর মামলা সাজানোর প্রশংসা করতে হয়—সত্যে মিথ্যেয় এমন একটি উপন্যাস সৃষ্টি করলেন যা' অবিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। আমি কেমন করে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি—কেমন করে ভারতবর্ষ থেকে বাইরে পালাবার চেষ্টা করেছি—আর এমন সব লোকের সঙ্গে মিশেছি যাদের কার্যকলাপ সন্দেহাতীত নয়। মোট কথা, তিনি আমার এমন একটি চরিত্র খাড়া করে দিলেন তাতে মনে হ'ল আমি কিছু না করেও যেন মন্ত্রবলে দুর্ধর্ষ বিপ্লবী হয়ে গেছি অন্ততঃ পুলিশের গোপন খাতায়। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে আমাকে গোপন গূঢ় অভিসন্ধি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বর্মায় পাঠানো হয়েছে। দেখতে ছেলেমানুষ হলে কি হয়—এ একটা ভয়ানক কিছু করবার মতলবে এ দেশে এসেছে। শেষ পর্যন্ত শ্রীরমণীমোহন ঘোষাল আমার বিরুদ্ধে বললেন 'এ ছোক্‌রা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না—কোন কাজেই পেছপা নয়, এ মরতে ভয় পায় না—খুন করতে সংকোচ বোধ করে না, যে কোন অপরাধ যে কোন সময়ে অবলীলাক্রমে করতে পারে। এরা সমাজের শত্রু—দেশের শত্রু—সভ্যতার শত্রু। এদের বিবেক বলে কোন জিনিসের বালাই নেই।' শুনতে কিন্তু ভালই লাগল। অকারণ একটা মুখরোচক সার্টিফিকেট্ পাওয়া গেল—আমার পাওনার অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া আছে সেখানে—অযাচিত করুণার উৎস।

তাঁর সেই নির্লজ্জ উদারতা দেখে মনে মনে হাসি। শেষ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দাঁড়াল যে আমি বিপ্লবীদলের সদস্য হিসেবে সরকারী কর্মচারীদের প্রাণের ভয় দেখিয়েছি আর বিনা পাশপোর্টে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কক্‌রিক্ অঞ্চল দিয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করেছি। মিঃ ঘোষালের আদি নিবাস চুচুঁড়ায়। আমার উকীল বাবুর জেরার উত্তরে শ্রীঘোষাল স্বীকার করলেন যে তিনি আমার দেশের লোক।

বিচার চলল প্রায় তিন মাস। আমার মামলা আরম্ভ হবার আগে কোর্টের পেস্কারবাবু যখন আমার উকীলবাবুর মুহুরীকে রেকর্ড দেখান তখন দেখেছিলুম একটা টেলিগ্রাম—করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট। তাতে লেখা ছিল গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র আজ সকালে রেঙ্গুন রওনা হয়েছে। রেঙ্গুনে পৌঁছানমাত্র যেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমার উকীলবাবু মিঃ গুপ্ত তাই শুনে খুব খুসী হয়েছিলেন। তাঁর মতে আমাকে গ্রেপ্তার করা ওদের পূর্বপরিকল্পিত—আমার মামলার খুব সুবিধে হবে। কিন্তু পরে সেটা রেকর্ড থেকে সরিয়ে ফেলা হয় সরকারী উকীলের পরামর্শে। মিঃ গুপ্ত যখন সেটা খুঁজে পেলেন না তখন সরকারী উকীলবাবু ঠাট্টা করে বললেন 'সেটার ডানা গজিয়ে উড়ে গেছে।' মিঃ গুপ্ত আমার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

আমি কোর্টে যাই আসি। রাস্তায় পরিচিত অপরিচিত সকলেই জিজ্ঞেস করেন 'কবে রায় হবে?' উত্তর দিই 'জানি না।' আমার মেসের লোকেরা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি কোথায় যাই আসি তার সম্বন্ধে তাঁরা কোনদিন প্রশ্ন করেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন যে পুলিশের অভিযোগ অনেকাংশে সত্য। আমি প্রতিদিনই বহুলোকের সঙ্গে মিশেছি, যাঁরা আসতেন তাঁরাও শিক্ষিত লোক। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আমার

নিমন্ত্রণ থাকত। আমি বাইরে গেলে সেগুলো রক্ষে করতে পারতুম না। আমার মেসের লোকেরা নাম ঠিকানা ও তারিখ লিখে রাখতেন, আমি সেই মত নিমন্ত্রণ রক্ষে করতুম।

দু'টি লোকের কথা বেশ মনে আছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জানালেন যে তাঁর বাল্যবন্ধু মিঃ ভৌমিক মৌলমীনে আছেন। আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমি তাঁর নির্দেশমত একদিন মিঃ ভৌমিকের বাড়ী গেলুম—আমাব মেসের কাছেই। একেবারে সাহেবী কায়দায় বৈঠকখানা সাজানো। দরজায় জানালায় ভারি সৌখিন পর্দা ঝুলছে—ভদ্রলোক বড় চাকরি করেন। আমি একটুকরো কাগজে লিখে বেয়ারার হাতে দিলুম—অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে।

অনেকক্ষণ পর বেয়ারা এসে বল্লে 'উনি এখুনি আসছেন।' কিছু পরে নেমে এসে তিনি আমাকে অন্যলোক মনে করে বললেন কি চাও? 'কিছুই না'—বললুম আমি। তাঁর কথা বলার ধরণ দেখে আমার মন তখন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। 'প্রফেসার ব্যানার্জী লিখেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে তাই এসেছি। তাঁকে শ্রদ্ধা করি তাই আমার আসা'—বললুম আমি। ভদ্রলোক বললেন 'কোন চাকরির চেষ্টায় এসেছ কি?' বললুম—'না, আমি এসেছিলুম দেশ বেড়াতে পুলিশ অযথা ধরে আমায় হায়রান করছে।' শুনেই তিনি বললেন, 'কাগজে দেখছিলুম বটে, তা আমি কি করব?' বললুম 'আপনাকে ত কিছু করতে বলিনি, কেন এসেছি তা'ত শুনলেন।' তিনি বিরক্তির সুরে বললেন 'তুমি আমার এখানে আর এস না—তোমাদের মত লোকদের আসা-যাওয়া আমি পছন্দ করি না।'

আমি চিরদিনই দুর্মুখ। তার উপর জেগে উঠল অহংকারের কৌলিন্য। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'আমি ভিক্ষে করতে আসিনি

আমার আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে মনে রাখবেন আমার মত লোক এলে আপনার বাড়ী ধন্য হবে। আপনি বাঙালী, এ দেশের লোকেরা আমার জন্যে যা' করেছেন তা' আপনার ধারণা নেই।' এই বলেই চলে এলুম। ভদ্রলোক এটা আশা করেন নি। ফিরে এসে মেসের বন্ধুদের বললুম। তাঁরা বললেন 'ঠিক বলেছেন—না যাওয়াই উচিত ছিল।' প্রবাসী ধনী সরকারী চাকুরে বাঙালী মিঃ ভৌমিক। তারপর একবার মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোন চেটিয়ার ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়ে। আমি যে তাঁকে চিনি এ ভাব দেখাই নি—গৃহস্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ ভৌমিক হয়ত ভাবছিলেন যে কোটিপতি কাষ্ঠব্যবসায়ীর বাড়ীতে আমি নিমন্ত্রণ পেলুম কেমন করে? ভগবান একদিক দিয়ে তাঁর দর্প চূর্ণ করলেন।

এই গেল প্রথম জনের কথা। দ্বিতীয়টি একজন স্ত্রীলোক। ঠিকানা ধরে একটি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলুম। বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী, এখানে অধিকাংশ বাড়ীই কাঠের। গেটে নাম লেখা ছিল, অন্ধকারে ভাল করে দেখবার আগেই চাপরাশি এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল, বোধ হয় আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিল। দু'এক মিনিট পরে একজন প্রৌঢ়া বর্মী মহিলা এসে পরিস্কার ইংরেজীতে বললেন 'তুমি আমার ছেলের মত— তোমাকে দেখব বলে নিমন্ত্রণ করেছি—কাগজে তোমার খবর বেরিয়েছে—শুনেছি তুমি মার খেয়েও কথা বল নি।' এই কথা বলে তিনি আমাকে ছোট ছেলের মত আদর করে নিয়ে গেলেন তাঁর খাবার টেবিলে। পাশে এসে যিনি বসলেন তাঁকে দেখে চমকে গেলুম। তিনি স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যাঁর কোর্টে আমার বিচার চলছে। সবটা কেমন ঘুলিয়ে গেল। বাংলা দেশ হ'লে এ জিনিস ত কল্পনার বাইরে। তিনি প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে বললেন 'আমার স্ত্রী, তোমাকে দেখবার জন্যে ওঁর ভারি ইচ্ছে হয়েছে।'

প্রৌঢ়া সেদিন যে স্নেহ যে আন্তরিকতা দিয়ে আমাকে খাওয়ালেন তা' বলা যায় না। ইংরেজ আমলে এ জিনিসও সম্ভব, তবে সেটা বাংলা দেশ নয় আর পুলিশও সেখানে অত তৎপর নয়। তিনি কথায় কথায় যেইমাত্র শুনলেন যে আমার মা নেই, অল্প বয়সে মা হারিয়েছি তাঁর মাতৃস্নেহ যেন উথলে উঠল। মা সব দেশেই সমান, তা বাঙালীই হোক্ আর বর্মীই হোক্। সন্তানের জন্যে মায়ের স্নেহ অকৃত্রিম। আসবার সময় বারবার বলে দিলেন যে যখন ইচ্ছে হবে যেন অসঙ্কোচে তাঁর কাছে চলে আসি। আমাকে কেন জানিনা তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সেই বিদুষী মহিলা আমার জন্যে কি না করেছিলেন। কিন্তু সব সময়ই লক্ষ্য করতুম তাঁর হাসির মধ্যে যেন কোন এক সুদূর বেদনার আভাস। নিঃসন্তান মহিলাকে কারণ জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি।

অনেকদিন তাঁর কাছে খেয়েছি বসেছি গল্প করেছি, কি চমৎকার মানুষ। একদিন কথায় কথায় বললেন 'তোমার দেশের মেয়েদের কথা বল।' বললুম, 'আপনি কি আমার দেশের মেয়ে নন?' তিনি তাড়াতাড়ি বললেন 'নানা তা বলছি না, দেশে দেশে মেয়েদের আচার ব্যবহার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছিলুম।' আমি কথাটা এড়াবার জন্যে বললুম 'মা চিরকাল সব দেশেই সমান, কোন দেশেই তাঁর প্রভেদ নেই। বিশ্বজননী—এদের জাত নেই দেশ নেই।'

তিনি আমার মুখের দিকে চাইলেন। খুব বুদ্ধিমতী মহিলা, দেখলুম কথাটা তাঁর মনঃপূত হ'ল না—তিনি অন্য জিনিস জানতে চাইছেন। একদিন বলেছিলেন যে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজী তর্জমা পড়েছেন, পড়েছেন শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভূমিকা। মনে পড়ল অল্পদিন আগে আমাদের বাংলার অধ্যাপক শ্রীকালিপদ সেন বলেছিলেন মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান। তাঁর কথা শুনে বইটা পড়েছিলুম—মনে পড়তেই বললুম—'মা শুনুন।'

বলতে আরম্ভ করলুম মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান—যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী ব্রহ্মবাদিনী তপস্বিনী মৈত্রেয়ী। শেষে যখন শুনলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনে যাবার সময় তাঁর দুই স্ত্রীকে সম্পত্তি ভাগ করে নিতে বললেন, তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আপনার এ দান নিয়ে আমি অমর হব ত?' স্বামী উত্তর দিয়েছিলেন 'না তা হবে না, তবে তোমার জীবন ধারণের প্রয়োজনে এগুলো লাগবে।' মৈত্রেয়ী তৎক্ষণাৎ সমস্ত সম্পদকে আবর্জনার মত ঠেলে দিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?' 'যা' দিয়ে আমি অমরত্ব লাভ করব না, অমৃতা হব না, তা, নিয়ে আমি কি করব?' এমন মধুর কথা এর আগে কেউ কোনদিন বলেন নি। সমস্ত উপনিষদের মধ্যে আমারই দেশের একটি মেয়ের মুখ থেকে এই জ্ঞানগম্ভীর শাশ্বতবাণী বেরিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড অমৃত, একের মধ্যে আশ্রয়। যিনি সেই একককে সর্বান্তঃকরণে আশ্রয় করেছেন, নির্ভর করেছেন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তিনি বরণ করতে পেরেছেন অমৃত। তাঁর না আছে কোন ক্ষতির ভয়, না আছে মৃত্যুর আশঙ্কা।

তিনি চুপ করে ভাবতে লাগলেন কথাটার নিগূঢ় অর্থ। আমি বললুম এইখানেই শেষ নয়। মৈত্রেয়ী এই কথা বলেই হাতযোড় করে উঠে দাঁড়ালেন আকাশের দিকে মুখ করে। চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে আসন্ন বিচ্ছেদব্যাথায় নয়—অন্তরে তখন তাঁর অন্য বীণার সুর বেজেছে—তার রাগিনী আলাদা—সাধারণের বোধগম্যের অতীত। তিনি তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি অন্তহীন আকাশের দিকে তুলে শান্তস্বরে বললেন—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময়—আবিরাবীর্ম এধি
রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

এইটেই ভারতবর্ষের সকল প্রার্থনার মর্মবাণী। সেই প্রার্থনা কিন্তু

আমার দেশের মেয়ের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। কথাটার অর্থ এই যে 'হে সত্য, সমস্ত অসত্য থেকে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও নইলে যে আমাদের অন্তরের প্রেমের ক্ষুধা মেটে না—সে উপবাসী হয়ে থাকে। হে জ্যোতি, গভীর আঁধার থেকে, অহং অন্তরাল থেকে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্ন যামিনীর পথিকের মত আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হে স্বপ্রকাশ তুমি একবার একান্ত আমার কাছে নিজরূপে প্রকট হয়ে ওঠ—তোমার মাঝে আমার প্রকাশ পূর্ণ হোক্, তা'হলেই আমার প্রেম সার্থক হবে। হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর, তুমি যে কলুষের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ দুর্মদ, তোমার প্রশান্ত সৌম্য মুখশ্রী—তোমার প্রেমের মুখ আমাকে দেখাও। অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তোমার অনন্ত প্রেমকে সার্থক করো। তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা কর—নিত্যকালের মত বাঁচাও। সেই ক্ষমাসুন্দর প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।'

কথাটা শুনে তাঁরও দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন 'এ কাহিনী ত শুনি নি।' আমি বললুম এটি উপনিষদে আছে—এই উপনিষদকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। আমার খুব ভাল লাগছিল বলতে। তাঁকে বললুম নিউম্যানের 'লীড কাইণ্ডলি লাইট' কবিতার অনেক আগে এই প্রার্থনার বাণী বেরিয়েছে ভারতবর্ষের নারীর কণ্ঠে। পরম তত্ত্বজ্ঞানী কবিকুলগুরু গ্যয়টে যাঁর সৃষ্টির মর্মভেদ করে বিশুদ্ধ বিপ্লবের সুর বেজেছিল I am the Spirit that denies তিনিও মারা যাবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে আকুল কণ্ঠে কেঁদে বলেছিলেন 'আলো, আরও আলো—Light more Light।' আমাদের মৈত্রেয়ীর সর্বাঙ্গসচেতন মন সম্পূর্ণ বিকশিত হ'য়েছিল তার চেয়ে বহুশত বর্ষ আগে।

চুপ করে বসে রইলেন তিনি—আমি এমন কমনীয় স্নিগ্ধ গভীর

মাতৃমূর্তি দেখিনি—দেখিনি জীবনের উপর এমন লাবণ্যের আবরণ—বুদ্ধের করুণা, শঙ্করের জ্ঞান ও চৈতন্যের প্রেমের অপূর্ব সমন্বয়। মনে হ'ল মৈত্রেয়ীর মৃত্যুহীন মধুর আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা যেন তাঁর কানে চিরন্তন কালের জন্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বললুম 'মা আজ আসি!' তিনি অন্যদিন বিদায় দেন হাসিমুখে—আজ আমার কথা বোধ হয় তাঁর কানেই গেল না। চুপ করে বসে রইলেন।

মিঃ ভৌমিকের কাছে পেয়েছিলুম অশোভন রূঢ়তা আর এঁর কাছে পেয়েছি অকুণ্ঠ স্নেহ মমতার ফল্গুধারা। আর বুদ্ধি শাসনের বহির্ভূতা যে মহিলাটি আমাকে একান্ত প্রয়োজনের দিনে রাতের আশ্রয় দিয়ে বিপদ অগ্রাহ্য করে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়েছিলেন, দেখেছি তাঁর অচঞ্চল নিষ্ঠা, অনবদ্য কর্তব্যবোধ আর অপরাজেয় নিয়মানুবর্তিতা।

কয়েকদিন পরে তাঁর কাছে গেলুম। তখন সে বাংলোয় আমার অবারিত দ্বার। যেতেই তিনি বললেন 'তোমার মৈত্রেয়ীর কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছে কিন্তু একটা কথা বলত, তাঁরা ত সংসারের খুঁটিনাটি কাজ সবই করতেন, এত সুন্দর করে ভাববার, জীবনকে এমন করে দেখবার সময় পেতেন কোথায়? এত জ্ঞান তাঁরা পেতেন কোথা থেকে?' মনে হ'ল সেদিনের রেশ এখনও কাটে নি -উত্তর দেওয়া আরও শক্ত। আমি কেমন করে তাঁকে বোঝাব যে মৈত্রেয়ীর মনের মধ্যে এমন একটি মাপকাটি বা কষ্টি-পাথর ছিল যার উপর সংসারের সমস্ত জিনিস একবার ঘসে নিয়েই তিনি বলতে পারতেন, 'আমি যা' চাই এ তা' নয়।' তিনি চাননি শরীরের অমরতা, তিনি জানতেন আত্মা অবিনশ্বর। তিনি চেয়েছিলেন সত্য, আলোক ও অমৃতের মাঝে সেই অনন্ত প্রেম যা' দিয়ে আমরা অন্তরাত্মার সত্য-পরিচয় খুঁজে পাই। তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন পাছে কোন শক্তপ্রশ্ন করেন তাই বললুম 'আজ একটু দরকার আছে উঠলুম।' চলে আসার সময় তিনি বললেন

'আর একদিন এসে ঐ রকম দু'একটি কাহিনী বলো।' সর্বনাশ, আমি বললুম 'ও বিষয়ে আমার মূলধন খুব কম। জীবনের পরিসর নিতান্ত সামান্য। বইয়ে পড়া দু'চারটা ইতিহাস জানি তাও খাপছাড়া—সেদিন মৈত্রেয়ীর যে কাহিনী বলেছি তাও বইয়ে পড়া বিদ্যে। বইয়ের কথাগুলোই হুবহু বলেছি।' তিনি কিন্তু বিশ্বাসই করলেন না যে আমি বই পড়া বিদ্যে নিয়ে এমন সুন্দর করে বলতে পারি। কি জানি মৈত্রেয়ীর বিষয় বলবার সময় তিনি আমার মুখে কি দেখেছিলেন তিনিই জানেন।

যেদিন রায় হবে তার আগের দিন আমার উকিল বাবু মিঃ গুপ্ত আমাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী পাঠালেন। বলে দিলেন যেন আমি তাঁর স্ত্রীকে বলি যাতে সুবিচার হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলুম কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগেই পড়ে গেলুম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সামনে। তিনি বললেন—'কি রায় আশা কর?' তৎক্ষণাৎ বললুম 'বেকসুর খালাস। অন্যায় আমি করি না।' আমার বলার ধরণ দেখে তিনি হেসে ফেললেন। বললেন 'ছাড়া তুমি পাবে না, আমি ছেড়ে দিলেও গভর্ণমেণ্ট তোমাকে বেশীদিন বাইরে রাখবে না।'

আমি যখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছি তিনি এসে বললেন 'তোমার বাড়ী ফিরে যাওয়া তাড়াতাড়ি দরকার। জরিমানা করলে দিতে পারবে ত?' বললুম 'বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে একটা পয়সাও দেবো না।' তিনি বললেন 'কাল তোমার উকীল বাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।' আমি চলে আসার সময় তাঁর স্ত্রীকে বললুম 'মা, আর বোধ হয় দেখা হবে না—জেল থেকে ফিরে যদি পারি ত দেখা করে যাব।' কথাটা শুনে তাঁর মুখখানি প্রভাতের চাঁদের মত পাণ্ডুর হয়ে গেল। চাইতে পারলুম না তাঁর মুখের দিকে। তিনি কিছু বলবার আগেই অপরাধীর মতো পালিয়ে এলুম।

পরের দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার উকীল বাবুকে বললেন 'পঞ্চাশ টাকার কম জরিমানা করলে আপীল হবে না, একান্ন করলে

মনে হবে আমি ইচ্ছে করে আপীলের সুযোগ দিয়েছি। তাই পঞ্চান্ন টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড।' আমার উকীল বাবুকে ঠাট্টা করে বললেন 'আপীল করে দিন, তা' না করলে আপনার মক্কেল ব্যারিষ্টারী করবে কেমন করে?' বিচারের সময় একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'তোমার জীবনের লক্ষ্য কি?' আমি কিছু বলবার আগেই মিঃ গুপ্ত বলেছিলেন 'ব্যারিষ্টার হয়ে আপনার আদালতে প্র্যাকটিস করা।' তাই সেদিনের পরিহাসের আজ তিনি এ ভাবে উত্তর দিলেন।

জরিমানা আমি দেবো না, জেলেই যাব মনে করে বসে আছি এমন সময় পেস্কারবাবু আমাকে জানালেন 'আপনার জরিমানার টাকা জমা পড়ে গেছে—আপনি যেতে পারেন।' জিজ্ঞেস করলুম 'আমি ত দিই নি কে দিয়েছেন?' বললেন 'জানি না, বলতে বারণ আছে।' আমি হাসতে হাসতে বললুম 'জানি না এক জিনিস আর বলতে বারণ আছে অন্য জিনিস। আপনি জানেন কে দিয়েছেন বলবেন না তাই বলুন।' প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন 'মাপ করবেন।'

যাই হোক্ মেসে ফিরে এসে ঠিক করলুম তারপরদিনই কলকাতা রওনা হব। বেলা চারটের সময় দেখি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁর স্ত্রী আমার মেসে গাড়ী নিয়ে এসে হাজির। বললেন 'আজই যেতে হবে, আর এখনই—দেরী হ'লে ষ্টীমার পাবে না।' কোন কথা বলার অবসর না দিয়েই বললেন 'তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।' আমাকে এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলেন। দেখা করা হ'ল না অনেকের সঙ্গে বিশেষ করে যাঁরা আমাকে নানা রকমে সাহায্য করেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী নিজে টিকিট কেটে এনে আমাকে ষ্টীমারে তুলে দিলেন। তাঁদের ইচ্ছে যাতে আমি রেঙ্গুনে ইংলিশ মেল ফেল

না করি। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললুম 'মা জরিমানার টাকাও দিলেন আবার টিকিট খরচাও দিলেন।' শুনে তিনি খুব ব্যথা পেলেন। ছলছল চোখে বললেন 'আমার নিষেধ ছিল, কে তোমাকে বলল ?' মহোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য !

ক্ষণেকের জন্যে মনে হ'ল যে দাঁড়িয়ে আছি 'মনুষ্যত্বের এক অভ্রভেদী চূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ বিশুদ্ধ রাজনিকেতনের সামনে—ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্র প্রকাশের মাঝে।' মনে হ'ল মানুষের মাঝেই ত তাঁর শক্তি, দিবৈশ্বর্য ও মঙ্গল আয়োজন।

আমার মনে আর কোন সংশয় রইল না। ভক্তের বোঝা ভগবানই বইলেন। স্বামী করলেন কর্তব্যের দায়ে জরিমানা—স্ত্রী দিলেন অন্তরের মমতায় সে টাকা সুদ সমেত। সেই মহীয়সী নারীর কথা ভুলব না—অনাত্মীয় অসহযোগিতার চিহ্ন মাত্র নেই। চিরদিনের জন্যে ঋণী হয়ে রইলুম। আর শোধ হবে না তাঁদের ঋণ যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছিলেন পরমাত্মীয়ের মত।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কোন কথা বললেন না। এমন কি তিনি যে আমাকে চেনেন এমন ভাবও দেখালেন না। জাহাজের ঘণ্টা পড়ল। এই মৌলমীন—এখানে পেয়েছি চরম নির্যাতন, অপরাজেয় সম্মান, রাজদণ্ড আর অনবদ্য মাতৃস্নেহ। সুখে দুঃখে হর্ষে বিষাদে মৌলমীন আমার কাছে চিরস্মরণীয়। সহরটা আজও ছবির মত চোখের সামনে ভাসছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও তাঁর স্ত্রী জাহাজ ছাড়তেই হাত নেড়ে বিদায় জানালেন যেন প্রবাসযাত্রী পুত্রকে বিদায় দিতে এসেছেন। মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথের কথা—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই॥"

চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল অকারণে। আস্তে আস্তে মৌলমীন 'বিস্মৃতি বিলগ্ন জীর্ণ সেতু'র মত দৃষ্টি পথের বাইরে চলে গেল। আজ আছে শুধু অখণ্ড জীবন প্রবাহের ভেতর তার বিরামবিহীন অমলিন স্মৃতিটুক—অনির্বচনীয়।

চৌদ্দ

ফিরে এলুম রেঙ্গুন—গিয়ে উঠলুম রাজেনদার বাসায়। তিনি আমায় পেয়ে মহাখুসী কিন্তু বললেন এখানে আর দেরী নয় আবার হয়ত কোন চার্জে ফেলে দেবে। তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আরও দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা কুঞ্জী ইউ, নয়নেন্দুর সহকর্মী। তাঁরা বললেন ভবিষ্যতে এ দেশে এলে তাঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ রইল।

ভারি সুন্দর সহর রেঙ্গুন—রাস্তাগুলি সরল ও সোজা, দুধারে বিরাট অট্টালিকা শ্রেণী। ইচ্ছে ছিল একদিন মিনজান জেলে প্রবেশদার সঙ্গে দেখা করে যাব—একটা অনুমতিপত্রও তাঁর দিদি যোগাড় করে দিয়েছিলেন কিন্তু সময়াভাবে আর দেখা করা হ'ল না। আর ইচ্ছে ছিল অনন্তদার সঙ্গে মান্দালয় জেলে দেখা করা। এই অনন্তদা'—শ্রীঅনন্তকুমার চক্রবর্তী একদিন দৌলতপুর সত্যাশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন। সেখান থেকে আসেন চেরী প্রেসে—তারপর যান কালীঘাটে সুভাষ বাবুর প্রতিষ্ঠিত অরফ্যানেজের ভার নিয়ে। সেখানে শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীনগেন সেন প্রমুখ কর্মীগণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। এ সময় শ্রীআব্দুল হালিমও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত ছিলেন—তাঁর সাহায্যে অনন্তদা শ্রীনলিনী গুপ্তের সঙ্গে পরিচিত হন। সে সময় তৃতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্যে তাঁরা শ্রীসন্তোষকুমার মিত্রের

নাম সাব্যস্ত করেন—কোন কারণে সন্তোষদার সে কনফারেন্সে যোগদান সম্ভব হয় নি। এর পরই অনন্তদা' শোভাবাজারে ধরা পড়ে যান।

পরের দিনই ধরলুম ইংলিশ মেল। চাঁদপাল ঘাটে পুলিশ আমার মালপত্র তল্লাসী করে ছাড়ল। আমি যখন মৌলমীনে তখন আমার বাবা মারা যান। মারা যাবার আগে বাবা আমাকে খুব খুঁজেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর বড় ও ছোট ছেলে একই জায়গায় প্রায় দু'হাজার মাইল দূরে সমুদ্র পারে তাই তাদের সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয় নি। আমার মেসের লোকেরা সে খবর জেনেছিলেন চিঠি পড়ে কিন্তু দুঃখ পাব বলে আমাকে জানান নি বটে তবে আমার উকীল বাবুকে জানিয়েছিলেন, তিনিও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলেছিলেন। তাই ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতি আমাকে ফেরৎ পাঠানোর জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলেন। বাবার শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার পর আবার ফিরে এলুম চুচুঁড়ায়—দেখা হ'ল পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে। বন্ধু শ্রীপ্রাণতোষ চ্যাটার্জী আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন কাজীদার কাছে—কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি বললেন 'কবে ফিরলি?' মাষ্টার মশাই-এর কাছে শুনলুম 'তোকে আটকে রেখেছে।' তিনি একটা গান গেয়ে শোনালেন 'দেখরে চেয়ে মনের মানুষ কে এলো তোর দ্বারে।'

মাষ্টার মশাই সব শুনলেন। সেদিন ময়দানে একটি জনসভা ছিল, মাষ্টার মশাই তার সভাপতি। তিনি সেই সভায় আমার একটু পরিচয় দিয়েই কিছু বলতে বললেন—আমি এত লোকের সামনে এর আগে কোনদিন বক্তৃতা দিই নি। যা' হোক্ কিছু বললুম, মাষ্টার মশাই বললেন বেশ হয়েছে।

তখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলছে। ১৯২৯ সনের ১০ই জুলাই আসামীরা 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে কোর্টে দাঁড়ালেন। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করলেন যে

একজন কনেষ্টবল তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে—এর প্রতিবিধান যদি আদালত না করেন ত তাঁরা নিজেরাই তার ব্যবস্থা করবেন। বিচারাধীন বন্দীরা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কোন কৌঁসুলী নিযুক্ত করলেন না। সরকার পক্ষ থেকে ১৯শে জুলাই এক দরখাস্ত পেশ করে সরকার নিজ খরচে তাঁদের জন্যে উকীল নিযুক্ত করবার চাইলেন অনুমতি। ২৬শে জুলাই মহামান্য হাইকোর্ট সরাসরি সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করে বললেন যে অনশনরত বন্দীদের অসম্মতিতে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উকীল নিয়োগের কোন ক্ষমতা নেই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশ অত্যাচারের অভিযোগে কর্ণপাত করলেন না দেখে বিচারাধীন বন্দীরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে আদালতের কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল। ম্যাজিষ্ট্রেট বন্দীদের শাস্তি স্বরূপ কোর্টে আসা ও ফিরে যাবার সময় হাতকড়া লাগাবার হুকুম দিলেন। ১৪ই আগষ্ট কয়েকজন বন্দী এই ব্যবহারের প্রতিবাদে আদালতে হাজির হতে অস্বীকার করলেন। সরকার পক্ষ তখন ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৫৪০ ধারা সংশোধন করে যাতে বন্দীদের অনুপস্থিতিতে ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার চালাতে পারেন সে কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর হোম মেম্বার সেই সংশোধনী প্রস্তাব আইনপরিষদে পেশ করলেন। কংগ্রেস পক্ষ ও অন্যান্য বিরোধী পক্ষ থেকে ঘোর আপত্তি উঠল। শেষ পর্যন্ত সরকার ৮ ভোটের জোরে আইন কলের রোলারের নির্মম দলনের সুবিধের জন্যে সেটা পাশ করিয়ে নিলেন। বিপক্ষে ছিল ৪৭ ভোট আর পক্ষে ছিল ৫৫ ভোট।

ইতোমধ্যে ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনী হাঙ্গামায় শ্রীসুখেন্দু বিকাশ দত্ত ছুরিকাহত হন—তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করান

হ'ল কিন্তু বাঁচানো গেল না। ২৭শে অক্টোবর তিনি মারা গেলেন পনর বছর বয়সে।

২১শে অক্টোবর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আরম্ভ হ'ল। একজন রাজসাক্ষীকে অন্য বন্দীরা ডক থেকে জুতো ছুঁড়ে মারলেন। মনের দুর্বলতার ভারে অপরাধী হতভাগ্য চাইল বিচারকের মুখের দিকে। অপরাধের শৃঙ্খলে সে আপন বলির কাছে বাঁধা। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বন্দীদের সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া লাগাবার হুকুম দিলেন। পরের দিন বন্দীরা কোর্টে আসতে অস্বীকার করায় জোর করে তাঁদের আনা হ'ল। ২৩শে অক্টোবর তাঁরা পুলিশী জুলুম ও অত্যাচারের অভিযোগ করলেন যে পুলিশ তাঁদের মারধোর করেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সে কথায় কর্ণপাত না করায় তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে পরের দিন থেকে তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না।

১৯৩০ সনের জানুয়ারী মাসে শ্রীভগৎ সিং-এর সহকারী শ্রীভগবতীচরণ নদীর ধারে এক জঙ্গলের মধ্যে বোমা তৈরী করার সময় বোমা ফেটে মারা গেলেন। কোন রকম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে পারলেন না সঙ্গীরা। শ্রীভগবতী চরণের স্ত্রী শ্রীমতী দুর্গাদেবী নিজের সমস্ত অলঙ্কার ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তিন হাজার টাকায় বিক্রী করে বন্দীদের মোকদ্দমার খরচার জন্যে দান করলেন। শ্রীভগৎ সিং-এর অনুচরেরা এ সময় লাহোরে রেলওয়ে ক্লিয়ারেন্স অ্যাকাউন্টস্ অফিস লুট করা ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের জেল থেকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা করলেন।

১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে গণেশদারা এলেন কলকাতায়। সেখান থেকে এলেন চুঁচুঁড়ায় আমাদের কাছে কিছু যন্ত্রপাতি ও কার্তুজাদি যোগাড় করতে। সাধ্যমত কিছু কিছু জিনিস দিলুম গণেশদাকে। বলে গেলেন পরীক্ষার পর যেন চট্টগ্রাম যাই। তখন তাঁরা গোপনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। ১৯৩০ সনে ২৬শে জানুয়ারী আমার একদাদা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র

গেলেন মারা—এ বছরটাই আমার দুঃসময়—মাস্তুলহীন নৌকার মত তখন সংসারের আর্থিক অবস্থা। জুটে গেল একজন অপরিচিত ধনী আশ্রয়দাতা, বললেন 'পড়াশুনা কর খরচ আমি দেবো।' মন সায় দিল না, বললুম 'প্রয়োজনের দিনে হাজির হব।' ভাবলুম রুদ্রের অবসানহীন প্রসন্ন দৃষ্টি তখনই দেখা যায় যখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর সন্তানেরা বৃহত্তর কল্যাণের আশায় সমস্ত অভাব দুঃখ দৈন্যকে অগ্রাহ্য করতে শিখেছে।

১৯৩০ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জ রামানন্দ ইউনিয়ন স্কুলের এক শিক্ষককে প্রাণ দিতে হ'ল পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে। ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডের দিন হ'ল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ—বাংলা দেশের বীর সন্তানগণের দুঃসাহসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ব্রিটিশ সরকার এ জিনিস কল্পনাও করতে পারেন নি। সেই ১৮ই এপ্রিল—ইষ্টার বিদ্রোহের অবিস্মরণীয় দিন। গণেশদারা ১৯২৮ সনের শেষের দিকে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তারপর হ'তে পুলিশ ছায়ার মত তাঁদের পেছনে ছিল তবুও তাঁরা দেখালেন যে ইচ্ছে থাকলে সব জিনিসই সম্ভব। পরিকল্পনাটা সত্যিই অদ্ভুত।

চট্টগ্রাম সহরের মাঝখানে একটা পাহাড়ের উপর একধারে অন্দরকিল্লা অন্যদিকে নন্দন কানন লয়েল রোড ও কাটা পাহাড়ের সংযোগ স্থলে ছিল টেলিগ্রাফ অফিস। তার পূব দিকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। রাত্রি তখন পৌনে দশটা টেলিফোন অপারেটার আহমেদুল্লা সুইস বোর্ডের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। এমন সময় ঠিক পরিকল্পনামত শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, শ্রীকালী চক্রবর্তী, শ্রীআনন্দগুপ্ত ও আরো তিনজন পেছন থেকে এসে অতর্কিতে হাতধরে তাঁকে সরিয়ে নেয়। দলপতি হুকুম দিলেন 'কেউ চীৎকার করবেন না।' সুইসবোর্ড ভেঙ্গে তাঁরা পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে সরে পড়লেন—বন্ধ হয়ে গেল টেলিফোন যোগাযোগ।

একদল ঠিক সেই সময় চট্টগ্রামের ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির অধিনায়ক শ্রীগণেশ ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ লাইন ও ম্যাগাজিন আক্রমণ করলেন। তখন পুলিশ লাইনে হাবিলদার সমেত ৭১ জন কনেষ্টবল ছিল। ঠিক নির্ধারিত সময় রাত্রি দশটায় হঠাৎ অস্ত্রাগারের সামনে এসে দাঁড়াল একখানা মোটর গাড়ী। সান্ত্রী শ্রীরমণী চক্রবর্ত্তী নিয়মিত জিজ্ঞেস করলেন 'কে আসে?' এঁদের মিলিটারী পোষাক দেখে তিনি মনে করলেন যে কোন অফিসার এসেছেন। তিনি স্যালিউট দেবার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের গুলিতে ঘটল তাঁর জীবনান্ত। সেই দলে ছিলেন সর্বশ্রীঅনন্ত সিং, বিধু ভট্টাচার্য, হরিপদ মহাজন, সরোজ গুহ আরও অনেকজন। অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙ্গে এঁরা সমস্ত অস্ত্রাদি পেয়ে গেলেন। প্রত্যেকে রিভলভার কার্তুজ রাইফেল গুলি নিলেন যথেষ্ঠ পরিমাণে। নতুন কর্মীদের শ্রীগণেশ ঘোষ শিখিয়ে দিলেন কেমন করে রাইফেল চালাতে হয়। সিপাইরা ভয়ে পালাল—আহত হ'লো দু'জন—শ্রীজয়করণ ও শ্রীশীতল প্রসাদ দুবে। পুলিশ সুপার মিঃ জনসন, ডি. আই. জি. অফ পুলিশ মিঃ ফারমার, এ. এস. পি. মিঃ লুইস, মিঃ মোর্শেদ প্রভৃতি ধুরন্ধরেরা ছিলেন, কিছুই করতে পারলেন না। তাঁরা ত ভয়েই কাছে ঘেঁসতে পারলেন না—তখন অস্ত্রাগার এঁরা দখল করে নিয়েছেন মনের আনন্দে—কঠিন কাজের মধ্যেই ত কল্যাণ।

ঠিক সেই সময় আর একদল গেলেন পাহাড়তলী এ. এফ. আই হেড কোয়াটার্স অস্ত্রাগারে শ্রীলোকনাথ বলের নেতৃত্বে। এই দলে ছিলেন সর্বশ্রীনির্মল সেন, মাখন ঘোষাল, রজত সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী ও আরও কয়েকজন। সেখানের চার্জে ছিলেন সার্জেন্ট ব্ল্যাকবার্ণ ও সার্জেন্ট মেজর ফারেল। মেজর ফারেল নৈশভোজনে স্ত্রীর সঙ্গে বসেছেন এমন সময় শুনলেন বাইরে একটা গুলির শব্দ। বাবুর্চিকে সাহেব জিজ্ঞেস করলেন

কিসের শব্দ? সে বুঝতে পারেনি, বললে পট্‌কা। সাহেবের কানে পিস্তলের শব্দ পরিচিত। তিনি বাইরে এলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানে এল 'বন্দে মাতরম্।' সাহেব বারান্দা থেকে নেমে অস্ত্রাগারের উঠোনে গিয়ে মেজাজের সঙ্গে বললেন 'কিয়া মাঙ্গতা?' হুকুম হ'ল 'গুলি কর'—সঙ্গে সঙ্গে চারজন বারান্দা থেকে গুলি করলেন। সাহেব বেড়ার উপরই পড়ছিলেন তাঁরা ধরে মোটরের পাশে শুইয়ে দিলেন। সাহেব তখনও মরেন নি, স্ত্রীকে ডেকে বললেন 'All right darling, I am gone.' 'এঁরা চীৎকার করে বললেন 'কেউ বাইরে এস না মারা যাবে।' এখানের অস্ত্রাগারও হ'ল এঁদের করায়ত্ব। মোটর গাড়ীর সঙ্গে দরজার কড়ায় দড়ি বেঁধে গাড়ী চালালেন শ্রীমাখন ঘোষাল। ইংরেজের শক্তির অহংকারের প্রতীক লৌহদ্বার ভেঙ্গে গেল। ভেতরের দরজা শ্রীলোকনাথ বল ও শ্রীবজত সেন ধাক্কায় ধাক্কায় ভেঙ্গে ফেললেন। এঁরা অস্ত্র পেলেন কিন্তু টোটা বা কার্তুজ কিছুই পেলেন না। সাধ্যমত রিভলভার ও রাইফেল সংগ্রহ করে ও দু'টি লুইসগান নিয়ে বাকী গুলিতে দলপতির নির্দেশ মত আগুন ধরিয়ে দিলেন। পাঁচ ছ'টিন পেট্রোল ছিটিয়ে সমস্ত অস্ত্রাগারটাতেই আগুন দেওয়া হ'ল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উইলকিন্স ও ক্যাপ্টেন টেট্ ছুটে আসছিলেন। একটা গুলি এসে জেলাশাসকের গাড়ীর রেডিয়েটারটা দিল নষ্ট করে। পাশেই ছিলেন ক্যাপ্টেন টেট্, তাঁর গাড়ীও জখম হয়ে গেল। বীরপুঙ্গবদ্বয় ভাবলেন যঃ পলায়তি। প্রাণভয়ে দু'জনেই সরে পড়লেন। আর্দালীর মৃতদেহ রইল পড়ে—সাহস দিয়ে গেলেন ড্রাইভারদের। শান্তিশঙ্কাহীন দুর্মদ বিপ্লবীরা অন্য লোক দেখলেই বলতে লাগলেন 'ফিরে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলতে লাগল শ্রাবণের বৃষ্টির মত অবিশ্রান্ত ধারায়। কয়েকজন এলেন গাড়ীর কাছে। জেলাশাসকের ড্রাইভার ধীরমন থাপা তখন অল্পবিস্তর আহত। একজন আলো ফেলে বললেন

এটা জেলা শাসকের ড্রাইভার। আর একজন বললেন 'দে ব্যাটাকে শেষ করে।' তাঁরা থাপাকে জিজ্ঞেস করলেন 'গাড়ীতে কে কে এসেছিল আর তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে।' ভীতকণ্ঠে থাপা বলল 'সাহেবদের পাহাড়তলী নিয়ে যাচ্ছিলুম্।' একজন বললেন 'ব্যাটা ডাহা মিথ্যে কথা বলছে—ব্যাটাকে মেরে ফেল।' মুহূর্ত্তের মধ্যে বুলেট ছুটল কিন্তু থাপা শুয়ে পড়াতে বুকের খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে বুলেটটা বেরিয়ে গেল। অস্ত্রাগার পুড়ে যখন ছাই হয়ে এসেছে তখন এঁরা চলে এলেন পুলিশ লাইনের বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে। শুধু পড়ে রইল ছ'টা মৃতদেহ—জীবলীলার ধুলিমলিন উচ্ছিষ্ট। আর কয়েকজন তখন আহত অবস্থায় আর্তনাদ করছে—মৃত্যুপথযাত্রীর নিষ্ফল বিলাপের মত। আর বাকি সিপাইগুলো ভয়ে নর্দমার ভেতর আর আশে পাশের জঙ্গলের নীচে। আগুনের আলো ছায়ায় তাদের মুখে ঝড়ের মেঘের মতো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো বিভীষিকার দারুণ ঘনঘটা। সেই প্রচণ্ড আক্রমণের বজ্র গর্জনে তাদের অন্তর তখন কাঁপছে বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো। এরাই নাকি ব্রিটিশ রাজত্বের শক্তিমান স্তম্ভ। কিন্তু বিপ্লবীদের মুখেও তখন হাসি নেই। কার্তুজ ও টোটা না পেয়ে এদেরও মনে নৈরাশ্যের অন্ধকার।

সেদিন বাইরে থেকে যাতে কোন রকমে সাহায্য না আসে আর চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থাও এঁরা করেছিলেন। ট্রেন চলাচল বিকল করে দেবার জন্যে চারজন গেলেন ধুম ষ্টেশনের কাছে—সর্বশ্রী লালমোহন সেন, সুকুমার ভৌমিক, সুবোধ মিত্র ও সৌরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ওরফে হারাণ। তাঁরা নির্দেশমত কর্তব্য পালন করলেন—দিলেন রেল-লাইনের ফিসপ্লেট সরিয়ে। আখাউড়া থেকে একটা মালগাড়ী আসছিল সেটা পড়ে রেললাইন বন্ধ হয়ে গেল। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হ'ল। আর একদল গেলেন শ্রীশঙ্কর বলে

একজনের নেতৃত্বে লাঙ্গলকোট এলাকায়। নষ্ট করা হ'ল রেল লাইন টেলিগ্রাফের তার।

আর একদল আক্রমণ করলেন ইউরোপীয়ান ক্লাব কিন্তু সেদিন গুড ফ্রাইডে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে গেছেন সকলে। ব্যর্থ হয়ে গেল জালিয়ানওয়ালাবাগের অপমানের প্রতিশোধের পরিকল্পনা। ফিরে এলেন সর্বশ্রী নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, অমরেন্দ্র নন্দী, মনোরঞ্জন সেন প্রমুখ কর্মীরা। সকলে যখন মিলিত হয়েছেন পুলিশ লাইনে তখন ইঞ্জিনিয়ার বাংলোর ওয়াটার ওয়ার্কসের কাছ থেকে লুইসগান থেকে সিপাইরা গুলি আরম্ভ করলে এঁরাও দিলেন প্রত্যুত্তর। শেষে এরা পুলিশ লাইন অস্ত্রাগারেও করলেন অগ্নিসংযোগ—প্রথম দুর্ঘটনা ঘটল শ্রীহিমাংশু বিমল সেন ওরফে আন্দুর—পেট্রোল ঢেলে আগুন দিতে গিয়ে সর্বাঙ্গ গেল পুড়ে। শুশ্রূষার জন্যে সর্বশ্রীগণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল আন্দুকে নিয়ে সহরে এলেন তারপর আর তাঁরা তাঁদের প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেন না। মিলিত হতে পারলে হয়ত ইতিহাস অন্য রকম হ'ত। রয়ে গেল অনেক ছোট খাট ত্রুটি—বেতারে সংবাদ পাঠাবার যন্ত্রগুলো বিকল করে দেওয়া আর দুটো ছোট ছোট অস্ত্রাগার ছিল সেগুলো নষ্টকরার পরিকল্পনা কারো মাথায় আসেনি। অল্পের জন্যে ঐশ্বর্যের আলো এলো না অন্ধকার ঘরে।

তিনদিন পরে অর্থাৎ ২১শে এপ্রিল পুলিশ কোন চাষীর কাছে খবর পায় যে কয়েকজন বাঙালী বাবুকে দেখা গেছে জালালাবাদ পাহাড়ে। পরের দিন ২২শে এপ্রিল পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী ছুটল ক্যাপ্টেন টেট্ ও কর্ণেল ডোলাস স্মিথ ও মিঃ লুইসের পরিচালনাধীনে। যখন তাঁরা জালালাবাদ পাহাড়ের উপর উঠছেন এমন সময় বজ্র গর্জনে হুকুম হ'ল হল্ট—শ্রীলোকনাথ বলের কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাবার হুকুম দিলেন

তিনি। মৃত্যু বিপদকে তুচ্ছ করেছে তখন সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান যুবশক্তির অসংশয় উন্মাদনা। দু' ঘণ্টা ধরে চলল দু'পক্ষের প্রচণ্ড সংগ্রাম—মৃত্যুজয়ী বীরেরা লড়লেন মরণপণ করে। এক একজনের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়তে লাগল পাহাড়ের বুকে তবুও গুলির বিরাম নেই। সূর্য তখন অস্ত-গমনোন্মুখ। সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্নের বর্ণাঢ্য আলোয় ও বীরের রক্তে জালালাবাদ উঠল রাঙ্গা হয়ে। সেদিনের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে ফিরতে হ'ল ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে। তাঁদের অর্ধব্যাটেলিয়ান সৈন্যের ম্যাগাজিন রাইফেল লুইসগান ও ভিকার্সগানের অজস্র গুলিবর্ষণ হ'ল ব্যর্থ—তাঁরা অবসাদের দুর্দিনে রাতের অন্ধকারে বিপ্লবীদের সামনে এগুতে সাহস করলেন না। দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের কম্পমান গর্জনের মাঝে বাংলা মায়ের মরণজয়ী দুলালেরা সেদিন যুদ্ধে জয়ী হলেন। এ জয় চিরদিনের জন্যে রইল অক্ষয় হয়ে। জালালাবাদ বাংলার মেবার পাহাড়। এ শৌর্য এ প্রাণময় প্রাণোৎসর্গের তুলনা নেই—পরাধীন জাতির নতুন অধ্যায় সূচিত হ'ল জালালাবাদের পুণ্য শৈলমালার নিভৃত কন্দরে।

পরের দিন ২৩শে এপ্রিল সকাল বেলা আবার সৈন্যবাহিনী ছুটল জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে গতদিনের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে। গতরাত্রের যুদ্ধমুখরিত দুর্গম শৈলমালা তখন শান্ত স্তব্ধ। সৈন্যদল পাহাড়ে উঠে দেখল যে দশজন বীর জীবনকে তুচ্ছ করে দেশের স্বাধীনতার জন্যে উৎসর্গ করেছেন মর্তলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ; আর দুজনের মেরুদণ্ড ভেদ করে গুলি চলে গেছে তবুও তাঁরা বেঁচে আছেন—শক্তিতীর্থের শেষ পূজারীর মত। যে দশজন প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা হলেন সর্বশ্রী হরিগোপাল বল ওরফে ট্যাগরা, নরেশ রায়, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নির্মল লালা, মধুসূদন দত্ত, প্রভাস বল, পুলিনবিকাশ ঘোষ, যতীন্দ্র লালা, ত্রিপুরা সেন ও

শশাঙ্কমোহন দত্ত। আর যাঁরা আহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন মতিলাল কানুনগো ও অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার। দেশ যেন কোনদিন এঁদের না ভোলে। এঁরা দুজনেই অল্পক্ষণ পরে মারা যান। ভগবানের অপর্যাপ্ত দয়া, শক্তির সত্যরূপ, মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হয়ে গেলো। দেশবাসীর শ্রদ্ধা ঝরে পড়ল দুঃসাহসী বীরদের উদ্দীপ্ত ললাটে। যাঁরা অমৃতের সন্ধান এনেছেন মানুষ তাঁদেরই মেরেছে—অথচ তাঁরা মরেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে থাকে। তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন।' এঁদের মৃতদেহ দাহ করা হ'ল জালালবাদ পাহাড়ের উপর।

শ্রীঅমরেন্দ্র নন্দীকে পাঠানো হয়েছিল সর্বশ্রীগণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষালের খোঁজে যাতে তাঁরা প্রধান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। তিনি এঁদের সন্ধান পেলেন না। লুকিয়ে রইলেন গ্রাজুয়েট হাইস্কুল ভবনে। স্কুল তখন বন্ধ ছিল।

২৪শে এপ্রিল পুলিশ তাঁর সন্ধান পেয়ে যেতে তিনি পালাবার সময় নিরুপায় হয়ে আলকারাণ লেনের একটা কালভার্টের নীচে থেকে গুলি চালালেন। নরঘাতকদের হাতে জীবন্ত আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ—। নিষ্প্রয়োজন অমঙ্গল জয়তোরণে মৃত্যুহীন বলিষ্ঠ জাগরণের উদ্যম। তখন তাঁর প্রাণে বাজছে সুরের ছন্দ

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত মানুষ চিরদিনই অপরিচয়ের গণ্ডী ভেদ করে দুর্বার হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে। তাই ইতিহাসের পাতায় পাতায় এত বিচিত্র কাহিনী। ইচ্ছে যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে তখন কোথাও তার আর থামবার কারণ থাকে না। শেষ পর্যন্ত নিজের বুকে শেষ গুলিটি চালিয়ে দিলেন

চট্টলের বীর সন্তান কঠিনবীর্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরবে—অপরিচয়ের অবমাননাকে নিশ্চিহ্ন করে। পরিচয়ের পূর্ণতার মাঝেই জাতির অভ্যুদয়—বিকৃতিতেই তার পতন।

এঁরা চারজন তখন প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে তাঁদের সন্ধানে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দু'একজন পরিচিতের ওখানে দু'একদিন লুকিয়ে থেকে ছদ্মবেশে চললেন কুমিল্লার দিকে। কত বিপদ কত সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে হেঁটে হেঁটে এলেন ভাটিয়ারী ষ্টেশন পর্যন্ত ২২শে এপ্রিল রাতে।

প্রধান বাহিনী তখন জালালাবাদ ছেড়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন। ৭ই মে সকাল বেলা শিকলবহ কালারপুর ঝুলদায় চারজন লড়লেন জীবনের শেষ সংগ্রাম—সর্বশ্রী রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত ও স্বদেশ রায় ভারতবর্ষের প্রথম রিপাবলিকান আর্মির সৈনিক। জীবনকে তুচ্ছ করে এঁরা

"দু'পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।"

এ বাণীর অখণ্ড সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন নিজেদের জীবনে।

পরে ধরা পড়লেন দু'জন। তার মধ্যে শ্রীঅমরেন্দ্র নন্দীর খুড়তুতো ভাই শ্রীফণীভূষণ নন্দীর যাবজ্জীন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়। দণ্ডভোগের সময় তিনি ১৯৩৭ সনে আলিপুর সেণ্টাল জেলে যক্ষ্মারোগে মারা যান। ২২শে এপ্রিল ফেনী রেলষ্টেশনে চারজন ধরা পড়লেন কিন্তু তাঁদের দেহ তল্লাসী করবার আগেই গুলি চালিয়ে চারজনেই পুলিশের হাত ছিনিয়ে সরে পড়লেন। ঐ দলে ছিলেন সর্বশ্রী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল। অগ্নিদগ্ধ আহত শ্রীহিমাংশু বিমল সেনের সেবা শুশ্রূষা করছিলেন শ্রীসুখেন্দু বিকাশ দস্তিদার—ধরা পড়লেন সেই অবস্থাতেই। একে একে ধরা পড়লেন আরও কয়েকজন। অন্যান্যেরা

আত্মগোপন করে রইলেন সাময়িক ভাবে। চট্টগ্রাম সহর ভরে গেল পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীতে—চলল বিপ্লবীদের অনুসন্ধান।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া মাত্র আরম্ভ হ'ল ধর পাকড়। বিনা বিচারে বাংলা দেশের বিপ্লবীরা আটক পড়লেন একে একে। সর্বসমেত ২১৬৭ জনকে আটকে রাখা হ'ল আর ১৯ জনকে রাখা হ'ল ১৮১৮ সনের ৩ আইনে state prisoner করে। সর্বশ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, রমেশ আচার্য, রবি সেন প্রমুখ নেতারা আটক হয়ে গেলেন। যাঁরা আত্মগোপন করে রইলেন তাঁরাই কিছু দিনের জন্যে বাইরে থাকতে পেলেন। সাতমাস পরে মাষ্টার মশাইকে ও অন্যান্য নেতাদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে পাঠান হয় বক্সা বন্দীশিবিরে।

১৯২৮ সনের শেষের দিকে বাংলার বিপ্লবীরা মুক্তি পেয়েছিলেন। গান্ধীজির চিরদিন লক্ষ্য ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের দুঃসাহসী নওজোয়ানদের উপর। তিনি দৃষ্টি রাখছিলেন তাঁদের কার্যকলাপে। বিপ্লবীরা তখন বাংলাব সব জেলাতেই কংগ্রেসের সভ্য হ'য়ে ঢুকে পড়েছেন। গান্ধীজি হয়ে পড়লেন চিন্তিত। ১৯৩০ সনে তিনি তাঁদের কাছে চাইলেন এক বছরের সময়। জানালেন তিনি আরম্ভ করবেন আইন অমান্য আন্দোলন—সারা ভারতব্যাপী এর ব্যাপ্তি। বিপ্লবীরা তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। মনে পড়ে ১৯২০ সনে তিনি দেশবন্ধুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে তিনি নিজে একবার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে বোঝাপাড়া করতে চান। দেশবন্ধু সে আয়োজন করেছিলেন। গান্ধীজি সে সভায় প্রাঞ্জল ও আবেগময়ী ভাষায় এক ঘণ্টার বেশী বক্তৃতা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করে প্রথমে শ্রীপুলিন বিহারী দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার কি মত?' জীর্ণজরার শিথিল ললাটের বলিরেখা

মুহুর্তের মধ্যে যেন হঠাৎ লাভ করল নবীনতার সৌকুমার্য। পুলিনদা সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলে উত্তর দিলেন। দেশবন্ধু লজ্জায় ম্লান হয়ে ঘাড় হেঁট করলেন—গান্ধীজি হলেন হতচকিত ও মর্মাহত। এবারেও তিনি এক বছরের সময় চাইলেন। বললেন, 'এই সময়ের মধ্যে স্বরাজ না আনতে পারলে তাঁর দেহ আরব সাগরের জলে ভাসবে।' বিপ্লবীরা তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। পারলেন না দু'টো কারণে। একটা হ'ল তাঁরা জানতেন অহিংসার দ্বারা পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের অনুরোধে স্বাধীনতা আসবে না, আর দ্বিতীয়টা হ'ল তখন অর্থাৎ ১৯৩০ সনে প্রকাশিত হয়েছে Indian Diary—লেখক মিঃ এডুইন, এস. মণ্টেগু। তাঁর লেখায় সত্য হোক্ মিথ্যে হোক্ গান্ধীজির স্বরাজের সংজ্ঞা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭-২২ সন পর্যন্ত ছিলেন ভারত সচিব। তখন লর্ড চেমসফোর্ড ভারতের বড়লাট ও লর্ড রোনাল্ডসে বাংলার গভর্ণর। মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ সনের নভেম্বর মাসে ভারতে আসেন এবং ১৯১৮ সনের ২৪শে এপ্রিল লণ্ডন ফিরে যান। তিনি ভারতের নেতাদের সঙ্গে দেখাশুনা করে দৈনন্দিন রিপোর্ট ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জকে পাঠাতেন। তিনি আমাদের কংগ্রেস নেতাদের সম্বন্ধে যা' লিখেছিলেন সেগুলোই এ বইয়ের বিষয়বস্তু। তিনি গান্ধীজি সম্বন্ধে ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

'Aftetwards we saw renowned Gandhi. He is a social reformer ; he has a real desire to find grievances and to cure them. . ... He dresses like a coolie, forbears all personal advancement, lives practically on the air and is a pure visionary. He does not understand details of scheme ; all he wants is that we should get India on our side. He wants the millions of Indians to live to the assistance of

British throne. হয়ত এটা ইংরেজের বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয়। এ দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

আমাদের কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ ছিল অন্যরকম। শক্তিমদমত্ত বিদেশীর অর্থ সাহায্যে দেশের রাজনীতির অনিশ্চয় গতি নিয়ন্ত্রণ ছিল আমাদের স্বপ্নের অতীত। ধনকুবের শক্তিবর্গের দ্বারেদ্বারে অস্বচ্ছলতার জন্যে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে নেওয়ার মধ্যে যে কদর্যতার গ্লানি তা' আমরা কোনদিন গ্রহণ করব বলে মনে করি নি। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা' দিয়েই দেশের সকল রকম সম্পদকে আবাহন করে আনতে পারব।

বাংলার বিপ্লবীরা গান্ধীজিকে সময় না দিয়ে ১৯৩০ সনে করে বসলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ। এ দিকে গান্ধীজি তাঁর কথামত সংগ্রামের কর্মসূচী করলেন নির্ধারণ। নিত্য প্রয়োজনীয় লবণ তৈরী করে ভঙ্গ করবেন লবণ আইন। দেশের লোককে তিনি আহ্বান জানালেন, বললেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ তিনি এনে দেবেন। মানুষের স্মৃতিশক্তি খুব কম। তাঁরা ভুলে গেলেন চৌরীচৌরার করুণ কাহিনী। ভুলে গেলেন শ্রীমতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপত রায়ের জেল থেকে চিঠি, যে একটা জায়গার সামান্য গণ্ডগোলে সারা ভারতের সংগ্রামী জনতাকে এমন নির্মম শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার তাঁর নেই। গান্ধীজি কোন উত্তর দিতে পারলেন না—শুধু লিখলেন যে যাঁরা জেলে আটক আছেন, তাঁরা বাহিরের ব্যাপারে একেবারে মৃতের ন্যায়। তাঁদের কোন রকম বক্তব্য শুনতে তিনি রাজী নন। বাংলা ও মহারাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দও করলেন গান্ধীজির তীব্র সমালোচনা।

গান্ধীজি পরে শ্রীসৌকত আলিকে বলেছিলেন 'আমি যদি চৌরীচৌরার সত্যাগ্রহ বন্ধ না করতুম তাহ'লে আজ কোথায় থাকতুম—তোমার সামনে বসে থাকতে পারতুম না।' (১)

(১) Life of myself Part I—Harindra Nath Chattopadhaya p. 191.

—১৮

গান্ধীজি করলেন তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডিযাত্রা। দলে দলে দেশের লোক সে আন্দোলনে যোগ দিলেন। ১২ই মার্চ ৭৯ জন বাছাই করা সত্যাগ্রহী গান্ধীজির নেতৃতে দু'শ মাইল পথ ২৪ দিনে অতিক্রম করে ৫ই এপ্রিল পৌঁছুলেন ডাণ্ডি—তখন সারা ভারত জুড়ে লবণ আইন ভঙ্গ করার প্রস্তুতি চলল—৬ই এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে প্রথম ভঙ্গ হ'ল লবণ আইন। গান্ধীজিকে বন্দী করে রাখা হ'ল যারবেদা জেলে। দেশের বহু লোক হলেন কারারুদ্ধ। চলল মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং—কেউ কেউ তাড়ি খাওয়া বন্ধ করবার জন্যে অতি উৎসাহে আরম্ভ করলেন তালগাছ কাটাতে। আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চাপ দিয়ে সরকারের হাত থেকে কিছু ক্ষমতা আদায় করা। এককালে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজি ইংরেজের উপকার করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু প্রত্যুপকার পেয়েছেন বলে কেউ জানে না। এ আন্দোলনে দেশের লোক ক্রমেই এগিয়ে চলতে লাগল। ১৯২১ সনের চৌরীচৌরার পরিণতি গান্ধীজির চোখের সামনে ভাসছিল। মনে পড়ে ব্রিটিশ অত্যাচার ও উৎপীড়নের ক্রমবৃদ্ধিতে তিক্ত অভিজ্ঞতায় গোরখপুর জেলায় চৌরীচৌরায় অহিংসবাদী সত্যাগ্রহীরাই ক্ষেপে গিয়ে পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে জানান প্রতিবাদ। দিনের পর দিন পুলিশের অমানুষিক তাণ্ডব নৃত্য দেখে তাঁরা অহিংসার বর্ম ঝেড়ে ফেলে একুশজন পুলিশ ও কয়েকজন সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলেন। গান্ধীজি সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহ বন্ধ করলেন। তিনিই আন্দোলনের পুরোধা ও কংগ্রেসের নিয়ামক। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণায় আন্দোলন বন্ধ করেছেন।

সমালোচনায় দেশ ভরে গেল—কেউ কেউ বললেন স্বাধীনতা দৌড় ঐ মদ আর গাঁজার দোকানের চৌকাঠ পর্যন্ত এসে থেমে গেল আন্দোলন ব্যর্থ হ'ল। তবুও ইংরেজ গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন গান্ধীজি প্রথমটা অস্বীকার করলেন, পরে দ্বিতীয় গোলটেবিল

বৈঠকে যোগ দিলেন। ক্ষুধিত পাষাণ কিন্তু পরশ পাথরে রূপান্তরিত হ'ল না। গোলটেবিল বৈঠকের ফলে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন এবং কিছু ক্ষমতা পাবার আশায় তিনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হ'লেন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের গোড়ায় হ'ল কুঠারাঘাত। অথচ দেশের লোক এতকাল ঐ ঐক্যের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ইংরেজের চাতুর্যে ও কপটতায় তা' ত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেন—কাজেই পাকিস্তানের জন্ম ১৯৪৭ সনে নয় ১৯৩৭ সনে ; জন্মদাতা মিঃ জিন্না নন—জন্মদাতা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ১৯২২ সনে হঠাৎ যেমন একদিন গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন—তেমনি ১৯৩২ সনেও হঠাৎ তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করলেন। দু'বারই বাধা পেয়েছিলেন বাংলা ও মহারাষ্ট্র থেকে।

গান্ধীজি হয়ত মনে প্রাণে অহিংসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন—বিপ্লবাত্মক কাজ মোটেই পছন্দ করতেন না। আদর্শে, বাক্যে ও কাজে তাঁর হয়ত কোন পার্থক্য ছিল না। সম্প্রতি ওয়ার্দা থানার ভূতপূর্ব দারোগা শ্রীভি. এম. চাওজী তাঁর 'সেবাগ্রামে পুলিশ' নামে বইয়ে প্রকাশ করেছেন যে ধর্মপ্রাণ গান্ধীজি একজন নিরুপায় শুধু রাতের জন্যে আশ্রয়প্রার্থী বিপ্লবীকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হন নি। সেই সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমানীর আমাদের সম্বন্ধে ধারণা ছিল অদ্ভুত। তাঁর ধারণা আমরা গৃহবিতাড়িত, স্বজন পরিত্যক্ত, নিরাশ্রয়, দরিদ্র সন্তান—দারিদ্র্যের জ্বালায় বেছে নিয়েছি এই পথ। আমরা misguided youths—উপার্জনের অক্ষমতায় উন্মাদ।

সত্যাগ্রহ চলবার সময় ৮ই মে শোলাপুরে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। পুলিশ মারল পঁচিশ জনকে গুলি করে, শতাধিক হলেন আহত। ছ'টা থানা ও সেসন্স জজের আদালত হ'ল ভস্মীভূত। মৃত পুলিশদের দেহ সেই আগুনে ফেলে দেওয়া হ'ল।

১২ই মে পর্যন্ত পুলিশ কিছুই করতে পারল না। সেদিনই মার্শাল আইন হ'ল জারি। রাস্তায় রাস্তায় মেসিনগান গেল বসে। বহু লোককে বন্দী করে নির্দয়ভাবে প্রহার দেওয়া হ'ল। ২২শে মে পর্যন্ত কারফিউ রইল বলবৎ। গান্ধীজি দেখলেন যে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অহিংসবাদীরা কত দূর যেতে পারে। চারজনের বিরুদ্ধে চলল মামলা। সর্বশ্রীমালাপ্পা ধন শেঠী, জগন্নাথ সিন্ধে, কিষণ সর্দা ও আব্দুল রসুল কুর্বান হোসেনের হয়ে গেল মৃত্যুদণ্ড। যারবেদা জেলে ১৯৩১ সনের ১২ই জানুয়ারী তাঁরা ফাঁসি কাঠে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। মৃত আহত দণ্ডিত সত্যাগ্রহী সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতারা কোন কথাই বললেন না।

যাই হোক্ কংগ্রেস নেতারা একে একে জেল থেকে মুক্তি পেলেন আর মুক্তি পেলেন ছেলের দল যাঁরা সর্বদেশে সর্বকালে সবার আগে এগিয়ে আসে। বাংলাদেশের ছেলেরাও সেদিন নেমে পড়েছিলেন তাঁর এই শেষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে—নির্মম অত্যাচারের মাঝেও তাঁরা ছিলেন অটল। সেই আন্দোলন ব্যর্থ হ'ল; ইংরেজ এবার কিন্তু কিছু কিছু ক্ষমতা ছাড়লো দেশের লোকের হাতে। অনেকে তাঁদের দৌলতে উজীর ওমরাহ হয়ে বসলেন।

বরিশাল নলচিড়া গ্রামের শ্রীদেবরঞ্জন সেনগুপ্ত ওরফে বলু ছিলেন বিপ্লবীদলের সদস্য—সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয়। ১৯৩০ সনের মে মাসের শেষে বোমা তৈরী করবার সময় বোমা ফেটে মারা যান। একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। ঠিক এ সময় ২৬শে মে নওজোয়ান ভারত সভার শ্রীউজীর চাঁদের বোমা তৈরীর সময় সেটা ফেটে গিয়ে সর্বাঙ্গ পুড়ে যায়—পরদিন হাসপাতালে তিনি মারা যান। একই ভাবে দু'টি তরুণ সন্তানকে আমাদের হারাতে হ'ল।

১৯শে এপ্রিল ঢাকায় ধরা পড়লেন শ্রীঅনিল কুমার দাস। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে নির্মম প্রহারের ফলে ঢাকা সেন্ট্রাল

জেলে তাঁর মৃত্যু হ'ল। আরো একটি অমূল্য জীবন পুলিশ এমনি করেই দিল নষ্ট ক'রে। অনুরূপভাবে মারা গেলেন মৈমনসিং পুলিশের অত্যাচারে শ্রীধীরেন দে। দেশ আজ এঁদের ভুলেই গেছে।

শোনা যায় এ সময় তরুণ বিপ্লবীরা যখন নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামতে বদ্ধ পরিকর ও অস্থির চিত্তে নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন তখন কোন বিশিষ্ট নেতা নিজের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেলের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিলেন। তরুণদের মনে তখন ধারণা হ'ল যে নেতাদের কাছে কোন সাহায্য পাওয়া দুস্কর। তাঁরা নিজেরাই কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

লবণ আইন অমান্য আন্দোলন চলার সময় ১৯৩০ সনের ৩রা জুন মেদিনীপুর চেঁচুঁয়াহাটের দাসপুর থানার দারোগা শ্রীভোলানাথ ঘোষ ও তাঁর অধীন কর্মচারী শ্রীঅনিরুদ্ধ সামন্ত সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার করায় ক্রুদ্ধ জনতার হাতে শ্রীভোলানাথ ঘোষ মারা যান ও অনিরুদ্ধ সামন্তকে গুম করা হয়। দাসপুর হত্যা মামলার জন্য এক বিশেষ আদালত গঠিত হয়। শ্রীপুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনরেন দিন্দার হয় ফাঁসির হুকুম—আপীলে হয় তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ। দণ্ডিতদের মধ্যে ১৮ জন আপীল করেন ফলে মুক্তি পান ছ'জন, পাঁচজনের দণ্ড কম করা হয় আর সাত জনের দণ্ড বাহাল থাকে। সর্বশ্রীকানন গোস্বামী, মৃগেন ভট্টাচার্য, বিনোদ বেরা ও ভূতনাথ মান্নারও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

তখন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের চলছে অনশন। জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা হ'ল বিফল। যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুর পর সরকার বাধ্য হয়ে বন্দীদের সঙ্গে ব্যবহার ও আহার্য সম্বন্ধে বিবেচনা করায় তাঁরা অনশন প্রত্যাহার করলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের প্রথম মামলা আরম্ভ হ'ল ত্রিশ

জনকে নিয়ে। তখনও আঠারজন পলাতক আছেন। পাঁচজন সহকর্মী কিছু মামুলি স্বীকারোক্তি করেছিলেন। পাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য বেরিয়ে পড়ে সেই আশঙ্কায় এবং ঐ মামুলি স্বীকারোক্তিও যাতে প্রত্যাহার করা হয় সে কারণে শ্রীঅনন্ত সিং ২৮শে জুন সরাসরি গিয়ে হাজির হলেন ইলিসিয়াম রোতে এবং প্রহরারত পুলিশের হাতে তিনটি চিঠি পাঠালেন নিজের নাম লিখে তিনজনের কাছে— মিঃ লোম্যান ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদার স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আই. বি. আর আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর শ্রীমন্মথ সেন। তাঁরা চিঠি পেয়েই ছুটে এলেন; তাঁকে সমাদরে বসালেন এবং বন্দী করে চট্টগ্রাম পাঠানো হ'ল। ৩রা জুলাই যখন তাঁকে চট্টগ্রাম জেল ফটকে ঢোকান হয় তখন সমবেত বিচারাধীন বন্দীরা ও অন্যান্য বন্দীরাও সমস্বরে চীৎকার করে ওঠেন 'বন্দেমাতরম্'। ছুটে এলেন জেলকর্তৃপক্ষ কেন চীৎকার হচ্ছে— উত্তর হ'ল 'আমাদের চট্টগ্রামের নেতা এসেছেন।' বাংলার বিপ্লব ইতিহাসের স্মরণীয় দিনগুলি। শ্রীশরৎচন্দ্র বসু গেলেন অনন্তদার পক্ষ সমর্থন করে মামলা চালাবার জন্যে। স্বীকারোক্তি গুলিও একে একে হ'ল প্রত্যাহৃত।

১৯৩০ সনের ১৯শে জুলাই গাইবান্ধা রোড অতিক্রমের সময় সেই সহরের পুলিশ কর্মচারীদের উপর বোমা ফেলা হ'লে কয়েকজন হন আহত। তিন দিন পরে ২২শে জুলাই পুনার ফার্গুসন কলেজের ছাত্র, গভর্ণর স্যার আর্ণেষ্ট হটসনের সামনে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি গুলি করলেন নির্ভয়ে। বুক পকেটের লোহার বোতামে গুলি লেগে গভর্ণর গেলেন বেঁচে।

কয়েকদিনের মধ্যেই অমৃতসর কলেজে কোন এক উৎসব অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিকট শব্দে সকলেই চমকে উঠলেন। আলো জ্বললে দেখা গেল ছাত্র শ্রীপ্রতাপ সিং পুলিশের চর প্রিন্সিপ্যালকে মারবার জন্যে

যে বোমাটি এনেছিলেন সেই বোমাটি ফেটে গিয়ে নিজেই নিহত হয়েছেন। ধরা পড়লেন কয়েকজন। তার মধ্যে ছাত্র শ্রীউজাগর সিং এর ১৯৩০ সনের ২৯শে জুলাই হ'ল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ।

এ সময় চুঁচুঁড়ায় পুলিশের উপদ্রব এড়াবার জন্যে চলে এলুম কলকাতায় আমার মামাত ভায়ের আশ্রয়ে—স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলুম। অনুকুলদা কিছু কিছু জিনিস দিয়ে গেলেন আমার কাছে। তাঁর কর্মকুশলতা চমৎকার—বাংলার বিপ্লবী দলকে তিনি বহু আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন। মনে আছে একবার তাঁর নির্দেশে একজায়গায় রিভলভার কিনতে গেছি। আমার পকেটে আছে একটি খেলনা পিস্তল—বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই সেটা আসল কি নকল। আমার সহকর্মী সরসী মোহনের কাছে দিয়েছি টাকা। গিয়ে দেখি যে লোক দেবে সে নেই তার বদলে অন্য একটি লোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে —মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর তার ঘরের সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—দরজা জানালা সব বন্ধ। দেখেই সন্দেহ হ'ল এর ভেতর পুলিশের লোক নেই ত? লোকটি জোর গলায় বললে 'টাকা এনেছেন ত?' তাকে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কথা বলতে শুনেই আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। আমি ঘাড় নেড়ে ইসারায় জানালুম টাকা আছে। এমন সময় লক্ষ্য করে দেখি যে গাড়ীর জানলার খড়খড়ি অল্প অল্প উঠছে নামছে। সঙ্গে সঙ্গে সরসীমোহনকে ইসারা করতেই সে দিল দৌড়—আমিও যেই দৌড়ুতে যাব অমনি একজন লোক গাড়ীর দরজা খুলে নামতে যাচ্ছে দেখে আমি দ্বিধামাত্র না করেই সেই খেলনা রিভলভারটা তাঁর দিকে উঁচিয়ে ধরতেই সে ভয়ে ধপাস করে পা'দানির উপর বসে পড়ল। অন্য একজন অপর পাশ দিয়ে ঘুরে আসবার আগেই আমি প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে চলে গেছি। ছেলে বয়েসে খুব দৌড়ুতে পারতুম। এসে অনুকূলদাকে বললুম, তিনি বুদ্ধির তারিফ করলেন।

পরের দিন আমি কলেজ থেকে বেরুচ্ছি একজন আই. বি. পুলিশের লোক বললে 'চল ইলিসিয়াম রো—হুকুম।' সেখানে আমাকে নানারকমের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হ'ল। একজন অফিসার মুরুব্বি চালে বললেন 'রিভলভার কিনতে যাওয়া হয়েছিল—কাছে ক'টা আছে?' ইত্যাদি নানা রকমের ব্যঙ্গোক্তি। মৌলমীনের অভিজ্ঞতা ছিল—মনে পড়ল ভদ্রলোক বলেছিলেন Costly mistake—কাজেই চুপ করে না থেকে সরাসরি অস্বীকার করলুম। প্রায় তিন চার ঘণ্টা পর ছাড়া পেলুম।

১৯৩০ সনের ২রা আগষ্ট সরকারী গুদাম লুট করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করতে গেলে একজন কনেষ্টবলকে গুলিতে প্রাণ দিতে হয় ঢাকায়। ২৫শে আগষ্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার বেলা ১১ টার সময় যখন তাঁর বাসা কীড্ ষ্ট্রীট থেকে লালবাজার চলেছিলেন তখন ডালহৌসী স্কোয়ারের পূবদিকে পর পর দু'টী বোমা ছুড়ে তাঁকে মারবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কি সৌভাগ্যের জোর! গাড়ীর ভেতর তিনি রইলেন অক্ষত আর যিনি বোমা ছুড়েছিলেন তিনি আহত হয়ে ধরা পড়লেন '৪৫০ বোরের রিভলভার নিয়ে। লালবাজার থানায় নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে খুলনার সেনহাটির শ্রীঅনুজাচরণ সেনগুপ্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—। ঠিক এই সময় তাঁর সহযোগী ল'কলেজের ছাত্র বসিরহাট নিবাসী শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠেন। একজন কনেষ্টবল তাঁকে তাড়া করে ও একজন টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী তাঁকে ধরলে তিনি রিভলভার দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে ওয়েলেসলী প্লেসের দিকে দৌড় দেন। পরে ধরা পড়লেন। তাঁর কাছে '৩২০ বোরের একটি ছ'ঘরা রিভলভার পাওয়া গেল। বিচারে ১৯৩০ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর ২০ বছরের দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়। তাঁকে পাঠানো হ'ল মেদিনীপুর জেলে 'সি' শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে।

আরম্ভ হ'ল ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা। ধরা পড়লেন ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র রায়, ডাঃ ভূপাল চন্দ্র বসু, সর্বশ্রীসুধী প্রধান, অদ্বৈত দত্ত, সুধীর সেন, দেবকুমার গুপ্ত, সীতাংশু চক্রবর্তী, কালিপদ ঘোষ, সুরেন্দ্র দত্ত, যতীশ ভৌমিক, অম্বিকা রায় প্রমুখ বিপ্লবীরা। সেই মামলায় ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র রায়, ও ডাঃ ভূপাল বসুর উপর পুলিশ যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল তা কথায় বলা যায় না। সহকর্মীদের বাঁচাবার জন্যে ডাঃ রায় সব দোষ নিলেন নিজের উপর—করলেন দলপতির যোগ্য কাজ। ১৬ই সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে ধরা পড়লেন শ্রীমতী রেণু সেন। ১৬ দিন হাজত বাসের পর তাঁকে রাজবন্দী করে রাখা হ'ল। এই মামলায় যিনি স্বীকারোক্তি করে রাজসাক্ষী হলেন সেই শ্রীসীতাংশু চক্রবর্তীকে সরকার বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ লণ্ডনে উচ্চশিক্ষার জন্যে পাঠালেন। শ্রীকালিপদ ঘোষের ধরা পড়ার খবরটাই লোকে শুনলেন তারপর আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বিচারে ডাঃ রায় ও ডাঃ বসুর পনর বছরের, সর্বশ্রীসুরেন্দ্র দত্তের বারো বছরের আর যতীশ ভৌমিকের ছু'বছরের জেল হয়ে গেল। প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেন সর্বশ্রীরসিক দাস, অদ্বৈত দত্ত ও অম্বিকা রায়। সঙ্গে সঙ্গে বিনা বিচারে তাঁরা বন্দী হলেন।

তিনজন বাদে সকলেরই বিভিন্ন মেয়াদের জেল হয়ে গেল। এর চারদিন পরে ২৯শে আগষ্ট ইনস্পেক্টর জেনারল অফ পুলিশ মিঃ লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপার মিঃ হডসনকে গুলি করলেন বিপ্লবীরা ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে। নারায়ণগঞ্জের অসুস্থ রিভার পুলিশ-সুপারকে তাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন। হাস-পাতালের প্রাঙ্গনে যখন ছু'জন দাঁড়িয়ে সুপারিণ্টেণ্ডের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তখন সকাল সওয়া ন'টার সময় তাঁদের ছু'জনেকে গুলি করে আত্মগোপন করলেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার কোরের শ্রীবিনয় বসু। ছু'দিন পরে ৩১শে মিঃ লোম্যান গেলেন

মারা আর মিঃ হডসন হলেন জন্মের মত বিকলাঙ্গ। পাঁচটি গুলির একটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি—মিঃ হডসনের গায়ে তিনটে আর মিঃ লোম্যানের গায়ে দু'টি বুলেট লেগেছিল। এ কাজের ভার পড়েছিল শ্রীবিনয় বসুর উপর। তিনি বড়লোকের ছেলে বলে কেউ কেউ সন্দেহ করেছিলেন যে তাঁর উপর ঐ ভার দিলে হয়ত তিনি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসবেন, না হয় সব পণ্ড করে দেবেন। এটা জানতে পেরে তাঁর মনে জেগে ওঠে দুর্জয় অভিমান, কেঁপে ওঠে প্রাণের আবেগ। মনে মনে সংকল্প করে বসলেন যে যেমন করেই হোক নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করবেনই। তাই শ্রীবিনয় বসু দিলেন অব্যর্থ লক্ষ্যের পরিচয়—সরেও পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর নাম কিন্তু প্রকাশ হয়ে পড়ল। পুলিশ অকৃতকার্য হয়ে বেপরোয়া মার দিলেন মেডিক্যাল মেসের ছাত্রদের—ফলে সেই দিনই একান্নজন আহত ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হ'ল। শ্রীসঙ্ঘের মেজদা শ্রীহরিদাস দত্তের সাহায্যে ও রক্ষণায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় শ্রীবিনয় বসু আত্মগোপন করে রইলেন। বিফল মনোরথ পুলিশ গুণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সারা ঢাকা সহরে আরম্ভ করে দিল বেপরোয়া লুটতরাজ। সুবিধা-বাদী গোরা ও উন্মাদ গুণ্ডারা সেদিন বাংলাদেশের ভাগ্যবিধাতা। অন্ধকাল শুধু চেয়ে রইল অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

কলকাতায় ১৯৩০ সনের ২৬শে আগষ্ট জোড়াবাগান পুলিশ-কোর্টে একটা বোমা ফাটান হয় আর তার পরদিনই ইডেন গার্ডেন্সের পুলিশ ফাঁড়িতেও অনুরূপভাবে বোমা পড়ে। ২৯শে আগষ্ট দেশবন্ধু পার্কে নিহত হন পুলিশের চর শ্রীরতন ভূষণ হাজরা। ৩০শে আগষ্ট মৈমনসিং গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীপবিত্র বসুর বাড়ীতে বোমা পড়ে—কিন্তু সকলের ধারণা তিনি নিজের প্রাধান্য বাড়াবার জন্যে ও 'রায় সাহেব' খেতাবের আশায় নিজেই একাজ করেন।

১৯৩০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যের সময় মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে দিয়ে আসছি সেই সময় একজন পুলিশ ওয়াচারের সঙ্গে দেখা। তিনি কয়েকবার আমাকে ইলিসিয়াম রোতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রায়ই দেখতুম কোন না কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে কখনও গম্ভীর হয়ে থাকতেন কখনও বা হাসতেন। একদিন কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন যে যখন কোন অফিসার কাছাকাছি থাকেন তখন তিনি গম্ভীর হয়ে থাকেন। সেদিন দেখি তিনি হাসছেন। বললুম ব্যাপার কি? বললেন, 'ভালো—এখন সাজ সাজ রব CAT সাহেব আপনার চাটগাঁয়ের বন্ধুদের খবর পেয়েছেন আজ রাতে যেতে হবে, তবে কোথায় যেতে হবে জানি না। টেগার্ট সাহেবকে আমরা কোডে Cat বলতুম Charls Arthur Tegart শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি করি কিছুই ঠিক না করতে পেরে ছুটলুম জুলুদার ফ্রাঙ্কুল ষ্ট্রিটের দোকানে। যদি কোন রকমে তাঁদের খবর দিয়ে সরিয়ে দিতে পারি। দেখা হ'ল না। অনুকূলদার সঙ্গেও দেখা হ'ল না। নিজেও জানি না তাঁরা কোথায় আছেন। নিরুপায়ের মত মনে হ'ল নিজেকে। দুশ্চিন্তায় মন গেল ভেঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই রাতেই চন্দননগর গোন্দলপাড়ায় ধরা পড়ে গেলেন। ব্যাপারটা এই—চন্দননগরে তখনকার দিনে এঁদের লুকিয়ে রাখার খুবই অসুবিধে ছিল। শ্রীভুপেন্দ্রনাথ দত্তের পরামর্শে ঠিক হয় যে চন্দননগরের কাশীশ্বরী পাঠশালার জন্যে একজন বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রী যদি পাওয়া যায় তা হ'লে তাঁর আত্মীয় বলে তাঁর কোয়ার্টার্সে কয়েকজনকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। স্কুলের সম্পাদক বসন্ত বাবু আর নরেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাই বন্দোবস্ত করলেন। ঠিক হ'ল সুহাসিনী দেবী প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হিসেবে এবং শ্রীশশধর আচার্য তাঁর স্বামী পরিচয়ে চন্দননগরে আসবেন। বসন্তবাবুর ভাই শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় একটি বাসা ভাড়া করা

হ'ল, স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর নামে। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাহায্যে বসন্তদা' আনলেন তাঁদের সে বাড়ীতে। এখানে এঁরা ছিলেন তিনচার মাস। রাত্রে যখন টেগার্ট সাহেব বাড়ী ঘেরাও করেন তখন দু'পক্ষের গুলি বিনিময় চলে। শ্রীমাখন ঘোষাল ওরফে জীবন গুলিতে প্রাণ দিলেন। তিনি যখন পুকুরের ধার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলেন তখনই কয়েকটা গুলি তাঁর গায়ে লাগায় পুকুরের জলে পড়ে যান। ধরা পড়লেন সর্বশ্রীগণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত। হয়ত এঁরা আরও কিছুক্ষণ গুলি চালাতে পারতেন কিন্তু তা' আর হয়নি। একজন প্রতিবেশী পাশের বাড়ী থেকে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় একটি সার্জেণ্ট সে দিকে আলো ফেলে গুলি করেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভদ্রলোক বেঁচে যান।

ফরাসী আইনানুসারে সন্ধ্যের পর থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত কোন খানাতল্লাসীর নিয়ম ছিল না। একজন মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাত সাড়ে তিনটায় একজন ইংরেজ পুলিশ কর্মচারী ফরাসী পণ্ডিত সাহেব প্রোক্যুরার বাড়ী ছুটে যান এবং বলেন 'আপনি চলুন একজন খুন হয়েছে।' টেগার্ট সাহেব নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রোক্যুরার কাছে বললেন যে এঁরা বাড়ী থেকে পালাবার চেষ্টা করছিলেন এবং ইংরেজ সার্জেণ্টদের দেখে গুলি করেছিলেন তাই সার্জেণ্টরা আত্ম-রক্ষার জন্যে গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়েছে। যাই হোক্ যাঁরা গোপন সংবাদ দিয়ে পুলিশ এনেছিলেন তাঁদের হ'ল রাতারাতি পদোন্নতি। একজন চলে গেলেন লণ্ডন আর অন্যজনের সামান্য একাউণ্টস্ ক্লার্ক থেকে ঐশ্বর্যের গতি ফিরল গোপন অজানা পথ ধরে। কিন্তু ভগবান তা' সইলেন না। পুরস্কারের সৌভাগ্য ভোগ করবার আগেই তাঁর এসে গেল পরপারের ডাক। প্রথম জন সেই রাত্রেই সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। পরে সরকারের অনুগ্রহে চলে যান লণ্ডন। শোনা যায় তিনিই ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলার গোপন তথ্যও পুলিশকে জানিয়ে ছিলেন।

পরের দিন পুকুরে জাল ফেলে শ্রীমাখন ঘোষালের মৃতদেহ তোলা হ'ল। সেই দেহ পরীক্ষা করলেন ডাঃ আশুতোষ দাস আর আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করলেন ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। বন্দীরা চন্দননগর পুলিশের কাছে কোন কথা বললেন না বা ফরাসী আইনের আশ্রয়ও নিলেন না। টেগার্ট সাহেব তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন চুঁচুড়ায়। শশধর বাবু ও শ্রীমতী সুহাসিনী দেবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে শশধর বাবুকে মুক্তি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় ফৌজদারী সংশোধিত আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যান্য বন্দীদের চট্টগ্রাম পাঠানো হ'ল। তখনও অনেকে পলাতক রইলেন।

১৯৩০ সনের সেপ্টেম্বরে খুলনার থানায় একটি বোমা ফেলা হয়। তখন বাংলা ও পাঞ্জাবে বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। পুলিশের একজন অধিকর্তা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও দসেরা বোমার মামলা পরিচালনা করছিলেন। তাঁকে ১৯৩০ সনের ৪টা অক্টোবর লাহোর ক্যান্টনমেন্টে মলের দিকে একটি মোটরে যেতে দেখে ক্যানেলের ধার থেকে একজন গুলি চালালেন। খাঁ বাহাদুর সৌভাগ্যক্রমে গেলেন বেঁচে কিন্তু তাঁর আর্দালীর গায়ে লাগল গুলি। ১০ই অক্টোবর তার ঘটল দেহান্তর। খাঁ বাহাদুর হলেন শঙ্কাইত। সরকার পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা হয়ে গেল যে যিনি এই যুবকের সন্ধান দিতে পারবেন বা তাঁকে ধরে দিতে পারবেন তাঁকে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে—কিন্তু অর্থলোভ কোন কাজে লাগল না।

১৯৩০ সনের ৭ই অক্টোবর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় বের হ'ল। শ্রীভগৎ সিং, শ্রীশিবরাম রাজগুরু ও শ্রীশুকদেবের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেল। আর সর্বশ্রী এম. জয়দেব, মহাবীর সিং, গয়াপ্রসাদ, এম. কিশোরীলাল, বিজয় কুমার সিংহ, শিব বর্মা, কানওয়াল নাথ তেওয়ারী ও আর একজনের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; কুন্দনলালের সাত বছর ও প্রেমদত্তের পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল। মুক্তি-

পেলেন সর্বশ্রীঅজয় কুমার ঘোষ, এল. দেশরাজ, আর্যরাম, যতীন্দ্র-নাথ সান্যাল, সুরিন্দর পাণ্ডে, ব্রহ্মদত্ত মিশ্র ও এল. রামশরণ দাস। শ্রীবটুকেশ্বর দত্তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলে নেওয়া হয়েছিল। রায় শুনে শ্রীভগৎ সিং বললেন 'জেলে পচার চেয়ে ফাঁসিকাঠে যাওয়া ঢের বেশী আনন্দের।' বন্দীদের আত্মীয়েরা করলেন শেষ চেষ্টা প্রিভি কাউন্সিলে আপীল।

এসময় রেল দুর্ঘটনায় দু'জন তরুণ বিপ্লবী প্রাণ হারালেন জলপাইগুড়িতে—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত আর শ্রীবীরেন রায়চৌধুরী। তাঁরা টেলিগ্রাফের তার কেটে কেটে চলেছিলেন। চেঁচুয়া হাটে এ সময় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল।

১৯৩০ সনের ১৩ই অক্টোবর মৈমনসিং জামালপুরে রিভলভার নিয়ে ধরা পড়লেন শ্রীসুধীন্দ্র কুমার রায়। তাঁর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। অস্ত্র আইনে জেল হয়ে গেল চার বছর। ঐ দিনই মৈমনসিং জেলার আই. বি. সাবইন্সেপেক্টর ও তাঁর দেহরক্ষী যখন ওয়ার হাউস লুটের মামলার দু'জন ফেরারকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করেন তখন তাঁরা গুলিবিদ্ধ হলেন।

লাহোরে তখন অনেককেই পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। রাওল-পিণ্ডির বিশবছরের তরুণ শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথের জন্যে মোটা টাকা পুরস্কারের ঘোষণা হয়ে গেছে। ১৯৩০ সনের ৪ঠা নভেম্বর পুলিশ তাঁর গোপন সন্ধান পেয়ে লাহোর ক্যান্টনমেণ্টের ধরমপুরায় তাঁর বাড়ীতে হানা দিলেন। সেখানে ছিলেন দু'জন পলাতক বিপ্লবী। আরম্ভ হ'ল দু'পক্ষের গুলি বিনিময়। একটা গুলি শ্রীবিশ্বেশ্বর নাথের পিঠ ভেদ করে চলে গেল। মেয়ো হাসপাতালে অপারেশন করবার পর ৫ই নভেম্বর তিনি মারা গেলেন—অমৃতের দুর্গপ্রান্তে মৃত্যু তার খুলে দিল দ্বার। অন্যজন সরে পড়লেন।

১৯৩০ সনের ১লা ডিসেম্বর পুলিশ কানপুরের দয়ানন্দ অ্যাংলো

বেদিক কলেজে তল্লাসী চালাবার সময় পলাতক বিপ্লবী শ্রীসালিগ্রাম শুক্লা সরে পড়ছিলেন। একজন কনেষ্টবল তা' দেখতে পেয়ে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করতেই তিনি রিভলভার বের করে তিনজন পুলিশ অফিসারকে পর পর তিনটি গুলি করে পালাবার চেষ্টা করলেন। একজন কনেষ্টবল শ্রীপ্রেমবল্লভ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে মারা গেলেন। সমস্ত পুলিশবাহিনী ও দু'জন ইউরোপীয়ান অফিসার ছুটে এলেন তাঁকে ধরবার জন্যে। একজন সার্জেন্ট শ্রীশুক্লার কপাল লক্ষ্য করে গুলি করায় তিনি পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালেন। একটু পরে জ্ঞান ফিরতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে মারা হ'ল। একজন সত্যিকারের বীর যোদ্ধা চলে গেলেন।

ঐ দিনই পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ ক্রেইগ চট্টগ্রাম পরিদর্শনান্তে চলেছিলেন লাকসাম চাঁদপুর হয়ে ঢাকায়। তাঁকে চাঁদপুরে স্বাগত জানাবার জন্যে লাকসাম ষ্টেশন থেকে বেলা দু'টোর সময় পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীতারিনী মুখার্জী সেই ট্রেনেই উঠলেন। বেলা ৪ টার সময় তিনি চাঁদপুরে নামবার দু'এক মিনিটের মধ্যে দু'জন—শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও শ্রীকালিপদ চক্রবর্তী তাঁকে পিছন দিক থেকে গুলি করলেন। তিনি দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়ে গেলেন—অন্যান্য পুলিশেরা ভয়ে দিল দৌড়। মিঃ ক্রেইগ তাঁর কামরা থেকে দেখতে পেয়ে এঁদের দুজনের দিকে কয়েকটা গুলি ছুড়লেন কিন্তু প্রত্যেকটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। তাঁর দেহরক্ষীরা গুলি করলেন কিন্তু তা' কোন কাজেরই হ'ল না। পুলিশের লক্ষ্য আর বিপ্লবীর লক্ষ্যের ব্যবধান অনেক। শ্রীতারিণী মুখার্জী মিঃ ক্রেইগকে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন আর বিপ্লবী দু'জন এসেছিলেন মিঃ ক্রেইগকে মারতে কিন্তু মৃত্যু স্বাগত জানাল শ্রীমুখার্জীকে; মিঃ ক্রেইগ বেঁচে গেলেন। এঁরা দু'জন সরে পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে শ্রীতারিণী মুখার্জী শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করলেন। তখন চারদিকে লোক ছুটেছে এ দু'জনকে ধরবার জন্যে। অ্যাডিসন্যাল পুলিশ সুপার মোটরে ছুটলেন—প্রায় বাইশ মাইল দূরে মেহেরকালি রেল ষ্টেশনের কাছে দেখলেন দু'জন আত্মগোপনের চেষ্টা করছেন। তাঁরা ধরা পড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও তাঁর সঙ্গীর কাছে দুটি রিভলভার আর একটি অ্যালুমিনিয়ম বোমা পাওয়া গেল। ১৯৩১ সনের ৩রা জানুয়ারী স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার হয়ে ২৪শে জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি ও শ্রীকালিপদ চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল। হাইকোর্টে আপীলে কোন ফল হ'ল না। ১৯৩১ সনের ৪ঠা আগষ্ট আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। এই শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের আগে বোমা তৈরীর সময় বোমা ফেটে সাংঘাতিকভাবে আহত হন ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাঁর সঙ্গে আহত হন শ্রীঅমরেন্দ্র নন্দী। অন্য একজায়গায় একইভাবে আহত হন শ্রীঅর্ধেন্দু দস্তিদার। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅমরেন্দ্র তাঁদের আহত অবস্থার জন্যে অস্ত্রাগার আক্রমণে সক্রিয় অংশ নিতে পারেন নি। শরীর চর্চায় ও ছাত্রহিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অদ্বিতীয়। ১৯২৮ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় জেলায় প্রথমস্থান অধিকার করেছিলেন। —চলে গেলেন বাংলা মায়ের একটি বীর সন্তান।

শ্রীবিনয় বসু ও তাঁর সহকর্মীরা তখন আত্মগোপন করে আছেন। শ্রীবিনয় বসু আছেন মেটিয়াবুরুজে শ্রীরাজেন গুহের বাড়ীতে আর শ্রীদীনেশ গুপ্ত ওরফে নসু আর শ্রীবাদল গুপ্ত ওরফে সুধীর আছেন নিউ পার্ক ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে এখন 'রসযোগ' খাবারের দোকান হয়েছে তারই দোতলায়। একদিন খবর এল রাইটার্স বিল্ডিংএ একটা মিটিং হবে—তাতে স্যার চার্লস টেগার্ট প্রমুখ অনেকগুলি হোমরা চোমরা ধুরন্ধর থাকবেন। এঁরা ঠিক করলেন যে এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। স্থির হ'ল শ্রীবিনয় বসুকে আনবেন শ্রীরসময় সুর,

শ্রীদীনেশ ও শ্রীবাদলকে আনবেন শ্রীনিকুঞ্জ সেন। খিদিরপুরের পাইপ রোডের মোড় থেকে তিন বন্ধু পরম আনন্দে সাহেবী পোষাকে হাজির হলেন সরকারের খাস দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংএ ১৯৩০ সনের ৮ই ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময়। তাঁরা কিন্তু জানতেন না যে এ মিটিংএর সময়টা কোন কারণে বদলে গেছে। তা' না হলে সব ক'জনকে এঁরা পেতেন একজায়গায় আর মনের আনন্দে সেদিন স্মৃতি অর্পণ করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মোৎসর্গ-কারী বীরদের—কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁরা মারতে পারলেন শুধু একজনকে। জেলের অধিকর্তা কর্ণেল সিমসন ছাড়া আর কেউ মরলেন না। কেউ বা পালালেন বৃষ্টির পাইপ ধরে, কেউ বা হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ বা ছুটে। দেবতার মন্দিরে পৌঁছুল না আমাদের নৈবেদ্য।

প্রথমে তাঁরা জেলের অধিকর্তা কর্ণেল সিম্পসনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আর্দালী তাঁদের একটা পরিচয় পত্রে নাম সই করতে বলে। তাঁরা আর্দালীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সরাসরি কর্ণেলের ঘরে ঢুকে তিনজনেই গুলি করলেন। কর্ণেল সিম্পসন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন—এঁরা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে চললেন পূবদিকে। কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী এঁদের দিকে একটা চেয়ার ছোড়বার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা তাঁকেও গুলি করলেন। তারপর তাঁরা ফাইনান্স মেম্বারের ঘরের দিকে এসে আর্দালীকে জিজ্ঞেস করলেন সাহেব আছে কিনা। সে ভয়ে বলল 'না'—এঁরা সে ঘরের দিকে কয়েকটা গুলি ছুড়লেন। গুলির শব্দ শুনেই পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল রিভলবার হাতে বেরিয়ে এসে এঁদের দিকে গুলি ছুড়লেন পিছন থেকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। একজন সার্জেণ্ট তাঁর হাত থেকে রিভলভার নিয়ে ছুড়লেন—কিন্তু ভয়ে তাঁর তখন হাত কাঁপছে গুলি লাগল না। অ্যাসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশও রিভলভার হাতে বেরিয়ে এসে গুলি করলেন—কিছুই হ'ল না। বড় বড় কর্তাদের রিভলভারের নিশানার নমুনা দেখে হয়ত সকলেই মনে

মনে হাসবেন। এঁরা তিনজনে ঢুকলেন পাসপোর্ট অফিসে—একজন বিদেশী পর্যটক ও অফিসের বাবু সাক্ষাৎ শমনরূপ তিনজনকে দেখেই পালিয়ে গেলেন। তখন জুডিসিয়াল সেক্রেটারীকে ঘর থেকে দরজা খুলে উঁকি মারতে দেখে এঁরা তাঁকে গুলি করলেন বুলেটটা গিয়ে লাগল উরুতে। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাশের ঘরে নিলেন আশ্রয়। তাঁরা শেষ ঘরে গিয়ে দেখলেন যে একজন কনেষ্টবল ঘর পাহারা দিচ্ছে। তাকে গুলি করলেন এঁরা। তখন লালবাজারে খবর চলে গেছে। পুলিশের ছোট বড় কর্তরা ছুটে এলেন—কিন্তু কেউই ঘরে ঢুকতে সাহস করলেন না। একজন কনেষ্টবলকে উঁকি মেরে দেখতে বললেন। চমৎকার!

তিন বন্ধুতেই খেয়েছিলেন পটাসিয়াম সায়েনাইড। কনেষ্টবল দেখল যে দু'জন ঘরের মেঝেয় পড়ে রয়েছেন, আর একজন চেয়ারে বসে আছেন, কিন্তু তাঁর মাথাটা পড়েছে এলিয়ে। শ্রীবাদল গুপ্ত মারা গেলেন সঙ্গে সঙ্গে—'উচ্ছ্বসিল সূর্যালোক তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।' শ্রীবিনয় বসু ও শ্রীদীনেশ গুপ্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শ্রীবিনয় বসু নিজের গায়ে রিভলভার চালিয়েছিলেন, তবুও পাঁচদিন পরে অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বর মারা গেলেন—আর দীনেশ গুপ্ত সে অবস্থাতেও কোন অজ্ঞাত কারণে গেলেন বেঁচে। ২৭শে মার্চ হাইকোর্ট, স্পেশাল ট্রাইবুনালের ১৭ই মার্চের রায় মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখলেন।

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের দুর্দান্ত শক্তির—এঁরা উপাসক, দুঃখে দৈন্যে অপমানে নতশির পরাধীন দেশবাসীর বেদনায় তাঁরা ব্যথাতুর—তাই তাঁদের মধ্যে সেই ধ্বংসের লীলা, যা' মহৎ সৃষ্টির পূর্বাভাস। বিপ্লবের পথ এঁদের কাছে পরম রমণীয় 'মৃত্যুর গর্জন তারা শুনেছে যে সঙ্গীতের মত।' ১৯৩১ সনের ৭ই জুলাই হাসতে হাসতে ফাঁসি কাঠে দীনেশ গুপ্ত প্রাণ দিলেন। অন্ধতমিস্র রজনীর অবসানে চলে গেলেন মৃত্যুহীন পারাবারে।

স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়বার সময় একটি মেধাবী ছাত্র অকারণে আমার সঙ্গে সৌহার্দ্য গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলেন দেখে আমার তাঁকে খুবই সন্দেহ হয়েছিল পুলিশের লোক বলে। তখন আমরা অতিরিক্ত সাবধানী। সেই ছাত্রটির অশোভন কৌতূহল দেখে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল। আমি যতই তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাই, তিনি ততই আমার সান্নিধ্য বেশী করে পেতে চান। আমার হুগলী কলেজের বন্ধু শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ত—আমার গোপন ইতিহাসের সঙ্গে তার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। তাকে বললুম আমার সন্দেহের কথা। সে বললে, 'অচ্যুত খুব ভাল ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিল—হয়ত তোমার ইতিহাস শুনেছে তাই শ্রদ্ধা আছে।' আমার কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না। একদিন কলেজে গিয়ে শুনলুম অচ্যুত ঘোষ আত্মহত্যা করেছেন প্রণয় প্রত্যাখ্যাত জীবনের অবসান ঘটিয়ে—লিখে রেখে গেছেন একটি সুন্দর কবিতা 'বিদায় বিদায় সাহারা হিয়ায়, ফোটে না ফোটে না ফুল' ইত্যাদি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি অবিচার না করেছিলুম নিরপরাধের উপর। ক্ষোভের অশান্তি রইল ক'দিন কিন্তু আমাদের সে রকম না করেও তো কোন উপায় ছিল না।

একবার আমাদের দলের কোন বড় অফিসারের পরামর্শে জাহাজে চাকরির দরখাস্ত করেছিলুম। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ আর্কুহার্ট তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য—তিনি দরখাস্ত সুপারিশ করে দিলেন। আমার বিরুদ্ধে কোন পুলিশ রিপোর্ট আছে কিনা জানবার জন্যে দরখাস্তখানা এসে পৌঁছুল লর্ড সিংহ রোডে। আবার আমার ডাক পড়ল সেখানে। একজন অফিসার ব্যঙ্গ করে বললেন 'জাহাজে চাকরির দরখাস্ত করা হয়েছে—কেন যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধে হবে বলে?' আমি কিছু বলবার আগেই বললেন 'আবার বড় লোকের সুপারিশ ধরা হয়েছে যে?' উত্তরে বললুম 'সুপারিশ

ধরতে গেলে বড় সুপারিশ ধরাই ভাল।' ছোট মুখে বড় কথা—তাঁর সে কথাটা সহ্য হ'ল না। 'ফাজিল ছেলে' বলে গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। মনে করলুম এ ত আমাদের প্রতিদিনের পাওনা জিনিস।

যাঁর কথায় চাকরির দরখাস্ত করেছিলুম, তিনি রাইটার্স বিল্ডিংএ বড় চাকরি করতেন। তাঁর উপর আমার খুবই শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অবশ্য প্রতিপদেই আমাকে সাবধান করে দিতেন যে, লোককে বিশ্বাস করা শক্ত। আমাকে কাগজে কলমে দেখিয়েছিলেন যে দু'চারজন যাঁরা দেশনেতা বলে পরিচিত তাঁরাও গোপনে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ পান। সমস্ত বিশ্বাস এক মুহূর্তে ভেঙ্গে গিয়েছিল। যাক্ তাঁকে গিয়ে বললুম 'আপনার জন্যেই আমাকে মার খেতে হ'ল।' তিনি সবটা শুনে কি ভাবলেন তারপর বললেন 'কথাটা ডাঃ আর্কুহার্টকে ব'লো।' আমারও দুষ্টু বুদ্ধি জাগল—বললুম প্রিন্সিপ্যালকে 'আপনার সুপারিশের জন্যে আমাকে চড় খেতে হ'ল।'

ডাঃ আর্কুহার্ট তখন মহাসম্মানী লোক। তিনি বললেন 'কে সে লোকটি?' বললুম 'নাম ত জানি না।' 'আচ্ছা যাও' বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন। মনে হ'ল কথাটা না বললেই হ'তো। পরের দিন ক্লাস করছি এমন সময় তাঁর কাছ থেকে নোট এল 'রোল নং ১৮১ যেন ক্লাসের শেষে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে।' গেলুম—দেখলুম দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তিমান—যিনি চড় মেরেছিলেন। ঘরে ঢুকতেই প্রিন্সিপ্যাল গম্ভীর মুখে বললেন, 'ঐ লোকটি কি তোমায় মেরেছিল?' 'হ্যাঁ স্যার'। আচ্ছা যাও। কলেজের শেষে যখন বাড়ী ফিরছি দেখি তিনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। ভারি আনন্দ হ'ল—দুর্বলের আত্মপ্রসাদ, দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত কি হয়? আশুনাথবাবু ছিলেন কলেজের কেরাণী। তাঁর শরণাপন্ন হলুম

—বললুম ব্যাপারটা। একদিন সিনেমা দেখাতেও রাজী হলুম। তিনি বললেন লক্ষ্য রাখব।

পরের দিন সব শুনলুম। সাহেব জিনিসটা নিজের অপমান বলে ধরে নিয়ে লোকটিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও অপমান করেছেন। তিনি মাপ চেয়ে তবে রেহাই পেয়েছেন।

১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাস। কলেজের আসন্ন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের তোড়জোড় আরম্ভ হয়েছে। পৌরোহিত্য করবেন স্বয়ং বড়লাট লর্ড আরউইন। কাজেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দরকার। ব্যবস্থা হয়ে গেল। কাজের ভার পড়ল আমারই উপর। তখন দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা শ্রীপান্নালাল মিত্র। তিনি ব্যবস্থা করলেন আর অনুকূলদা দিলেন উৎসাহ। মনে আনন্দ আর ধরে না—একটা কাজের মত কাজ, কেবলই মনে হয় এ সৌভাগ্য থেকে যেন বঞ্চিত না হই। সেই দিনটার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকি। ঠিক হ'ল দু'টি বোমা দু'একদিন আগে লুকিয়ে রেখে আসতে হবে। আমি আর একজন—দু'জনে দু'পাশ থেকে দু'টি বোমা ছুড়ব এবং পরক্ষণেই রিভলভার চালাব। সঙ্গে থাকবে পটাসিয়াম সায়েনাইড। আমার সঙ্গীকে তখনও চিনি না, সেও বোধ হয় আমাকে চেনে না, ঠিক ছিল কাজের দিনে কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিয়ে পরস্পর পরস্পরকে চিনব। কত সতর্ক হতে হয় বিপ্লবীদের।

আমার কোন সহপাঠিনী কেমন করে আমার পরিচয় জেনে ছিলেন জানি না। হয়ত মনে মনে কিছু শ্রদ্ধাও জন্মেছিল আমার উপর—দু'একবার তা প্রকাশ করবার চেষ্টাও করেছিলেন; কিন্তু তখন আমি নীরস খট্‌খটে মানুষ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক।' হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর কথা—তাঁকে গিয়ে বললুম 'আমার একটু উপকার করবেন—দু'টো জিনিস আপনাদের কমনরুমের কোন গোপন জায়গায় একদিন লুকিয়ে রেখে আসবেন—যখন চাইব তখন যেন পাই।' কি ভাবলেন জানি না মুখের

দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন, বললেন 'ও তুবড়ি বাজীর পটকায় কি দেশ উদ্ধার হবে?' তাঁর অবজ্ঞার কর্কশ হাসিতে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল—মুখে তা' প্রকাশ না করে বললুম 'পারবেন কিনা বলুন?' মনে হল 'মেয়েদের সহজ বুদ্ধি বোধ হয় পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ।' যাক্ তিনি রাজী হয়ে গেলেন যে কোন কারণেই হোক্। বললুম 'ধন্যবাদ'।

ব্যবস্থা হ'ল কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন—আমার ভাগ্যেই হয়ত এ রকমটি হয়। কোন কারণে বোধ হয় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে পড়ল—বড়লাট আসবেন না বলে খবর এসে গেল। তাড়াতাড়ি বোমা দু'টি সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলুম। কিন্তু কি করে পুলিশ জানতে পারল? সঙ্গীটির কথা শুনলুম সে অবিশ্বাসী নয় তবে হয়ত অসাবধানী। পুলিশের সমস্ত সন্দেহ পড়ল আমরাই ওপর। দু'এক জায়গায় খানাতল্লাসী হ'ল। এ সুযোগের এমন পরিসমাপ্তি দেখে মনটা কিন্তু খুব মুষড়ে গেল। কত আকাশ কুসুম কল্পনা—কত চিন্তা কেমন করে কাজটা করব। কত কষ্টে যে রিভলভার দু'টি যোগাড় করেছিলুম—নিজের জীবনকে বিপন্ন করে অথচ কিছুই করতে পারলুম না। মনটা অবসাদে গেল ভরে। সমস্ত আনন্দ ধুলিসাৎ হয়ে গেল ব্যাবিলনের সৌধচূড়ার মত।

রিভলভার দু'টি যোগাড় করার ব্যাপারটা এই—অনুকূলদা একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন সন্ধ্যের পর সেখানে যেতে। মিঃ জন বলে একজন ফিরিঙ্গি দু'টো জিনিস দেবেন। সঙ্কেত মত আমার পরিচয় দিতে হবে। কথামত ঠিকানা মিলিয়ে ওয়াটগঞ্জ অঞ্চলে বাড়ীটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি ধর্মশালা বিশেষ —সব রকম জাতের পতিতালয় সেটা। মদের দুর্গন্ধ, পেঁয়াজের পচা খোসা, ডিমের খোলা চারদিকে পচা পচা গন্ধ। গা বমি বমি করতে লাগল। মনে মনে ভাবলুম—অনুকূলদা কোথায় পাঠালেন? ঘরের নম্বর ধরে দরজার সামনে দাঁড়াতে একটি

স্থূলাঙ্গিনী ফিরিঙ্গি মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি চাও? বললুম—মিঃ জনের খোঁজে এসেছি। 'এখানে অপেক্ষা কর' বলে ঘরের ভেতর একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। আমি লজ্জায় অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করছি। ভয় পাছে দেখে কেউ কিছু মনে করে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একজন মোটাগোছের লোক এলেন—তিনিই মিঃ জন। তাঁর হাতের একটা চড় খেলে আমার মত দশটা ছেলে একসঙ্গে ঘুরে পড়ে যাবে। তিনি এত নেশা করেছেন যে নিজেকে ঠিক রাখতে পারছেন না।

আমি সঙ্কেতমত পরিচয় দিয়ে মিঃ জনের হাতে টাকা দিলুম—জিনিস দু'টি ভারি সুন্দর। আমাকে দেখে মিঃ জনের মনে হয়ত সন্দেহ হ'ল যে আমি ছেলে মানুষ, সব গোলমাল করে তাঁকে বিপদে ফেলে দেবো। আমাকে বল্লেন 'তুমি নেবে কি করে? ধরা পড়ে যাবে যে?' তখনকার দিনে আমাদের গিঁট দিয়ে কাপড় পরবার নির্দেশ ছিল—কোমরে জিনিস থাকলে যেন না আলগা হয়ে যায়। বললুম ঠিক পারব। মিঃ জন খানিকক্ষণ ভাবলেন তারপর কি ভেবে বললেন 'না চল তোমাকে খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে আসি।' আমি কিন্তু জিনিস দু'টো কোমরে নিয়ে নিয়েছি—টাকা ত দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় এসে দু'জনে দাঁড়ালুম ট্যাক্সির জন্যে। এমন ভাবে দাঁড়িয়েছি যেন কেউ কাউকে চিনি না। কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে ক্রমেই শঙ্কিত হয়ে পড়ছি—নেশার ঝোঁকে সে না রাস্তায় গড়াগড়ি দেয়। ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। তাঁর চেনা ট্যাক্সি ও শিখ ড্রাইভার মিলল। দু'জনে চলেছি হঠাৎ পিছনের দিকে তাকাতেই মনে হ'ল একটা মোটর বাইক আমাদের পিছন পিছন আসছে ও পাশের সাইডকারের লোকটি ট্যাক্সির নম্বর লিখছে। মিঃ জনকে বললুম 'বোধ হয় পুলিশ পিছু নিয়েছে।' তিনিও পিছু ফিরে তাকালেন। আশ্চর্য, এক মুহূর্তে তাঁর নেশা গেল ছুটে। যে লোক এতক্ষণ টলছিল সে সোজা হয়ে বসে

ড্রাইভারের কানে কানে কি বলল শুধু কানে এল জোরসে চালাও। তখন প্রায় গড়ের মাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে গাড়ী তখন প্রায় ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে দৌড়ুচ্ছে। আমি বললুম 'মিঃ জন, এ দু'টো ভরা আছে ত?' উত্তরের অপেক্ষা না করে খুলে দেখে নিলুম। বললুম 'Mr. John, I will fight till the last bullet, you better try to escape.' এত বিপদেও মাতালের রসিকতা এল, বললে 'নিজের জন্যে একটা রাখবে না?' শিখ ড্রাইভার হয়ত আমাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছিল। আমাদের ট্যাক্সি একটা ট্রাম লাইন পার হ'ল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রাম এসে পড়ল, ফলে পিছনের মোটর বাইক গেল থেমে। সেই ফাঁকে ড্রাইভার গাড়ীর বেগ কমিয়ে বললে 'ভাগো।' আমরা দু'জনে দুদিকে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলুম। ট্রাম চলে যাবার পর পিছনের গাড়ী ট্যাক্সি লক্ষ্য করে ছুটল, আমরা তখন সরে পড়েছি। আমি এ গলি সে গলি ঘুরে ঘুরে চলে এলুম মলঙ্গা লেনে। অনুকূলদা সবটা শুনলেন, খুসী হয়ে পিঠ চাপড়ে দিলেন। কিন্তু যে কাজের জন্যে সে দু'টো আনা হ'ল সে কাজে আর লাগল না।

বিপদ না এলে জীবনের কোন মূল্যই নেই। গতানুগতিক জীবনের কোন বৈচিত্র্য নেই। বুদ্ধিহীন উচ্ছ্বাস ত জীবন নয়। আত্মসংহারের মধ্যে যে উন্মাদনা তা জীবনের একটা অঙ্গ হতে পারে, সবটা নয়। তবুও মাঝে মাঝে মন অস্থির দুরন্তপনায় মেতে ওঠে—সর্বনাশের আলিঙ্গনে আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নিতে পায় নব নব স্বাদ, নব নব স্বাচ্ছন্দ্য। তাই সামাজিক আবেষ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বেমানান, অপাংক্তেয়। আরউইন হত্যার প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে মনটা গেল অবসাদে ভরে।

১৯৩০ সনের ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্ণর মিঃ জিওফ্রে ডি মণ্টমোরেন্সিকে গুলি করলেন

শ্রীহরকিষণ। কয়েকবার গুলি ছুড়তে ছুড়তে শ্রীহরকিষণ একটা থামের কাছে এসে দাঁড়ালেন। গুলির আঘাতে আহত হলেন সাবইনেস্পেক্টর গার্ড শ্রীচন্নন সিং। মেয়ো হাসপাতালে শ্রীচন্নন সিং মারা গেলেন। গভর্ণর সমেত তিনজন হলেন আহত। শ্রীহরিকিষণ তাঁর বিবৃতিতে বললেন 'অহিংস নীতিতে স্বাধীনতা আসবে না—বিনা রক্তস্রোতে দেশ স্বাধীন হতে পারে না তাই আমি এ পথ বেছে নিয়েছি। চার্চিলের বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছে ইংরেজ ভারতকে কোনদিন মুক্তি দেবে না। আমার মনে হয়েছে বহুযুগের ব্যথিত ক্ষতমুষ্ঠি রক্তলাঞ্ছিত বিপ্লবের পথ ইতিহাস-বিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।' গভর্ণরের গায়ে ছু'জায়গায় গুলি লেগে-ছিল আর আহত হয়েছিলেন দু'জন ইংরেজ মহিলা। ১৯৩১ সনের ৯ই জুন শ্রীহরকিষণের মিনওয়ালি জেলে ফাঁসি হয়ে গেল—মৃত্যু তাঁর ঘুচাইল জীবনের জীর্ণ উত্তরীয়। ফাঁসির আগে জানিয়ে গেলেন যে 'একটা ভগৎ সিং বা একটা হরকিষণকে ফাঁসি দিয়ে ইংরেজের সাম্রাজ্য নিরাপদ হবে না। আবার ভারতে জন্মাতে চাই।' মিনওয়ালী জেলের পাশে মুসলমান কয়েদীদের কবর স্থানে পুলিশের কড়া পাহারায় তাঁর মৃতদেহ সৎকার করা হ'ল। (১)

১৯৩১ সনের ২৫শে জানুয়ারী ধরা পড়লেন সর্বশ্রী সরোজ কুমার চক্রবর্তী, ননীগোপাল সেনগুপ্ত, সুধীরঞ্জন চক্রবর্তী, মন্মথ নাথ দাস, নরেন্দ্র নাথ সেন ও আরো কয়েকজন। পাওয়া গেল দু'টি রিভলভার ১৮টি কার্তুজ ও একটি ব্যবহৃত কার্তুজ। বাখরগঞ্জের সেসন্স জজের রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকজন আপীল করায় সরোজ কুমার, ননীগোপাল ও সুধীরঞ্জনের তিন বছরের জেল, মন্মথর দু'বছর ও নরেন্দ্রনাথ সেনের আড়াই বছরের দণ্ড হয়ে গেল।

ছকু খানসামা লেন ও অপার সার্কুলার রোডের জংশনে একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও আটটি কার্তুজ নিয়ে ধরা পড়লেন শ্রীসুকুমার

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ই জুন ১৯৩১।

মজুমদার ও শ্রীমুকুল চন্দ্র রায়। বিচারে সুকুমারের চারবছর ও মুকুলের পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল। সকলেরই কাজ ব্যহত হ'তে লাগল। এ সমস্ত ধরা পড়ার পেছনে অধিকাংশ জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা। এ সময় পাঞ্জাবের শ্রীসুজন সিং নামে একজন সৈন্য বিভাগে যোগ দেন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টের কর্ণেল মিঃ কুরটিসকে হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩১ সনের ২০শে জানুয়ারী তাঁর বাংলায় গিয়ে দেখেন যে তিনি নেই। তাঁর স্ত্রীকে ও দুইটি কন্যাকে কৃপাণ দিয়ে আহত করে তিনি প্রত্যেকটি ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও কর্ণেলের দেখা পেলেন না। কুরটিস পত্নী হাসপাতালে মারা গেলেন মেয়ে দুটি বেঁচে গেল। বিচারের সময় নির্ভয়ে বললেন 'জালিয়ানওয়ালাবাগে নারী শিশু কাউকে ডায়ার বাদ দেয় নি—তারই প্রতিশোধ।' ৭ই ফেব্রুয়ারী হ'ল তাঁর ফাঁসির হুকুম। লাহোর সেন্‌ট্রাল জেলে ৮ই এপ্রিল তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। ফাঁসির মঞ্চে উঠে চীৎকার করে বললেন 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ।' সমস্ত বন্দীরাও সমস্বরে চীৎকার করলেন 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ—বন্দে মাতরম্।'

১৯৩১ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রিভিকাউন্সিল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আপীল সরাসরি অগ্রাহ্য করে দিলেন। উত্তর ভারতে তখনও পুলিশের কর্তারা শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদকে ধরবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। লাহোর দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলা ও নিউ দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলাতেও তাঁকে পাওয়া গেল না। সরকার পক্ষ থেকে জীবিত কি মৃত তাঁকে ধরে দিলে দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন সমস্ত উত্তর ভারতে শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এলাহাবাদে কোন কংগ্রেস নেতার সাহায্যে তিনি তাঁর নতুন কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। মনে মনে হয়ত ধারণা ছিল মানুষের অতিথিশালার কোন প্রাচীর নেই। এক কর্মীর সঙ্গে তাঁর আলফ্রেড্ পার্কে দেখা করার কথা। এবারেও ভগৎ সিং-এর

মত একইভাবে কোন বিশিষ্ট নেতার কাছ থেকে হ'ল বিশ্বাসঘাতকতা, সংকীর্ণতার নীচতায়। ১৯৩১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে নয়টার সময় তিনি আলফ্রেড্ পার্কে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় পুলিশ ঘিরে ফেলল তাঁকে। তিনিও শেষ গুলিটি পর্যন্ত চালালেন। আহত হলেন এই পনর মিনিটের সংগ্রামে দু'জন উচ্চ-পদস্থ পুলিশ অফিসার। বীরের মত যুদ্ধ করতে করতে শ্রীচন্দ্রশেখর প্রাণ দিলেন। সংগ্রাম চলার সময় তাঁর সঙ্গী, পুলিশের অধিকর্তা এক ইংরেজ অফিসারকে যখন গুলি করতে যাচ্ছেন তখন দলপতি বললেন 'আমার মৃত্যু দিয়ে সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করতে হবে—মৃত্যু এগিয়ে এসেছে তুমি পালাও, আমার জন্যে অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও দলপতির আদেশে সঙ্গিটি কৌশলে পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরের একটি ছাত্র সাইকেল নিয়ে ব্যাপারটা দেখছিলেন, তাঁর সাইকেলটা কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ চলে গেলেন প্রত্যয় ও প্রতিভার সঙ্গে নতুন সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে ক্লান্তিহীন কর্মে, কৃপণতাহীন ত্যাগে। দহন যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে মহাজীবনের জয়গানে উদ্ভাসিত হ'ল বীর্যবানের পরিচয়—'মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হ'ল বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।' যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাঁর নেতৃত্বের পথ হ'ল পরিষ্কৃত। অন্য কেউই জানল না তাঁর পরিচয় কিন্তু বিপ্লবীদের মনে সেই বিশ্বাসঘাতক চিরদিন ঘৃণ্য হয়ে রইলেন। রসুলাবাদ ঘাটে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে চন্দ্রশেখর আজাদেব শেষকৃত্য করা হ'ল।

১৯৩১ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী বরিশালের আই. বি. সাব-ইন্‌স্পেক্টরের বাড়ীতে পড়ল বোমা—ভয় দেখানই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

১৯৩১ সনের ৬ই মার্চ চট্টগ্রামের অ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীশশাঙ্ক ভট্টাচার্য অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। চট্টগ্রামের

আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। বিপ্লবীদের মুহুর্মুহু আত্মপ্রকাশে গান্ধীজি বিচলিত হয়ে উঠলেন। ৮ই মার্চ তিনি দেখা করলেন বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে। হ'ল একটা চুক্তি—গান্ধী আরউইন চুক্তি। গান্ধীজি বাদে লর্ড আরউইন থেকে আরম্ভ করে সকলেই বুঝলেন এটা ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ছাড়া আর কিছু নয়। করাচীর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজিকে তীব্র সমালোচনার হতে হ'ল সম্মুখীন। গান্ধীজি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন সুভাষ বাবুর সঙ্গে এই রফা করতে যে প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি গান্ধীজির কোন সমালোচনা করবেন না—অন্য সব জায়গায় থাকবে তাঁর মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা। গান্ধীজির গত্যন্তর ছিল না। তিনি হাজার চেষ্টা করেও গান্ধী আরউইন চুক্তির দোহাই দিয়ে শ্রীভগৎ সিং এর ফাঁসি বন্ধ করতে পারলেন না। বুঝলেন যে 'কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে পিপাসিতের জন্যে জল নেই'। তিনি জানতেন যে দেশের লোকের মনে অবিশ্বাসের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

১৯৩১ সনের ১৭ই মার্চ নদীয়া জেলার কোতোয়ালি থানায়, এস. পি.র বাংলোয় ও সাব ইন্‌স্পেক্টরের বাড়ীতে বোমা ফেলা হ'ল। দেখান হ'ল যে বাংলার সমস্ত জেলাই আসন্ন বিপ্লবের পটভূমি।

২৩শে মার্চ লাহোর সেন্‌ট্রাল জেলে সর্বশ্রীভগৎ সিং, শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়ে গেল। ওরা কিন্তু মরে না—মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে নেয় জীবনকে—ত্যাগের আত্মপরিচয়ে। মহাজীবনের আলিঙ্গনে জ্যোতির্ময় সিংহাসনে ওরা মৃত্যুঞ্জয়—ওরা অবিনশ্বর—ওরা ইতিহাস-বিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ওরা যদি মরে তবে বাঁচে কে? মৃত্যু নয়—রুদ্রের অন্তহীন প্রসন্নতায় জীবনের অনবদ্য দুর্জয় মহিমা শুধু অভিশাপ জীর্ণ নির্মোকমুক্ত।

১৯৩১ সনের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডী মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষামূলক একজিবিসন্ দেখতে এসেছিলেন। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময়

দু'জন খুব কাছ থেকে তাঁকে কয়েকটা গুলি করে সরে পড়লেন। সকলেই সেই গোলমালে পালাবার জন্যে ব্যস্ত। একটু পরে দেখা দেল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা গুলি পিঠে আর দুটো গুলি তাঁর দু'হাতে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘোড়ার গাড়ী করে মেদিনীপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল কিন্তু বাঁচানো গেল না। পরদিন সকাল দশটায় তিনি মারা গেলেন। শ্রীবিমল দাসগুপ্ত ও শ্রীজ্যোতিজীবন ঘোষ তখন সরে পড়েছেন। পুলিশ শুধু শ্রীবিমল দাসগুপ্তের নাম জানতে পারল। তাঁর খোঁজ চলতে লাগল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ সম্পর্কে ধরা পড়েন শ্রীসুবোধ দে। তাঁর বয়স তখন সতের। তাঁকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধিত আইনে আটক রাখা হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে টাইফোয়েড রোগে তিনি মারা গেলেন ১৯৩১ সনের ১৫ই এপ্রিল।

১৯৩১ সনের ২৪শে এপ্রিল রয়েল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবে ইউরোপীয়ানদের প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে বোমা ফেলা হ'ল। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক বিপ্লবী শ্রীজগদীশ ও তাঁর সহকর্মীকে পুলিশ ১৯৩১ সনের ৩রা মে লাহোর সালিমার গার্ডেনস এর কাছে দেখতে পেয়ে পার্কটা ঘিরে ফেলবার ব্যবস্থা করে ফেলেন। এঁরা যখন একটি কৃত্রিম জলাশয়ের ধারে বসে গল্প করছেন তখন পুলিশ তাঁদের ব্যস্ত রাখবার জন্যে বোরখা পরা একজনকে স্ত্রীলোকের বেশে তাঁদের কাছে পাঠালেন। তাঁরা পুলিশের এ চাল বুঝতে পেরেই গুলি চালালেন দু'পক্ষের গুলি বিনিময় চলল। শ্রীজগদীশ আহত হয়ে জলে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেলেন। দিয়ে গেলেন জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দেশমাতৃকার পায়ে মৃত্যুর অর্ঘ্যপাত্রে। তাঁর সহকর্মী আহত অবস্থায় ধরা পড়ে দীর্ঘ দিনের কারাদণ্ডে হলেন দণ্ডিত। (১)

---

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose

শ্রীচন্নন সিং ও তাঁর এক বন্ধু কয়েকটি বোমা নিয়ে হোসিয়ারপুর থেকে আসার পথে আদমওয়াং ষ্টেশনে নেমে যখন পথের ধারে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন হঠাৎ তাঁদের একজনের হাতের ধাক্কা লেগে একটা বোমা বিকট শব্দে বিদীর্ণ হয়ে যায়। শ্রীচন্নন সিং সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে দু'এক ঘণ্টার মধ্যে ১৯৩১ সনের ১৩ই মে মারা যান। তাঁর সঙ্গী পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন। দুজনের বাড়ী তল্লাসী করে প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায়। (১)

১৯৩১ সনের জুন মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার বন্দীদের ডিনামাইট সাহায্যে জেল ভেঙ্গে বের করে আনার চেষ্টা হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী তখন সিউড়ী জেলে অসুস্থ। তাঁকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করার জন্যে বীরভূমের বিপ্লবীরা ১৯৩১ সনের ১৭ই জুন চেষ্টা করলেন একই উপায়ে কিন্তু কৃতকার্য হতে পারলেন না। পুলিশ সংবাদ পেয়ে গেল। পুলিশের কর্তারা নির্দেশ দিলেন ভালাযের 'সাবিত্রী ক্লাব', মল্লারপুরের 'তরুণ সঙ্ঘ', মুর্শিদাবাদ মালিহাটীর 'ছাত্র সমাজ'-এর সভ্যদের উপর কড়া নজর রাখতে। পুলিশ জানাল যে 'এই সব জায়গা আর অঞ্চল বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির কর্মকেন্দ্র। এই বিপ্লবীরা শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলার নেতৃত্বে বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্যে অর্থ সংগ্রহ ও অস্ত্র সংগ্রহে রত। এঁরা কলকাতার এক আবগারি সুপারের বাড়ী থেকে ও বীরভূম জেলার এক ডাক্তারের বাড়ী থেকে রিভলভার ও পিস্তল চুরি করেছেন কিন্তু কাউকেই হাতে নাতে ধরা যাচ্ছে না।'

১৯৩১ সনের ২৩শে জুলাই শ্রীযশোবন্ত সিং, শ্রীদেওনারায়ণ তেওয়ারি ও তাঁদের এক সহকর্মী পাঞ্জাব মেলে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ-রত মিঃ জি, আর হেক্‌সট্ নামে একজন ইংরেজকে ছুরিকাহত করার পর ২৮নং ফিল্ড বিগ্রেডের একজন সহযাত্রী লেফটেনাণ্ট, তাঁদের

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose.

ধরবার চেষ্টা করেন। ধস্তাধস্তির সময় ছোরার আঘাতে ছু'পক্ষই অল্পবিস্তর আহত হন। এঁরা তিনজনে তখনকার মত সরে পড়লেন—পরে ধরা পড়েন। মিঃ হেক্‌সট্ গেলেন মারা। বিচারে এঁদের ছু'জনের ফাঁসি ও সহকর্মীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়ে গেল। জব্বলপুর সেন্‌ট্রাল জেলে ১৯৩১ সনের ১২ই ডিসেম্বর এঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। প্রতিবাদে পরদিন জব্বলপুর সহরে প্রতিপালিত হ'ল পূর্ণ হরতাল।

শ্রীদীনেশ গুপ্তের ফাঁসির হুকুম দেন আলিপুরের সেসন্স জজ মিঃ আর. আর. গার্লিক। ১৯৩১ সনের ২৭শে জুলাই এক অজ্ঞাত-পরিচয় যুবক তাঁকে কোর্টের মধ্যে তাঁর নিজের এজলাসে শেষ করে দিলেন—গুলি গেল তাঁর কপাল ভেদ করে। প্রেসিডেন্সী জেনারল হাসপাতালে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারা গেলেন। একজন সাধারণ পোষাকে সি. আই. ডি কনেষ্টবল যুবককে গুলি করলেন কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। পরিবর্তে তিনি নিজে যুবকের গুলিতে আহত হলেন। একজন সার্জেণ্ট যুবকটিকে গুলি করলেন—ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। পকেটে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল—লেখা ছিল 'ধ্বংস হও। দীনেশ গুপ্তের অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার লও। ইতি বিমল গুপ্ত।' পুলিশের কর্তারা বহু সন্ধানেও তাঁর আসল পরিচয় জানতে পারলেন না। আত্মোৎসর্গকারী যুবক মজিলপুর নিবাসী শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য—সাতকড়িদার হাতে গড়া ছেলে। নামের আকাঙ্ক্ষা নেই—কাজে যাবার আগে নিয়ে গেলেন অপরিচয়ের ছদ্মবেশ—নবীনতার সৌকুমার্যে। নিঃশঙ্ক দুর্জয় বিপ্লবী নিষ্ঠুর ভাগ্যকে পরিহাস করে সুন্দরের হাত থেকে অমৃতের কণা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলেন অনন্তলোকে।

বিপ্লবী শ্রীসূরযনাথ চৌবের শ্রীরামবাবু নামে এক সহকর্মী ১৯৩১ সনের ৩১শে জুলাই বোমা তৈরী করার সময় পাটনা সহরের

ধর্মশালা গেট ঘাট রোডের এক বাড়ীতে সাংঘাতিকভাবে আহত হন ও পরের দিন মারা যান। তাঁরা পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীরাম-নারায়ণ সিং ওরফে ললিত সিংকে মারবার ষড়যন্ত্র করছিলেন। বিচারে শ্রীসূরযনাথের মৃত্যুদণ্ড হয়। ১৯৩২ সনের ১৮ই এপ্রিল তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।

১৯৩১ সনের ৮ই আগষ্ট ব্রহ্মবিদ্রোহীদের ৪১ জনের বিচার হয়ে সর্বশ্রীনা পো থিন, না বো পুক, না খান মেয়ং, না পো থিট, না পো সুং, না বা থ, না পো টার ফাঁসি হয়ে গেল। বাকি সকলের ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের হয়ে গেল করাদণ্ড। আলাংতাং বিদ্রোহ মামলায় ন'জনের ফাঁসি ও দু'জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, থিংলাং বিদ্রোহ মামলায় শ্রী ইউ থাথওয়ালকা ও আর একজনের ফাঁসি ও পঁচিশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কামা বিদ্রোহ মামলায় থেটমেয়োর স্পেশাল জজ ৭৫ জনের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। হাইকোর্ট আপীলে চল্লিশ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৭৫ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়ে গেল। কিঁপাদি বিদ্রোহ মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৭২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা হ'ল। মিনডন বিদ্রোহে হ'ল ২৪ জনের ফাঁসি ও ৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ১৯৩১ সনের ৯ই মে দলনেতাদের দুই পুত্র শ্রী বা সেন ও শ্রী হী অ্যাডম্যান শাম্পা ও অন্যান্য ১৩ জনের ফাঁসি হয়ে গেল। ১৪ই মে ৪৯ জন বিদ্রোহীর ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের দণ্ড হ'ল।

১২ই আগষ্ট দেশের বাণী কাগজে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রশংসার জন্যে সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর ন'মাস জেল ও ২৫০৲ অর্থদণ্ড হয়ে গেল। অনাদায়ে আরও তিন মাসের জেল।

১৯৩১ সনের ২১শে আগষ্ট মধ্যপ্রদেশের বহরামপুরের ডিভি-সন্যাল কমিশনার যখন স্কাউট র‍্যালি পরিদর্শন করছিলেন তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হ'ল—কিন্তু সেটা ফাটল না। সেই দিনই ঢাকা ডিভিশনের কমিশনার মিঃ ক্যাসেলের উপর আক্রমণ

হ'ল তিনি অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। ধরা পড়লেন শ্রীললিত চন্দ্র রাহা---জেল হ'ল পাঁচ বছরের আর শ্রীযাদব চন্দ্র রাহার বিরুদ্ধে চলল অস্ত্র আইনের মামলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ৪ঠা আগষ্ট ফাঁসি হবার পর চট্টগ্রামের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা শ্রীসূর্য সেনের নেতৃত্বে ৩০শে আগষ্ট আত্মপ্রকাশ করলেন। রেলওয়ে কাপের ফাইন্যাল খেলায় চট্টগ্রামের টাউন ক্লাব ও কোহিনূর ক্লাবের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ আসানুল্লা ছিলেন টাউন ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। খেলায় টাউন ক্লাব জয়ী হওয়ায় তিনি যখন আনন্দ করছেন ঠিক সেই সময় তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে অভ্রান্ত নৈপুণ্যে একজন তাঁকে গুলি করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন। সকলেই ভয়ে পালালেন কিন্তু রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন নিরুদ্বেগ উৎকণ্ঠাহীন শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য। তাঁকে একজন পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার করে অমানুষিক মার দিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় থানায় নিয়ে গেলেন। সরকারও এ সুযোগ খুঁজছিলেন। চোদ্দ থেকে পঁয়তাল্লিশ বয়স্ক বহু লোককে মারতে মারতে থানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। বাধিয়ে দেওয়া হ'ল সহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। তিন দিন ধরে লুটতরাজ চলতে লাগল অবাধে, আগুন দেওয়া হ'ল ঘরে ঘরে--ব্যর্থ আক্রোশের শোচনায় পরিণতি। বিচারে জুরীদের অধিকাংশের মতে ১৯৩১ সনের ১৪ই অক্টোবর আসামী নির্দোষ হওয়ায়, মামলা মহামান্য হাইকোর্টে পাঠানো হ'ল। ১৯৩২ সনের ২২শে ডিসেম্বর তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়ে গেল।

১৯৩১ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর বর্ধমান কালনা থানায় একটি বোমা পড়ে—পরের দিন মেমারি থানার অফিসারের ঘরেও একটি বোমা ফেলা হয়।

এই সময় গয়া ষড়যন্ত্র মামলায় কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হয়। আপীলে অবশ্য প্রাণদণ্ড মকুব হয়ে যায়। কালুকোঠীতে ডাকাতি

করার অপরাধে কানপুরের শ্রীদেবী দয়ালের হয় ফাঁসি। সি. আই. ডি. ইন্‌স্পেক্টরকে গুলি করলেন শ্রীঅজিত কুমার বসু—সেই মামলায় তাঁর ও শ্রী ডি. এন. ভট্টাচার্যের হ'ল দীর্ঘ কারাদণ্ড। এই সময় বর্মাবিদ্রোহ মামলায় আরও কয়েকজনের হয় মৃত্যুদণ্ড।

বর্মী ফুঙ্গীরা বলতেন যে 'নিজেকে দিতে দিতে যেদিন মানুষ পাবে অন্তহীন পাওয়া সেইটেই হবে তার পরিপূর্ণ পাওয়া। নিজেকে পলে পলে ক্ষয় করে চিনতে হয় যথার্থ অক্ষয়কে। জগতে যদি মৃত্যু না থাকত তবে মানুষ অমৃতকে পেত কোন্ অবকাশে? তাই চাই মৃত্যুর জন্যে সাধনা।' চমৎকার জীবন দর্শন।

১৯৩১ সনের ১১ই নভেম্বর মৈমনসিং সেরপুরের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরীকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা হয়।

১৯৩১ সনের ২৭শে নভেম্বর বহরমপুর থেকে শ্রীত্রিদিব চৌধুরীকে ও ১লা ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর থেকে শ্রীগোপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আটক করা হ'ল। ঐ দিনই বাংলাদেশের চারজন বিশিষ্ট নেতাকে ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনে মধ্যপ্রদেশের দামো জেলে পাঠানো হয়। তাঁরা সকলেই বক্সা বন্দীশিবিরে ছিলেন। মাষ্টার মশাই তাঁদের মধ্যে একজন। সর্বশ্রীসত্যভূষণ গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্তকে বক্সা থেকে পাঠানো হ'ল মিনওয়ালী জেলে।

পনের

আজ বিস্মৃত দিনের কথা লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে—যা' মনে করে লিখছি সেটা অতীতের স্মৃতিকথা না অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি না আকাঙ্খার আবেগ? তখন অন্তরে ছিল রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি—কর্মজীবনের অপ্রতিহত গতি ছিল

দিকে দিকে প্রসারিত। একমাত্র সাময়িক অর্থাভাব ছাড়া কোন বাধাই কোন কিছুই আটকাতে পারে নি।

ছেলে বয়েসে অভ্যেস ছিল কবিতা লেখার—অনেক বড় লোকের ছেলে নিজেদের নামে প্রকাশ করবে বলে সেগুলো পয়সা দিয়ে কিনে নিত—মাসিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে নিজেদের নাম বেরুত। দু'পক্ষেরই লাভ—এক পক্ষের নাম, অপর পক্ষের কিছু পয়সা। আমাদের কোন পরিচিত অধ্যাপকের হাতে একবার আমার এক কবিতার খাতা গিয়ে পড়ে। তিনি পড়ে বললেন 'তোমার চেহারার সঙ্গে ত মনের মিল নেই—তোমার কাজের সঙ্গে কবিতার সংগতি নেই—কেমন করে এগুলো লেখো?' হেসে বললুম 'ফরমাস মাফিক লেখা—তাগিদে লিখতে হয়।'

একদিন দেখা করতে গেলুম ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের সঙ্গে—স্বামী বিবেকানন্দের ভাই—মনে মনে ভারি সংকোচ। যখন প্রথম তাকে দেখলুম, দেখলুম সাধারণ মানুষ কোন অহমিকা নেই—। এত বড় পণ্ডিত—ব্যবহার করলেন চমৎকার—স্বামীজির পরিচয়ে নিজের পরিচয় দিতে ঘোরতর আপত্তি। পরিচয় হ'ল—মাষ্টার মশায়ের ছাত্র ও শ্রীহরিনারায়ণ চন্দ্রের ভাই শুনে খুসী হলেন—বললেন 'পড়াশুনা কর'—কতকগুলো বইয়ের নাম বলে দিলেন। ভারি চৎকার মানুষ।

আর দেখেছিলুম বিভূতিদাকে—বাঁকুড়ার শ্রীবিভূতি ভূষণ সরকার। মানিকতলা মুরারী পুকুর বাগানবাড়ীতে ধরা পড়ে যাঁরা দ্বীপান্তরে যান তাঁদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন বিভূতিদা। চমৎকার মানুষ—সংসারের বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও শান্ত সহজ মানুষটি—'অন্তহীন তমসায় অম্লান দ্যুতি।'

এঁদের কাছে শুনেছিলুম সিপাহী বিদ্রোহের অনেক যোদ্ধা ও কর্মী পরে সাধু হয়ে যান। সর্বশ্রীঅরবিন্দ বাদে এঁদের সহকর্মীদের মধ্যেও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে নিরালম্ব স্বামী,

নিখিলেশ ভৌমিক স্বামী ভবানন্দ, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, পরেশ লাহিড়ী স্বামী মহাদেবানন্দ, সতীশ মুখোপাধ্যায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী, সতীশ সরকার নির্বাণস্বামী ও যোগেশ ভট্টাচার্য স্বামী অচলানন্দ নামে পরিচিত হন। ত্রিপুরায় সাধুর বেশে ধরা পড়েন শ্রীশান্তি কুমার মুখার্জী ও শ্রীআশু দাসগুপ্ত। যোদ্ধা হলেন জ্ঞানতপস্বী, কর্মী হলেন সন্ন্যাসী বৈরাগী—আত্মার আনন্দক্ষেত্রে এ আত্মীয়তা শুভদিনের সূর্যালোক না দুর্দিনের বজ্র পতন এ প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত রয়ে গেল।

যাক্ যে কথা বলছিলুম—অর্থাভাব যখন প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে তখন বন্ধু শ্রীহৃষীকেশ দত্ত ও শ্রীপঞ্চানন পালিত তার একটা উপায় ঠিক করে ফেললেন। তখন সবেমাত্র তাঁরা শিবপুর বোমার মামলায় খালাস পেয়েছেন। যন্ত্রপাতির যোগাড় হয়েছে অথচ টাকা দিয়ে সেগুলো নিতে পারছি না বড়ই অস্বস্তি। এঁরা খবর দিলেন যে একজায়গায় একটি সোনার ঠাকুর আছে, চুরি করা যেতে পারে। বন্ধু শ্রীকানাইলাল পাল ও শ্রীকানাইলাল ব্যানার্জীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হ'ল ওটা সরাতে হবে। শ্রীকানাইলাল পাল থানায় ডায়েরী করল যে তার সাইকেল চুরি গেছে—আর সেই সাইকেল নিয়ে একজন গেল ঠাকুর সরিয়ে আনতে। তার ধারণা ছিল না যে সোনার ঠাকুর এত ভারি হবে। তাই তোলামাত্র বেহিসেবী তার হাত থেকে মূর্তিটি পড়ে গেলেন মাটীতে। শব্দে জেগে উঠলেন অনেকে। তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে বন্ধুটি পড়ে গেল নর্দমার ভেতর। সাইকেল ধরা পড়ল কিন্তু বিগ্রহ গেলেন বেঁচে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে। স্যাকরার দোকানে তাঁর রূপান্তর বা নবকলেবর হ'ল না। টাকার হিসেব থেকে আমরাও বাদ গেলুম— লোকসান শুধু সাইকেলটা।

সরসী মোহন রায় ছিল আমার একান্ত অন্তরঙ্গ ও অধিকাংশ কাজের সঙ্গী। অনুকূলদা তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

সুন্দর চেহারা, অপরূপ মুখশ্রী, লেখাপড়ায় মেধাবী, গানে চমৎকার গলা, বেহালা বাজনায় আর অভিনয়ে অদ্বিতীয়। তার বাবা যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন মাতৃহীন একমাত্র ছেলের তাতে জীবনে কোন উপার্জন না করলেও চলে যেত। অল্প বয়সে মা-বাবা মরার সুযোগ চিরদিনই নিয়ে থাকেন নিকট আত্মীয়েরা। কিন্তু সরসী মোহন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে দুর্বার জীবন, যেখানে মৃত্যু সব সময় ওৎপেতে বসে আছে। স্বাস্থ্য ভাল, দেখতে সুন্দর, কলেজে পড়ছে কাজেই তাকে সৎপথে ফেরাবার জন্যে কাকারা এক জমিদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করলেন—সম্পত্তির লোভ ত ছিলই। জমিদারবাবু ভাবী জামাইকে দেখে মুগ্ধ। সরসীমোহন লুকিয়ে তাঁকে জানিয়ে এলো যে বাইরে যা' দেখছেন সেটা শিমুল ফুল—মেয়ের মঙ্গল চান ত ও কাজ ভুলেও করবেন না। কাকারা কথাটা শুনলেন—অপমানে রাগে তাঁরা সরসীমোহনকে সম্পত্তি থেকে কৌশলে বঞ্চিত করলেন। কিন্তু তার মন তখন অজানিত ঐশ্বর্যে ভরপুর—সম্পত্তির লোভ বা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য তাকে হাতছানি দেয় না। সে দুর্গমে দুর্যোগে অপরাজিত; দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার মাঝে নেই কোন অসম্মান। সংসারে সত্যিকারের আপন বলতে কেউ রইল না। কষ্ট করে ছাত্র পড়িয়ে পড়তে লাগল। বললুম ভাই, 'এত কষ্ট করা ত তোমার অভ্যেস নেই।' হেসে বলল 'চা খাই ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করে। সেদ্ধ না হ'লে রস বেরোয় না। তেমনি দুঃখ কষ্টের ফুটন্ত জলে সেদ্ধ না হ'লে অন্তরের পরিচয়ে সুখ দুঃখের নাট্যলীলায় জীবনপাতার রস ত বেরুবে না।' চুপ করে গেলুম। সত্যিই ত আখকে পীড়ন না করলে রস পাওয়া যায় না, চন্দনকে ঘসে ঘসে ক্ষয় না করলে ত সৌরভ বেরোয় না—বেদনার ভেতর দিয়েই ত অজানা শক্তির জন্ম; চিত্ত থেকে চৈতন্যে উদ্বোধন—মানুষের পাথেয়।

তার বেহালা বাজান শুনে একটা কথা আজও মনে পড়ে।

একটা বাজনার দোকানে একটা পুরাণো বেহালার দাম শুনে আশ্চর্য লেগেছিল। দোকানী বলেছিল যে এ বেহালা যিনি বাজাতেন তিনি খুব বড় দরের ওস্তাদ। তাঁর অনেকদিনের অনেক রাগিনীর সুরে এর নির্জীব কাঠের অনুপরমাণু গুলো সুরের স্পন্দনের ছন্দে ছন্দে অনুরণিত ও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে—তাই এত দাম।

সেদিন মনে হয়েছিল তেমনি প্রতিদিন ভগবানকে ডাকতে ডাকতে আমাদের মত যাঁরা অন্তরে মৃত অসাড়, তাদেরও শরীর মনের সমস্ত অণুপরমাণু এমন হয়ে উঠবে যে তাঁর নাম আমাদের শরীরে, মনে, সংসারে, কর্মে, আশ্চর্য বিকাশ মাধুর্যে, বিচিত্র রাগিনীতে আপনা হতেই মধুর কণ্ঠে, নতুন নতুন লীলাছন্দে বেজে উঠবে। আজও বেহালা শুনলে সে কথাটাই মনে পড়ে। যাক্ সে কথা।

চিরদিনই আমাদের অর্থের জোর সামান্য—মনের জোর দুর্ধর্ষ। একদিন সরসীমোহনকে বললুম 'টাকা পেলে পিস্তলের সন্ধান ছিল।' সে খুব বুদ্ধিমান ও কর্মঠ। দু'তিন দিন পরে তার কথায় গেলুম এক জায়গায়। সে সন্ধ্যের সময় এক কৃপণ তেজারতি ব্যবসায়ীর গদীঘরে সুযোগমত সাধুর পোশাকে ঢুকে পড়ল। সাইকেল নিয়ে সশস্ত্র আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। সাধু দেখে কুসীদজীবী প্রণাম করলেন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। উঠে দেখলেন সাধুর এক বগলে তাঁর ক্যাশবাক্স, অন্যহাতে উদ্যত রিভলভার—আর মুখে সতর্কবাণী 'একটি কথা বলবেন না।' বাক্স খুলে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে চলে এল। কোন গোলমাল নেই, প্রাণহানি নেই। নিঃশব্দে তার লজ্জাজনক কৃপণতার টাকা আমাদের কাছে চলে এল। আর একবার সুন্দর চেহারার সুযোগ নিয়ে এক পুলিশের কর্তার আদুরে কলেজে পড়া মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাল সে—প্রেমের অভিনয়ে অদ্বিতীয়। ছলনাময় নৈকট্যের বন্যায় পুলিশ অফিসারের পিস্তল সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে ভেসে চলে এল তার কাছে। আজ

কত কথাই মনে পড়ছে। হিজলীতে থাকবার সময় ঠিকেদারের হাতে গোপনে টাকা পাঠাতুম তার পড়াশুনার জন্যে। কে জানত এমন একটা তাজা জীবন্ত মানুষ চলে যাবে সামান্য ক'দিনের জ্বরে। কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে এর মত আরও কত প্রতিভাধর অপরিচিত বিপ্লবীর জীবন রয়ে গেছে সাধারণের কাছে অজ্ঞাত।

আমি জানি বৃহত্তর আদর্শ ও কল্যাণের জন্যে দলের কর্মীদের বিপদ অসম্মান ও অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে অনেকে নানা রকম দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করেছেন—কাউকে করতে হয়েছে মিথ্যা অভিনয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সাহায্য করতে গিয়ে শ্রীমতী সুহাসিনী গাঙ্গুলী ও শ্রীশশধর আচার্যকেও অভিনয় করতে হয়েছিল অথচ পুলিশের তরফ থেকে কত মিথ্যে কুৎসা রটনা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের এ উদারতা ও ত্যাগ সামান্য নয়। লোকে কুৎসাটাই বিশ্বাস করে কেননা সেটা মুখরোচক—তাঁদের ত্যাগ ও দানের দিক্‌টা কেউ দেখে না। জীর্ণ আবরণের আড়ালে আজ সংস্কারের বিভীষিকা ও মূঢ়তায় মানুষের মন আবিষ্ট। বহুযুগ পুঞ্জিত অপরাধের ভারে তার পৌরুষ উপেক্ষিত, চিন্তা বিপর্যস্ত, বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্ত ও চিত্ত মুমূর্ষু।

তখন বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজী অনার্স নিয়ে বি, এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু পড়ব কি? তখন এমন অবস্থা যে, যে কোন সময়ে পুলিশ হয়ত আমাকে ধরতে পারে। সন্তোষদা তখন চন্দননগরে পালিতদের বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন। একদিন ডেকে পাঠালেন—আলোচনা করলেন নানা বিষয়ে—শেষে বললেন 'এখন কি করবার আছে?' বললুম 'সে ত আপনি বলবেন। আমরা শুধু হুকুম তামিল করার লোক।' শুনে হাসলেন বললেন 'নিজেকে এত ছোট মনে করিস কেন? তোর মনে এমন কোন চিন্তা আসতে পারে সেটা আমরা হয়ত ভাবতে পারি না।' মনে পড়ল বিপিনদার কথা। একটা গোপন মিটিংএ একজন

বিশেষ পুলিশ অফিসারকে মারবার কথা হচ্ছে। নেতারা সকলেই একমত—। আমরা বয়ঃকনিষ্ঠ আমাদের কোন মতামত নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাদের মত জিজ্ঞেস করা হ'ল। ছোটদের পক্ষ থেকে বলা হ'ল 'ওকে মেরে লাভ কি? একটা গুলি তারপর ওর সকল দুঃখের অবসান—তার চেয়ে ওর একমাত্র পুত্রকে শেষ করে দেওয়া হোক্ সারা জীবন অনুশোচনায় আর কাতরতায় দগ্ধ হতে হতে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।' একজন বললেন 'ছেলে ত কোন অপরাধ করে নি।' উত্তর হ'ল অপধাধ নিরাপরাধের প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন অত্যাচারী পুলিশ অফিসারকে শাস্তি দেওয়া।' শেষ পর্যন্ত ছোটদের মতই গ্রাহ্য হ'ল। কিন্তু এ কাজ শেষ করবার আগেই সেই পুলিশ অফিসারের পুত্র নিজেই তার বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে বিষপানে জীবন শেষ করে দিলেন। এঁরও স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান কম নয়।

এর কয়েকদিন পরেই সন্তোষদা ধরা পড়লেন। আমি নিজে তখন কিছুই করছি না অথচ পুলিশ আমার উপর কড়া নজর রেখেছে। তাদের ধারণা আমি নিশ্চয় কিছুর মতলবে আছি। তাদের চেষ্টা ছিল আমাকে কোন মোকদ্দমায় জড়িয়ে দিয়ে আটকে দেবে। কাজেই আত্মগোপন করতে হ'ল। তখন দিনগুলো খুব খারাপ লাগছে। নিজের চেষ্টায় বা পরের সাহায্যে কিছু করবার মত অবস্থার কথা চিন্তা করতেও মন যায় না। আবেগহীন উত্তাপহীন দেহমন নিয়ে মনে হতে লাগল কি করেছি? এ পর্যন্ত কাজের মত কাজ কিছুই করা হয় নি। অথচ চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগচী তখন বাইরে ছিলেন। গেলুম তাঁর কাছে, বললুম কিছুই ভাল লাগছে না। তিনি সব সময়েই উৎসাহ দিতেন। অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে বললেন অপেক্ষা করতে হবে—সময় মত নির্দেশ পাবে।

কয়েকদিন কেটে গেল। ১৯৩১ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল

বেলা কাগজে খবর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। হিজলী বন্দী নিবাসে গুলি চালিয়ে আগের দিন রাত্রে দু'জনকে মেরে ফেলা হয়েছে—তার মধ্যে সন্তোষদা একজন অপরজন শ্রীতারকেশ্বর সেন। কয়েকজন আহত হয়েছেন—দু'একজনের অবস্থা গুরুতর। মনে হ'ল হিংস্র দন্তে অট্টহাস্যে আদিযুগের গুহামানব আজ উপহাস করছে সভ্যতার নিদর্শনকে। সভ্যজীবন ফিরে চলেছে প্রাগৈতিহাসিক বন্যজীবনে।

মনের অবস্থা তখন স্বাভাবিক নয়। সমস্ত রক্ত যেন মাথায় চড়ে গেল। কি করা যায়? মৃতদেহ কলকাতায় আনা হ'ল। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সে শোকসভায় পৌরহিত্য করলেন। বললেন 'ডাক যখন পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতী নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।' প্রথমে কথা ছিল সভা হবে টাউন হলে, কিন্তু বিরাট জনসমাবেশ দেখে ঠিক হ'ল সভা হবে মনুমেণ্টের নীচে। অনুকূলদা তখনও আত্মগোপন করে আছেন। টাউন হলে পুলিশ আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল, বন্ধু সরসীমোহন আমাকে পালাবার সুযোগ করে দিল। অনুকূলদাও নিষেধ করলেন, বললেন এখন ধরা দেওয়া চলবে না। কিন্তু অনুকূলদা নিজেই দু'তিন দিনের মধ্যে ধরা পড়ে গেলেন।

সেদিন দেশের লোক হিজলী বন্দীশিবিরের এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করে নি। রবীন্দ্রনাথ বললেন 'আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক্ না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতা, কারণ এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়।'

মনে মনে তখন রাগের আগুন জ্বলে উঠেছে। ঠিক করলুম নিজেরাই এর ব্যবস্থা করব। বুঝলুম কমাণ্ডাণ্ট মিঃ বেকারের চেয়ে মিঃ হাচিন্সই যত নষ্টের মূল। এই লোকটিকে চেনবার জন্যে শ্রীপান্নালাল মিত্র আমাকে কয়েকবার রাইটার্স বিল্ডিংএ পাঠিয়েছিলেন। অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলুম বর্মায় আমার দাদার স্বাস্থ্য টিকছে না তাই বাংলা দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। মিঃ হাচিন্স ছিলেন তখনকার দিনের নামকরা ধুরন্ধর। রাজবন্দীদের সমস্ত রেকর্ড তখন তাঁর কাছে। আমাকে প্রথমবার বললেন 'আচ্ছা দেখব কি করতে পারি।' দ্বিতীয়বার সরাসরি বললেন 'তোমার দাদা জেলখানায় একটা খুন করিয়েছেন—আনলে আবার একটা করাবেন। কাজেই আনা হবে না।' আর কিছু না হোক্ লোকটিকে ভাল করে চিনে এলুম।

রিভলভার বিক্রীর নাম করে যে লোকটি আমাকে ধরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছিল, তাকে হঠাৎ একদিন রাস্তায় পেয়ে গেলুম—বললুম 'শেষ করে দেবো ও রকম চালাকি করলে।' দোষ স্বীকার করে বললে যে পুলিশের লোক তার কাছে রিভলভার দিয়ে আমাদের ধরবার ফাঁদ পেতেছিল। পেটের দায়ে পুলিশের ভয়ে সে এ কাজ করেছিল আর কোনদিন করবে না।

এই সময় একদিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, এত বৃষ্টি যে অল্পদূরের জিনিস দেখা যায় না। হঠাৎ হাওড়া ষ্টেশনের ঠিক বাইরেই দেখি মিঃ হাচিন্সের গাড়ী। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলুম ভেতরে তিনি বসে রয়েছেন—আর দেরী নয়। খুব কাছ থেকে গুলি করলে কাঁচ ভেঙ্গে গুলি লাগবে। ভাগ্য এখানেও অপ্রসন্ন। আত্মবিস্মৃত পূজার নৈবেদ্য হয়ে গেল উচ্ছিষ্ট। সামান্যের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। রিভলভার বের করেও চালাতে পারলুম না। গাড়ীটা বেরিয়ে গেল। আমার ধারণা হ'ল মিঃ হাচিন্স হয়ত দেখতে পান নি। কাগজে কোন খবর বেরুল না—আমাকে ধরবার চেষ্টা হয়েছে

বলে খবর পেলুম না। কিন্তু পরে জেনেছিলুম তিনি আমাকে ঠিক চিনতে না পারলেও আন্দাজ করেছিলেন। হিজলী বন্দী শিবিরে থাকার সময় একবার অফিসে কি কাজে গেছি দেখি মিঃ হাচিন্স অ্যাসিষ্টাণ্ট কমাণ্ডেন্ট শ্রীবৈদ্যনাথ বাবুর সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাকে দেখেই তিনি তাঁকে বললেন 'Is he not some Chandra? I distinctly remember his face. He aimed at me but missed his mark'. কি করলুম হাতের নাগালের মধ্যে পেয়েও কিছু করতে পারলুম না। সারারাত্রি পারলুম না ঘুমুতে। আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদ না আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ বোঝা?

একদিন শুনলুম যে হাওড়ার দু'টি লোক আমায় খোঁজ করে গেছেন। থাকতুম ৪০নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীটে। আমি বুঝলুম কারা তারা। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমে হৃষীকেশের বাড়ী যাব ঠিক করলুম—তার বাড়ীর গলিতে গিয়ে দেখি খানাতল্লাসী হচ্ছে। দেখি একজন পুলিশের লোক সাধারণ পোষাকে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—লক্ষ্য সম্পূর্ণ আমার ওপর। সে অবস্থায় পালাবার আর পথ নেই। কোমরে রিভলভার ভাবছি কি করব এমন সময় কানে এল 'ডান দিকে দরজা ঢুকে পড়।' বন্ধু শ্রীকানাই লাল ব্যানার্জীর গলা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের বাড়ীতে ঢুকে পড়লুম—দেখি উঠানের ধারেই পাঁচিল—কেমন করে আজও বলতে পারি না সেটা টপ্‌কে বাইরে পড়লুম—সঙ্গে সঙ্গে ছুট। দূরে গিয়ে একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে খানিক দূর গিয়ে নেমে পড়লুম। সে যাত্রাও রক্ষে পাওয়া গেল। বন্ধু কানাইকে পরে এর শাস্তি ভোগ করতে হ'ল। ব্যাটারী চার্জ করে স্বীকারোক্তি আদায় সম্ভব হয় নি। তবে তাকে বহুদিনের জন্যে অকেজো করে দিল।

এমনি করে বিপদের মুখ থেকে অনেক বারই রক্ষা পেয়েছি।

একবার পুলিশের তাড়ায় পালাবার উপায় না দেখে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে পাশের এক পোড়ো বাড়ীর ছাদ দিয়ে সরে পড়েছিলুম। একটা জিনিস ছিল সেটা আমার মাষ্টার মশায়ের আদর্শ। যাই করি না কেন কোনদিন মনে হয় নি যে অন্যায় করছি। আইনের চুলচেরা বিচারে হয়ত সেগুলো চরম অপরাধ কিন্তু মনে কোনদিন রেখাপাত করে নি। কাজের উন্মাদনা বাদ দিলে অন্য সময় দেখা যাবে আমি নিতান্ত সাধারণ ছেলে, আমার মধ্যে আছে একটি সরল প্রাণের আবেগ, নির্দ্বন্দ্ব সংযম ও নীরব মিতাচার। স্বভাবের মধ্যে না আছে অন্ধতা, না আছে নিষ্ঠুরতা। পুলিশের কোন লোক আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন master of simulation বর্ণচোরা। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলুম 'জগৎটাই ত তাই, আপনি যখন সাধারণ পোষাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখেন আমাদের গতিবিধির উপর তখন কারসাধ্য আপানাকে চেনে যে আপনি পুলিশের চর।' ভদ্রলোক শুকনো হাসি—হাসলেন—আমিও খোঁচা দেবার জন্যে গম্ভীর হয়ে বললুম 'দেখুন না আমরা সাধারণ মানুষ যখন জগতকে দেখি তখন দেখি তার মাঝে রয়েছে গতি, আঘাত আর বিনাশ। কিন্তু সমগ্রটা আমাদের চোখে পড়ে না। যাঁরা বিদগ্ধ পণ্ডিত তাঁরা দেখেন যে সবের মধ্যে একটা স্তব্ধ সামঞ্জস্য, এইটেই হচ্ছে তাঁর নিত্যস্বরূপ যিনি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে শিবম্ আর আত্মার মধ্যে তিনি অদ্বৈতম্।" আমার কথা শুনে তাঁর বোধ হয় খারাপ লাগল। বললেন 'Devil can quote scriptures ধর্মপুত্তুর আমার।' আমি চুপ করে গেলুম। কথাটা তুলেছিলেন তিনিই। শুধু শুনতে হবে—উত্তর দিলেই বিপদ।

সরসীমোহন সব সময় আমার সঙ্গী—বন্ধুরা তামাসা করে বলতেন যেন Q এর সঙ্গে U। সে কতবার আমাকে বিপদের মুখ

থেকে বাঁচিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিলাসের বহু বেষ্টনে ঘেরা ধনীর ছেলে হয়েও নবযুগের সন্ধানে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। তার মধ্যে দেখি নি বুদ্ধির দ্বিধা, স্বার্থের বন্ধন বা ক্ষতির আশঙ্কা। তার মত আরও অনেকে নামহীন পরিচয়হীন হয়ে নিঃশব্দে চলে গেছেন—যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদেরও অনেকে চেনেন না। সর্বশ্রীঅরুণ সিংহ, কালাচাঁদ সাহা, সন্তোষ পাল, সূর্য লাহা, বোধিসত্ব বসু, গোপাল নন্দী, প্রদোষ রায়, ধীরঞ্জীব রায় এবং আরও অনেকে হয়ে আছেন সাধারণের অজানিত।

হিজলী হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পরেই ১৯৩১ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর মৈমনসিং-এ ধরা পড়ে গেলেন রিভলভার ও বোমার মাল মসলা নিয়ে সর্বশ্রীধরণীকান্ত চক্রবর্তী, শৈলজারঞ্জন ভট্টাচার্য, নিখিল ভূষণ চৌধুরী, সুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য, জগবন্ধু বসু, প্রফুল্ল কুমার মজুমদার ও মনীন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। বিচারে শৈলজারঞ্জন ও মনীন্দ্র চন্দ্র মুক্তি পেলেন আর সকলেরই সাজা হয়ে গেল। তখন বাংলার প্রতি জেলায় কর্মোদ্যমের নতুন সাড়া পড়ে গেছে। ঢাকা, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, রংপুর, বর্দ্ধমান সব জায়গাতেই সকলেই নতুন উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেছেন।

পরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর দু'জন ইংরেজ মিলিটারী অফিসার চলেছিলেন পাঞ্জাব মেলে। তাঁদের দু'জন বিপ্লবী দোঙ্গার গং ষ্টেশনে ছুরি মারলেন—একজন গেলেন মারা। উভয়েরই হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হিজলী বন্দীশিবির থেকে সে সময় পালালেন শ্রীনলিনী দাসগুপ্ত ও শ্রীফনী দাস। কর্তৃপক্ষ ধরতেই পারলেন না যে তাঁরা কেমন করে চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়লেন। পরে ধরা পড়ে তাঁদের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আমাদের কর্মজগৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে—নীরব নিঃশব্দ কর্তব্য পালনে, কোন সম্মান বা খ্যাতির আকাঙ্খায় নয়, আত্মত্যাগের আলোকে সমুজ্জল। এই আদর্শ নিয়েই বৈপ্লবিক জীবনের সূচনা ও

পরিসমাপ্তি। পরাধীনতার অপমান ও গ্লানি যখন সহ্যাতীতরূপ ধারণ করে তখনই দেশে দেশে তার প্রতিবাদে প্রাণের অমিত প্রাচুর্যে দুর্লঙ্ঘ বিপত্তিকে ধূলিসাৎ করে প্রকাশ পায় বিপ্লববাদ—আমাদের বিপ্লব প্রচেষ্টা জীবনের অকিঞ্চিৎকর জঞ্জাল পুড়িয়ে দেশ-প্রেমের আগুন জ্বালাবার প্রতীক—স্বাধীনতা আন্দোলনের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। বিপ্লববাদ আপন মহিমাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত—স্বে মহিম্নি।

এই আদর্শেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবীরা দেশে বিদেশে অদম্য উৎসাহে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিছুদিনের জন্যে সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশ কবল মুক্ত করেছিলেন—ইরাকে বন্দী ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী। লাহোর থেকে গৌহাটি পর্যন্ত যুগপৎ অভ্যুত্থানের আয়োজনে হয়েছিলেন বদ্ধপরিকর। কুতালা—আমারার বন্দী সৈন্যদের দলভুক্ত করে ভারতে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যবস্থা করেছিলেন, আর করেছিলেন আফগান আমীরের সাহায্যে আফগান সীমান্তে বিরাট কর্মপ্রচেষ্টা। সে ইতিহাস আজ কম লোকেরই জানা আছে। বিদেশিনী ভারত হিতৈষিণী শ্রীমতী আগনেস স্মেলডের সাহায্যে গড়ে তোলেন 'ফ্রেণ্ডস অফ ইণ্ডিয়া সমিতি'। স্বাধীনতার সেই তাম্রনীলাভ স্বপ্নের পিছনে ছুটে কত অমূল্য জীবন সে প্রচেষ্টার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে তার ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। মহা-রাষ্ট্রের গুপ্তসমিতির সব তথ্য লোক আজ জানে না। যেটুকু সাধারণে জানে সেটুকু হচ্ছে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ থেকে।

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সেই বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার দিনে একদল যুবক রাষ্ট্র বিপ্লবের দ্বারা দেশে যুগান্তর আনবার উদ্যোগ করেছিলেন। আর যাই হোক্ এই প্রলয় হুতাশনে তাঁরা নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। এই জন্যে তাঁরা কেবল আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই সকলেরই নমস্য। তাঁদের

নিস্ফলতাও আত্মার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।' বিশ্বকবির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গীর কত প্রভেদ। বাংলার বিপ্লবীদের দুর্জয় জীবনের পিছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অফুরন্ত প্রেরণা—তাই তিনি সকলের প্রণম্য।

নীরব কর্মের মধ্যেই আমাদের শ্রীহীন স্বাচ্ছন্দহীন বিপর্যস্ত জীবনের বীর্যসাধ্য সাধনা, আত্মাহুতির মধ্যেই আমাদের আত্মবিস্মৃত কর্মের যোগাসন—অক্ষুণ্ণ শক্তির অপর্যাপ্ত প্রকাশ, সর্বস্ব ত্যাগের পরমাশ্চর্য বিকাশ। দেশের স্বাধীনতাই একমাত্র কাম্য—চরম লক্ষ্য—সাধনার পরম বস্তু, চিরবাঞ্ছিত আনন্দের স্বর্গ।

ষোল

১৯৩১ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর আমার ছন্দহীন জীবনের আর একটি স্মরণীয় দিন। অযাচিত কর্তব্যের দায়িত্ব নিয়ে ডোববার দুর্বুদ্ধি আমার আজন্মের অভ্যেস—নিরুদ্দিষ্ট ভবিষ্যতের পানে তাকাবার সময় কম। এমনি একটা সামান্য কিন্তু আমার কাছে অভাবনীয় মূল্যবান জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে বাইরে যাবার কথা। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলুম। ভিজে কাপড়ে বাড়ী ঢুকছি ধরা পড়ে গেলুম। ৪০নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ঢুকতে একটু সরু গলির মত ছিল সেখানে পুলিশ ছিল লুকিয়ে—দু'দিক থেকে আমাকে ধরল ঘিরে যাতে কোন রকমে সরে না পড়তে পারি। মনে হ'ল ভাগ্যিস কাল রাত্রে সরসীমোহনের কাছে যন্ত্রটা রেখে এসেছি। সেই দলে ছিলেন হাওড়ার আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযামিনী চট্টোপাধ্যায়। আমাকে নিয়ে গেলেন হাওড়ায় তাঁর অফিসে। সেখানে তাঁর অধীনস্থ অফিসার শ্রীমুকুন্দ ভট্টাচার্য মশাই আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন করলেন্। কথাবার্তা শুনে তাঁরা আমাকে ছেড়ে

দেবেন বলেই ঠিক করেছিলেন, কিন্তু কি মনে করে তাঁরা লর্ড সিংহ রোডে ফোন করলেন। জবাব পেয়ে চাটুয্যে মশায় বললেন 'আপনাকে পুলিশ অনেকদিন ধরে খোঁজ করছে আর আপনি বেশ তাদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর ছাড়া হবে না।'

বুঝলুম আর উপায় নেই। পালাবার চেষ্টা বৃথা—জাহাজ যখন ডুবছে তখন মাস্তুলে ধ্বজা উড়িয়ে লাভ কি? দিন কয়েক আগে অনুকূলদা ধরা পড়েছেন—তিনি বারবার সাবধান করে গেছেন যেন ধরা না পড়ি। সহজে নিষ্কৃতি পাব তার কোন আশা দেখলুম না। তবে ভাগ্য ভাল যে কাছে কোন অস্ত্র পায় নি। জোড়াবাগান থানা থেকে একদল কনেষ্টবল এসে বাড়ী তল্লাসী করল—আপত্তিকর কিছুই পেল না। শুধু এক টুকরো কাগজ ছিল দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্ত আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, কাগজটা কেমন করে রয়ে গিয়েছিল।

এলুন লর্ড সিংহ রোডে আই. বি.-র খাস দপ্তরে—ইংরেজ শাসন যন্ত্রের চক্রব্যূহ—আমাদের মত ক্ষুদে অভিমন্যুদের সেখানে নিস্তার নেই। এর আগে ছিল দালন্দা হাউস—নির্যাতনের গোপন কেন্দ্র। দেখি আমার মত আরও কয়েকজন আগেই উপস্থিত—তবে তাঁরা কিন্তু খুব হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছেন ভয়ডরের চিহ্নমাত্র নেই—ব্যাপারটা কি? বুঝলুম সুযোগ্য পুলিশ কাজ দেখিয়েছে কর্তব্যের আবর্জনা ভার বয়ে। যাদের আসলে ধরবার কথা তাদের পালাবার সুযোগ দিয়ে ভুল করে রাজনীতির ধারে কাছে ঘেঁসে না এমন নিরপরাধ কয়েকজনকে ধরে এনেছে—এরা সবাই বড় বড় সরকারী কর্মচারীর আত্মীয়—তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের কোন রিপোর্ট নেই। তারাও বুঝেছে যে পুলিশের কোথাও ভুল হয়েছে।

নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিল। এই সুযোগে আমিও দিতে গেলুম ছোট্ট একটু সাহসের পরীক্ষা—তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে সরবার মতলবে পা বাড়িয়ে কয়েক পা

গিয়েও ছিলুম---হঠাৎ একজন অফিসার বললেন 'তুমি নও।' এই বলে তাঁরা দু' একজন মুখ চাওয়া চাহি করে, দিলেন আমার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে---পালাবার চেষ্টা করেছিলুম এই অজুহাতে।

সেদিন আবার মেয়েদের হোষ্টেল তল্লাসী করে একটি মেয়ের সুটকেশ থেকে পুলিশ একটি রিভলভার উদ্ধার করেছে। যাঁর সুটকেশ তিনি তখন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—পুলিশ দেখে হয়ত তখনকার মত সরে পড়েছিলেন। তাঁর ঘরের বাসিন্দা আর একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে আনা হয়েছে। তিনি অনেক দূরে বসেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁর দিকে আমার লক্ষ্য পড়ল দু'জনেই পরস্পরের কাছে অপরিচিত—তবে যে একই অপরাধে এক জায়গায় এসেছি তা' উভয়েরই জানা। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি তার অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত পাণ্ডুর মুখখানি নামিয়ে ফেলল—হয় আমার পালাবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে, না হয় আসন্ন নির্যাতনের আশঙ্কায়।

একজন পুলিশ অফিসার দূর থেকে জানলার ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন আমাদের দু'জনকে। বেরিয়ে এসে আমাকে অভিধান বহির্ভূত ভাষায় করলেন গালাগালি; করলেন একটা কদর্য ইঙ্গিত। তাঁর বোধ হয় ধারণা হ'ল যে আমাদের দু'জনের আগে হতেই ঘনিষ্ঠতা আছে। এই পুলিশের লোকটি মারের জন্যে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। আঙ্গুলের মাথায় পিন ফুটিয়ে, শরীরের স্থান বিশেষে কষ্ট দিয়ে, মলদ্বারে গরম ডিম ঢুকিয়ে, মর্মদহন যন্ত্রণায় স্বীকারোক্তি আদায়ের নানা রকম গুপ্ত দমন উপায় ও নিষ্ঠুর পীড়ন নৈপুণ্যের জন্যে তিনি নাম করে পদোন্নতি করেছিলেন। আমাকে অপমান করে তিনি এগিয়ে গেলেন মেয়েটির কাছে। কি বললেন শুনতে পেলুম না শুধু দেখলুম রাগে দুঃখে অপমানে লাঞ্ছনায় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

আর যায় কোথা? মনে হ'ল সমস্ত রক্ত যেন মাথায় চড়ে

গেল। চঞ্চল মনে জেগে উঠল দুর্বুদ্ধি—অক্ষম নিরুপায়ের শেষ সম্বল—কিন্তু হাত যে বাঁধা। তিনি আবার এসে বললেন 'যা জিজ্ঞেস করছি সত্যি করে বল, তোমাকে ছেড়ে দেবো।' মুখ কাঁচু মাচু করে বললুম 'বলুন কি বলতে হবে—আমি মিথ্যে কথা বলি না।' আমার শুকনো মুখের অবস্থা দেখে ভদ্রলোক হয়ত ধারণা করলেন যে আমি ভয় পেয়ে গেছি—তাঁর গালাগালিতে কাজ হয়েছে। মোলায়েম গলায় বললেন 'বেশ এই ত ভাল-ছেলের মত কথা—এস আমার সঙ্গে—যেন আমার কতযুগের অকৃত্রিম বন্ধু।

একটা চেয়ারে বসেছি—সামনে একটা ছোট টেবিল—ওধারে তিনি বসলেন, বললেন নাম কি? আমার নাম বলামাত্রই তিনি ঘাড় নীচু করে লিখতে আরম্ভ করলেন। আমার মনে হ'ল এই ত সুবর্ণসুযোগ। মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুধাতুর হিংস্র বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লুম কিষ্কিন্ধ্যার সেই অনার্য সন্তানটির উপর। অবশ্যম্ভাবী ফল যা' হবার তাই হ'ল। তাঁর বিশেষ কিছু করতে পারলুম না—মার খেলুম আমিই বেশী—তিনি শুধু অপমানিত হলেন। তাতেই আনন্দ। তখন আমাদের বিশ্বকেন্দ্রানুগ মন—তার না আছে জরা না আছে বার্ধক্য। মনের তুচ্ছ আবরণ ভেদ করে সেই আনন্দ যে আনন্দে মানুষ বাঁচে, নিজে তৃপ্ত হয় অপরকে তৃপ্তি দেয়। আনন্দের কোন বন্ধন নেই। দুঃসাধ্য সাধনা ও আসক্তি বন্ধনহীন আত্মত্যাগের ভেতর দিয়েই ত মানুষের শক্তির সার্থকতা। ভদ্র-লোক ধারণা করতে পারেন নি যে আমার মত শান্তশিষ্ট দেখতে নিরীহ একটা ছোট ছেলে পুলিশের আস্তানায় ঢুকে অনধিকারের বেড়া ভেঙ্গে এমন করে চড়াও হতে পারে। তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে পঞ্চাশটি শেয়ালের চেয়ে একটি সিংহশিশু অনেক বড়। সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ঘন্টি গেল পড়ে। অফিসাররাও সব ছুটে এলেন—তখনও আমার হাতকড়া লাগানো হাত তাঁর গলা

আটকে রয়েছে। অনাবশ্যক মেদের প্রাচুর্যে তিনি হাঁফাচ্ছেন। যদি কোন রকমে টেবিলের উপর উঠতে পারতুম তা হলে ইচ্ছে ছিল আমার বড় বড় দাঁত দিয়ে তাঁর গালের খানিকটা মাংস ছিঁড়ে আনবার যাতে সারা জীবন তাঁর মনে থাকবে যে একটা লোক তার অশ্রুজলে অভিষিক্তা অপরিচিতা ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধের চিহ্ন চিরদিনের জন্যে রেখে গেছে তার দেহের এমন জায়গায় যা' গোপন করবার কোন উপায় নেই।

ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরিতাপের চেয়ে মনে হ'ল আজ রাতে পুলিশ হাজতে আমার কম্বল ধোলাই হবে। কম্বল ধোলাই মানে সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে হিন্দুস্থানী লোটায় গতর চূর্ণ বিচূর্ণ করবে—অথচ বাইরে তার কোন চিহ্ন থাকবে না। এই ভদ্রলোকটি এই মারেরও উদ্ভাবন করে পুলিশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

যখন গোলমাল চলছে তখন নেমে এলেন স্বয়ং স্পেশাল সুপারিণ্টেডেণ্ট শ্রীনলিনী মজুমদার। ইনি খুব সামান্য পদ থেকে ঐ পদে উন্নীত হয়েছিলেন নিজের যোগ্যতার গুণে। লোকটির কি নিষ্ঠুর স্মৃতিশক্তি। তিনি এসেই হাতকড়া খুলে দেবার হুকুম দিলেন। স্বাতন্ত্র স্পর্ধায় মত্ত পুলিশ অফিসারটি রাগে ক্ষোভে আমার উপর তর্জন গর্জন করে আস্ফালনের সুরে বললেন 'খুন করে ফেলব।' মজুমদার সাহেব তাঁকে অশোভন মুখ বিকৃত করে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন। বললেন 'খুব হয়েছে একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে পারনা আবার কথা বলছ?' বেচারী একে মোটা তায় তোতলা তার উপর ধমক খেয়ে নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় চুপ করে গেলেন অবমানিতের দুঃখভার মনের মধ্যে নিয়ে।

এই শ্রীনলিনী মজুমদার, এঁকে মারবার জন্যে এর আগে বাবুঘাটে একবার চেষ্টা হয়। পরের চেষ্টা আমরা করেছিলুম হাওড়ায় তাঁর গুরুদেব শ্রীযোগেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী; দু'বারই চেষ্টা কার্যকরী হয় নি।

আমার দিকে চেয়ে মজুমদার সাহেব বললেন 'কি গুণ্ডামী লাগিয়েছেন?' তিনি সকলকেই আপনি বলতেন কেন না তাঁর আশঙ্কা ছিল হয়ত তুমি বলার জন্যে কেউ তাঁকে অপমান করতে পারে। আমি চুপ করেই রইলুম। অফিসারটি আবার কি একটা বলবার চেষ্টা করতেই তিনি বিশ্রী রকম মুখ ভঙ্গি করে ধমক দিয়ে বললেন 'চুপ কর বুঝেছি। একে চেন না, বর্মায় কথা না বলার জন্যে খুব মার খেয়েছিল আর তুমি দু'টো গালমন্দ করে কথা বের করতে চেয়েছিলে?' অফিসারটির ধারণা হয়ত বদলে গেল—যাকে এতক্ষণ ছেলেমানুষ বলে উপেক্ষা করছিলেন, শুনলেন তার পুরানো দিনের একটুকরো ইতিহাস। মজুমদার মশাই আমাকে বললেন 'আপনি ত হরিনারাণ বাবুর ভাই?' একজন লোককে বললেন আমাকে উপরে নিয়ে যেতে। যিনি নিয়ে গেলেন তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠবার সময় আমাকে চুপিচুপি বললেন 'নিজে বাঁচাবার জন্যে যেন অন্য কারো নাম ক'রো না—কিছু স্বীকার করো না।' ভূতের মুখে রাম নাম! যাই হোক্ আমি তখন ভাবছি কেমন করে পুলিশ হাজত এড়ান যায়। বুদ্ধি করে এটা এড়াতে না পারলে আবার মৌলমীনের অবস্থা হবে।

উপরে গিয়েই মজুমদার সাহেবকে বললুম 'আমার দু'তিনবার জলের মত পায়খানা হয়েছে আর বমি পাচ্ছে, একবার বাথরুমে যাব।' আমাকে বাথরুমে নিয়ে গেলে, চেষ্টা করে যতখানি পারি মুখের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে দিলুম বমি করবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে বমি করে ফেললুম। যখন আমরা নীচে মারামারি করছিলুম তখন সিপাইরা আমার পিঠের উপর লাঠি মেরেছিল কিন্তু আমার নিরলস উদ্যম ও উত্তেজনার মুখে বিশেষ কিছুই বুঝিনি। একে মার খেয়েছি তার উপর বমি ও পায়াখানা—মজুমদার সাহেব কি ভাবলেন জানি না, আমাকে তাড়াতাড়ি জেল হাতপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। আমি বাথরুম থেকে ফিরে এসে বললুম 'খুব খারাপ

লাগছে, হয় আমাকে ছেড়ে দিন না হয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, আবার বমি করব'—বলেই ছুটলুম বাথরুমের দিকে। এবার বোধ হয় সত্যিই তাঁদের ভয় হ'ল। ফিরে আসতেই বললেন 'ছাড়া হবে না, জেল হাজতে যেতে হবে। কোথায় যেতে চান?' এ কথা বলেই মজুমদার সাহেব তাঁর বড় বড় হলদে হলদে চোখ দু'টো আমার মুখের উপর রাখলেন। এতক্ষণ বুদ্ধি করে ঠিক ধাপ্পা দিয়েছিলুম—কিন্তু অন্তরের আবেগে আনন্দের আতিশয্যে মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—প্রেসিডেন্সী জেল।

'কেন দলের সব লোক আছে বলে? তা হবে না হাওড়া জেল' —বললেন তিনি। আমার অনুপস্থিতিতে কি আলোচনা হয়েছে জানি না, যে লোকটি আমায় নীচে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়েছিল সে খুবই রসিক। আমায় নীচে নামিয়ে আনতেই আমার হাতে অপমানিত হওয়া অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন 'কি হুকুম হ'ল?' কনেষ্টবলটি বললে 'আরে চিড়িয়া ত ভাগতা হ্যায়! তিনি বললেন 'কি রকম?' কনেষ্টবল বললে 'আরে এ ত পুরাণো খলিফা আছে মনিবাবু। হাওড়া জেল।'

হিংস্রতার আনন্দ খুবই তীব্র ও নিষ্ঠুর। ক্ষুব্ধ অভিমান ও দর্পের একি অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর পরিসমাপ্তি। হাতের শিকার নাগালের মধ্যে এসেও ফসকে গেল। এর আগে আমারও গিয়েছিল। পুলিশ হাজত এড়াতে পেরে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। এক-দিকে আনন্দও হ'ল—এটা আশা করি নি—স্বপ্নলব্ধ দৈবসম্পত্তি লাভের মত আনন্দ। কিন্তু অন্য দিকে আশাভঙ্গের পরম দুঃখকর ব্যর্থবেদনা ও অনৈপুণ্যের অখ্যাতির সঙ্গে তখন পিঠের যাচিত ও অযাচিত অনুগ্রহের যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে। হাত নাড়তে বেশ কষ্ট হচ্ছে। যে আই. বি.-র লোকটি আমাকে হাওড়ায় আনছিলেন তাঁর কাছে শুনলুম মেয়েটির খবর—আসল লোককে পাওয়া যায় নি তাই তাঁর ঘরের সহপাঠিনীকে আনা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করবার

জন্যে। আমি অসুখের ভাণ করে শক্তিহীন শৈথিল্য দেখিয়ে কূর্ম অবতারটি সেজে বেরিয়ে এলুম লর্ড সিংহ রোড থেকে—হাওড়া জেলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিচারহীন বিধানের কঠিন আশ্রয়ে।' হয়ত হ'ল শক্তির পরাজয় কিন্তু বাঁচলুম কদর্যময় দুর্গতির পঙ্ককুণ্ড থেকে। অফিসারটি বললেন 'মারামারি করলেন কেন?' বললুম—'মেয়েদের উপর অভদ্র আচারণ বরদাস্ত করি না।' আমার কলেরা হয়েছে সে খবর তখন হাওড়া জেলে এসে গেছে। তাই আমাকে আলাদা করে রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

যখন জেল ফটকে ঢুকছি একটা পুরানো কথা মনে পড়ে যেতে হাসি এল। জেলার বাবু সিলেটের লোক—নিজস্ব ভাষায় বললেন 'হাসেন ক্যান?' আমি যখন প্রথম হাজতে ঢুকি একজন জমাদার বলেছিল 'এ বড় মজার জায়গা—যে একবার আসে তাকে বারে-বারেই আসতে হয়।' তার সে কথাটা মনে পড়ে যেতে হাসি এসেছিল। সারাদিন কিছু খেতে পাই নি—ক্ষিদেয় তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। কলেরা হয়েছে কেউ কিছু খেতে দেবে না, সিপাই পর্যন্ত কাছে আসে না ভয়ে। মহামুস্কিল হ'ল। না খেতে পেয়ে মরব নাকি? সিপাইকে বললুম 'ডাক্তার বাবুকে একবার সেলাম দাও।' একে কলেরা তার উপর আবার ডাক্তার ডাকছি—সঙ্গে সঙ্গে কোয়াটার্সে খবর গেল। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না। কপাল মন্দ—মিথ্যা আশ্রয়ের ফল সঙ্গে সঙ্গে।

রাত প্রায় আটটায় ডাক্তারবাবু এলেন—আমি তখন একটা কম্বল পেতে শুয়েছি আর মশার উপদ্রবে একখানা কম্বল আগা-গোড়া ঢাকা দিয়েছি। ডাক্তারবাবু এসেই 'কই কি হয়েছে?' বলে যেই আমার মুখের কম্বল সরিয়েছেন অমনি চমকে উঠলেন। আমি তাঁর খুব পরিচিত। তার ছেলের হোষ্টেলে আমাকে অনেক-বার দেখেছেন। তাঁর ধারণা ছিল আমি তাঁর ছেলের সহপাঠি। এ হেন ডাক্তারবাবু আমাকে দেখে ভড়কে গেলেন ভবিষ্যতের

অনিশ্চয়তার চিন্তায়। তাঁর হয়ত ভয় হ'ল যে তাঁর ছেলেকেও এমনি করে ধরে আনবে। ভয়টা নিতান্ত অমূলক নয়। তাঁর মনের চেহারাটা তখন আমার কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁর মন তখন ভারাক্রান্ত। বললুম 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে সারাদিন খাওয়া হয় নি, কিছু খেতে দেবার ব্যবস্থা করুন, নইলে ক্ষিদেয় মারা পড়ব যে। সে জন্যেই ত আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

'এত রাতে কি পাব? আচ্ছা দেখি, হাসপাতালে কিছু আছে কি না?' বলে অন্যমনস্কের মত চলে গেলেন। পরে ছু'টি আপেল ও ন্যাসপতি পাঠিয়ে দিলেন। কাটবার কোন উপকরণ নেই—নাই থাক্ ক্ষিদের চোটে খোসা সমেত কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেললুম। রাতে মোটেই ঘুম হ'ল না, পিঠের যন্ত্রণা বেড়েই চলল—তার উপর কম্বলের কুটকুট ও মশার কামড়, বালিশের বদলে একখানা ইট। দীনতার পঙ্ককীর্ণ আবর্জনার সমারোহ।

পরের দিন সকাল বেলা এলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমাকে নিতান্ত ছোট ছেলে মনে করে বললেন 'কোন্ ক্লাসে পড়?' বললুম বি. এ. পড়ছি। ইংরেজীতেই বলছিলেন বললেন 'খুন করতে পার?' বললুম 'ও কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।' তাঁর নাম শ্রীকে. এস. ঠাকুর সিং—মারাঠী ব্রাহ্মণ। তিনি মনে প্রাণে খুব স্বদেশী—একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন বিলাতী জিনিস তাঁর বাড়ীতে নেই বলেছিলেন একদিন। তিনি কি মনে করে ডাক্তার বাবুকে বললেন 'পুলিশের কাজ নেই—এই বাচ্ছা ছেলেগুলোকে ধরে আনছে।' আমাকে বললেন 'আচ্ছা দেখব তোমার জন্যে কি করতে পারি।' আমি সুযোগ পেয়ে বললুম 'অন্যান্য রাজ-বন্দীরা যেখানে আছেন সেখানে আমাকে পাঠিয়ে দিন।' তিনি বললেন 'তোমার কলেরা হয়েছে বলে সন্দেহে আলাদা করে রাখা হয়েছে।' বললুম সেরে গেছি। ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞেস করুন

—কাল পুলিশ মার ধোর করেছিল তাই কেমন গা ঘুলিয়ে বমি হয়েছিল' বলেই জামাটা সরিয়ে পিঠটা দেখালুম– মারের জন্যে কালসিটে দাগ পড়ে আছে। ভদ্রলোক দেখে হয়ত ব্যথিত হলেন —বললেন 'আচ্ছা তাই হবে।' বুঝলুম ছাড়া ত পাব না থাকতে হবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বর্বরতম প্রণালীর বন্ধন দশায় অনির্দিষ্ট কালব্যাপী অনিশ্চিত ভাগ্যের প্রতীক্ষায়।'

এলুম ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। সেখানে ছিল হৃষীকেশ ও পঞ্চানন—কয়েকদিন আগে ধরা পড়ে এসেছে—আমাকে কলকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানাল। পুরানো বন্ধুত্বের সান্নিধ্য তখন ভালই লাগল। জেলের ভেতর সাদা কালা আদমীর থাকার ব্যবস্থা পৃথক। ইংরেজ আমলে সাদা কালার প্রভেদ সবখানেই—চাকরি, মাইনে, সুযোগ এমন কি জেলখানাতেও।

দু'চার দিন পরে শ্রীঠাকুর সিং আমাকে বললেন 'আমি তোমাকে ছোট ছেলে দেখে নির্দোষ মনে করেছিলুম—পুলিশের কাছে বলতে তারা শুনিয়ে দিলে যে তুমি এর আগেও একবার ধরা পড়েছিলে—তোমার এক দাদার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে, তুমি এবার ধরা পড়ে মারামারি করেছ। তোমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু রিপোর্ট, আমি কিছু করতে পারব না।' মনে করলুম বলি 'আমি ত আপনাকে কিছু করতে বলি নি।' কিন্তু চুপ করে গেলুম। লোকটি কিন্তু খুবই ভদ্র—কোনদিন খারাপ ব্যবহার করেন নি। কোন অসুবিধের কথা বললে সাধ্যমত তা' দূর করবার চেষ্টা করতেন।

এর কয়েকদিন পরে ১৯৩১ সনের ২রা অক্টোবর রাত্রে মানিকতলা ক্যানেল ওয়েষ্ট রোডে শ্রীকালীকৃষ্ণ কুণ্ডুর গদীতে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে ধরা পড়লেন শ্রীমতী বিমল প্রতিভা দেবী, সর্বশ্রীধীরেন চৌধুরী, শ্রীকালিপদ রায়, নরহরি সেন ও নোয়াখালীর প্রফুল্ল ভট্ট। ধীরেন চৌধুরী মোটর চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যে কাজের জন্যে তাঁরা গেলেন তা' সুবিধে করতে পারলেন না।

৩রা অক্টোবর পুলিশ ফরিদপুরে শ্রীলাল মিঞা, জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার গুহ মজুমদার ও ডাঃ রাসবিহারী সেনের বাড়ী তল্লাসী করল। ২৮শে অক্টোবর ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল. সি. ডুর্ণো বেলা এগারোটার সময় নবাবপুরের রায় এণ্ড কোম্পানীর মদের দোকানের সামনে গাড়ীতে বসেছিলেন তখন তিনি বিপ্লবীদের হাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েও বেঁচে গেলেন। গুলি করে শ্রীসরোজ গুহ নির্বিঘ্নে সরে পড়লেন। কপালের পাশে গুলি লাগল। তিনি কর্ণেল ও. ব্রায়েন ও ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে চলে এলেন। পরের দিন ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স ও আহত হয়ে বেঁচে গেলেন। মিঃ ভিলিয়ার্স যখন তাঁর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসে বসে কাজ করছিলেন তখন বেলা সাড়ে এগারটার সময় শ্রীবিমল দাসগুপ্ত তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে পর পর তিনটী গুলি করলেন। একটি গুলি শুধু তাঁর পিঠে লাগে। রয়ালিষ্ট লীগের তিনজন সদস্য শ্রীদাসগুপ্তকে ধরে ফেললেন। মিঃ বার্টলে, রায়বাহাদুর নলিনীকান্ত বসু ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুনালে শ্রীদাশগুপ্তের ১৩ই নভেম্বর দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কয়েকদিনের মধ্যে ধরা পড়লেন ঢাকার রাউলি গ্রামের শ্রীসুধীন্দ্র মোহন রায় [১] ছ'ঘরা রিভলভার নিয়ে মঙ্গলা লেনে। পাঁচ বছরের জেল হয়ে চলে গেলেন আন্দামান।

কয়েকদিন পরে একজন আই. বি. অফিসার এলেন আমার কাছে। যেমন কালো দেখতে তেমনি রুক্ষ কথা,—অপরাধ ও অকল্যাণের যেন একটা পুঞ্জীভূত চেহারা। হুকুমের ভঙ্গীতে বললেন 'আমি এলুম একটু আলাপ করতে।' কথা শুনে মনে হ'ল যেন কণ্বের তপোবনে দুর্বাসা এসে বললেন 'অয়মহং ভোঃ।' কণ্ব-

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯শে অক্টোবর ১৯৩১।

দুহিতা শকুন্তলা শুনতে না পেয়ে অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন আর আমি তাঁর কথা বেশী করে শুনতে পেয়ে মেজাজ ফেললুম বিগড়ে। ভাগ্যবিড়ম্বিত পুলিশপুঙ্গবের দম্ভে একটু আঘাত করে ছাড়লুম। তিনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন সব পুরানো কথা—নতুনের মধ্যে বললেন যে আমি যে সাহেবের আর্দালীকে দিয়ে কার্তুজ যোগাড় করতুম তার চাকরি গেছে। তিনি সঙ্গে করে ফটোগ্রাফার এনেছিলেন—আমার ছবি সবদিক থেকে তোলা হ'ল—মানে দাগী আসামী হয়ে গেলুম। বললেন যে আমার বিরুদ্ধে যা কিছু প্রমান পুলিশ যোগাড় করেছে তা সমস্তই মহামান্য হাই-কোর্টের দু'জন বিচারপতির কাছে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের অপক্ষপাত বিচারে আমি বিনা বিচারে আটক থাকার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছি। কাজেই আমার উপর নতুন আদেশ জারি হ'ল যে পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক থাকব। বলা হ'ল আমাকে বাংলা ও ইংরেজী হাতের লেখার নমুনা দিতে হবে। বাংলা কবিতা দু'চার লাইন বানিয়ে লিখে দিলুম। ভদ্রলোকের পছন্দ হ'ল না—বললেন 'কবিতায় হবে না, ফক্কুড়ি না করে গদ্যে আটদশ লাইন লিখে দাও'। একে ত ভদ্র-লোককে দেখে মন গেছে খারাপ হয়ে তারপর ফরমাস ও কথা বলার ধরণ দেখে গেলুম ক্ষেপে—রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে লিখে দিলুম কয়েক লাইন—"পুলিশ একবার যে—চারায় অল্পমাত্র দাঁত বসাইয়াছে সে-চারায় কোন কালে ফুলও ফোটে না ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিদ্যা, তেমনি চরিত্র; পুলিশের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উন্মাদ হইয়া বহরমপুর পাগলা গারদে জীবন কাটাইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তাহার কাছে বৃটিশ রাজের একচুল মাত্র আশঙ্কার কারণ ছিল না অথচ তার

কাছ থেকে আমাদের দেশ বিস্তর আশা করিতে পারিত। পুলিশের মারের ত কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। উহাদের নিঃশ্বাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্কুর শুকাইতে সুরু করে। উহাদের খাতা যে গুপ্ত খাতা, উহাদের চাল যে গুপ্ত চাল। সাপে খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না আজকের দিনে তেমনি পুলিশে-ছোঁয়া মানুষকে কেহ ব্যবহারে লাগায় না—এমন কি বাংলা দেশের কন্যা-দায়িক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাতে ভয় করে।"

ভদ্রলোক সেটা পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন খানিকটা ইংরেজী লিখে দাও। কি লিখি? আবার লিখলুম বানিয়ে কয়েক লাইন। তারপর মনে পড়ে গেল তত্ত্বজ্ঞানী স্যাণ্টায়ানার কথা—লিখে দিলুম—

"The misfortune of the Revolutionists is that they are disinherited and their folly is that they wish to be disinherited even more than they are. Hence in the midst of their most passionate and heroic idealism, there is a strange poverty in their minds many an ugly turns in their lives and an ostentatious vileness in their manners. They wish to be the leaders of mankind but they are the wretched representatives of humanity." জানিনা ভদ্রলোক কেন এত চটে গেলেন। শেষের লেখা দু'টো আমার সামনেই ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

মাননীয় বিচারপতিদের মত বলাতে মনে হ'ল তাঁরা পুলিশের বানানো রিপোর্টের উপরই ত রায় দিয়েছেন। বললুম 'আমার বিরুদ্ধে কি কি রিপোর্ট আছে বলবেন কি?' তিনি একবার আমার মুখের দিকে কটমট করে তাকালেন, ভাবটা এই যে 'দেখছি এ

ছোকরার সাহসের অন্ত নেই।' সত্যিই তখন আমার সাহসের কোন অন্ত ছিল না। তাছাড়া আমার দুষ্টুবুদ্ধি ছিল সব সময়েই— অকৃত্রিম আত্মীয়তার ভাণ করে সেই দুর্বাসাটিকে বলে ফেললুম 'আপনি যখন আমার মত বয়সের ছিলেন, মানে কলেজে পড়তেন তখন কি আপনার মনে কোনদিন ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করবার চিন্তা জাগে নি? আপনার নাতি নাতনীরা যারা স্বাধীন ভারতের আসন্ন সূর্যোদয়ের অরুণ সারথি, তারা যখন বলবে দাদু তোমরা এতগুলো লোক দেড়শ বছর ধরে এই ক'টা ইংরেজের কাছে পরাধীনতার অবিচ্ছেদ্য গ্লানি ও অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের বোঝা কেমন করে সহ্য করেছিলে? কি উত্তর দেবেন?' নিত্য অভ্যাসের স্থূল পর্দায় বোধ হয় অকারণে টান পড়ল। এই নিষ্ঠুর কঠোর পরিহাসের অপ্রত্যাশিত উৎপাতে ভদ্রলোক চটে বোম হয়ে গেলেন। দুর্বাসার কালো মুখ বেগুনে হয়ে গেল—রাগে উঠে পড়লেন বললেন 'এখন জেলে পচতে থাক।' চাকরির এমনই মোহ। শক্তিহীনতাই শ্রীহীনতার যথার্থ রূপ। ভদ্রলোক চলে যাবার পর মনে হ'ল এটা ত আমার মনের ক্ষোভেরই বহিঃ প্রকাশ। ভদ্রলোকের মনে কষ্ট না দিলেই হ'ত।

তখন মনে মনে ভারি অস্বস্তি—কিছুই করতে পারলুম না— অথচ কতদিন জেলে আটক থাকতে হবে কে জানে? পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা কতকাল বইতে হবে কে জানে? দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তখন অনাবিষ্কৃত। তখন কেবলই চিন্তা যেমন করে হোক্ জেল থেকে পালাতে হবে। একদিন একটা সুযোগ মিলল অপ্রত্যাশিতভাবে। রাত্রে উঠে দেখি আমার সেলের লাগাও পায়খানার গেটটা একটু ফাঁক—ঠেলতেই খুলে গেল। ব্যাপারটা কি? সন্ধ্যে সাতটা হ'লেই আমাদের সেলে তালা পড়ে যেত—রাত্রে বাইরে আসবার কোন উপায় ছিল না—কেমন করে খুলল অথচ বাইরে তালা ঠিকই লাগানো। ভাল করে দেখতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। গেট

বন্ধ করবার সময় আলতারাফটা ঠিক জায়গায় না পড়ে পাশ দিয়ে গেছে—তারপর তালা লাগিয়েছে না দেখে—যেটাতে আটকাবে তার ভেতর দিয়ে যায় নি। খরগোস যাতায়াত করেছে তাই তাদের গা লেগে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেছে। আমি বেরিয়ে এলুম মায়াবী নিশাচরের মত—কিন্তু পাঁচিল টপকাবো কি করে? ভারি ভুল হয়ে গেছে যদি একখানা চেয়ার ঘরের মধ্যে এনে রাখতুম। হঠাৎ মনে হ'ল কাপড়ে ইট বেঁধে দেওয়ালে আটকে দিয়ে ওঠা যাবে—এই মনে করে ঘরের মধ্যে গিয়ে একখানা কাপড় নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি দেখি একজন ওয়াডার এসে পড়েছে খোলা গেটের কাছে। তাকে দেখেই সরে এলুম, সেও বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল। ডাকাডাকি করে অন্য ওয়ার্ডারকে ডেকে এনে তালা ঠিক করে বন্ধ করে গেল। এমন সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলুম না।

পরের দিন হৃষিকেশ ও পঞ্চাননকে বললুম সেই সুযোগের ব্যাপারটা। তারাও শুনে আফশোষ করতে লাগল। সেদিন থেকে সবাই ঘরে একখানা করে চেয়ার রেখে দিতুম—এই আশায় যদি কোনদিন আবার সুযোগ মেলে—কিন্তু কোনদিনই মিলল না। তখন চেষ্টা করতে লাগলুম অন্য কি ভাবে পালানো যায় দেখতে হবে বাইরে কোন্ দিকে কি আছে? জেলারবাবু খুবই সতর্ক থাকতেন। এর আগে চট্টগ্রামে ছিলেন—তখন অস্ত্রাগার আক্রমণের বন্দীদের ওয়ার্ড থেকে ডিনামাইট ও রিভলভার পাওয়া যায়—সে জন্যে তাঁর বদলির আদেশ হয়, তারপর এসেছেন এখানে।

১৯৩১ সনের ১৩ই অক্টোবর শ্যামবাজার বোমার মামলায় ৭ জনের মধ্যে সর্বশ্রীফণীভূষণ দাশগুপ্ত, প্রফুল্লকুমার দে, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সন্তোষ ব্যানার্জী, সুধীর দাস ও কালীকৃষ্ণ দাসের এক বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে গেল। রাজকুমার ব্যানার্জী শুধু পেলেন মুক্তি। ঐ দিন ঢাকায় ব্যাপটিষ্ট মিশনের সামনে ঢাকা পোষ্ট অফিসের ২৮০০০৲ টাকা পেয়ে গেলেন বিপ্লবীরা

চার জনের কর্মকুশলতায়। এসেছিলেন সাইকেলে, চলেও গেলেন সাইকেলে, কনেষ্টবল কিছুই করতে পারল না।

একদিন দিনের বেলা আমরা তিনজনে আমগাছে চড়েছি—বাইরে কোথায় কি আছে দেখবার জন্যে—অমনি পাগলা ঘন্টি পড়ে গেল। সিপাই সান্ত্রী যে যেখানে ছিল এল ছুটে। আমরাও তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নামব মনে করে লাফিয়ে পড়লুম। আমি ঠিক জেলার বাবুর সামনেই পড়লুম—আর একটু হ'লে ঘাড়ে পড়তুম, ফলে হয়ত দু'জনেই জখম হতুম। তিনি শ্রী ঠাকুর সিং এর কাছে অভিযোগ করলেন যে আমরা তাঁকে খুন করবার মতলবে এমন করে তাঁর ঘাড়ে পড়বার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি সে কথা বিশ্বাস করলেন না। আমায় জিজ্ঞেস করায় বললুম 'অনেকদিন আটকে আছি বাইরেটা দেখবার সখ হয়েছিল, তাই গাছে চড়েছিলুম—জানতুম না গাছে চড়া বারণ আছে। পাগলা ঘন্টি পড়ায় তাড়াতাড়ি নামবার জন্যে লাফ দিয়েছিলুম—জেলার বাবু হঠাৎ এসে পড়েছিলেন, তাকে মারবার ইচ্ছে ছিল না— তিনি নিজেকে বড় করবার জন্যে এ অভিযোগ করেছেন। আমরা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না।' তিনি মুচকে হাসলেন; কেন জানিনা আমার কথাটা বিশ্বাস করলেন—হয় ত আগে সিপাইদের জিজ্ঞেস করেছিলেন। পরের দিন জেলার বাবুকে একা পেয়ে বললুম 'আপনাকে মারবার জন্যে গাছে চড়ার দরকার হয় না। আপনি ত চীনে মাটির পুতুল, এতই নগণ্য যে আপনার সম্বন্ধে এ চিন্তা কোন দিন মনেই আসে নি; ইচ্ছে হলেই ত বহুদিন আগেই সাবাড় হয়ে যেতেন।' ভদ্রলোক মনে মনে চটলেও মুখে কিছু বললেন না। তাঁরও দুষ্টুবুদ্ধি ছিল ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। তিনি হৃষীকেশকে বাবু বলতেন না। আপত্তি করায় বললেন 'বাবু কথাটা বেবুন থেকে এসেছে।' তারপর আমরাও তাঁকে জেলার বলে ডাকতে আরম্ভ করলুম অথচ তাঁর সামনে তাঁর অধীনস্থ ডেপুটি জেলারকে ডেপুটি

বাবু বলে ডাকতুম। কথাটা শুনতে তাঁরও ভাল লাগত না। আবার বাবু বলতে আরম্ভ করলেন। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে মজা করে সময় কাটান যেত মন্দ নয়। ছেলেমানুষী বুদ্ধিটাই তখন প্রবল।

একদিন ডাক্তারবাবু চুপিচুপি আমাকে বললেন 'কাল পঞ্চানন বাবু রাজসাহীর গোদাগাড়ী গ্রামে যাচ্ছেন, হুকুম এসে গেছে।' আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বিদায় অভিনন্দনের আয়োজন করলুম। জেলার বাবু বললেন 'কেমন করে জানলেন যে কাল পঞ্চাননবাবু চলে যাবেন?' তৎক্ষণাৎ বললুম 'বা রে আপনিই ত বলে গেলেন —বুড়ো হচ্ছেন তাই সব ভুলে যান।' ভদ্রলোক ত অবাক, যেন আকাশ থেকে পড়লেন—আমরাও গম্ভীর হয়ে রইলুম।

একদিন তাঁকে বললুম 'দেখুন এই কয়েদীগুলো অভাবের তাড়নায় না হয় সংসর্গদোষে অপরাধী হয়ে এখানে শাস্তি ভোগ করছে—কিন্তু আপনারা ত এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছেন। পরিশ্রম করে এরা ফসল ফলাচ্ছে আপনারা মজা করে খাচ্ছেন— আপনাদের শাস্তির বিধান কোথায়? সময় সময় আপনারা ত গুরুতর অপরাধ করে থাকেন।' ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন, হয়ত মনে করলেন চুপ থাকাই ভাল। তখন থেকে তিনি আমাদের কাছে আসা কমিয়ে দিলেন, আমরাও আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হলুম।

শ্রীঠাকুর সিং আমাকে খুব ভাল বাসতেন। একদিন বললেন 'তুমি ছাত্র, তোমার বন্ধু দু'টি পড়াশুনা করে না—আমি যতদিন এখানে সিভিল সার্জেন আছি তুমি থেকে যাও, ভাল করে লেখা-পড়া কর—ক্যাম্পে অনেক লোক, কত রকমের গোলমাল, ওখানে পড়াশুনায় ব্যাঘাত হবে।' আমি চুপ করে রইলুম। বন্ধনহীন অসংযত মনে তখন বৃহত্তর পরিবেশের দিকে প্রবল আকর্ষণ। জেলখানার সংকীর্ণ প্রাচীরের মাঝে মনে হ'ল জমবে না প্রাণের

উত্তাপ, আনবে না মনের স্বাচ্ছন্দ্য। তখন সতীর্থদের নব নব প্রাচুর্যের কোলাহলের দিকে মনের গতি।

কলকাতায় অস্ত্র আইনে ধরা পড়েছিলেন সর্বশ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, ভূপেশ ভট্টাচার্য, ফনীন্দ্র চন্দ্র সেন, সুশীল রায়, অজিত রায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সেনগুপ্ত প্রশান্তকুমার সমাদ্দার ও সুখেন্দু কুমার গোস্বামী। ৩রা ডিসেম্বর তাঁরা ষড়যন্ত্র মামলায় মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অর্ডিনান্সে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'ল।

দেখতে দেখতে তিনমাস কেটে গেল। ডিসেম্বর মাসে এল বদলির আদেশ—যেতে হবে হিজলী অবরোধ শিবিরে। যেদিন হিজলী আসব তার আগের দিন শ্রীঠাকুর সিং এলেন আমার ঘরে, হয়ত কিছু উপদেশ দিতে। আমি তখন কিপলিং-এর লেখা পড়ছিলুম। বললুম 'আপনি ত আমার দেশের লোক, শুনুন ওরা আমাদের কত অবজ্ঞার চোখে দেখে—কিপলিং আমাদের দেশকে তুলনা করেছেন একটা চিড়িয়াখানার সঙ্গে—ভারতবর্ষ একটা চিড়িয়াখানা আর গভর্ণমেণ্ট একটা সার্কাস কোম্পানী। তাঁরা সভ্য জগতের সামনে শাসন করে চিড়িয়াখানার জন্তুদের ইচ্ছেমত নাচাচ্ছেন চাবুকের ভয় ও মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে। তাঁর এ লেখায় প্রকাশ পেয়েছে একটা অহংকার মিশ্রিত নিষ্ঠুরতা আর তাচ্ছিল্য। ওরা আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে না তাই পুনায় মহামারীর সময় ওরা দুই নাটু ভাইয়ের উপর করেছিল যথেচ্ছ অত্যাচার—লোকমান্য তিলকের উপর কম নির্যাতন হয় নি। এই অবজ্ঞার বলেই সমস্তিপুরে একদিন দরিদ্রের বিহাহ উৎসবে উঠে-ছিল হত্যাকাণ্ডের মর্মভেদী আর্তনাদ। স্যার্ হেনরী ফাউলার পার্লামেণ্টে একদিন নির্লজ্জভাবেই স্বীকার করেছিলেন 'ওয়ারেং হেষ্টিংস ও লর্ড ক্লাইভের কাজগুলো যদি পার্লামেণ্টের বিচারাধীন হ'ত তবে হয়ত আমাদের ভারত সাম্রাজ্য গড়ে উঠত না।' কাজের

ন্যায়নীতির কোনই বালাই নেই। ক্ষমতায় অন্ধ ইংরেজ সময় সময় কর্তৃত্ব নেশায় এমন সব কাজ করে বসেছে যাতে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে—তা' তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটই হোন্ আর লাট সাহেবই হোন্।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাইলেন। বললুম আর একটু স্পষ্ট করে বলি 'ক্ষমতায় অন্ধ লর্ড কার্জন দিল্লীর দরবারে ডিউক অফ কনটকে আনিয়ে নিজে দরবার তক্তে বসে ইংল্যাণ্ডের রাজ-বংশের কি প্রকাশ্য অবমাননা করেন নি? তিনি ত নিজের দম্ভ প্রচার করবার জন্যেই এ কাজ করেছিলেন।' এদেশে ইংরেজ যখনই কোন দমনআইন পাশ করাতে চেয়েছে তখনই বাংলাদেশ থেকে তার প্রতিবাদ উঠেছে। বাংলার ছেলেরাই প্রথম হাত তুলেছে ইংরেজের গায়ে, ছুঁড়েছে বোমা, উঁচিয়ে ধরেছে পিস্তল, হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে ফাঁসি কাঠে—চলে গেছে দ্বীপান্তরের সাজা নিয়ে। ইংরেজের গায়ে হাত তুললেই কাগজে কাগজে তার প্রতিবাদ। অনেকদিন আগে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান গড়ের মাঠে কোন ইংরেজের বেয়াদপি সহ্য না করতে পেরে তাকে চাবুক মেরেছিলেন—তাঁর জেল ত হ'লই—আবার তা' নিয়ে কাগজে কাগজে হৈ চৈ। এলাহাবাদে শ্রীসোমেশ্বর দাস ইংরেজের গায়ে হাত দেওয়ার জন্যে গ্রামশুদ্ধ লোকের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তিনি হয়ত মনীষি হার্বার্ট স্পেন্সারের ভক্ত তাই তাঁর মনে ছিল "principles admitted in theory are scorned in practice. Forgiveness is voted dishonourable. An insult must be wiped out by blood. (১) তিনি ত জানতেন না যে 'আমাদের জীর্ণ প্লীহা ইংরেজের বুটাগ্রের পক্ষে যেরূপ সহজ লক্ষ্য, ইংরেজের নাসাগ্র আমাদের বদ্ধ মুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নয়।'

(১) Facts and Comments—Herbert Spencer.

ভদ্রলোক চুপ করে শুনলেন। হয়ত আমার কাছে এ সব কথা শোনার আশা কোনদিন করেন নি। আলাপের ছিন্ন অবকাশে হয়ত পেলেন আমার দৈন্য-বিজয়ী মনের নতুন পরিচয়। বললুম 'চিড়িয়াখানায় হাতির পাশে বাঁদরও থাকে। ব্রাউনিং টেনিসনের পাশে কিপলিং ঠিক সেই রকম নয় কি? দুগ্ধফেননিভ শয্যার পাশে শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন। ইংলণ্ডও ত তা'হলে একটা চিড়িয়াখানা?' তিনি হাসলেন, যাবার সময় বলে গেলেন 'আর হয়ত দেখা হবে না—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' আমিও হাত তুলে নমস্কার করে বললুম 'আপনাকে চিরদিন মনে থাকবে।'

আজ অপস্রিয়মান স্মৃতির স্খলিত উত্তরীয়ের ছিন্ন প্রান্তে সেদিনের ছোটখাট ঘটনাগুলো বিলীয়মান অস্তশিখরের বিকীর্ণ জীর্ণ পথ বেয়ে যেন ভিড় করে আসছে।

শেষ হ'ল হাওড়া জেলের বন্দী জীবন।

সতেরো

১৯৩১ সনের ৯ই ডিসেম্বর এলুম হিজলী অবরোধ শিবিরে—'নরমেধ যজ্ঞের স্পর্ধিত দেউল।' ট্রেনে আমার সঙ্গে আরও দু'জন এলেন—ঢাকার শ্রীশচীশ সরকার ও শ্রীবারীন রায়। দু'জনেরই উপর নোটীশ জারি হয়েছে হিজলী বন্দী শিবিরের অধ্যক্ষের কাছে হাজির হবার জন্যে। পরিচয় হ'ল। হিজলীতে তখন আমার মত প্রায় দু'শো বন্দী। পুরানো বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন—দেখা হ'ল অনেকদিন পরে। কিছুদিন আগে গুলি চলেছিল—দু'জন গেছেন মারা—আর শ্রীগোবিন্দপদ দত্তের একটি হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে। আর একজনের বেওনেটের আঘাত গুরুতর হলেও বেঁচে গেছেন—নাম শ্রীশচীন্দ্রকুমার ঘোষ—দু'জনেই

কৃষ্ণনগরের লোক। শ্রীশশীন্দ্র কুমার ঘোষের দাদা শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় ছিলেন।

১৯৩১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি. জি. বি. ষ্টিভেনস্‌কে মারলেন ফৈজুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয়ের দু'টি ছাত্রী—শ্রীমতী শান্তি ঘোষ ও শ্রীমতী সুনীতি চৌধুরী। তাঁরা সকাল দশটার সময় একটা ঘোড়ার গাড়ীতে প্রথমে কালেক্টারের অফিসে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে আসেন তাঁর বাংলোয় এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একটি কাগজে নাম লিখে দেন শ্রীমতী ইলা সেন ও শ্রীমতী মীরা দেবী। দেখা করার উদ্দেশ্য—মেয়েদের একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতা। মিঃ ষ্টিভেন্স যখন সেই দরখাস্তে মন্তব্য লিখছেন তখন তাঁরা তাঁকে গুলি করলেন—করলেন বীরাঙ্গনা ভগিনীর কাজ। এস. ডি. ও. শ্রীনেপাল সেন ছিলেন কাছে। তিনি 'পাকড়ো পাকড়ো' বলে চীৎকার করলেন, অন্য কয়েকজন তাঁদের ধরে ফেল্লেন। তাঁরা কিন্তু পালাবার কোন চেষ্টাই করেন নি; চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন এক জায়গায়। এই 'পাকড়ো' বলে চীৎকার করবার জন্যে সৌভাগ্যের পথ বেয়ে শ্রীসেনের এসে গেল খেতাব আর চারজন দেহরক্ষী। যতদিন চাকরি করবেন পাবেন নতুন নতুন সুযোগসুবিধে—খেতাব আর পদোন্নতি। অনিশ্চিত প্রাণের ভয়ের চেয়ে কর্মজীবনের সুনিশ্চিত উন্নতি কারো কারো কাছে ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়। শোনা যায় ভয়ে বড় জোর একরাতে মানুষের কালো চুল সাদা হয়ে যেতে পারে কিন্তু তাতে কি আসে যায়? চাকরি জীবনে শুভ্র রজত খণ্ডের চোখ ধাঁধানি অধিকতর কাম্য। মোট কথা সৌভাগ্যের গোপন চাবিটির সন্ধান জানা চাই তবেই উন্নতি—দেশ স্বাধীনই হোক্ বা পরাধীনই থাক। শ্রীমতী শান্তি ও শ্রীমতী সুনীতির কাছে '৩২০ বোরের বেলজিয়ান তৈরী দু'টি রিভলভার পাওয়া গেল। ১৯৩২ সনের ২৭শে জানুয়ারী তাঁদের বিচার শেষ হয়ে, হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড।

এ সম্পর্কে ধরা পড়লেন সর্বশ্রীশিশির চৌধুরী, অপূর্বকাঞ্চন দত্তরায়, বিভূতি বসু, শিশির সোম, অনন্ত দে, সন্তোষ চ্যাটার্জী, ভূবন বর্ধন, ফনীন্দ্র গুহ, বিনয় নন্দী, সমরেন্দ্র নন্দী, অমরেন্দ্র পাল ও চট্টগ্রামের শ্রীমতী ইন্দুমতী সিংহ ও শ্রীমতী নীলিমা নন্দী এবং আরও অনেকে।

পরেরদিন ১৫ই ডিসেম্বর ধরা পড়লেন শ্রীমতী প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম। ২০শে ডিসেম্বর ধরা পড়লেন ঢাকায় শ্রীমতী লীলা নাগ (রায়)। তাঁকে ও শ্রীমতী রেণু সেনকে বিনা বিচারে আটক রাখা হ'ল। পরে আরও অনেকে ধরা পড়লেন—শ্রীমতী উষা রায়, শ্রীমতী বীণা রায়, শ্রীমতী সীতা সেন, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বসু, শ্রীমতী লতিকা দাস, শ্রীমতী রেণুকণা দত্ত ও শ্রীমতী শকুন্তলা চৌধুরী। সকলকেই বিনা বিচারে আটক রাখা হ'ল দীর্ঘদিন।

১৯৩১ সনের ৩০শে ডিসেম্বর মানিকতলা ডাকাতি মামলার প্রধান সাক্ষীকে গৌরীবাড়ী লেনে মারবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস নেতারা বন্দী হলেন—কর্মীরাও আটক পড়লেন প্রায় ৩২২০০ জন। বোম্বাইএর কল্যাণ ষ্টেশনে ১৮১৮ সনের ৩ আইনে শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসুকে বন্দী করে রাখা হ'ল শিউনি জেলে। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ায় অনেক লেখালেখির পর তাঁকে পাঠানো হ'ল ভাওয়ালী স্বাস্থ্য নিবাসে। শেষে ডঃ লেফটেনাণ্ট কর্ণেল বাকুলির সুপারিশে নিজ খরচে তিনি গেলেন ইউরোপ।

এদিকে বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশ তখন অব্যাহত চলেছে। ১৯৩২ সনের জানুয়ারী মাসে হুগলীতে ধরা পড়লেন শ্রীসুনীলরতন গাঙ্গুলী। রিভলভার পাওয়া গেল তাঁর কাছে—জেল হ'ল সাত বছর। এই সময় বর্দ্ধমান জেলার ফরিদপুর থানা থেকে অন্তরীণ অবস্থায় একজন রাজবন্দী পালালেন। কলকাতায় ধরা পড়লেন পলাতক শ্রীঅবনীমোহন ভট্টাচার্য ওরফে প্রভাত—পাওয়া গেল

রিভলভার—। শ্রীঅবনীমোহনের জেল হয়ে গেল দীর্ঘদিনের। কয়েকদিন পরেই ধরা পড়লেন রিভলভার সমেত শ্রীঅনন্ত কুমার মুখার্জী—জেল হ'ল পাঁচ বছর।

১৯৩২ সনের ১৯শে জানুয়ারী ঢাকার এক সার্জেণ্ট মিঃ বোর্ণকে সুবিধে মতন পেয়ে বিপ্লবীরা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তাঁকে পিটিয়ে তাঁর রিভলভারটি নিয়ে সরে পড়েন। ২২শে জানুয়ারী হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গাড়ীতে পাতিহাল ষ্টেশনে বোমা ফেলা হয়। ১৯৩২ সনের ১লা ফেব্রুয়ায়ী লোথিয়ান কমিটির সদস্যদের ট্রেন উড়িয়ে দেবার জন্য দিল্লীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে রাখা হ'ল বোমা। বোমা ফাটল কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। ২রা ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর জেল থেকে পালালেন ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীদীনেশ মজুমদার, মেছুয়া বাজার বোমার মামলার শ্রীশচীন করগুপ্ত আর শ্রীসুশীল দাসগুপ্ত। কর্তৃপক্ষ ধরতেই পারলেন না যে কেমন করে সিপাইদের সঙ্গে কানামাছি খেলতে খেলতে তাঁরা সরে পড়লেন।

১৯৩২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শ্রীমতী বীণা দাস গভর্ণর স্যার ষ্টানলি জ্যাকসনকে সেনেট হলে গুলি করলেন। তিনি অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলেন। উপাচার্য সুরাবর্দী সাহেব তখন শ্রীমতী বীণা দাসের গলা টিপে ধরেছেন। তা হ'লে কি হয়, পর পর সব কার্তুজগুলি তিনি ছুড়লেন —'কাঁপিল না ক্লান্তকর, টুটিল না বীণা।' পাঞ্জাবের গভর্ণরও অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন ১৯৩০ সনের ২৩শে ডিসেম্বর। শ্রীমতী বীণা দাসের ন' বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। অস্ত্র প্রাপ্তি সম্বন্ধে পুলিশ কোন কথাই বের করতে পারল না। পুলিশ সন্ধান চালাতে লাগল। এ সম্পর্কে ১০ই ফেব্রুয়ারী ধরা পড়লেন কলকাতার শ্রীমতী প্রমিলা গুপ্ত ও শ্রীমতী সুশীলা দাসগুপ্ত। তখন তাঁরা বেথুন কলেজের ছাত্রী। অন্তরীণ অবস্থায় থাকতে হ'ল দীর্ঘদিন। ১৮ই

ফেব্রুয়ারী ধরা পড়লেন শ্রীমন্মথ বিশ্বাস ও শ্রীললিতমোহন সিংহ রিভলভার সমেত। শ্রীললিত মোহন ও শ্রীমন্মথের দু'বছর করে কারাদণ্ড হয়ে গেল ।

১৯৩২ সনের ২রা মার্চ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলার রায় বের হ'ল। দেখা গেল বিচারপতি মিঃ জে. ইউনী. শ্রীনরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী ও শ্রীআবদুল হাই—এঁদের ফাঁসির হুকুম দেন নি। দিয়েছেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের দণ্ড। সেদিন আমাদের সকলেরই আনন্দের সীমা ছিল না। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এ মোকদ্দমা সুচিন্তিতভাবে পরিচালিত হ'ল তিনি হলেন পরলোকগতা শ্রদ্ধেয়া ভগিনী শ্রীমতী ইন্দুমতী সিংহ।

১৯৩২ সনের ১৪ই মার্চ চরমুগুরিয়া পোষ্ট অফিস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন ফরিদপুরের ইদিলপুর নিবাসী শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ধরা পড়বার আগে তিনি দু'জনকে সাংঘাতিকভাবে করলেন আহত। সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন পাঁচ জন। ১৯৩২ সনের ৪ঠা জুলাই হাইকোর্ট তাঁর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখলেন। ২২শে আগষ্ট বরিশাল জেলে তাঁর ফাঁসি হ'য়ে গেল—আর একটি জীবন পড়ল বলি। এ সময় পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে মারা গেলেন শ্রীজ্যোতির্ময় সেন।

১৬ই মার্চ কলকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট থেকে ধরা পড়লেন শ্রীযোগেন্দ্র মোহন গুহ। তাঁর বাসা ২নং কালুঘোষ লেন তল্লাসী করবার সময় বেরিয়ে পড়ল তাঁর সুটকেশ থেকে রিভলভার—জেল হয়ে গেল ছ'বছরের। সঙ্গী শ্রীহরিপদ পেলেন মুক্তি। ২৮শে মার্চ রংপুর লালমনিরহাটে সেটেলমেণ্ট অফিসারদের পিস্তল ও গুলি করায়ত্ত করার জন্যে তাঁদের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩২ সনের ৩০শে মার্চ ভিক্ষু শরণশঙ্করকে ২৭বি, যুগল কিশোর দাস লেন থেকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করে প্রথমে আলিপুর সেনট্রাল জেলে পরে বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

১৯৩২ সনের ১লা এপ্রিল বেনারসে গঙ্গার উপর ডাফরিণ ব্রীজ চলন্ত ট্রেন সমেত উড়িয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়লেন পাঁচজন। ২৪ পরগণার শ্রীশীতলপ্রসাদ পাণ্ডে প্রথম জীবনে ছিলেন কনেষ্টবল পরে বিপ্লবীদলের সভ্য হয়ে তাঁর সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সকলের প্রশংসাভাজন হন কিন্তু সরকার তখন তাঁকে খোঁজ করছেন। ৩রা এপ্রিল সাবইন্‌স্পেক্টর শ্রীমজাহর হোসেন কোন সূত্রে সংবাদ পেয়ে ঝাঁঝাঁ ষ্টেশনে তাঁকে পেয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চান আর জিজ্ঞেস করেন যে তিনি বিনা লাইসেন্সে কোন আগ্নেয়াস্ত্র রেখেছেন কিনা! লাইসেন্স দেখাবার অছিলায় তিনি পকেট থেকে রিভলভার বের করে পুলিশ সাবইন্‌স্পেক্টর ও গুপ্তচর দু'জনকেই গুলি করলেন। সাব ইন্‌স্পেক্টর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন মারা আর গুপ্তচর হলেন গুরুতর ভাবে আহত। তাঁকে ধরবার আগেই শ্রীশীতল প্রসাদ রিভলভারের গুলিতে নিজের জীবন শেষ করে দিলেন। মানুষ নিজের বর্তমানের চেয়ে ঢের বড়। ১৪ই এপ্রিল আগরতলা সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে ধরা পড়লেন শ্রীসরোজ রঞ্জন চক্রবর্তী ও বে-আইনী ঘোষিত ছাত্রসংঘের সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র সেন।

১৬ই এপ্রিল বন্দী হলেন পলাতক রাজবন্দী শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চ্যাটার্জী। তিনি নৌকাযোগে স্বরূপকাটি থেকে যাবার পথে ধরা পড়লেন। বঙ্গবাসী কলেজে পড়বার সময় তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিনান্সে আটক করা হয়। তিনি জেল থেকে পালিয়ে গেলে তাঁকে ধরে দিলে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

১৫ই এপ্রিল ঢাকা এক্‌বামপুর গ্রামের শ্রীক্ষীতিশচন্দ্র মুখার্জী বোমা তৈরী করতে গিয়ে সাংঘাতিক ভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না। ১৭ই এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। বিপ্লবের আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। মহাকালের মঙ্গলশঙ্খ নির্ঘোষে তার ধূমায়িত বহ্নিরাশি দিগন্ত

প্রসারিত। ২১শে এপ্রিল মার্টিন কোম্পানীর মিশন রো অফিস বাড়ীর গুদামে লুকানো একটি বোমা অসময়ে গেল ফেটে।

১৯৩২ সনের ২২শে এপ্রিল আন্দামান ফেরৎ পঁচিশজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের লাহোর জেলে নিয়ে যাবার সময় হেডকনেষ্টবল ও তাঁর সঙ্গী ন'জন কনেষ্টবলকে হঠাৎ ২৩শে এপ্রিল রাত্রি একটার সময় একেবারে কাবু করে তাঁদের চারটে রাইফেল নিয়ে বিপ্লবীরা গাড়ীর চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে নরওয়ানা ও ঝিন্দ ষ্টেশনের মাঝ বরাবর সরে পড়লেন। পালাবার পথে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সশস্ত্র রেলপুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর তাঁরা সকলে নির্বিঘ্নে চলে গেলেন। পরিচয় দিলেন বিপ্লবী জীবনের অটুট সংকল্প। গুরুতর আহত হলেন হেড কনেষ্টবল শ্রীঅমরনাথ আর একজন।

১৯৩২ সনের ২৩শে এপ্রিল শ্রীরতন সিংহ নামে একজন বন্দী বিপ্লবী ও তাঁর তিনজন সহকর্মী ভাতিণ্ডা ষ্টেশনের কাছে তাঁদের প্রহরীদের কাছ থেকে সরে পড়েন। ধরতে গিয়ে হেড কনেষ্টবল গুলিতে প্রাণ দেন। সরকার থেকে শ্রীরতন সিং-এর গ্রেপ্তারের জন্যে তিন হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল। ১৫ই জুলাই হোসিয়ারপুরের রুরকি গ্রামে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। পুলিশ তাঁর ঘর অবরোধ করলে তিনি ভেতর থেকে গুলি চালিয়ে তিনঘণ্টা লড়লেন। মারা গেল তিনজন পুলিশ কনেষ্টবল ও একজন গ্রামবাসী। শ্রীরতন সিং জীবন্ত ধরা দিলেন না—নিজের জীবন নিজেই শেষ করেদিলেন।

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডী খুন হবার পর শ্রীবিমল দাশগুপ্ত মিঃ ভিলিয়ার্সকে মারতে গিয়ে ধরা পড়েন। প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বুদ্ধিমত্তায় তাঁর মাত্র দশ বছরের দণ্ড হয়। মিঃ পেডীর জায়গায় এসেছিলেন মিঃ রবার্ট ডগলাস। তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হ'ল ইহজগত থেকে ১৯৩২

সনের ৩০শে এপ্রিল। তিনি সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটার সময় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিসে মিটিংএ সভাপতিত্ব করছিলেন। পশ্চিম দিকের বারান্দা দিয়ে দু'জন এসে তাঁর দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছ'টা গুলি করলেন। তিনটে গুলি মিঃ ডগলাসের হাতে বুকে ও পেটে লাগল। এঁরা দৌড়ে পালিয়ে গেলেন কিন্তু কিছুদূর গিয়ে শ্রীপ্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ধরা পড়ে গেলেন—দেখা গেল তাঁর রিভলভার থেকে মাত্র একটা গুলি বেরিয়েছে আর সে গুলির বোর মিঃ ডগলাসের দেহ বিদ্ধ গুলির বোর আলাদা। অন্য জন শ্রীপ্রভাংশু পাল নির্বিঘ্নে সরে পড়লেন। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে শ্রীপ্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের উপর নির্মম নির্যাতন চলল তবুও কোন কথা বের করা গেল না। শ্রীভট্টাচার্যের কাছে একটি কাগজ পাওয়া গেল—লেখা ছিল 'হিজলী হত্যাকাণ্ডের সামান্য প্রতিবাদ মাত্র। তাঁদের মৃত্যুতে ব্রিটিশের চৈতন্য হোক্ আর আমাদের আত্মোৎসর্গে ভারতবাসী জাগুক্।' বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হ'ল। হাইকোর্টে আবেদনও বিফল হয়ে গেল। ১৯৩৩ সনের ১১ই জানুয়ারী মেদিনীপুর জেলে সেই কঠিন তপস্যারত বীরযোদ্ধার ফাঁসি হয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি জেলা শাসক ও মিঃ ডগলাসের স্থলাধিকারী মিঃ বার্জকে বললেন "We are determined Mr. Burge, not to allow any European to remain in Midnapore. Yours is the next turn! Get yourself ready." ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন শ্রীপ্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করে।

যেদিন মিঃ ডগলাস্ মারা যান সেদিন আমরা হিজলীর উঁচু টাওয়ারটা সাজিয়ে ছিলুম আলো দিয়ে আর সকলে মিলে ড্রাম পিটে আকাশ বাতাস সরগরম করে তুলে মেদিনীপুরের বীর ভাইদের কাজের সমর্থন জানিয়েছিলুম। সেদিন আকাশপ্লাবী আনন্দের শতলক্ষ ধারায় বন্দীশালা মুখরিত। কমাণ্ডেণ্ট মিঃ বার্জ

এত আনন্দের কি কারণ জিজ্ঞেস করলেন। চট্টগ্রামের শ্রীমনি সেন তাঁকে বললেন 'আমাদের কাছে খবর এসেছে যে মিসেস্ বার্জ অনশন আরম্ভ করেছেন—আর এই জিদ্ ধরেছেন যাতে তাঁর স্বামী মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ না নেন—কেন না তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে তাঁর স্বামীও আগের দু'জনের মত বেঘোরে প্রাণটা দেবেন।' মনিদা তখন জানতেন না যে তাঁর এ রসিকতা একদিন যথার্থই সত্যে পরিণত হবে।

এ সময় চন্দননগরের শ্রীকালিচরণ ঘোষ ও শ্রীরামপুরের শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ধরা পড়লেন। আর সুদূর বর্মায় ধরা পড়লেন সর্বশ্রীসুধাংশু গুপ্ত, পরিমল মুখার্জী, জিতেন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসের নির্দেশে তাঁরা রেঙ্গুনে অর্থ সংগ্রহ ও মীনজানে বৈপ্লবিক উত্থানের চেষ্টা করছিলেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্বকবিকে কবিতায় অভিনন্দন দেবার ভার পড়েছিল আমার ও শ্রীসান্ত্বনা গুহের উপর। কিন্তু আমাদের কবিতা কারো পছন্দ হ'ল না—আমাদের কবিতায় বিষয়বস্তু ছিল 'তোমাদের জন্মদিন আছে আমাদের নাই।' শেষ পর্যন্ত গদ্যে কয়েক লাইন লিখে পাঠানো হ'ল—আমাদের বন্ধুদের মতে ঐ কবিতা দেখলে কবিগুরু দুঃখ পাবেন—অমূলক আশঙ্কা—অদ্ভুত মানুষের চিন্তাধারা। যাই হোক্ কবিগুরু উত্তর দিলেন 'কারাভ্যন্তর থেকে তোমাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে' ইত্যাদি। বক্সার বন্দী নিবাস থেকে বিপ্লবীরাও তাঁকে অভিনন্দন জানান তার উত্তরে তিনি দার্জিলিং থেকে লিখলেন কবিতায় :—

"নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন,
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হ'তে
উন্মুখর ঊর্ধ স্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কি অভিনন্দন।" ইত্যাদি।

আমাদের কবিতা পাঠালেও রবির জ্যোতি কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত না—তাঁর আশীর্বাণী বরফগলা ঝর্ণার মতই ঝড়ে পড়ত আমাদের মাথার ওপর।

১৯৩২ সনের ১১ই মে লুধিয়ানার কাছে রেললাইনের পাশের সব তার কেটে দিলেন বিপ্লবীরা। ১৯৩২ সনের ৬ই জুন দেউলী বন্দীশিবিরে আত্মহত্যা করলেন শ্রীমৃণালকান্তি রায়চৌধুরী। বন্দী জীবন তাঁর কাজে অসহ্য।

তখন পাঞ্জাব আর বাংলায় বিপ্লবীরা দিকে দিকে আত্মপ্রকাশ করছেন। চট্টগ্রামে পুলিশ ও সৈন্যেরা কোন সূত্রে খবর পায় যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের মহানায়ক মাষ্টারদা শ্রীসূর্য সেন ও তাঁর অনুবর্তী কয়েকজন ধলঘাট থানার পটিয়া গ্রামে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন। তাঁরা তখন নতুন কর্মসূচী নির্ধারণে ব্যস্ত—উদ্‌যোগ পর্বের আগেই ত অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

১৯৩২ সনের ১৩ই জুন রাত্রি ন'টার সময় পুলিশ ও সৈন্যেরা হানা দিলেন সেই বাড়ীতে। ২।৮ নং গুর্খা রেজিমেণ্টের একজন হাবিলদার ও ক্যাপ্টেন ক্যামারণের নেতৃত্বে তাঁরা সেই বাড়ীর দোতলায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনির্মল সেন ও অন্য সকলে গুলি চালালেন—'আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা গোপনে উঠিল জ্বলি শিখায় শিখায়।' নির্মলদার নির্দেশে মাষ্টারদা, শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও শ্রীঅপূর্ব সেন পিছন দিক দিয়ে চলে এলেন। শ্রীনির্মল সেন ক্যাপ্টেন ক্যামারণকে গুলি করে শেষ করে দিলেন। শেষে পুলিশের গুলিতে তাঁকেও প্রাণ দিতে হ'ল। শ্রীনির্মল সেন ছিলেন শ্রীসূর্য সেনের ডান হাত। পটিয়ার সৈন্য শিবির থেকে আরও সৈন্য আনা হ'ল—চলল চারটি লুইস গান থেকে গুলি—শেষে দেখা গেল যে শ্রীনির্মল সেন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আর শ্রীঅপূর্ব সেনও দিয়েছেন আত্মবলি। আত্মত্যাগে কোন

কার্পণ্য নেই। সে সাহস সে অদম্য অধ্যবসায় সহজ সাধনার ধন নয়। অজস্র সঞ্চিত পূঞ্জীভূত ত্যাগেই তাঁদের মহত্ত্ব প্রবাল দ্বীপের মত আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত্যুর আলোকতীর্থ পানে আজও তাঁদের পলকহীন দৃষ্টি। সেখান থেকে চলে এলেন মাষ্টারদা শ্রীসূর্য সেনের সঙ্গে শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রণাম জানিয়ে এলেন সহকর্মীদের দেশহিতের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগকে—'আপন দানের পূণ্যে স্বর্গ তব রহিল না দূর।' এদিকে আশ্রয়দানের অপরাধে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ও তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর চার বছর করে জেল হয়ে গেল। তাঁদের রাখা হ'ল মেদিনীপুর জেলে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মারা গেলেন যক্ষ্মা রোগে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর পায়ে বেড়ী লাগান ছিল। মিঃ কাটারিয়া ছিলেন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট; শ্রীরামকৃষ্ণের মা একই জেলে অথচ ছেলেকে মৃত্যুকালেও তাঁকে দেখতে দেওয়া হ'ল না।

১৯৩২ সনের ২৬শে মে ঢাকায় লাট প্রাসাদের সামনে কনেষ্টবল গার্ড সোলেমান খাঁকে মেরে তার পিস্তলটি নিয়ে বিপ্লবারা সরে পড়লেন।

ইংরেজ সরকার তখন ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। বিলাসের স্বর্গপুরী সিমলার শৈল শিখর থেকে নির্দেশ আসতে লাগল বারে বারে। একে একে পাশ হয়ে গেল অনেকগুলো আইন উদ্যতখড়গ অর্ডিনান্স। এল Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act of 1932—মানুষ পেষা যাঁতা কল। আয়র্লণ্ডের Black and Tan এর পুনরাবৃত্তি। ইংরেজের মুখপাত্র ইংরেজী সংবাদপত্রগুলো বিশেষ করে Statesman সরকারকে আরও কঠোর হস্তে বিপ্লব দমনের পরামর্শ দিতে লাগলেন। আয়র্লণ্ডের মুক্তি আন্দোলন দমনের জন্যে তু'রংএর পোষাক পরা auxiliary force এর পরিবর্তে এখানে পুলিশ ও গুপ্তচরের মিলিত অত্যাচারই

হ'ল ভয়াবহ। বিপ্লবীরা কিন্তু অর্ডিনান্স ও আইন গ্রাহ্য না করেই কাজে নেমে পড়লেন। ধুরন্ধরেরা মনে করেছিলেন যে যাঁদের জেলে দিয়েছেন বা আটক রেখেছেন তাঁরা বন্দী থাকলে বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। সে ধারণা ভুল প্রমান হয়ে গেল।

১৯৩২ সনের ১২ই জুন ই. বি. রেলওয়ের রাজবাড়ী ষ্টেশনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারেরর গাড়ীতে ফেলা হ'ল বোমা। মুন্সীগঞ্জে বিপ্লব ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী পরিবারবর্গের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার চালাচ্ছিলেন সেখানের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ সেন। বিশেষ করে মহিলাদের উপর অপমানকর ব্যবহার করে সরকারের প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন—সত্য হোক্ মিথ্যে হোক্ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি নাকি নিজের উন্নতির জন্যে কলেজের পাঠরতা কোন আত্মীয়াকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেছিলেন। ১৯৩২ সনের ২৭শে জুন রাত্রে তিনি বিছানায় নিদ্রিত অবস্থায় খুন হলেন। পুলিশ অনুসন্ধান করে বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীকালিপদ মুখার্জী ও শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য নামে দু'জন যুবককে গ্রেপ্তার করে এবং মিথ্যে প্রলোভনে তাঁদের একজনের কাছ থেকে মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায় করে। শ্রীমুখার্জী ঢাকা পোষ্ট অফিস থেকে টেলিগ্রাম করছিলেন পরদিন সকালবেলা Kamakshya's operation successful, no anxiety." পুলিশ তাঁকেই ধরে। অথচ কামাখ্যা চক্রবর্তী নামে এক রোগীর সেদিন অস্ত্রোপচার হয়েছিল মিটফোর্ড হাসপাতালে—ধৃত যুবক সেই খবরই দিচ্ছিলেন। ১৯৩৩ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। যিনি এ কাজ করেছিলেন তিনি তখন অন্যত্র। ইংরেজের দৃপ্ত আত্মম্ভরিতা ও নির্দয়তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠল বিপ্লবীদের জয় তোরণ। যে পুলিশ অফিসার এই মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের কৃতিত্ব নিয়েছিলেন তিনি শ্রীকালিপদ মুখার্জীর ফাঁসির পর বিবেকের বৃশ্চিক-

দংশন সহ্য করতে না পেরে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে চির-দিনের মত নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

১৯৩২ সনের ১২ই জুলাই চট্টগ্রামে ঘোষণা করা হ'ল যে পলাতকা ১৯ বৎসর বয়স্কা বিপ্লবী শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে।

১৯৩২ সনের ১৩ই জুলাই কানপুর ব্রিষ্টল হোটেলে যখন অনেক-গুলি ইংরেজ নরনারী মদ্যপান ও নৃত্যগীতে রত তখন সেখানে দু'টো বোমা পড়ল কিন্তু নিক্ষেপের দোষে সে দু'টো ফাটল না। ভীত সন্ত্রস্ত নরনারীর নেশা ও আনন্দ ছুটে গেল একই সঙ্গে—প্রাণ ভয়ে যে যেখানে পারলেন ছুটে পালালেন। কয়েকদিনের জন্যে সব রকম আমোদ-প্রমোদ বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৩২ সনের ১৯শে জুলাই ঢাকা ট্রেন ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত বন্দীদের মুক্তি দিয়েই সংশোধিত ফৌজদারী আইনে বন্দী হলেন ডাঃ সুশীলচন্দ্র বসু, সর্বশ্রী নীতিশচন্দ্র মজুমদার, দুর্গেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ও সুনীতিরঞ্জন বসু। সর্বশ্রী সুধীর আচার্য, বামাচরণ চ্যাটার্জী ও ধীরেন্দ্র চন্দ্র দে আটক থাকলেন।

ঐ দিনই লণ্ডনে কমন্স সভায় স্যার স্যামুয়েল হোর ঘোষণা করলেন যে বিপ্লবীরা কারাগারের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে কাজেই তাঁদের একশ জনকে অবিলম্বে আন্দামান পাঠানর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পেশোয়ারে লেডি রিডিং হাসপাতালে ২২ বছরের এক মুসলমান যুবক আর্দালীর কাজ করতেন। হাসপাতালের সিভিল সার্জেন ছিলেন Mr. W. J Coldstream তিনি যখন ১৯৩২ সনের ২২শে জুলাই অপারেশন থিয়েটারে যাচ্ছেন তখন সেই আর্দালী আবদুল রসিদ সিভিল সার্জেনকে ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে আবদুল রসিদ এর আগে আইন অমান্য আন্দোলনে কয়েকমাস কারাদণ্ড ভোগ করেছেন এবং পরে নওজোয়ান ভারত সভার সদস্য

হয়ে বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৩২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর পেশোয়ার জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।

১৯৩২ সনের ২৯শে জুলাই কুমিল্লার অ্যাডিসনাল পুলিশ সুপার মিঃ ই. বি. এলিসন যখন সাইকেলে তাঁর বাংলোয় ফিরছিলেন তখন একটা পটকার শব্দ শুনে নামতেই একজন সাইকেলে এসে তাঁকে কয়েকটা গুলি করে সাইকেল ফেলে সরে পড়লেন। গুলি লাগল তলপেটে। ধরা পড়লেন নোয়াখালির জমিদার শ্রীরজনী কান্ত আইচের পুত্র শ্রীসন্তোষ কুমার আইচ আর চাঁদপুরের শ্রীপুণ্যব্রত মজুমদার, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন। সাইকেলের মালিক শ্রীসন্তোষ কুমার আইচ। পুলিশের বেশী সন্দেহ সন্তোষ বাবু আর পুণ্যব্রত বাবুর উপর। তাঁদের দু'জনকে মার দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে হাতকড়া লাগিয়ে সন্তোষ বাবুকে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হ'ল আর পুণ্যব্রত বাবুকে দাঁড় করান হ'ল পুলিশ অফিসার আব্দুল গফুর খাঁর সামনে। খাঁ সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভদ্র ভাষায় প্রশ্ন করতেই পুণ্যব্রত বাবু হাতের হাতকড়া সজোরে মারলেন খাঁ সাহেবের মাথায়। কেটে গিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল তাঁর মুখে। সঙ্গে সঙ্গে এঁদের দু'জনকেই জেল হাজতে পাঠানো হ'ল। মারের হাত থেকে বেঁচে গেলেন এঁরা আর খাঁ সাহেবের রক্তদানই সার হ'ল—স্বীকারোক্তি আদায়ের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি। আসল আক্রমণকারী কিন্তু ধরা পড়লেন না, আজও তিনি শিক্ষকতা করছেন আর পুণ্যব্রত বাবু চাকরি করছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এ সময় Statesman পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আলফ্রেড, এইচ ওয়াটসন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। তাঁর উপর একবার চেষ্টা হ'ল ১৯৩২ সনের ৫ই আগষ্ট। মিঃ ওয়াটসন তাঁর মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বেলা তিনটের সময় অফিসে ফিরছিলেন এমন

সময় শ্রীঅতুল কুমার সেন গাড়ীর ভেতর হাত ঢুকিয়ে তাঁকে গুলি করলেন কিন্তু সেটা তাঁর কপাল ঘেঁসে গেল আর হাত থেকে রিভলভারটা পড়ে গেল। গেটের দরওয়ান ও পুলিশ কনেষ্টবল তাঁকে জাপটে ধরে ফেলল আর শ্রীসেন কৌশলে তাঁর হাতটা মুক্ত করে পটাসিয়াম সায়েনাইড খেয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। পুলিশ সন্ধানে জানলেন যে শ্রীসেনের নিবাস খুলনার সেনহাটিতে এবং তিনি কলকাতায় থাকতেন ১০ নং নারকেল বাগান লেনে। চেষ্টা বিফল হয়ে গেল।

ঢাকায় অ্যাডিসনাল এস. পি ছিলেন মিঃ গ্রাসবী। ১৯৩২ সনের ২২শে আগষ্ট তাঁর উপর চেষ্টা হ'ল কিন্তু তিনি অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। পুলিশের সাতটি গুলি বিদ্ধ হ'ল শ্রীবিনয় রায়ের গায়ে তবুও তিনি মৃত্যুকে জয় করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড নিলেন। ধরা পড়লেন সন্দেহে আরও কয়েকজন। তাঁদের যখন আটকে রাখা হয়েছে পুলিশ হাজতে, সে সময় দু'চার জন গুপ্তচরকেও বন্দী সাজিয়ে সেখানে পুলিশ রেখে দিল। মিঃ গ্রাসবী একে একে ডাকলেন তাঁদের। একজন এমন চমৎকার অভিনয় করলেন যে মিঃ গ্রাসবী তাঁকে নিরপরাধ বলেই ঠিক করলেন। রাত্রে যখন সকলে পুলিশ হাজতে বলাবলি করছেন কাকে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে—অভিনয়দক্ষ বন্ধুটি বললেন 'ব্যাটাকে লটকা দেখিয়েছি—ব্যাটা বলেছে ছেড়ে দেবে।' পূর্ববঙ্গে লটকা অর্থে 'কলা'। পরদিন আবার তাঁর ডাক পড়ল, তাঁকে মিঃ গ্রাসবী বললেন "You showed me latka yesterday. I will see how long you can remain in jail" শেষ পর্যন্ত তাঁকে আসতে হ'ল বন্দীশিবিরে। গুপ্তচরবৃত্তি হ'ল সার্থক।

১৯৩২ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দীশিবির থেকে অসুস্থ অবস্থায় কুমিল্লার শ্রীশৈলেশ চন্দ্র চ্যাটার্জীকে দেউলী বন্দীশিবিরে পাঠানো হ'ল কিন্তু ১৯৩৩ সনের ১৭ই অক্টোবর তিনি সেখানের

জেল হাসপাতালে মারা গেলেন। বিপ্লবী শ্রীযোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর নিকট আত্মীয় সুদর্শন এই তরুণ ছিলেন সকলেরই প্রিয়। তাঁর মৃত্যুতে বিপ্লবীদের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

১৯৩২ সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর রিভলভার নিয়ে ধরা পড়লেন মজিলপুরের শ্রীসুকুৎ গোপাল দত্ত—জেল হয়ে গেল চার বছর।

১৯৩২ সনে শ্রীঅজয়কুমার ঘোষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল। তিনি ১৯২৯ সনে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন, পরে মুক্তি পান। কানপুরে তাঁর বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অজুহাতে আরও কয়েকবার ধরা পড়েন। শেষ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার বলে তাঁকে স্বগৃহে আটক রাখা হয়।

শ্রীনির্মল সেনের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তখন চট্টলের যুবক যুবতীদের প্রাণ সঞ্জীবিত করে তুলেছে। তাঁদের মনে এসেছে নতুন উদ্যম নতুন কর্ম্মপ্রেরণা। শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন বিপ্লবী দলের সদস্যা—শ্রীনির্মল সেন ছিলেন তাঁর আদর্শস্থানীয়। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মোদ্যম, শ্রীঅনন্ত সিংহের দিদি শ্রীমতী ইন্দুমতী সিংহের চেষ্টায় ফলবতী হয়। শ্রীনির্মল সেনের আসক্তি বন্ধনহীন আত্মত্যাগে দুঃখ পেয়েছিলেন শ্রীমতী প্রীতিলতা সবচেয়ে বেশী। দুঃসাহসী প্রেমে সার্থক, দুশ্চর তপস্যাসিদ্ধা ভগিনী প্রীতিলতা পরিকল্পনা করলেন নতুন অভিযানের; সমর্থন করলেন মহানায়ক শ্রীসূর্য সেন। এই বীরাঙ্গনার লক্ষ্য ছিল আসাম বেঙ্গল ইউরোপীয়ান ক্লাব—যাকে সকলে পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট বলতেন। এটা চট্টগ্রাম থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। ১৯৩২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দশটায় তিনি ঝাঁসীর রাণীর মত পুরুষের পোষাকে নেতৃত্ব করলেন এই অভিযানের—'রক্তে তখন লেগেছে তাঁর সর্বনাশের নেশা।' এক জায়গায় অনেকগুলো সাদা চামড়া পাওয়া যাবে। সঙ্গে কয়েকজন মৃত্যু পাগল তরুণ—বিপ্লবের বহ্নিশিখায় ভাস্বর, প্রাণের উন্মাদনায় জীবন্ত। সাহেব মেমরা তখন

—২৩

নাচগানে মশগুল হঠাৎ ক্লাবের খোলা জানলা দিয়ে একটা বোমা বিরাট শব্দে বিদীর্ণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা বোমা ফাটল—আর রাইফেল ও রিভলভার উঠল গর্জে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারালেন মিসেস স্যুলিভ্যান আর আহত হ'লেন তেরজন। বিপ্লবীরা সরে পড়লেন। এ যুদ্ধে আহত হ'লেন ভগিনী প্রীতিলতা। ইংরেজের হাতে বন্দিনী হওয়ার চেয়ে বীরজনবাঞ্ছিত মৃত্যুশয্যায় শয়ান শ্রেয়স্কর মনে করে হাসতে হাসতে শেষ করে দিলেন আত্মাহুতির সংকল্পে শুদ্ধ নিজের জীবনকে পটাসিয়াম সায়েনাইডে সেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভগিনী প্রীতিলতা। দুঃখ লাঞ্ছনা ও ত্যাগ বরণে দীপ্ত অন্যেরা নির্বিঘ্নে চলে এলেন। পুলিশের অনুসন্ধান ব্যর্থ হ'তে সে জায়গায় অধিবাসীদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য হয়ে গেল। অত্যাচারের সীমা নেই। প্রচার পত্র বিলি হ'ল 'জীবিত কি মৃত ইউরোপীয়ান বা ফিরিঙ্গীদের ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সদর দপ্তরে পাঠাতে পারলে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।'

এই অভিযানের আগে এ কাজের ভার পড়ে শ্রীশৈলেশ্বর চক্রবর্তীর উপর। ব্যবস্থা ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বোমা রিভলভার নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকবেন। অন্য সকলে যথা সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন। যথাসময়ে সকলে এলেন কিন্তু শ্রীশৈলেশ্বর চক্রবর্তী সময় মত আসতে পারলেন না। বিফল মনোরথ হয়ে এঁরা সেদিন ফিরে এলেন। একটু পরেই শ্রীচক্রবর্তী যথাস্থানে গেলেন তখন সহকর্মীরা ফিরে এসেছেন। দুঃখে ও নিজের অকর্মণ্যতার অভিমানে বিষ খেয়ে সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করলেন। এরই নাম বিপ্লবী জীবনের কঠোর নিয়মানুবর্তীতার আদর্শ। ১৯৩০ সনের ১৮ই এপ্রিল তিনি এ ক্লাবে গিয়ে গুডফ্রাইডের জন্যে কাউকে পান নি। দ্বিতীয়বারে তাঁরই জন্যে অভিযান ব্যর্থ

হ'ল তাই তিনি তাঁর জীবন বিপ্লবীর অযোগ্য বলে শেষ করে দিলেন নিজের হাতে। এরই নাম নিয়মানুবর্তিতা—বিপ্লবী জীবনের প্রথম পাঠ।

১৯৩২ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর আবার আক্রমণ হ'ল মিঃ আলফ্রেড ওয়াটসনের উপর। দিনের শেষে সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় মিঃ ওয়াটসন তাঁর মহিলা সেক্রেটারীকে নিয়ে তাঁর গাড়ীতে চলেছিলেন। তাঁর গাড়ী নেপিয়ার রোডের কাছাকাছি আসার সময় একটি হুডখোলা গাড়ী ক্লাইড রোডে এসে গেল। সেই গাড়ীর ভেতরে বসেছিলেন তিনজন ও একজন গাড়ী চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই গাড়ী থেকে মিঃ ওয়াটসনকে লক্ষ্য করে এই তিনজন কয়েকবার গুলি ছুড়লেন। তাঁর কাধে লাগল বিশেষ ক্ষতি হ'ল না। একজন পুলিশ সার্জেন্ট এঁদের গুলি করল। মিঃ ওয়াটসন গাড়ীর চালককে জোরে চালাতে বললেন—ইতোমধ্যে হুডখোলা গাড়ী সাহেবের গাড়ীর পথরোধ করে কয়েকবার গুলি চালিয়ে সরে পড়লেন জিরাট ব্রীজ ধরে এবং অন্ধকারের মধ্যে অনেকদূর গেলেন চলে। মিঃ ওয়াটসন কিন্তু গেলেন বেঁচে। কিন্তু মাঝের হাট বুড়াশিবতলায় গাড়ীখানা একটা আলোকস্তম্ভের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিকল হয়ে গেল। এঁরা চারজনে গাড়ী ফেলে রেখে পালালেন রায়বাহাদুর রোড দিয়ে। আহত দু'জন ধরা পড়ে আত্মহত্যা করলেন আর একজন পালালেন ট্যাক্সি করে। সে দু'জনের নাম শ্রীননী লাহিড়ী ওরফে শ্রীমনি লাহিড়ী ও শ্রীগোপল চৌধুরী ওরফে শ্রীঅনিল ভাদুড়ী। সন্দেহে ধরা পড়লেন কয়েকজন। পাছে মোটর গাড়ীর ড্রাইভার ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেন তার জন্যে চেষ্টা চলল তাঁকে সরিয়ে দেবার। এ ব্যবস্থা কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে শ্রীসাতকড়ি ব্যানার্জীর পরামর্শে কলকাতায় এলেন বন্ধুবর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মোদক ও শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ২রা অক্টোবর। উত্তর কলকাতায় একটা বাড়ী ভাড়া করা ছিল, যাতে

নিরাপদে সকলে সেখানে আসতে পারেন তার জন্যে ছিল একটা বিশেষ সঙ্কেত—বারান্দায় একটা জামা টাঙ্গানো থাকত। দূর থেকে জামা ঝুলছে দেখলেই বুঝতে হবে নিরাপদ। বাড়ীতে কোন মেয়েছেলে না থাকলে পাড়ার লোক সন্দেহ করবে এজন্যে ঠিক হ'ল শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী, শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষকে এনে এ বাড়ীতে রাখবেন। কিন্তু পুলিশ বাড়ীটার সন্ধান পেয়ে গিয়ে যাঁরা ভেতরে ছিলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করে জামাটি যথাস্থানে রেখে ফাঁদ পেতে বসে রইল। সঙ্কেত ঠিক আছে দেখে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ শ্রীবিজয় মোদক যেই বাড়ীর কাছ বরাবর এসেছেন পুলিশ তাঁকে ধরতে এলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিলেন ছুট—শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন কিন্তু যে পুলিশ অফিসার তাঁকে ধরতে গেলেন তিনি তাঁকে লাথি ও ঘুষির চোটে করে ফেললেন অর্ধমৃত। এদিকে তিনকড়িদা চলেছেন আস্তে আস্তে পায়ে চটি, গায়ে ফতুয়া, পূজারী ব্রাহ্মণের বেশে—ধরা পড়লেন; বললেন কাল্পনিক নাম—কয়েকজন কাল্পনিক আত্মীয়ের ও যজমানের নাম করে বললেন সেখানে এসেছেন। পরের দিন এণ্টালী থানার পুলিশ কয়েকজন নিরীহ ভদ্রলোককে যাঁদের নামের সঙ্গে দৈবাৎ তিনকড়িদার কাল্পনিক নামের মিল ছিল—ধরে এনে হাজির। তাঁরা তিনকড়িদাকে চেনেন না—তিনিও তাঁদের চেনেন না। কাজেই যা' অবশ্যম্ভাবী ফল—দু'জন পাঠান এল কম্বল ধোলাই করতে। চলল নির্যাতন—তিনিও মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হবার ভান করতে লাগলেন। তার আগেই ধরা পড়েছেন শ্রীসুনীল চ্যাটার্জী। শ্রীধীরেন্দ্র রায় ধরা পড়ে পুলিশকে নিজের বাসা দেখাচ্ছি বলে কৌশলে সরে পড়লেন চন্দন-নগরে। এদিকে শ্রীসুশীতল রায়চৌধুরী এসব ব্যাপার না জেনে শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষকে নিয়ে এ বাড়ীতে আসছিলেন—ধরা পড়ে গেলেন। বেদম প্রহারেও তাঁর মুখ থেকে কথা বের করা গেল না। শ্রীমতী ইন্দুসুধা অতিকষ্টে পালালেন। অনেকদিনপরে জলপাই-

গুড়ির সামগ্রী চা বাগানে ধরা পড়ে বিনা বিচারে রইলেন আটক। পুলিশের সন্দেহ যে যে লোক এত মার খেয়ে নাম বলে না সে নিশ্চয়ই বিপ্লবী দলের লোক—কাজেই শ্রীসুশীতলকে আটক থাকতে হ'ল। একে একে ধরা পড়লেন শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী এবং আরও অনেকজন।

১৯৩২ সনের ২৪শে অক্টোবর বগুড়ার জয়পুর হাটে বোমা তৈরী করতে গিয়ে বোমা ফেটে মারা গেলেন শ্রীসুধাংশু শেখর নন্দী। আহত হলেন কয়েকজন। শ্রীসুধাংশুশেখরের পিতা শ্রীশশধর নন্দী ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী—আহতদের অর্থ সাহায্য করে তাঁদের দূরে সরিয়ে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তখনও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের মহানায়ক মাষ্টারদা শ্রীসূর্যসেন ধরা পড়েন নি। তিনি চট্টগ্রামেই আত্মগোপন করে থেকে বৈপ্লবিক কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। গ্রামে গ্রামে উদ্বুদ্ধ করছিলেন যুবকযুবতীদের নবযুগের আহ্বানে নব নব প্রেরণায়। চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে তখন তিনি দেবতার মত। পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে ধরা সম্ভব হয় নি। সৈন্যবাহিনী চট্টগ্রাম সহর ও আশে পাশের সমস্ত গ্রাম তোলপাড় করেও বিফল মনোরথ। যারাই সন্দেহের চোখে পড়তে লাগল তাদেরই উপর চলল নির্যাতন।

এই সময় হিজলীতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের জন্যে হ'ল অনশন আঠারো দিন ধরে। অনশনের ফলটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয় জেনেও আমাদের অনশন চালিয়ে যেতে হ'ল। গান্ধীজি অবশ্য অনশনটাকে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন অনেকবার —যেমন করেছেন চরকা ও খদ্দর। গান্ধীজি দেশের জনজাগরণের উদ্গাতা সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। তাঁকে মহাত্মা নাম দিয়েছিলেন ১৯১৫ সনের ২৭শে জানুয়ারী গোনদালে এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীবৈদ্যরাজ জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী। (১)

(১) যুগান্তর ২৩শে আশ্বিন, ১৩৭৫ ইং ১০।১০।৬৮

আমরা কোনদিনই অহিংসবাদে বিশ্বাসী ছিলুম না। আমাদের কাছে অহিংস বা অসহযোগ আন্দোলন একটা নিষ্ফল ভিক্ষুকতা ছাড়া আর কিছুই নয়—তার মধ্যে আছে কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি—আবেদনপুষ্ট দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি। সমাজের মঙ্গল সাধনে জাতীয় জীবনের কর্তব্য নিরূপণে বা বিশ্বজনীন প্রেমের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ হিসেবে অহিংসবাদ, খদ্দর বা চরকা কোন সাহায্য করতে পেরেছে কিনা আজও অনেকের সন্দেহ আছে।

সে যুগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আজ আমাদের দেশে চরকা-লাঞ্ছন পতাকা উড়িয়েছি। এ যে সংকীর্ণ জড় শক্তির পতাকা, অপরিণত যন্ত্রশক্তির পতাকা, স্বল্পবল পণ্যশক্তির পতাকা, এতে চিত্তশক্তির কোন আহ্বান নেই। সমস্ত জাতিকে মুক্তির পথে পথে যে আমন্ত্রণ সে ত কোন বাহ্য প্রক্রিয়ার অন্ধপুনরাবৃত্তির আমন্ত্রণ হতে পারে না। তার জন্যে আবশ্যক পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ; সে কি এই চরকা চালনায়। চিন্তাবিহীন মূঢ় বাহ্য অনুষ্ঠানকেই ঐহিক পারত্রিক সিদ্ধিলাভের উপায় গণ্য করেই কি এতকাল জড়ত্বের বেষ্টনে আমরা মনকে কর্মকে আড়ষ্ট করে রাখি নি। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির কারণ কি তাই নয়। আজ কি আকাশে পতাকা উড়িয়ে বলতে হবে বুদ্ধি চাইনে, বিদ্যে চাইনে, প্রীতি চাইনে, পৌরুষ চাইনে, অন্তর প্রকৃতির মুক্তি চাইনে, সকলের চেয়ে বড়ো একমাত্র চোখবুজে মনকে বুজিয়ে দিয়ে হাত চালানো, বহুসহস্র বৎসর পূর্বে যেমন চালানো হয়েছিল তারই অনুবর্তন করে। স্বরাজ-সাধন যাত্রায় এই হল রাজপথ? এমন কথা বলে মানুষকে কি অপমান করা হয় না।"

১৯৩২ সনের ৩০শে অক্টোবর গোয়া থেকে আসবার পথে একজন ধরা পড়লেন ৪ টি রিভলভার ও কিছু কার্তুজ নিয়ে। জেল হয়ে গেল দীর্ঘদিনের। এ সময় মেদিনীপুরের শ্রীসন্তোষ বেরা

নামে একজন বিপ্লবীর পুলিশ হাজতে নির্যাতনের ফলে জীবনান্ত ঘটল। ঢাকা জেলেও অনুরূপভাবে প্রাণ দিলেন শ্রীঅনিল দাস। যাঁরা এঁদের জীবনান্ত ঘটালেন দেশ স্বাধীন হবার পর তাঁদের হ'ল চাকরিতে উন্নতি।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী শ্রীফনী ঘোষের জন্যে সরকার থেকে রিভলভার, অর্থ ও দেহরক্ষীর সুবন্দোবস্ত করা হয়। শ্রীঘোষ বন্ধুদের অনেককেই ফাঁসিকাঠে, বা আন্দামান সেলুলার জেল বা দ্বীপান্তরে পাঠাতে পেরেছিলেন বলে সরকার তাঁকে বেতিয়াতে একখানা দোকান করবার মূলধন ও একজন দেহরক্ষী দেন। ১৯৩২ সনের ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যের সময় শ্রীফনী ঘোষ সামনের একটা দোকানের সামনে বসে বন্ধু শ্রীগণেশপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে গল্প করছিলেন এমন সময় পেছন দিক থেকে একটা ভোজালি তাঁর মাথায় চালিয়ে দেওয়া হয়। শ্রীগণেশ প্রসাদ আক্রমণকারীকে ধরবার চেষ্টা করে আহত হলেন। আক্রমণ-কারীরা সরে পড়লেন। ১৭ই নভেম্বর শ্রীফনী ঘোষ ও ২০শে নভেম্বর শ্রীগণেশপ্রসাদ মারা যান হাসপাতালে। এঁরা পালাবার জন্যে দু'খানা সাইকেল রেখেছিলেন একটা সাইকেলের পিছনে একটা কাপড়ের বাণ্ডিল ছিল। সেই কাপড়ের ধোবী চিহ্ন ধরে দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীবৈকুণ্ঠ সুকুল এবং তার এক বন্ধুর সন্ধান পাওয়া গেল। শ্রীবৈকুণ্ঠ হাজিপুর গান্ধী আশ্রমে কাজ করতেন। ১৯শে অক্টোবর তাঁর দেশ জালালপুরে বৈকুণ্ঠের জিনিসের ভেতর থেকে একটা রিভলভার পাওয়া যায় তখন থেকেই তাঁর খোঁজ চলে। তাঁর সম্পত্তি হ'ল বাজেয়াপ্ত। ১৯৩৩ সনের ৬ই জুলাই তিনি সোনপুর গণ্ডক ব্রীজ পার হবার সময় ধরা পড়লেন একটা নারকেল বোমা নিয়ে। ১৯৩৪ সনের ১৪ই মে গয়া সেনট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল! (১)

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose.

১৯৩২ সনের ১৮ই নভেম্বর রাজসাহী সেনট্রাল জেলের সুপার মিঃ লিউক সন্ধ্যের সময় সস্ত্রীক বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁরা যখন একটি ব্রীজের উপর বেড়াচ্ছেন এমন সময় একজন সাইকেলে এসে তাঁকে গুলি করলেন। অল্পের জন্যে গুলি পেটে না লেগে লাগল পায়ে। সরে পড়লেন আক্রমণকারী শ্রীভোলানাথ কর্ম্মকার। মিঃ লিউক প্রাণে গেলেন বেঁচে। কয়েকদিন পরে ধরা পড়লেন শ্রীভোলানাথ এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায়। অদৃষ্টের কি পরিহাস। এই বিশ্বাসঘাতক বন্ধুটি এমনই একজনের ভ্রাতুষ্পুত্র যিনি এক-দিন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে প্রমাণ করবার জন্যে প্রামাণ্য তথ্যের উপর কলম ধরেছিলেন। বিশ্বাসঘাতক পুরস্কার স্বরূপ পেয়ে গেলেন চাকরি আর শ্রীভোলা নাথ গেলেন আন্দামানে। আজও তিনি সরকারী চাকরিতে দিন দিন পদোন্নীত হয়ে চলেছেন—ইংরেজ তাড়িয়ে আমরা স্বাধীন হয়েছি—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ।'

১৯৩২ সনের ১৯শে নভেম্বর ত্রিপুরায় কালিকচ্ছে মালিয়া নামে একজন গুপ্তচরকে মারবার চেষ্টা হয়। ২৭শে নভেম্বর পুলিশ গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করে পটিয়ার কাছে জঙ্গল খাঁ গ্রামে একজন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীকে ধরবার জন্যে এলেন। পুলিশ বাড়ী ঘেরাওর পর চীৎকার করে আত্মসমর্পণের জন্যে জানান হ'ল। এমন সময় শ্রীশ্যামকুমার নন্দী পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন—আর একজন সরে পড়লেন। ঘরের মধ্যে দেখা গেল একজনের দেহ অ্যাসিডে পুড়ে গেছে ও একজন ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। এই সময় শ্রীবীরেন দে নামে একটি কিশোর অসাবধানতার জন্যে নিজের রিভলভারের গুলিতে আহত হ'য়ে মারা গেলেন।

১৯৩২ সনের ১৪ই ডিসেম্বর দিনাজপুরের কয়েকজন সাঁওতাল

শ্রীজিতু ছোটকা ও শ্রীসামুর নেতৃত্বে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে দু'জন প্রাণ দিলেন কয়েকজন হ'লেন আহত।

১৯৩২ সনের ১৭ই ডিসেম্বর ধরা পড়লেন শ্রীশচীন্দ্র কর গুপ্ত। মেদিনীপুর জেল থেকে পালিয়ে তিনি অনেকদিন আত্মগোপন করে ছিলেন —। চন্দননগরে থাকবার সময় অর্থাভাব যখন প্রকট তখন কোন একজন বিশিষ্ট নেতার ভাই টাকা দেবেন বলে তাঁকে ও শ্রীদীনেশ মজুমদারকে ডেকে পাঠালেন। এঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলেন শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস। পথের মধ্যে শ্রীদীনেশ মজুমদার পথ হারিয়ে দলভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। শ্রীশচীন কর গুপ্ত ও শ্রীপ্রকাশ দাস গেলেন অর্থের জন্যে কিন্তু যিনি অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি এঁদের অহেতুক দেরী করিয়ে দিতে লাগলেন—শেষে ব্যাপারটা সন্দেহ-জনক মনে করে এঁরা দু'জনে যখন চলে আসছেন তখন পুলিশ চারদিক থেকে তাঁদের ঘিরে ধরায় দু'জনেই বন্দী হলেন। শ্রীশচীন্দ্র কর গুপ্ত রিভলভার নিয়ে ধরা পড়লেন—জেল হ'য়ে গেল ছ'বছরের আর শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাসকে বিনা বিচারে আটক রাখা হ'ল দীর্ঘদিন। (১) পুরস্কারের অঙ্ক অজানা রইল। তার কিছুদিন পরে ধরা পড়লেন শ্রীসুশীল দাসগুপ্ত। ইনিও মেদিনীপুর জেল থেকে পালান। পুলিশের যখন তাঁর কলকাতায় থাকবার জায়গায় এসে পড়ার উপক্রম হয়েছে তিনি তৎক্ষণাৎ একটা গামছা পরে বাসন মাজতে আরম্ভ করলেন—যেন বাড়ীর চাকর। পুলিশ প্রথমে তাঁকে চাকর মনে করে চলে যাবার পরক্ষণেই যিনি আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনিই দূর থেকে ইসারা করে দেখিয়ে দিলেন। যেদিক থেকে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না সেখান থেকেই এল বিপদ। বিশ্বাসের কোন মূল্যই রইল না। দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গকারী কোন

(১) শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাসের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ।

মহান্ সন্তানের পুত্রই এ কাজ করলেন। সুশীল বাবুর পালাবার কোন উপায় রইল না। ধরা পড়ে জেল হ'য়ে গেল চার বছরের। (২)

শেষ হ'ল ১৯৩২ সন বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টার স্বাক্ষর নিয়ে। তবে এটা ঠিক, বিপ্লববাদের মধ্যে আবেগ ও উত্তেজনার পরিমাণ ছিল বেশী। দুর্যোগে অপরাজিত মৃত্যুকামী তরুণের দল আমরা ম্যাৎসিনীর মতবাদ পবিত্র গঙ্গার জলে ধুয়ে নিয়ে তাকে ভগবদ্গীতার উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলুম। আনন্দমঠের বন্দে-মাতরম্ মন্ত্র সম্বল করে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম জীবনযাত্রার পথে শতাব্দীর আবর্জনা সরিয়ে মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগে। সেখানে না ছিল স্বার্থের বন্ধন, না ছিল ক্ষতির আশঙ্কা। অভিভাবকের শাসনের বাইরে, সমাজের চোখ রাঙানির অন্তরালে, আমাদের ছিল স্বাধীন কর্মক্ষেত্র। পথ যাই হোক্ লক্ষ্য ছিল আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা—মুক্তি অথে বন্ধনহীন শূন্যতা নয়। ভিক্ষে করে নয়—বুকের রক্ত দিয়ে-শৌর্যে, বীর্যে, ত্যাগে উপল বন্ধুর দুঃখগম্য পথ থেকে অর্জন করে আনব—নানা বাধা বিঘ্ন আসক্তির দুর্গম প্রাকার ভেদ করে—স্বদেশ প্রেমের অদ্ভুত চাঞ্চল্যে হবে জীবনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ। নেতাদের মনে কি ছিল জানি না। তাঁরা আমাদের ভাড়াটে গুণ্ডার মত ব্যবহার করতে চাইতেন কিনা বুঝি নি। তাঁদের কৃতিত্ব অর্জনের পাথেয় স্বরূপ আমরা ছিলুম কিনা—এ প্রশ্ন কোনদিন মনে জাগে নি। আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রাণ দিতে চলেছি দেশের জন্যে—নেতার জন্যে নয়। এ শিক্ষাই আমি অন্ততঃ আমার মাষ্টারমশায়ের

(২) শ্রীসুশীল দাশগুপ্তের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ। তিনি আর ইহজগতে নেই। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় শান্তি মিছিলের পুরোভাগে তিনি ছুরিকাহত হয়ে প্রাণ দিলেন আর প্রাণ দিলেন শ্রীস্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচীন মিত্র।

কাছে পেয়েছিলুম। তিনি দিয়েছিলেন অকুণ্ঠিত ভাষায় অসাধ্য সাধনের ইঙ্গিত—চিন্তায় সাহস, কর্মে নির্ভীকতা। কাজের মধ্যে ছিল না কোন দারিদ্র্য, কোন কৃপণতার চিহ্ন। মনে ছিল প্রচুর কর্মস্পৃহা—আদর্শ ত প্রাণহীন জড় পদার্থ নয়।

হিজলীতে থাকবার সময় পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জী "An appeal to the youths of Bengal who tread the paths of violence" বলে এক পুস্তিকা ছাপিয়ে প্রতি জেলে ও অন্তরীণ শিবিরে পাঠালেন কর্তৃত্বের ভাব দেখিয়ে। তার যথাযথ উত্তর পাবার পর সখেদে বললেন "When Caliban was taught language he learnt how to curse Prospero" হায়রে! রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে, তাহাদের বাক্যের তেজ, দীনতাকে আরও উজ্জ্বল করে প্রকাশ করে মাত্র।'

আজ এতকাল পরে সে সব উৎসাহ কোথায় নিভে গেছে, মনের চিন্তাধারাও গেছে সম্পূর্ণ অন্য পথে। বিপ্লবের পথে যারা স্ববর্ণ স্বগোত্র, অন্তরঙ্গ, তাঁরা হয়ত ভাবছেন এত ত্যাগ, এত নির্যাতন কি এই স্বাধীনতার জন্যে করেছিলুম? যাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলুন তাঁরা কি দেশের অবস্থা এমনি পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন? রাজনৈতিক ডাকাতিতে অর্থাগমের চেয়ে অর্থব্যয়ই বেশী হয়েছে বলে আমরা শেষ পর্যন্ত ডাকাতি বন্ধ করে একমাত্র সরকারি অর্থ ও নিজেদের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মধ্যেই সেগুলো সীমাবদ্ধ রেখেছিলুম। আজ স্বাধীন দেশ যদি বলে যে একমাত্র কংগ্রেসই ভারতের মুক্তিদাতা তাহলে সেটা যে সত্যের অপলাপ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু আজ স্বাধীনতার যে রূপ চোখে পড়ছে তাতে এটাই প্রকট হচ্ছে যে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী লোক স্বাধীনতার ফলে দিল্লীর মহাকরণের পক্ষপুটে অথবা দেশের সরকারী কর্ণধারদের কোলে আশ্রয় পেয়েছেন।

হাতে নাতে অন্যায় ধরা পড়লে বা আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হলেও গোপন হাতের ইঙ্গিতে তা' চাপা পড়ে যায়। লক্ষ লক্ষ টাকারও হিসাব মেলে না।

চাকরীর বেলায় যোগ্যতার মাপকাঠি আমলাতান্ত্রিক পক্ষপাতিত্ব। নেই গুণের বা বিদ্যার সমাদর—তাই প্রতিভাধর ডাক্তার, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকদের স্থান জুটছে না আমাদের দেশে—তাঁদের হতে হচ্ছে বিদেশীদের দ্বারস্থ। ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার মত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক বা ডঃ বরুণ হালদারের মত অসাধারণ তত্ত্বানুসন্ধানী বিজ্ঞানতপস্বী একদিন দিল্লীতে কোন দ্বিতায় শ্রেণীর চাকুরির যোগ্য বলে বিবেচিত হন নি—আসল কথা বিদ্যার খ্যাতি থাকলেও তাঁদের ছিল না মুরুব্বীর জোর। অথচ বিদেশে তাঁরা পেলেন প্রচুর সমাদর, অকুণ্ঠিত সম্মান, গবেষণার প্রকৃষ্ট সুযোগ ও আর্থিক আনুকূল্য। প্রতিভার ভাগ্যে দুঃখ রয়ে গেল দীর্ঘকাল। স্বাধীনতালাভের পর জীবনের, সমাজের, বিদ্যার, গুণের, কর্মসংস্থানের, ব্যবসার ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে যে সংক্রামক ব্যাধি ঢুকেছে তা' আজ দূর করা সুদূরপরাহত। দূর হ'ল না চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের সংকোচ ও মনের উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতা, এই ত স্বাধীনতার রূপ। অথচ এই স্বাধীনতার জন্যে আমাদের মত হাজার হাজার যুবক ও ছাত্র একদিন জীবন তুচ্ছ করে বিদেশীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন—যাঁরা আজ বেঁচে আছেন তাঁদেরও হয়ত ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিতে হ'ত দৈবক্রমে নিতান্ত ভাগ্যের জোরে নিস্কৃতি পেয়েছেন।

যাক্ সে অনুশোচনা। ১৯৩২ সনের শেষের দিকে বক্সা থেকে বন্দীশিবিরে এলেন নৃপেনদা—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। নৃপেনদা বহুবার জেল খেটেছেন, সহ্য করেছেন অনেক নির্যাতন। রসিক এই লোকটি বন্দীজীবনের দুঃখ লাঘব করবার উদ্দেশ্যে ও বন্ধুদের আনন্দ দেবার জন্যে গম্ভীর হয়ে বানিয়ে বানিয়ে নানা রকমের আজগুবি

ভালমন্দ খবর ছড়াতেন মাঝে মাঝে। ভাষার মধ্যে রসিকতার অভাব ছিল না। অনেকে বিশ্বাস করে পরে তাঁর রসিকতা বুঝতে পেরে লজ্জা পেতেন।

নৃপেনদার কথা মনে হ'লে সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের নাম মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন 'দাদা ঠাকুর'—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে ছিল তাঁর নিবাস। ছেলে বয়েস থেকেই বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁর বুদ্ধির কোন দিন অভাব দেখা যায় নি। দুঃসাহসিক কাজেরও তাঁর অন্ত ছিল না। 'বিদূষক' কাগজের তিনি নিজেই সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রচারক ছিলেন। পুলিশ অনেক বার তাঁকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছে—এমন কি তাঁর 'পণ্ডিত প্রেসে' রিভলভার লুকিয়ে রেখে দিয়ে খানাতল্লাসী করতে এসে দেখে যে তীক্ষ্ণধী দাদাঠাকুর তাদের ফাঁকি দিয়ে দিয়েছেন—রিভলভাব তখন নদীর জলে। তাঁর ব্যঙ্গ ও স্বরচিত ইংরেজী কবিতায় তদানীন্তন ইংরেজ লাট সাহেবও আমোদ উপভোগ করেছেন। আজীবন দেশহিতব্রতে জীবন উৎসর্গকারী 'দাদাঠাকুর' ছিলেন বিপ্লবীদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

১৯৩৩ সনের ৯ই জানুয়ারী ১নং ডরসেট বাহিনীর ক্যাপ্টেন মিঃ ফ্ল্যাভেলের পিস্তল কেড়ে নেবার চেষ্টা হ'ল কিন্তু সুবিধে হ'ল না। এই সময় ডায়োসেসিন হোষ্টেল থেকে ধরা পড়ল কয়েকটি রিভলভার—ফলে বন্দী হলেন শ্রীমতী জ্যোতিকণা দত্ত, ও শ্রীমতী বনলতা দাশগুপ্ত।

১৯৩৩ সনের ১১ই জানুয়ারী শ্রীপ্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়ে গেল মেদিনীপুর জেলে—মৃত্যুর আগে জেলা শাসক মিঃ বার্জকে জানিয়ে গেলেন যে তাঁরও নিস্কৃতি নেই।

হিজলী থেকে বহরমপুর আসছি কড়া পাহারায়। আমরা তিনজন চলেছি সঙ্গে আছে রাইফেলধারী গুর্খা বারজন, একজন আই. বি. সাব-ইন্সেপেক্টার আর একজন পুলিশ সাব ইনেস্পক্টর।

এই ফৌজ চলেছে আমাদের সঙ্গে কাজেই লোকেরা ভাবছে এরা কারা? তিনজনের মধ্যে একজন আমায় গোপনে বললেন যে আমি সাহায্য করলে তিনি পালাবার চেষ্টা করবেন। তাঁর বাড়ী বরিশাল। আমি বললুম 'যদি পারেন ত পালান, আর যদি পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন তবে চেষ্টা না করাই ভাল। মার ত আমাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত।' আমি জানি, তিনি খুব উৎসাহী কর্মী কম কথা বলতেন এবং খুবই বুদ্ধিমান।

আমার সমর্থন পেয়ে তিনি কেবলই সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু আগে থেকেই পুলিশ কর্মচারীরা কেমন করে টের পেয়ে সাবধান হয়েছিলেন। আমার মনে হয় হিজলী থেকে বেরুবার আগে তিনি যখন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন হয়ত কোন গুপ্তচর কথাটা শুনেছিল। আই. বি.-র লোকটি তাঁর পিছু কিছুতেই ছাড়ছিলেন না। আমরা অন্য দু'জন খড়গপুর ষ্টেশন প্লাটফর্মে পায়চারি করছি—আমাদের সঙ্গে ঘুরছে একজন রাইফেলধারী, আর তিনি একা বসে আছেন, বাকি ক'জন পুলিশের লোক তাঁর চারদিকে। এমনি করেই তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে তিনি আর পালাতে পারলেন না। পৌছুলুম বহরমপুর ক্যাম্পে। স্বাস্থ্যটা এখানে থাকার সময় একেবারে ভেঙ্গে গেল।

নানকানা বোমা বিস্ফোরণ মামলায় পলাতক আসামী ছিলেন শ্রীজগ্‌গুরাম। সহকর্মী শ্রীসজ্জন সিংকে হায়দারাবাদের পুলিশ সাবইনেস্পেক্টর মহম্মদ সাদিকের হত্যাকাণ্ডের জন্যে তখনও পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ১৯৩৩ সনের ২৮শে জানুয়ারী শ্রীজগ্‌গুরাম লাহোরে এলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী বেলা দশটার সময় হঠাৎ এক বিকট শব্দে বোমা বিদীর্ণ হয়ে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই গেলেন মারা। একজন বলিষ্ঠ কর্মীর তিরোধান হয়ে গেল।

তখনও চট্টগ্রামে মাষ্টারদা শ্রীসূর্য সেনকে ধরবার জন্যে পুলিশ

ও সৈন্যবাহিনী শুধু প্রাণপাত পরিশ্রমই করছে না করছে অত্যাচারের চূড়ান্ত। চট্টগ্রাম গুপ্তচরে পূর্ণ হয়ে গেছে। চট্টলের ঘরে ঘরে মাষ্টারদা তখন দেবতা বলে পূজা পাচ্ছেন। একদিন পুলিশের নজর থেকে পালাবার সময় বৃষ্টির জন্যে একটি দরিদ্রের পর্ণকুটীরের বাইরে মাষ্টারদা দাঁড়িয়েছেন—শুনলেন বৃদ্ধা তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম জানিয়ে বলছেন 'ভগবান, সূর্য সেনকে সকল বিপদথেকে রক্ষে করো।' কি সকাতর ব্যাকুল প্রার্থনা।

এ সময় সন্দেহ ভাজন ছেলেমেয়েদের কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। শ্রীমতী কল্পনা দত্তের নাম কেটে কলেজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। অকল্যাণের উৎস চিরদিন শতধারায় উৎসারিত। মাষ্টারদাকে ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা রকমের পুরস্কার দেওয়া হবে, বার বার ঘোষণা হতে লাগল—পুরাকালের গল্প রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্বের মত। টাকার লোভ বড় লোভ। মাষ্টারদার নিজের মামা এ লোভ সামলাতে পারলেন না। গোপন উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করলেন মাষ্টারদাকে। সংবাদ দিলেন পাটিয়াথানার দারোগা শ্রীমাখনলাল দীক্ষিতকে। মাষ্টারদার মনে কণামাত্র সন্দেহ হয় নি যে কলির এই কংসটি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। মাষ্টারদাকে পুলিশ ধরে ফেলল—পালাবার চেষ্টা করেও পারলেন না। তখন বাড়ী ঘিরে ফেলেছে ৩৫ জন সশস্ত্র সিপাই, ৩ জন অ্যাসিষ্টাণ্ট সাব ইন্‌স্পেক্টর ৩ জন কনেষ্টবল একজন মিলিটারী অফিসার আর পটিয়া থানার দারোগা শ্রীমাখনলাল দীক্ষিত। ধরা পড়ে গেলেন মাষ্টারদা ১৯৩৩ সনের '৬ই ফেব্রুয়ারী গৈরালাগ্রামে। চট্টলের যুবক যুবতীরা এ অপমান, এ বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে পারলেন না। মামা শ্রীনেত্র সেন তখনই টাকা পেলেন কিনা জানিনা। ধরিয়ে দেবার পরদিন তিনিও খেতে বসেছেন, তাঁর আত্মীয়েরা দেখলেন যে ভাতের থালার উপর পড়ে রয়েছে তাঁর খণ্ডিত মাথাটি —আর দেহটিকে কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে কারা রেখে

গেছে—বিশ্বাসঘাতকতার চরম ও পরম পুরস্কার দিয়ে। ১৯৩৩ সনের ২৬শে মার্চ পটিয়া থানার দারোগা শ্রীমাখনলাল দীক্ষিতকেও পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ প্রাণ দিতে হ'ল নিজের বাড়ীতে সন্ধ্যে ৭টায়। সাবাস চট্টলের বিপ্লবী ভাই-বোনেরা।

পুলিশের কাছে খবর এল যে পাঁচ ছ'জন বিপ্লবী চন্দননগরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সন্ধান চলতে লাগল। ১৯৩৩ সনের ৯ই মার্চ সন্ধ্যের সময় চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার মঃ কঁ্যা কয়েকজন কনেষ্টবল নিয়ে একটা বাড়ী ঘেরাও করার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে ধরা পড়ে গেলেন। পুলিশ তাঁকে মিঃ ওয়াটসনের আক্রমণকারীদের অন্যতম বলে সন্দেহ করল। অপর দু'জন অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন। মঃ কঁ্যা নিজে সাইকেল চড়ে পলাতকদের সন্ধানে চললেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন যে দু'জন পথচারী চলেছেন—তিনি সাইকেল থেকে নেমে তাঁদের জিজ্ঞেস করতে এলেন যে তাঁরা এ রাস্তায় দু'জনকে পালাতে দেখেছেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের একজন শ্রীদীনেশ মজুমদার গুলি করলেন মঃ কঁ্যার ললাট লক্ষ্য করে। তিনি পড়ে গেলেন কনেষ্টবলটি এগিয়ে আসায় তাকেও গুলি খেয়ে ধরাশায়ী হ'তে হ'ল। মঃ কঁ্যা হাসপাতালে তার পরদিন মারা গেলেন—তাঁর মৃতদেহ ফ্রান্সে পাঠান হ'ল বিমানপথে। শ্রীদীনেশ মজুমদার পালিয়ে এসে রাতে একটি বাড়ীতে আশ্রয় চাইলেন—আশ্রয় দাতা আশ্রয় দিলেন কিন্তু জানালেন যে তিনি সেই বাড়ীতে এসে খুবই ভুল করেছেন। তিনি বললেন 'আমার এক দাদা শ্রীহরিনারায়ণচন্দ্র দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দীর্ঘদিন দ্বীপান্তর খাটছেন আর অন্য এক ভাই শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র বিনা বিচারে আটক আছেন —পুলিশের এ বাড়ীর উপর নজর আছে কাজেই কাল ভোরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দোবো।' শ্রীমজুমদার রাতের মত

আশ্রয় পেলেন। আমার খুড়তুতো দাদা শ্রীললিতমোহন চন্দ্র তার পরদিন ভোরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেন। কিন্তু রাতের আশ্রয়ের কথা পুলিশ জানতে পেরে আশ্রয়দাতার উপর চালালেন চরম নির্যাতন—ফলে তিনি উন্মাদ হ'য়ে গেলেন। আজও আমার সেই দাদা বিকৃত মস্তিষ্ক।

১৯৩৩ সনের ১৩ই মার্চ হবিগঞ্জে ইটখোলা পোষ্ট অফিসের পিওনকে সন্ধ্যের সময় রেলষ্টেশনে টাকা নিয়ে যাবার পথে কয়েকজন করলেন আক্রমণ ও টাকার থলি কেড়ে নিয়ে পড়লেন সরে। আশে পাশের লোক চীৎকার শুনে এঁদের ধরবার জন্যে এগিয়ে আসতেই এঁদের একজন করলেন গুলি। একজন রেলকর্মচারী হলেন নিহত। একে একে ধরা পড়লেন চারজনই। ২২শে জুলাই বিচার আরম্ভ হয়ে শ্রীঅসিত ভট্টাচার্যের ফাঁসি আর সর্বশ্রীবিরাজ দেব, বিদ্যাধর সাহা ও গৌরাঙ্গ দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়ে গেল। ১৯৩৪ সনের ২রা জুলাই কিশোর অসিতের শ্রীহট্ট জেলে ফাঁসি হয়ে গেল। আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ প্রত্যর্পণের আবেদন হ'য়ে গেল নামঞ্জুর।

১৯৩৩ সনের ১লা এপ্রিল বহরমপুর ক্যাম্পে যে ঘটনা ঘটল তার তুলনা হয় না।—সেটা আমাদের স্মরণীয় দিন। তখন বি. এ. পরীক্ষা চলছে। সরকার পক্ষ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে, কোন না কোন অজুহাতে আমাদের মার দেবে। গোলমালটার সূত্রপাত পূর্বপরিকল্পিত। সাধারণ কয়েদী যারা আমাদের কাজ করত—সেই 'ফালতু'রা হাসপাতালে একজন রোগীকে বিনা কারণে অপমান করে বসল সরকারের ইঙ্গিতে—তিনি গেলেন চটে। হাসপাতালটি ক্যাম্পের একপাশে, মাঝখানে উঁচু পাঁচিল। ফালতুর দল সরকারের প্ররোচনায় রোগীদের আক্রমণের উদ্যোগ করতেই একটা হৈ হৈ শব্দ। খবর এল মারামারি হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কয়েকজন পাঁচিল টপ্‌কে হাসপাতালে

গিয়ে পড়লেন। এদিকে সিপাইরা আগে থেকে মুখে কাপড় জড়িয়ে তৈরী ছিল যাতে কেউ সনাক্ত করতে না পারে। তারা রাইফেল, বেওনেট ও কিছু সংখ্যক লাঠি দিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে এল ছুটে। তখন আমাদের হাতিয়ার মাত্র বাইশখানা হকিষ্টিক। কিন্তু ঐ বাইশখানা ষ্টিক দিয়ে পাঁচশ সিপাইয়ের আক্রমণ আটকান যাবে কি করে? অসম্ভব বুঝে প্রায় অনেকেই ঘরে ঢুকে পড়লেন। সিপাইরা যাকে সামনে পেল তাকেই মারতে আরম্ভ করল নির্দয়ভাবে।

একটিমাত্র লোক মৈমনসিং-এর শ্রীদীনেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য একা দাঁড়ালেন রুখে এবং যতক্ষণ না তাঁর মাথাটা ফেটে গেল ততক্ষণ তিনি একা সাত আটজন পাঠানকে দিলেন কাবু করে। তারা তখন মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছে। সাহায্য করবার কেউ থাকলে হয়ত তিনি আরও কিছুক্ষণ যুঝতেন। সেদিন একা তিনি যে সাহস দেখিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না। তখন কমাণ্ডেণ্ট ছিলেন না —ছিলেন অ্যাসিষ্টাণ্ট কমাণ্ডেণ্ট শ্রীপবিত্র বসু—তিনি এসেই হুকুম দিলেন গুলি চালাতে। এই শ্রীপবিত্র বসু শোনা যায় নিজের উন্নতির জন্যে নিজের বাড়ীতেই বোমা ফেলে পদোন্নীত হন। এদিকে এক একটা ঘরে আমরা প্রায় সত্তর আশি জন ঢুকে পড়েছি। ঘর মানে টালির ছাদ চারপাশে দেওয়ালের বদলে বড় বড় লোহার গরাদ মাঝে মাঝে আঠারো ইঞ্চি ইটের চওড়া থাম। যে ঘরে ছ'জন থাকবার কথা সেখানে ঢুকে পড়েছি প্রায় ষাটজন। গুলি চললে একজনও বাঁচব না। আড়ালে আশ্রয় নেবার কোন জায়গা নেই—গুলি এধার থেকে ওধার ভেদ করে চলে যাবে। সিপাইরা হুকুম পাবামাত্র হাঁটু গেড়ে রাইফেল উঁচিয়ে বসল সুবেদারের হুকুমের অপেক্ষায়। নিয়মানুসারে সুবেদার হুকুম না করলে তারা গুলি চালাবে না, তবে কমাণ্ডেণ্ট বা অ্যাসিষ্টাণ্ট কমাণ্ডেণ্ট সুবেদারকে হুকুম করলে সুবেদার তা'

মানতে বাধ্য। আবার সুবেদার হুকুম দিলেও কমাণ্ডেন্ট তা' বন্ধ করতে পারেন।

সিপাইরা যখন গুলি চালাবার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসেছে তখন আমাদের সকলেরই মনের অবস্থা এক রকম। শুধু মনে হচ্ছে যে কয়েকটা আওয়াজ হবে আর আমরা শেষ। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত কি রকম তা' বোধহয় উপলব্ধি করলুম। মৃত্যুর আকাশ অমলিন স্বচ্ছ—জীবনের যবনিকা সেখানে আর আচ্ছন্ন নয়। স্তব্ধ—নিস্তব্ধ বন্দী শিবির যেটা প্রায় হাজার লোকের কলরবে সব সময় মুখরিত থাকত সেখানে কোন শব্দ নেই। দূরে গঙ্গার ধারে ফেরিওয়ালার গলা শোনা যাচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে এক বৃদ্ধার তারস্বর। তিনি সাহসে ভর করে তাঁর বাড়ীর ছাদ থেকে সকলকে জানিয়ে চীৎকার করছেন "ওরে আমার বাছাদের মেরে ফেললরে।" শিবিরের শতশত বন্দী পুত্রদের প্রহার ও অত্যাচারের আশঙ্কায় জননীর সে মর্মভেদী আর্তনাদ আজও কানে ভাসছে।

সুবেদার মেজর একটুক্‌রো কাগজ শ্রীপবিত্র বসুর সামনে ধরে বললেন হুকুমটা লিখে দিতে। সুবেদার জানতেন যে পবিত্র বাবু সময় মত সবটা অস্বীকার করবেন—ফলে গুলি চালাবার অবশ্যম্ভাবী ফলের জন্যে তিনি নিজে দায়ী হবেন—সব অপরাধ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়বে। পবিত্র বসু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন—তখন তিনি না পারছেন কিছু বলতে, না পারছেন কিছু লিখতে। এমন সময় কমাণ্ডেন্ট এসে পড়লেন। কয়েকজন এ সময় গাছে উঠে পড়েছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে তাঁরা গাছ থেকে নেমে কমাণ্ডেন্টকে বললেন 'দেখুন একবার অবস্থাটা।' শুনেই তিনি বললেন 'এমনি করেই মারা উচিত।' সিপাইদের বললেন 'গুলি নয় বেওনেট চার্জ কর।' একজন বিদেশী শাসক বন্ধ করলেন গুলি আর একজন দেশী তাঁবেদার হুকুম দিলেন দেশের নিরপরাধ যুবকদের গুলি করে মারতে। উদ্যতমুষ্টি বিভীষিকা

রেখে গেল চিরদিনের জন্যে কলুষের আঘাত চিহ্ন। স্বাধীন ভারতে আজ এদেরই সমাদর বেশী—আমাদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত দুর্ভাগ্যের ফল।

হুকুম পাবামাত্র সিপাইরা ঘরে ঢুকে এলোপাথাড়ী লাঠি রাইফেলের কুঁদো ও বেওনেটের খোঁচা দিয়ে মার আরম্ভ করলে—এর চেয়ে গুলি বোধ হয় ছিল ভাল। সে যে কি নির্যাতন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—আমরা নিরুপায়। একজন সিপাই পিছন থেকে আমার মাথার উপর একটা লাঠি তুলছে দেখতে পেয়ে দিনাজপুরের শ্রীকরালীকান্ত বিশ্বাস চীৎকার করে উঠল 'গঙ্গা তোকে মেরে ফেললে'— করালী আমার সহপাঠী এক সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছি। সে খুব লম্বা মানুষ তাই তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আমার মাথার উপর চাপিয়ে দিল—লাঠিটা পড়ল চেয়ারের উপর। চেয়ারের পিঠ আর একটা হাতল গেল ভেঙ্গে—আমি সেই চোটে কয়েক জনের ঘাড়ের উপর ভাঙ্গা চেয়ার মাথায় পড়ে গেলুম। মাথাটা রক্ষে করল করালী—লাঠি লাগলে আর হয়ত বাঁচতে হ'ত না। সিপাইটার রাগ পড়ল করালীর উপর—দ্বিতীয় লাঠি পড়ল তার কোমরে—সে পড়ে গেল। তখন আহত বন্দীদের লাঠি পেটার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। সে যে কি দিন আজও মনে পড়লে শিউরে উঠি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তখন আমরা প্রতীক্ষা করছি যে কোন সময়ে জীবনের হাত ধরে মৃত্যু নৃত্য করবে—আসবে শেষ নিঃশ্বাসের ইসারা।

সেদিন আমরা সারারাত সেই অবস্থাতেই অনাহারে ঘরে বন্ধ রইলুম। ঘটনাটা ঘটল বেলা চারটের সময়। ঠিক তার পরের দিন অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'ল নতুন ক্যাম্পে। সেখানেও একটি লোক শ্রীদীনেন্দ্র ভট্টাচার্যের মত রুখে দাঁড়ালেন—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ। ঠিক হ'ল এর প্রতিবাদে অনশন করতে হবে। আমি মোটেই রাজী ছিলুম না—কিন্তু সকলের যখন এই মত

তখন আমিও তাই মেনে নিলুম। প্রায় পনরদিন অনশনের পর কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। নামে মাত্র একটা তদন্ত কমিটি বসল এবং তাঁদের রিপোর্ট অনুসারে পবিত্র বসু যিনি সকল অনিষ্টের মূল তিনি পেলেন নতুন খেতাব। যোগ্য লোকের যোগ্য পুরস্কার। আর আমাদের লাভের মধ্যে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল।

ঠিক একবছর আগে হিজলীতে থাকবার সময় আমি ও আর একজন সকলকে এপ্রিলফুল করেছিলুম, পরের বছর আমিও বোকা বনে গেলুম। ব্যাপারটা এই—হিজলীতে প্রতিমাসের শেষে আমাদের খুব বড় রকমের ভোজ হ'ত। ৩১শে মার্চ ভোজ খাবার পর রাত্রে আর কিছুতে ঘুম আসে না—তখন রাত্রে বন্ধ করবার নিয়ম হয় নি, শুধু চারদিকে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। আমি ও আমার বন্ধু ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় ধৃত শ্রীঅদ্বৈত দত্ত অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গল্প করে দু'জনে পায়খানায় গেলুম—যাঁরা ঘুমুচ্ছিলেন তাঁদের উপর মনে মনে হিংসে হচ্ছিল—হঠাৎ দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় চাপল। রাত পোহালেই ১লা এপ্রিল একটা মজা করা যাক্। ক্যাম্পে প্রায় ত্রিশটা পায়খানা ছিল—আমরা দুজনে মাত্র একটি শৌচের মগ রেখে বাকিগুলি দড়ি বেঁধে একটা শালগাছের ডালে পাতার আড়ালে টাঙ্গিয়ে রেখে ব্যারাকে এসে চুপচাপ শুয়ে রইলুম। সকাল বেলা বড্ড গোলমাল একটা মগ নিয়ে সকলেরই টানাটানি—মগ কি হ'ল? কয়েকজনের কাপড় চোপড় নষ্ট হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে মগগুলো আবিস্কৃত হলো। কে এ কাজ করেছে? খুঁজে বের কর। ১লা এপ্রিল মনে করে জিনিসটা আর বেশী দূর এগোয় নি—তবে জানাজানি হয়ে গেল কাদের কর্ম এটি। নীরস বন্দীজীবনে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য মন্দ লাগে না।

হিজলীতে থাকবার সময় একটা না একটা গোলমাল লেগেই

থাকত। একবার কর্তৃপক্ষ নিয়ম করলেন যে এর পর প্রতিদিনই বন্দীদের গণনা করা হবে এবং রাত্রে শিবিরের ব্লকগুলি তালা বন্ধ হবে। আগে এ সবের ব্যবস্থা ছিল না—আমরাও রাত্রে গরমে বাইরে মাঠে ঘুরে বেড়াতে বা শুয়ে থাকতে পারতুম—সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এ নিয়ে মহা হৈ চৈ—শেষ পর্যন্ত আলাপ আলোচনা অনশন ইত্যাদি করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রফা হ'ল যে যে যার ঘরে থাকব একটা নির্দিষ্ট সময়—সুবেদার এসে গণনা করে যাবে। কারো নাম ধরে ডাকা হবে না বা উত্তর দিতে হবে না। কিছুদিন পরে আবার নিয়ম হ'ল যে কমাণ্ডেণ্ট যখন ঘরে আসবেন তখন আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমরাও উল্টো প্রস্তাব দিলুম যে আমরা দাঁড়াতে রাজী আছি কিন্তু আমরাও অফিসে গেলে কমাণ্ডেণ্ট দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করবেন। সাহেব রাজী হলেন না। আবার হৈ চৈ—শেষকালে জোর করে আমাদের উপর নিয়ম চাপানো হ'ল। আমরাও ঠিক করলুম যে তিনি যখন আসবেন আমরা কেউ ঘরে থাকব না, বারান্দায় পায়চারি করব। দাঁড়াবার প্রশ্ন উঠবে না। কমাণ্ডেণ্ট তখন মিঃ বার্জ। একখানা পাঠ্য বই কিনতে দিয়েছিলুম ম্যাথু আরণল্ডের 'কালচার এণ্ড এনার্কি'। যিনি সেন্সারিং অফিসার তিনি এনার্কি কথাটা দেখেই বইটা বন্ধ করে দিলেন, আমাকে একবারও জানালেন না। অনেকদিন পরে আমাকে জানান হ'ল বইটা আপত্তিকর। এতে মিঃ বার্জের কোন দোষ ছিল না—ছিল সেন্সারিং অফিসারের নির্বুদ্ধিতা। সে বেচারী Matriculation-এর গণ্ডীর বাইরে যায় নি—ফর্দ মিলিয়ে দেখেছে এনার্কিজিমের বই নিষিদ্ধ, তাই আমারটাও নিষিদ্ধ। আমার কাছে চিঠি এল যে অমুক তারিখের অর্ডার দেওয়া বইখানা দেওয়া হবে না। কারণের ঘরে 'আপত্তিকর' জায়গায় একটা দাগ দেওয়া আছে—সইটা অবশ্য মিঃ বার্জের তিনি হয়ত, জানেনই না যে কি বই।

আর যায় কোথা সাহেবকে খোঁচা দিয়ে লিখলুম—'শুনেছি আপনি একজন আই. সি. এস.। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক কেমন করে আপত্তিকর হ'ল বুঝলুম না।' সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল। ভাষা অসম্মানজনক—হুকুম হ'ল সাতদিন নির্জন সেল। বললুম 'একটু বেশী দিন করা যায় না।' তিনি আমার কথা ফক্কুড়ি মনে করে বললেন 'সুবেদার, বাবুকে নিয়ে যাও।' যাবার সময় বললুম 'যাচ্ছি কিন্তু আমার আবেদনের উত্তরটা বাকি রইল।' গেলুম নির্জন সেলে—ভারি ভালো জায়গা। কোন গোলমাল নেই—আত্মচিন্তার পরম রমণীয় স্থান। আমাকে নিয়ে যাবার পর মিঃ বার্জের খেয়াল হ'ল যে কেন আমি ঐ কথা বললুম। পরে অনুসন্ধানে জানলেন যে বইটা বন্ধ করা উচিত হয় নি। পরের দিন সকাল বেলা নিজে এসে বললেন 'আপনি ব্যারাকে যেতে পারেন; বই আপনি পাবেন। তবে চিঠিতে ঐ ভাষা লেখা উচিত হয় নি।' বলেই চলে গেলেন। আমার সেন্সারিং অফিসার সম্বন্ধে কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। সব জায়গাতেই একই বিদ্যের লোক। আমার কোন বন্ধু দেউলীতে 'তবলা তরঙ্গিনী' বলে বই আনতে দিয়েছিলেন—। সেন্সারিং অফিসার লিষ্ট মিলিয়ে দেখলেন তবলা তরঙ্গিনী নেই—নোট দিলেন "Tabla allowed but Tarangini not."

যাক্ পুরানো কথা। ১৯৩৩ সনের ২৬শে এপ্রিল মিলিটারি পোষাকে চারজন বিপ্লবী ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়ে রিভলভার দেখিয়ে টাকা নিয়ে সরে পড়লেন। পরে ধরা পড়লেন বাইশ জন। এ সময় আত্মগোপনকারী শ্রীদীনেশ মজুমদারের খরচের জন্য টাকার দরকার মেটাতে তাঁর বন্ধু শ্রীকানাই ব্যানার্জী গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্কের চেক্ জাল করে ২৭০০০৲ টাকা বের করে নিলেন।

আগষ্ট মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেলেন ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী। কৃতবিদ্য পরম পণ্ডিত ডঃ অধিকারী

দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে লেখাপড়া শেখেন। পরে কমুনিষ্ট পার্টির সভ্য হন। জীবনে বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে।

১৯৩৩ সনে ষড়যন্ত্র মামলায় কানপুরে শ্রীমানবেন্দ্র রায়ের ছ'বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। এ সময় আরম্ভ হ'ল আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা। বরিশালের সর্বশ্রী প্রভাত চক্রবর্তী, যোগেশ মজুমদার, পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল, জিতেন গুপ্ত, ধীরেন ভট্টাচার্য, যতীন চক্রবর্তী, পরেশ গুহ, সত্যেন মজুমদার, দ্বিজেন তলাপাত্র, সুরেন ধরচৌধুরী, জ্যোতিষ মজুমদার, হরিপদ দে, অমূল্য সেন, বিমল ভট্টচার্য, মণীন্দ্র চৌধুরী ও সীতানাথ দে প্রমুখ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা চলল অনেকদিন ধরে। সীতানাথ দে, প্রমাণাভাবে পেলেন মুক্তি —। প্রভাত চক্রবর্তী, পূর্ণানন্দ দাস গুপ্ত ও আরও কয়েকজনের হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এ সময় আন্দামানে বন্দীদের প্রতি অসদ্‌ব্যবহারের বিরুদ্ধে আরম্ভ হ'ল অনশন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত শ্রীমহাবীর সিং ১২ই মে থেকে অনশন আরম্ভ করলেন—জোর করে খাওয়ানোর কাজে কুফল ফলল। ১৭ই মে শেষ রাত্রে তিনি মারা গেলেন। বাংলার শ্রীমানকৃষ্ণ নমদাস ১৬ই মে থেকে অনশন আরম্ভ করলেন। একই ভাবে তিনিও চলে গেলেন ২৬শে মে। শ্রীমোহিতমোহন মৈত্র আরম্ভ করলেন অনশন ১২ই মে থেকে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ২৮শে মে। তিনটি মূল্যবান জীবন শেষ হ'য়ে গেল।

১৯৩৩ সনের ১৯শে মে পুলিশের কর্তারা সংবাদ পান যে চট্টগ্রামের গহিরা গ্রামে তখন অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার ছ'জন পলাতক আত্মগোপন করে আছেন। পুলিশ যখন বাড়ী ঘেরাও করছে সে সময় দু'পক্ষের গুলি বিনিময়ের মধ্যে দু'জন পালালেন। গুলিতে মারা গেলেন গৃহস্বামী শ্রীপূর্ণচন্দ্র তালুকদার ও পলাতক শ্রীমনোরঞ্জন দাস। ধরা পড়লেন শ্রীতারকেশ্বর দস্তিদার।

১৯৩৩ সনের ১৯শে মে গহিরা গ্রামে ধরা পড়লেন চট্টগ্রামের শ্রীমতী কল্পনা দত্ত (যোশী)।

১৯৩৩ সনের ২২শে মে পুলিশ খবর পেয়ে ১৩৬।৪-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ী ঘেরাও করলেন। তখন ভোর চারটে। সবচেয়ে উপরের তলার ঘরে পুলিশ ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা জানলা থেকে একটি গুলি এসে ইনস্পেক্টর শ্রীমুকুন্দ ভট্টাচার্যের কাঁধে লাগে। ত্বু'পক্ষের চলল গুলি বিনিময়। একজন এই অবসরে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীর ছাদ দিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত বন্দী হলেন সর্বশ্রীদীনেশ মজুমদার, নলিনী দাসগুপ্ত, ও জগদানন্দ মুখার্জী ও আরও দু'জন। ১৯৩৩ সনের ৫ই অক্টোবর আলিপুরে বিচার আরম্ভ হয়ে ১০ই অক্টোবর শ্রীমজুমদারের ফাঁসির হুকুম হয়। হাইকোর্ট আপীলে কোন ফল হ'ল না।

১৯৩৩ সনের ৩রা আগষ্ট এলাহাবাদ হাইকোর্ট মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আপীলের রায় দিলেন। রায়ে কমরেড মুজাফর আহমদ, ডাঙ্গে ও সৌকত ওসমানির তিন বছর, ফিলিপ স্প্রাটের দু'বছর, ঘাটে, বেন ব্রাডলী, মীরজাকর, জগলেকার, নিম্বকার, মোহন সিং, আবতুল মজিদ ও ধরণী গোস্বামীর এক বছর ও শ্রীগোপেন চক্রবর্তীর ৭ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। কমরেড দেশাই, হাচিনসন্, রাধা-রমন দত্ত সমেত ন'জন পেলেন মুক্তি।

১৯৩৩ সনের ২২শে আগষ্ট দেউলী বন্দী নিবাসে নিউমোনিয়ায় মারা গেলেন শ্রীহরিপদ বাগচী। স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের হাতে তাঁর মৃতদেহ দাহ করার জন্যে দেওয়া হ'ল।

১৯৩৩ সনের ২৩শে আগষ্ট ঢাকায় ধরা পড়লেন শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস ও তাঁর ত্বই সহকর্মী। সুটকেশ থেকে বেরুল রাইফেলের টোটা ২০টা। জেল হয়ে গেল পাঁচ বছরের। ঐ দিনই জামাল-পুরের শ্রীধীরেন দে নামে একজনের দেহ বুলেটে জর্জরিত অবস্থায়

গভর্ণমেণ্ট স্কুলের খেলার মাঠে পাওয়া গেল। মৃতের পিতা, আই. বি. সাব ইনস্পেক্টর, তাঁর আর্দালী ও একজন গুপ্তচরের বিরুদ্ধে এবিষয়ে তদন্তের প্রার্থনা করলেন কিন্তু সরকার সে আবেদন নামঞ্জুর করে দিলেন। সরকার এত চেষ্টা এত আইন এত অর্ডিনান্স করেও বিপ্লব আন্দোলন বন্ধ করতে পারলেন না।

১৯৩৩ সনের ২রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের তৃতীয় ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ নিহত হলেন শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅনাথ পাঁজার গুলিতে। মিঃ বার্জ ছিলেন ক্রীড়ামোদী এবং নিজে ছিলেন মেদিনীপুর টাউন ক্লাবের সভাপতি। সেদিন টাউনক্লাব ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলা ছিল। খেলা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ আগে যখন খেলোয়াড়রা মাঠে প্র্যাক্‌টিস করছেন তখন পূর্বপরিকল্পনা মত শ্রীব্রজকিশোর চক্রবর্তীর ইঙ্গিতে শ্রীঅনাথ পাঁজা ও শ্রীমৃগেন দত্ত মিঃ বার্জকে গুলি করলেন। মিঃ বার্জ নিজে খেলতে নেমেছিলেন। একজন মিঃ বার্জের পিছন দিক থেকে পাঁচটি গুলি মারলেন আর অন্যজন তাঁর সামনে থেকে অটোমেটিক পিস্তল দিয়ে তিনটি গুলি করলেন—কোনটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বার্জের জীবনান্ত ঘটল। পুলিশ এ. এস. পি. কাছেই ছিলেন মৃগেনকে ধরতে এলে মৃগেন তাঁকে গুলি করলেন কিন্তু গুলিটা দু'পায়ের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি মৃগেনকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বার্জের দু'জন দেহরক্ষী মৃগেনকে গুলি করে। পরদিন তিনি গেলেন মারা। আর অনাথকে রিজার্ভ ইনস্পেক্টর গুলি করে মেরে দিলেন। পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হওয়ায় পুলিশ মহলে সাড়া পড়ে গেল। ধরা পড়লেন বারজন আর একজন শ্রীশান্তিগোপাল সেন রইলেন পলাতক। পুলিশের কর্তারা অমানুষিক অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। শ্রীকামাখ্যাচরণ ঘোষকে মেদিনীপুরের অ্যাডিসন্যাল এস. পি. মিঃ জোন্স নিজহাতে বিবস্ত্র করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেত মেরেও স্বীকারোক্তি আদায় করতে

পারলেন না। তাঁর ধারণা ছিল এই নির্মম মারের মত আর কোন ভাল দাওয়াই নেই—কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল যে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মোকদ্দমার সময় সেই অমানুষিক মারের ব্যাপারটা ইংরেজ সিভিল সার্জেন পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারলেন না। বিচারে শ্রীনির্মলজীবন ঘোষ, শ্রীব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ রায়ের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল ১৯৩৪ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী। আপীলের আবেদন নিষ্ফল হয়ে গেল। (১) ১৯৩৪ সনের ২৫শে অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ রায়ের ও পরদিন ২৬শে অক্টোবর শ্রীব্রজকিশোর চক্রবর্তী ও শ্রীনির্মল জীবন ঘোষের মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি হয়ে গেল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড পেলেন সর্বশ্রীকামাখ্যাচরণ ঘোষ, সনাতন রায়, নন্দদুলাল সিং ও শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত। শ্রীশৈলেশচন্দ্র ঘোষ রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পেলেন। তাঁকে সরকার নিজ খরচে দিলেন লণ্ডনে পাঠিয়ে। আর বিচারে মুক্তি পেলেন সর্ব্বশ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ, পূর্ণানন্দ সান্যাল, মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সরোজ রঞ্জন দাস কানুনগো—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা হ'ল। শুধু তাই নয় মেদিনীপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর মেদিনীপুর ছেড়ে চলে যাবার নোটীশ জারী হয়ে গেল। (২) মেদিনীপুরে সেদিন বাংলার ছেলেরা প্রমাণ করে দিল যে তাঁরা রাষ্ট্র চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জীবনের বেগে চঞ্চল, স্বাধীনতা যুদ্ধের বেপরোয়া সৈনিক। ১৯৩১ সনের ৭ই এপ্রিল মিঃ পেডী, ১৯৩২ সনের ৩০শে এপ্রিল মিঃ ডগলাস ও ১৯৩৩ সনের ২রা সেপ্টেম্বর মিঃ বার্জ মেদিনীপুরের মাটিতে জীবন দিলেন।

বাবর আকালী মোকদ্দমার ভাই গুরুদিৎ সিংএর দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৩ সনের ১৭ই অক্টোবর খবর পাওয়া গেল যে

(১) 39 Calcutta Weekly Notes 744.

(২) Ibid.

মুলতান সেনট্রাল জেলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সরকার এ খবরটা বরাবরই গোপন রেখেছিলেন। মৃত্যুর কারণ আজও অজ্ঞাত।

সরকার যত নতুন নতুন নিয়ম কানুন বা আইন প্রণয়ন করতে লাগলেন বাংলার ছেলেরা ততই কাজে উৎসাহী হয়ে উঠতে লাগলেন—আইনের ভয়াবহরূপকে তুচ্ছ করে ধূমকেতুর ধ্বজদণ্ড হাতে নিয়ে। ১৯৩৩ সনের ২৮শে অক্টোবর আবার বিপ্লবীরা আত্মপ্রকাশ করলেন। হিলি রেল ষ্টেশনে করলেন এক দুঃসাহসিক ডাকাতি—লুট হ'ল মেল ব্যাগ। এঁদের ধরতে গিয়ে কয়েকজন প্রাণ হারালেন আর কয়েকজন হলেন অল্পবিস্তর আহত। বিচারে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীহৃষিকেশ ভট্টাচার্য ওরকে অনুকূলের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শ্রীপ্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল ওরফে কমল অমল, শ্রীসরোজ কুমার বসু ও শ্রীসত্যব্রত চক্রবর্তীর দশ বছর; শ্রীহরিপদ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার, শ্রীআব্দুল কাদের চৌধুরী ওরফে ডাক্তারদার হ'ল সাতবছর আর শ্রীকিরণ চন্দ্র দের পাঁচ বছরের জেল। ছাড়া পেলেন শ্রীকালিপদ সরকার। টাকা অবশ্য তাঁরা অল্পই পেয়েছিলেন মাত্র ৪৬২৪ টাকা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় হ'ল এর পেছনে বৃহত্তর পরিকল্পনা।

১৯৩৩ সনের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজের বিধান সভায় গভর্ণরের বসবার জায়গায় একটি রিভলভার রাখলেন বিপ্লবীরা, সংকেতে জানালেন ব্রিঠিশ শাসকদের ভাগ্যের পরিণতি। চলল মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলা। পুলিশের বক্তব্য যে গভর্ণরের আসনের নীচে রিভলভার রাখা মানে ভীতি প্রদর্শন। এসময়ে বোম্বাইয়ে এম্পায়ার থিয়েটারে দু'বার পড়ল বোমা। শোলাপুরের কয়েক জায়গাতেও বোমা ফাটল।

১৯৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে জামালপুরের বিপ্লবীরা একজায়গায় গেলেন অর্থসংগ্রহে। কিন্তু দলের কনিষ্ঠসভ্য শ্রীবীরেন দে গ্রাম-বাসীদের বল্লমের আঘাতে আহত হয়ে তিনদিন পরে মারা গেলেন।

১৯৩৪ সনের ৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে যখন কয়েকজন ইউরোপীয়ান পল্টনমাঠে ক্রিকেট খেলা দেখছেন তখন চারজন তরুণ তাঁদের আক্রমণ করলেন বোমা পিস্তল নিয়ে। খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল। সাহেবদের দু'একজন হলেন আহত। দু'জন বিপ্লবী মারা গেলেন শ্রীনৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য ওরফে শ্রীনৃত্যরঞ্জন সেন ও শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য ওরফে শ্রীহিমাশুবিমল চক্রবর্তী। দু'জন ধরা পড়লেন শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী আর শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ৩১শে জানুয়ারী বিচারে দু'জনের ফাঁসির হুকুম হ'ল। ১৯৩৪ সনের ৫ই জুন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে অগ্নিহোত্রী তরুণ দ্বয়ের ফাঁসি হয়ে গেল।

বিচারে মাষ্টারদার আর শ্রীতারকেশ্বর দস্তিদারের মৃত্যুদণ্ড আর শ্রীকল্পনাদত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়ে গেল। ১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী ধার্য হ'ল ফাঁসির দিন। বর্বর শাসকের তাতেও তৃপ্তি হ'ল না। ফাঁসির আগের দিন তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করা হ'ল তা কোন সভ্যজাত কল্পনা করতে পারে না। ইংরেজের সভ্যতারও পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন। দানবের তাণ্ডব নৃত্যের মত পৈশাচিক শারীরিক অত্যাচার হ'ল আত্মসমাহিত সেই পথচিহ্নহীন দহনজয়ী তীর্থযাত্রী মহানায়কের উপর। শোনা যায় তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ ফাঁসি কাঠে ঝোলান হয়। অপ্রসন্ন দিনাবসানের অঙ্গনতলে পরিসমাপ্তি হয়ে গেল তাঁর মাতৃ-যজ্ঞ-হোমাগ্নির পূর্ণাহুতি। আত্মত্যাগপরায়ণ চরিত্রের সমস্ত মাধুর্য, অমলিন সৌহার্দের অনবদ্য সৌন্দর্য, দেশাত্মবোধের মর্মস্পর্শী গভীরতা ও দুঃখ প্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের অতলস্পর্শী আহ্বান ফুটে উঠল মৃত্যুজয়ী বীরের মুখে। এই দুই বীরের বিচ্ছেদ বেদনায় বন্দীশালার সমস্ত বন্দীর মর্মভেদ করে পূর্ণশক্তির দ্বিধাহীন অকুণ্ঠিত বাণী পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে ধ্বনিত হয়ে উঠল 'বন্দে মাতরম্।' মৃত্যুহীন বিশ্বপথিক বাংলার গৌরব সূর্য গেল অস্তাচলে।

ইংরেজের তখনও বিশ্বাস যে জীবিত সূর্য সেন অপেক্ষা মৃত

সূর্য সেন ঢের বেশী শক্তিশালী। বীর্যের তপস্যায় তিনি সিদ্ধ, দেশ প্রেমের সাধনায় তাঁর জীবন সার্থক। তাঁর চিতাভস্মে লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর জন্ম হবে তাই তাঁদের দু'জনকে দাহ না করে দূর সমুদ্রের জলে ভারি পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। পৃথিবীর ক্ষুদ্র মাটির পরিধিতে তাঁদের জায়গার সঙ্কুলান হ'ল না তাই অনন্ত জলরাশির কোলে তাঁরা মিলিয়ে গেলেন।

তাঁদের উদ্দেশ্যে আমরাও বিশ্ব কবির ভাষায় বলি—

"তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্যুর শৃঙ্খলে
সাধ্য আছে কার?
সত্যের বন্ধন পরো, সে বন্ধন প্রেম মন্ত্র বলে
করো অলঙ্কার।
জীবন-বীণার তার অশিথিল শক্তি দিয়ে বাঁধো
দিনে রাত্রে সুখে দুঃখে আলোয় আঁধারে তুমি সাধো
মৃত্যুহীন প্রাণের ঝঙ্কার॥"

আঠারো

মাষ্টারদার ফাঁসির সংবাদে চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে উঠল হাহাকার, কিন্তু বাংলা দেশের ছেলে মেয়েদের অন্তরে দিয়ে গেল দেশাত্মবোধের পরম ঐশ্বর্য। বয়ে গেল চিত্ত প্রান্তরের মাঝখানে অমৃত মন্দাকিনীর ধারা। আবার তাঁরা নতুন উদ্যমে লাগলেন কাজে। মনে জেগেছে তখন জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণে দুঃখের মূল্য দিয়ে অর্জন করার সাধনা। রক্তস্রোতের উপর ধূলিলিপ্ত দৈন্যদারিদ্র্য-জয়ী জীবনের শ্বেত শতদল তখন ভেসে উঠেছে কর্মপ্রেরণার অফুরন্ত শক্তি নিয়ে।

১৯৩৪ সনের ১৯শে মার্চ বরানগর আলমবাজারে ধরা পড়লেন

সর্বশ্রী বিমলকৃষ্ণ বিশ্বাস ও গোপীমোহন দাঁ। তাঁদের দলের সদস্যা শ্রীমতী বিমলাবালা দেবীর বাড়ী তল্লাসী করে পাওয়া গেল তু'টি রিভলভার—একটি পিস্তল। ধরা পড়লেন সর্বশ্রীকালিদাস ঘোষ, লক্ষণচন্দ্র অধিকারী ও পঞ্চানন সামন্ত। সকলেরই শাস্তি হয়ে গেল কেবল রাজসাক্ষী পঙ্কজকুমার মিত্র মুক্তি পেলেন। বৃহত্তর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ল অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র ধরা পড়ে গেল। (১) ১৯৩৪ সনের ৯ই এপ্রিল জেলে মারা গেলেন মৈমনসিং জেলার জামালপুরের শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

১০ই এপ্রিল শ্রীমতিলাল মল্লিক ও তাঁর তুই সহকর্মী যখন রাত্রে দেওভোগ গ্রামের ভেতর দিয়ে চলেছেন তখন তিনজন হিন্দু যুবককে দেখে কয়েকজন মুসলমানের সন্দেহ হয়। তাঁরা এঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করে সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাঁদের ধরবার চেষ্টা করলে এঁদের একজন গুলি চালান আর একজন ছোরার আঘাতে একজনকে ধরাশায়ী করেন। ধরা পড়লেন শ্রীমতিলাল মল্লিক ও আর একজন। তু'জনের বিরুদ্ধে চলল মামলা। ১০ই ডিসেম্বর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে শ্রীমল্লিকের ফাঁসি হয়ে গেল। ২৯শে এপ্রিল হিজলী বন্দীশিবিরে মারা গেলেন শ্রীনন্দতুলাল ঘোষ। তাঁর বাবা ডাক্তার নিয়ে ছুটে এলেন শেষ চেষ্টা করবার জন্যে কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেওয়া হ'ল না।

৭ই মে হাওড়া শিবপুর থানায় পাঁচটা বোমা পড়ল। ধরা পড়লেন সর্বশ্রীঅবনী মুখার্জী আর তাঁর তুই সহকর্মী ভোলানাথ আর মোহনলাল। অবনীর ট্রাঙ্ক থেকে পাওয়া গেল বোমা ও বোমা তৈরীর প্রচুর উপকরণ। জেল হয়ে গেল অবনীর ছ'বছর আর তাঁর সঙ্গীদের পাঁচ বছর করে। (২)

তার পরদিন ৮ই মে বেলা সাড়ে তিনটার সময় দার্জিলিং

---

(১) 39 Calcutta Weekly Notes 761.

(২) 40 Calcutta Weekly Notes 32.

লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে বাংলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন ঘোড় দৌড়ের খেলা দেখিছিলেন। খেলা সবে শেষ হয়েছে—প্রায় দশ ফুট দূর থেকে তাঁর দিকে পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করলেন শ্রীভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য। ঠিক পর মুহূর্তেই প্রায় ৬ ফুট দূর থেকে গুলি করলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ওরফে সমরজিৎ। কি ভাগ্যবান লোক—অত কাছ থেকেও দু'জনে গুলি করেও তাঁকে মারতে পারলেন না। কাজেই দাঁড়িয়েছিলেন মিস থর্ণ টন, তিনি অল্প আহত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন মিঃ টানডী গ্রীন ও বারোয়ারীর রাজা ঝাঁপিয়ে পড়লেন রিভলভার কেড়ে নেবার জন্যে—তখন পুলিশের গুলি লেগে এঁরা পড়ে গেছেন। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে এঁরা কিছু মামুলী স্বীকারোক্তি করলেন। (১) একে একে ধরা পড়লেন সর্বশ্রীমনোরঞ্জন ব্যানার্জী ওরফে নরেশ চৌধুরী, মধুসূদন ব্যানার্জী, অমিয় ব্যানার্জী ওরফে সুশীল সেন, সুকুমার ঘোষ ওরফে লেন্টু ও সুশীল চক্রবর্তী ওরফে অজিত কুমার ধর। ১৮ই মে শ্রীমতী উজ্জলা মজুমদার কলকাতায় ধরা পড়লেন শ্রীমতী শোভারাণী দত্তের সঙ্গে। শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার তাঁর মামুলি স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলেন ও মনোরঞ্জন তাঁর স্বীকারোক্তির অধিকাংশ পরিবর্তন ও অস্বীকার করলেন। শ্রীমতী উজ্জ্বলা দেবী ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতা ছিলেন—কখনো শ্রীমতী অমিয়া মজুমদার কখনও মলয়া, মলিনা বা লীলা। শ্রীসুকুমার ঘোষ ও অন্য দু'একজন কোন স্বীকারোক্তি করলেন না। স্পেশাল ট্রাইবুনালে সর্বশ্রীভবানী, রবীন্দ্র ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি, শ্রীমতী উজ্জ্বলার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, মধুসূদন ও সুকুমারের চোদ্দবছর, সুশীলের বারো বছরের জেল হয়ে গেল। পুলিশের উর্ধতন কর্তারা করলেন জঘন্যতম আচরণ। ভগিনী উজ্জ্বলার বিরুদ্ধে কতকগুলো মিথ্যে অভিযোগ চাপিয়ে দিয়ে বিব্রত করবার চেষ্টা

(১) 39 Calcutta Weekly Notes 334.

ব্যর্থ হ'ল। চেষ্টা চলল তাঁকে লোক সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করবার।(১) কিন্তু মাতৃযজ্ঞে নিবেদিতা প্রাণ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা ভগিনী উজ্জ্বলা তখন নিন্দাস্তুতির বাইরে। তাঁর ত্যাগ ও কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মবিসর্জনপর মধুর নম্রতা ও সুনির্মল চরিত্রের উপর দেশের লোক পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাল। বুঝতে কারো বাকি রইল না পুলিশের অপকীর্তি—অপবাদে সত্যকে খর্ব করবার সব রকম হীন ও জঘন্য চেষ্টা বিফল হ'ল। হাইকোর্ট আপীলে শ্রীভবানী প্রসাদ ও শ্রীরবীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম বহাল রইল—শ্রীমনোরঞ্জনের ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, শ্রীমতী উজ্জ্বলার চোদ্দ বছর, শ্রীমধুসূদনের চোদ্দবছর ও শ্রীসুকুমারের চোদ্দ বছরের জেল হয়ে গেল।(২) ১৯৫৩ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী ভবানীর ফাঁসি হয়ে গেল রাজসাহী জেলে। গভর্ণর বেঁচে গেলেন অদ্ভুত রকমে। ট্রাইবুনালের সভাপতির প্রশ্নের উত্তরে ভবানী বলেছিলেন 'হ্যাঁ আমি দুঃখিত—কিন্তু যা করেছি তার জন্যে নয়, আমার দুঃখ এই যে গভর্ণর এখনও বেঁচে আছেন।'

১৯৩৪ সনের ৯ই জুন আলিপুর সেনট্রাল জেলে শ্রীদীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়ে গেল। একটি বলিষ্ঠ কর্মঠ বীরের হ'ল জীবনাবসান মাতৃপূজার বেদীতে। আর তাঁর সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন শ্রীনলিনী দাসগুপ্ত ও শ্রীজগদানন্দ; দু'জনেরই হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। শ্রীনলিনী দাসগুপ্ত হিজলী বন্দীশিবির থেকে ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বরে পালিয়ে এসে দীনেশ ও জগদানন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

বীরভূমের বিপ্লবীরা এই সময় বর্ধমান জেলার বনওয়ারিবাদ রাজার ভাগ্নের বাড়ীতে অর্থসংগ্রহের অভিযান করলেন। সন্ধ্যে সাতটার সময় মাত্র চারজন—সর্বশ্রীরজত ভূষণ দত্ত, সত্যেন্দ্র গুপ্ত,

(১) 39 Calcutta Weekly Notes 334.
(২) Ibid 350.

নিত্যগোপাল ভৌমিক ও প্রভাতকুসুম ঘোষ যখন বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে তখন সেখানে ঢুকে বাড়ীর বন্দুকগুলি হাত করে ফেললেন। গোলমালে যখন গ্রামের লোক প্রায় বাড়ী ঘিরে ফেলেছে তখন তাঁরা সাহসে ভর করে তাদের দিকে বন্দুকের শব্দ করতে করতে ও পটকা ফুটিয়ে বেরিয়ে এলেন। নদী সাঁতরে পার হয়ে ভিজে জামা কাপড়ে ১৮ মাইল পথ হেঁটে নির্বিঘ্নে পৌঁছুলেন গন্তব্যস্থানে। এ ছাড়া ট্রেনে ডাক লুট, রাণীগঞ্জে মোটর ডাকাতি প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজের জন্যে পুলিশের দৃষ্টি পড়ল এঁদের উপর। একে একে ধরা পড়লেন বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ থেকে ৪২ জন—আরম্ভ হ'ল বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৩৪ সনের ১৪ই জুলাই তিনজন বিচারপতি মিঃ কে. সি. চন্দ্র, মিঃ বি. কে. গুহ ও মিঃ এস. বি. ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত ট্রাইবুনালে ২১ জনকে নিয়ে বিচার আরম্ভ হ'ল। বাকি ২১ জনকে বিনা বিচারে বিভিন্ন বন্দীশালায় ও গ্রামে অন্তরীণ রাখা হ'ল। সরকার পক্ষের সাক্ষী ৩০২ জন। ২৪শে সেপ্টেম্বর রায়ে ১৭ জনের দণ্ড হয়ে গেল। তিনজন পেলেন প্রমাণাভাবে মুক্তি ও রাজসাক্ষী হিসেবে শ্রীনিত্যগোপাল ভৌমিক মুক্তি পেলেন। সর্বশ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়, রজতভূষণ দত্ত, প্রভাতকুসুম ঘোষ, সমাধীশ রায়, ধরণীধর রায়, হারান ঘাঙার, উমাশঙ্কর কোঙার, বিজয় ঘোষ, প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী, হরিপদ ব্যানার্জী, কালিপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে পাঠান হ'ল আন্দামান সেলুলার জেলে। আর সর্বশ্রীসত্যেন্দ্র গুপ্ত, বিনয় কুমার চৌধুরী, জয়গোপাল রায়, সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, বনবিহারী রায় ও সত্যগোপাল চন্দ্রকে রাখা হ'ল বাংলার বিভিন্ন জেলে।

কৃষ্ণনগর থেকে রিভলভার নিয়ে ধরা পড়েছিলেন শ্রীঅমৃতেন্দু মুখার্জী, তাঁকেও দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হ'ল। বাঁকুড়ায় সশস্ত্র ধরা পড়লেন সর্বশ্রীবিমল সরকার ও ভবতোষ কর্মকার

হুগলীতে শ্রীহরিপদ চৌধুরী, কুমিল্লায় শ্রীধীরেন চক্রবর্তী, কুড়িগ্রামে শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ ও কলকাতায় শ্রীরাধাবল্লভ গোপ। কলকাতায় ডিনামাইট পাওয়া গেল শ্রীযোগেন্দ্র ব্যানার্জীর কাছে। সকলেরই দণ্ড হয়ে গেল দীর্ঘদিনের। এ সময় বিভিন্ন জেলে ও আন্দামানে দণ্ডিত বিপ্লবী ও বিনা বিচারে আটক বিপ্লবীদের সংখ্যা কয়েক হাজার। চরপাড়া অর্থসংগ্রহ মামলায় দণ্ড হয় সর্বশ্রীসত্যরঞ্জন ঘোষ ও নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজনের। অনুরূপ মামলায় সিঙ্গায় দণ্ডিত হন সর্বশ্রীফণী দাসগুপ্ত, ননী দাশগুপ্ত, ভবতোষ পতিতুণ্ডি ও আরও কয়েকজন। চট্টগ্রাম বাথুয়ায় দণ্ড পান সর্বশ্রীমোক্ষদা চক্রবর্তী, প্রিয়দা ব্যানার্জী; আর অন্য মামলায় চরমুগুরিয়ায় শ্রীসুরেন কর, দিনাজপুরে শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মাদারীপুরে শ্রীঅনুকুল চ্যাটার্জী, কুড়িগ্রামে সর্বশ্রীকুমুদ মুখার্জী, রাজমোহন করঞ্জাই, নরেন দাস; আর আঙ্গারিয়ায় শ্রীমদন রায়চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীরা। বিশ্বাসঘাতকদের খুনের মামলায় সর্বশ্রীঅমূল্য রায়, পরেশ সেন ও ফরিদপুরে অমূল্য চৌধুরী ও আশু ভরদ্বাজ তখনও দীর্ঘদিনের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। উত্তরবঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত সর্বশ্রীহেমচন্দ্র বক্সি, জ্ঞান গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন ও চট্টগ্রাম অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলায় সর্বশ্রীবিনোদ দত্ত, হিমাংশু ভৌমিক ও কলকাতার বড়বাজারে অর্থসংগ্রহ ও হত্যার মামলায় শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাসের তখনও বিভিন্ন জেলে দণ্ডভোগ চলছে।

১৯৩৪ সনের ৩১শে জুলাই আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত বন্দী সর্বশ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, সীতানাথ দে ও নিরঞ্জন ঘোষাল আলিপুর সেনট্রাল জেল থেকে দুঃসাহসের সঙ্গে পালালেন। সেদিন খুব ঝড়জল ও আকাশ মেঘে কালো হয়ে ঢেকে গেছে— সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তাঁরা করলেন —। তার আগে কয়েকদিন ধরে তারা এ বিষয়ে অভ্যেস করছিলেন। এঁদের

পালাবার পর পুলিশ উঠল ব্যস্ত হয়ে। তারপর ৮ই আগষ্ট ধরা পড়লেন বরিশালে শ্রীঅনন্ত কুমার চক্রবর্তী পলাতক অবস্থায়। ধরা পড়ে নাম দিলেন শ্রীরবীন্দ্র চক্রবর্তী। প্রমাণ হ'ল যে তিনি কোন দল বিশেষের নেতা। জেল হয়ে গেল পাঁচ বছরের ও জরিমানা পঞ্চাশ টাকা। (১)

ঠিক এই সময় শ্রীহট্টে রাজনৈতিক অর্থসংগ্রহের মামলায় ধরা পড়লেন সর্বশ্রীঅজিত কুমার চক্রবর্তী, বিনয়ভূষণ লস্কর, মতিলাল রায়, দিগীন্দ্র দাসগুপ্ত, বিনয় দেবরায়। সকলেরই সাজা হয়ে গেল। সর্বশ্রীঅজিত কুমার ও বিনয় ভূষণের সাত বছর, মতিলালের পাঁচ বছর ও অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের হয়ে গেল জেল। মেদিনীপুরে ধরা পড়লেন সর্বশ্রীহরিহর সিংহ, সরোজ ভূষণ রায়, কানাইলাল কুণ্ডু, নলিনী রঞ্জন সিংহ ও গৌরাঙ্গ পাল, দণ্ড হয়ে গেল দীর্ঘদিনের। তখন ধরপাকড় প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার। ১৯৩৪ সনের ১৩ই নভেম্বর আজমীঢ়ে রিভলভার সমেত ধরা পড়লেন শ্রীশম্ভুনারায়ণ। কিন্তু ১৯৩৫ সনের ৫ই জানুয়ারী দেখা গেল তাঁর দেহ গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলান। আত্মহত্যা বা হত্যা কিনা তা' আজও অজ্ঞাত রইল।

১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে গাইবান্ধায় ধরা পড়লেন সাতজন রিভলভার ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে—সর্বশ্রীনগেন্দ্র নাথ মুন্সী, পরেশচন্দ্র চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র দাস, নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস সত্যেন্দ্রনাথ চাকী, বিজয়কুমার নন্দী, বিনয়কুমার তরফদার। তখন ধরা পড়া মানেই দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড। রিভলভার কাছে পেলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্যন্ত হতে পারবে বলে আইন প্রণয়ন হয়ে গেছে।

১৯৩৫ সনের ২৯শে জানুয়ারী টিটাগড় থানার গোয়ালপাড়া থেকে কয়েকজন ধরা পড়লেন রিভলভার ও নানা রকম বিস্ফোরক

(১) 40 Calcutta Weekly Notes 255.

পদার্থ নিয়ে। একে একে ধরা পড়লেন ত্রিশজন। পুলিশ শ্রীসীতানাথ দের সন্ধানে রইলেন। আরম্ভ হ'ল টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। বিচারপতি তিনজন মিঃ এইচ. জি. এস. বীভার, মিঃ কে. সি. দাশগুপ্ত ও রায় এন. সি. বোস বাহাদুর। বিচার আরম্ভ হ'ল ১৬ই নভেম্বর, তখনও শ্রীসীতানাথ দে ধরা পড়েন নি। তিনি ধরা পড়লেন ১৯৩৬ সনের ৩রা মে। একসঙ্গে বিচার চলল। শ্রীসন্তোষ সেন ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল চৌধুরী রাজসাক্ষী হয়ে মুক্তি পেলেন। ৫০২ জন সাক্ষী ফরিয়াদী তরফে সাক্ষী দিলেন। ১৯৩৭ সনের ২৭শে এপ্রিল ট্রাইবুনাল রায় দিলেন। ১৭ জনের দণ্ড হয়ে গেল শ্রীসুধাংশুবিমল দত্ত নাবালক বলে তাকে বোরষ্টাল জেলে তিন বছরের জন্যে পাঠানো হ'ল। জেলে অত্যাচারের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে অনশনে প্রাণ দিলেন শ্রীহীরেন মুন্সী। বাকি পনরজন সর্বশ্রীপূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত ওরফে বুড়োদা, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী ওরফে সুরেশ ওরফে প্রণব কুমার রায় ওরফে রমেশ মজুমদার ওরফে সতীশ বসু ওরফে প্রণব, শ্রীমতী পারুল মুখার্জী ওরফে নীহার, ওরফে শান্তি, ওরফে আরতি, ওরফে শোভারাণী বসু ওরফে রাণী, ওরফে খুকী, ওরফে সুরমা দেবী, সীতানাথ দে, দেবপ্রসাদ ব্যানার্জী, জগদীশ চক্রবর্ত্তী, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য, অজিত মজুমদার, প্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ, প্রফুল্ল সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল ধীরেন মুখার্জী, জীবন ধুপী, যোগেশ মজুমদার ও ধনেশ ভট্টাচার্য আপীল করেন। সর্বশ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, নিরঞ্জন ঘোষাল ও সীতানাথ দে তাঁদের আগের দণ্ড ভোগ শেষ হবার আগেই জেল থেকে পালিয়েছিলেন। শ্রীপূর্ণানন্দ ও শ্রীশ্যামবিনোদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ বলবৎ রইল অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের যে দণ্ড ট্রাইবুন্যাল দিয়েছিলেন তা' বহাল রইল। (১) এ সময় শ্রীমতী সরোজআভা দাস চৌধুরীকে বিনা বিচারে আটক রাখা হ'ল।

(১) 68 Calcutta Law Journal 206.

চট্টগ্রামের শ্রীরোহিনীকান্ত বড়ুয়া কিছুদিন হিজলী বন্দীশিবিরে থাকবার পর যান বহরমপুর ক্যাম্পে সেখান থেকে তাঁকে গোয়ালন্দ থানায় অন্তরীণ করা হয়। সে ছিল আমার ছাত্র। কিন্তু থানার দারোগা সৈয়দ আরশেদ আলি তাঁর সঙ্গে প্রথম থেকেই এমন দুর্ব্যবহার আরম্ভ করলেন যে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ১৯৩৫ সনের ১৫ই জুন রাত্রি আটটার সময় তিনি একটা কাটারী দিয়ে দারোগার দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন—শক্তিমানের নিষ্ঠুর বিদ্রোহ। ১৬ই জুলাই স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচার আরম্ভ হয়ে ১৮ই জুলাই তাঁর মৃত্যুদণ্ড হ'ল। ২৫শে নভেম্বর হাইকোর্ট তাঁর আপীল নামঞ্জুর করলেন। ১৮ই ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রোহিনী প্রাণ দিলেন। সেই কিশোরের মুখখানা আজও মনে পড়ে।

দ্বারভাঙ্গার মধুবনী থানার গৌহর গ্রামে শ্রীআশরফি নামে একটি কিশোর বোমা তৈরী করার সময় বোমা ফেটে ১৯৩৫ সনের ৬ই জুলাই মারা যান। তাঁর ঘর থেকে দু'টো বই পাওয়া গেল 'পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড' ও 'অংরেজকো খুন করনা'। ১৯৩৫ সনের শেষের দিকে মুন্সীগঞ্জের শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত লালগোলায় অন্তরীণ থাকার সময় রোগে মারা গেলেন। তাঁর যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল না। (১)

১৯৩৫ সনের ১০ই অক্টোবর শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর গুহ আর তাঁর সহকর্মীরা ধরা পড়লেন অস্ত্র নিয়ে। শ্রীরমেশ দত্ত ও শ্রীবীরুভূষণের হ'ল সাত বছর জেল আর অন্য সকলের পাঁচ বছর। হুগলীতে ধরা পড়লেন শ্রীনিতাই জানা, শ্রীশশধর চ্যাটার্জী প্রমুখ ন'জন। নিম্ন কোর্টে ২৬শে জুলাই তাঁদের পাঁচ বছরের সাজার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে তাঁরা করলেন আপীল। ব্যবস্থা হ'ল পুনর্বিচারের। (২)

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose 548—49

(২) 40 Calcutta Weekly Notes 959.

তখন পুলিশের যাঁদের উপর সুনজর পড়েছে তাঁদের আর নিস্তার নেই, নতুন আইনের কল্যাণে। বন্ধু শ্রীহৃষিকেশ দত্ত এসময় মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু কয়েকদিন পরেই রিভলভার নিয়ে ধরা পড়ে পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল—পাঠানো হ'ল আন্দামানে। এই সময় আন্দামানে মারা গেলেন শ্রীমোহিত অধিকারী।

গান্ধীজি এসময় আর একবার বিপ্লবী নেতাদেব সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলেন। আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের চেষ্টা করলেন অহিংসনীতিতে আস্থাবান করতে। অনিচ্ছার সঙ্গে দু'বছর পরে সরকার তার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভিন্ন ভিন্ন জেল থেকে নেতাদের যাঁরা ১৮১৮ সনের ৩ আইনে আটক ছিলেন তাঁদের সকলকে ১৯৩৭ সনে একজায়গায় আনা হ'ল হিজলী বন্দী শিবিরে। অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সর্বশ্রীরমেশ আচার্য, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, রসিকলাল দাস, ভূপতি মজুমদার, সত্যরঞ্জন গুপ্ত, প্রতুল ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, জীবনলাল চ্যাটার্জী, অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ও ভূপেন দত্তর সঙ্গে গান্ধীজি অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক করলেন কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। আলোচনা মুলতুবী রইল। কয়েকদিন পরে গান্ধীজি জানালেন যে তাঁর হিজলী এসে আলোচনায় অসুবিধে আছে কাজেই এঁদের নিয়ে যাওয়া হ'ল প্রেসিডেন্সী জেলে। গান্ধীজি শেষ চেষ্টা করলেন কিন্তু সুবিধে হ'ল না। এর আগেও তিনি দু'বার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কিছু করতে পারেন নি।

মেদিনীপুরের শ্রীনির্মলজীবন ঘোষের ভাই শ্রীনবজীবনকে মেদিনীপুর থেকে বের করে দেওয়া হয়—১৯৩২ সনের নভেম্বরে। কলকাতায় ১৯৩৪ সনে ফেব্রুয়ারীতে আবার তাঁকে বহরমপুর ক্যাম্পে পাঠান হয়। সেখান থেকে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানার গ্রামে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৩৬ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর

দেখা গেল তিনি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। এটা আত্মহত্যা না হত্যা তাই নিয়ে অনুসন্ধানের জন্যে আত্মীয়েরা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন কিন্তু সরকার তাতে কর্ণপাত করলেন না (১) ১৯৩৬ সনের ১৭ই অক্টোবর দেউলী বন্দী নিবাসে শ্রীসন্তোষ চন্দ্র গাঙ্গুলী নামে একজন বিপ্লবী আত্মহত্যা করলেন—জেল জীবন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল। শ্রীসাতকড়ি ব্যানার্জী ছিলেন বিপ্লবীদের মধ্যে একজন সত্যিকারের কর্মযোগী। ২৪ পরগণার মহীনগরে তাঁর জন্ম। সারাজীবন দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করে এসেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য দেউলী বন্দীনিবাসে তিনি রোগে ভুগে মারা গেলেন ১৯৩৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। বাংলামায়ের একটি বলিষ্ঠ কৃতীসন্তান চলে গেলেন। ১৯৩৭ সনে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে শ্রীফণী নন্দী, মেদিনীপুরে শ্রীধনেশ ভট্টাচার্য ও রাজসাহী জেলে শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মারা গেলেন। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুন্সী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অনশনে প্রাণ দিলেন ১৯৩৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী।

এ সময় ভারত সরকার ইস্তাহার প্রকাশ করলেন যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা' নিয়ে ভারত সরকার বাংলা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অনেক রকম বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও সরকারী কর্মচারীদের নিধন বন্ধ হয় নি অস্ত্রশস্ত্র চুরি এখনও চলছে। সে জন্যে বাংলায় আরও অনেক সৈন্য সংখ্যা বাড়ান দরকার। তাই দু'দল ভারতীয় পদাতিক, একদল ইংরেজ পদাতিক বাংলাদেশে পাঠান হ'ল। (২)

এত ফাঁসি, এত জেল, এত দ্বীপান্তর, এত অন্তরীণ করেও দেশ থেকে ইংরেজ বিপ্লববাদ দূর করতে পারলেন না। হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনায় বহুদিনের তপস্যায় যার জন্ম তাকে দূর করা শক্ত।

(১) Murder of British Magistrates—B. J. Ghose 69

(২) আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯শে আগষ্ট ১৯৩২।

আধ্যাত্মিকতাই সকল শক্তির মূল, আত্মার সত্য দৃষ্টি—পরিপূর্ণতা তার স্বভাব। স্বাধীন শুভ বুদ্ধির জন্ম এরই মধ্যে—সেই বুদ্ধিই মানুষকে শিখিয়েছে ত্যাগের মন্ত্র—'রণধারা বাহি জয়গান গাহি'—মরণের দিকে এগিয়ে যেতে। সত্যের জন্যে—ন্যায়ের জন্যে অকুণ্ঠিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে তার শক্তির অন্ত নেই। সেই অগোচর গভীর উদার মনোবৃত্তির মাঝেই ত্যাগের যথার্থ ঐশ্বর্য, মাঙ্গল্যের অতুচ্চ সোপান, আনন্দের বিজয় তোরণ। সেই অনন্য দুর্লভ ত্যাগের আনন্দই ছিল আমাদের কর্মপথের পাথেয়—

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার
কারাগার করে অভ্যর্থনা।..."

উনিশ

বন্দীজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে মন্দ লাগে না। বহরমপুরে ছিলুম প্রায় ছ'বছর—লেখাপড়া, খেলাধুলা, আলাপ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক, অভিনয়, গান বাজনা সব রকম সুবিধে নিজেরাই করে নিয়েছিলুম। কোন কিছু নতুন সুবিধে আদায় করতে হ'লে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ না করে আদায় হ'ত না—এমন কি রোগের চিকিৎসা পর্যন্ত।

ডাঃ সুকুমার বসু ছিলেন আমাদের বন্দী শিবিরের ডাক্তার। তাঁর ব্যবহারে আমরা সবাই তাঁর উপর বিরক্ত ছিলুম। কেউ কেউ আবিষ্কার করলেন যে তিনি ইলিসিয়াম রোতে ধৃত বন্দীদের পরীক্ষা করে বলতেন এ লোক আরও মার খেতে পারবে কিনা? পুলিশের

কর্তারা তাঁর কথামত ব্যবস্থা করতেন। তাঁকে কোন অসুখের কথা বললেই তিনি সবটাই তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন 'ও কিছু নয়'। কেউ কেউ তাঁকে নিয়ে নানারকম রগড় করতেন। একজন বললেন 'ডাক্তারবাবু আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি?' ভদ্রলোক পরিহাস না বুঝে বললেন 'কোথায়?' তখন উত্তর হ'লো 'মনে পড়েছে পাশিংশোর সিগারেটের টিনে।' ভদ্রলোক ঐ রকম টুপি ব্যবহার করতেন। তাঁকে নিয়ে একটা গোলমাল লেগেই থাকত। তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি মস্তবড় ডাক্তার ও বিরাট পণ্ডিত--আর অহংকারের অন্ধ অনুবর্তনায় আমাদের মনে করতেন যে অকাল জরাগ্রস্ত এই অবরুদ্ধ যুবকেরা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়।

অথচ আমাদের যিনি প্রধান ডাক্তার ছিলেন আমরা সকলেই তাঁকে ভালবাসতুম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতুম। তিনি ছিলেন সত্যিকারের দরদী লোক—ব্যবহার ছিল অমায়িক—আমাদের খুবই সহানুভূতির চোখে দেখতেন। তিনি যখন মৈমনসিং হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার তখন আমাদের কয়েকজন বন্ধু পুলিশের গুপ্তচরকে মার দিয়ে জলে ফেলে দেন। সে পুকুরের জলে পড়ে মারা যায়। তার মৃতদেহ পরীক্ষার সময় বন্ধু শ্রীবিনয় বক্সী ডাক্তারের শরণাপন্ন হ'ন যাতে তাঁর রিপোর্টে সন্দেহে ধৃত বন্ধুরা বেঁচে যান। তিনি সত্যিকারের ঘটনা শুনলেন এবং তাঁর চেষ্টায় ও রিপোর্টের বলে সকলেই বেঁচে যান। তিনি লিখলেন মৃতব্যক্তির পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে মদ পাওয়া গেছে—মনে হয় নেশার ঘোরে পুকুরে পড়ে যাবার সময় সিঁড়ির কোণে লেগে পাঁজর ভেঙ্গে গেছে।

—

আর একবার বিনয়বাবুরা গেছেন অর্থসংগ্রহে—। পুলিশ কোন রকমে খবর জানতে পেরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে যখন দু'পক্ষের গুলি বিনিময় হচ্ছে—তখন একটা গুলি গিয়ে লাগে বিনয়বাবুর পেটে। সঙ্গে সঙ্গে বিনয়বাবু মুঠো করে

গুলিটা পেটের চামড়াশুদ্ধ টিপে ধরলেন, যাতে দৌড়ুতে গিয়ে গুলিটা পেটের ভেতর বেশী না ঢুকতে পারে। সেই রক্তাক্ত অবস্থায় যখন এঁরা পালিয়ে আসছেন তখন সহকর্মীদের মধ্যে একজন বললেন 'বিনয়ের পেটে গুলি লেগেছে ও বেশীদূরে যেতে পারবে না, পথেই মরবে—ওর মাথাটা কেটে নিয়ে চল—সনাক্ত হবে না।' বিনয়বাবু ছিলেন শেরপুরের মধ্যে সেরা পালোয়ান আর কুস্তিগীর। তিনি বললেন 'ভয় নেই গুলিটা ধরে ফেলেছি।' এক মুহূর্ত আগে যে ছিল সহকর্মী, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, সে কিনা নির্বিবাদে হৃদয়হীনের মতো বলে দিল 'পথেই মরবে—ওর মাথাটা কেটে নিয়ে চল।' সামঞ্জস্যহীন নিষ্ঠুর কর্তব্য—কিন্তু আমাদের বিপ্লবী জীবনের স্বরূপই এই, কর্তব্যের কাছে আর কিছু নয়। দীপশিখার মতো আত্ম-দানেই মানুষের আত্ম উপলব্ধি। সেই অবস্থাতেই বিনয়বাবু শরণাপন্ন হলেন আবার ঐ ডাক্তার সাহেবের কাছে, তিনি বললেন 'এখন গুলি বের করতে গেলে বিপদ আছে।' সেই থেকে গুলিটা আজও রয়ে গেছে তাঁর পেটে।

আমি তখন খুবই অসুস্থ তার উপর পেটের যন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পাচ্ছি। ডাঃ সুকুমার বসুকে বললে তিনি গ্রাহ্য করেন না। একদিন বললুম 'আমার দাদা ডাক্তার, জানতে চেয়েছেন অসুখটা কি?' তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন 'নিউরসিস অফ দি ষ্টমাক।' বললুম 'ডাক্তারবাবু নিউরসিস বুঝি, কিন্তু ষ্টমাকের নিউরসিস কি রকম?' তিনি বললেন 'আপনি বুঝবেন না।' শেষ পর্যন্ত যখন অসুখ বেড়ে গেল তখন ডাক্তারবাবুকে বললুম 'আমাকে সিভিল সার্জেনকে দেখান।' তিনি সে কথায় কান দিলেন না। শেষে লিখলুম কমাণ্ডেণ্টকে ডাঃ বসুর অবহেলার কথা। লেখা পড়ে সাহেব আগুন হয়ে গেলেন। হবারই কথা—চিঠির ভাষাটা মোটেই ভদ্রলোকের মত হয় নি—ডেকে পাঠালেন আমাকে। যখনই কমাণ্ডেণ্ট এ রকম কাউকে ডেকে পাঠাতেন তখনই বসবার

চেয়ারটা সরিয়ে রাখতেন যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বসতে না পান। এই নিয়ে অনেকে অনুযোগ করেছেন কিন্তু কিছু ফল হয় নি। আমি একদিন বলেছিলুম 'আপনারা চেয়ার আদায় করতে জানেন না।' কয়েকজন উপহাস করে বলেছিলেন 'ভায়ার বেলা দেখা যাবে।'

সাহেবের ডাকে অফিসে গিয়ে দেখি চেয়ার সরান। আমি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সাহেবের টেবিলে চড়ে বসলুম। বললুম 'আমি অসুস্থ আমাকে বসতেই হবে।' সাহেব রাগে অপমানে ফেটে পড়লেন, বললেন 'কেস টেবিলে এলে চেয়ার পাওয়া যায় না—দোষীকে চেয়ার দেবার নিয়ম নেই।' বললুম 'মন্দ নয় বিচারের আগেই দোষী ঠিক হয়ে গেল।' সাহেব গেলেন ক্ষেপে। আমি তখনও টেবিলের উপর বসে আছি। বাধ্য হয়ে সাহেব একটা চেয়ার দিতে বললেন আর বললেন 'আপনার অসুখ বলে বিশেষ কারণে চেয়ার পেলেন।' আমি বললুম 'আমি চাই প্রত্যেকেই এ রকম চেয়ার পায়।'

আমার চিঠির অসংযত ভাষার জন্যে সাহেব আমার জরিমানা করলেন তিন টাকা—বললেন 'আপনার সামনে ল পরীক্ষা তাই নির্জন সেলে পাঠালুম না।' তাঁর বলা শেষ হলে বললুম 'আপনার কথা শেষ হয়েছে, এবার আমার কথা শুনুন। আমি আজ দু'বছর পেটের যন্ত্রণায় ভুগছি অথচ ডাঃ বসু আমাকে একবারও সিভিল সার্জেনকে দেখাচ্ছেন না—আমি অনেকবার তাঁকে অনুরোধ করেছি।' ফিরে এলুম—সকলকে বললুম কেমন করে চেয়ার আদায় করেছি। ডাক্তারবাবু আমার উপর চটেই রইলেন—বোধ হয় অপমানটা ভুলতে পারলেন না। তিনি হয়ত মনে ঠিক করেছিলেন যে তাঁকে খোসামোদ না করলে তিনি আমাকে সিভিল সার্জেনকে দেখাবেন না।

একমাস শেষ হতে তখন সাহেবকে একটা চিঠি লিখলুম আরও খারাপ ভাষায়। লিখলুম 'আর একবার তিনটাকা জরিমানা দেবার

সুযোগ নিচ্ছি। একমাস আগে আমার তিনটাকা জরিমানা করেছিলেন ডাক্তার বাবুর বিরুদ্ধে অসংযত ভাষা ব্যবহারের জন্যে। জরিমানা আদায় হয়েছে কিন্তু আপনার জরিমানা আমার রোগ সারতে পারে নি। যাই হোক্ আমাকে আর সিভিল সার্জেনকে দেখাবার প্রয়োজন নেই। দেখি আপনার জরিমানা আমায় রোগমুক্ত করে কিনা?'

চিঠি পড়েই সাহেব রাগে জ্বলে উঠলেন—এ রকম অপমানকর ভাষায় যে একজন বন্দী চিঠি লিখতে পারে তা' তিনি কল্পনাই করতে পারেন নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠালেন—বুঝলুম এবার আমার চিকিৎসা হবে। তখন আমি একটা লুঙ্গি পরে স্নান করছি এমন সময় দেখি সিভিল সার্জেন ক্যাপ্টেন মন্টেগোমারি চলেছেন—হাসপাতালের দিকে। তিনি জাতিতে আইরিশ, ব্যবহারও ভাল। তিনি হাসপাতালে ঢোকবার আগেই আমি সেই অবস্থাতেই ভিজে গায়ে তাঁর সামনে হাজির হয়ে বললুম 'ক্ষমা করবেন—আমার অন্য উপায় নেই বলেই এ অবস্থায় ছুটে এসেছি। আপনি যদি দয়া করে আমায় দেখেন—অনেকদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছি।' তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন 'কাপড় বদলে চলে আসুন। গেলুম তাঁর কাছে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন 'পেটে ঘা হয়েছে খাবার সম্বন্ধে খুব সাবধান।' বললুম ডাঃ বসু বলছিলেন 'আমার নিউরসিস অফ দি ষ্টমাক হয়েছে—তাই কি দেখলেন?' শুনেই তিনি হেসে ফেললেন আর ডাঃ বসুর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল।

ভর্তি হলুম হাসপাতালে—সিভিল সার্জেন আমাকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে রাখলেন। হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ডাঃ হরিশ সেন—আমার দাদার গুরুভাই, ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীকুলদানন্দ মহারাজের শিষ্য। পরিচয় দিতেই চিনলেন—চিকিৎসার কোন ত্রুটি হ'ল না।

অনেক সময় অকারণে অনেকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে দিতেন। একবার এ রকম অকারণে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা হ'ল অথচ যখন সত্যিকারের বিবাদ করার প্রয়োজন ছিল তখন কিছুই করা হ'ল না। আমরা কয়েকজন সেই ঝগড়ায় যোগ দিতে রাজী হলুম না। পাছে গোলমাল হয় বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের আলাদ করে রাখলেন। আমরা কম্যুনিষ্ট দলের লোক সন্দেহে অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করতে লাগলেন। এমনকি শেষপর্যন রটিয়ে দিলেন আমরা পুলিশের গুপ্তচর। আমরা দল গড়তে না পারলেও দলাদলি করতে সিদ্ধহস্ত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হতে আরম্ভ করলেন—তাঁদের বুঝিয়ে বললুম এতদিনে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হতে পেরেছেন। বিপ্লবীদের মধ্যে যখন যাঁর কিছু প্রাধান্য বাড়ে তখন অন্যদল অন্ধ ঈর্ষার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় তাঁর নামে ঐ রকমের কুৎসা রটান। এ ত অনেকদিন ধরে চলে আসছে—এ দুর্ণাম অনেককেই নিতে হয়েছে। শ্রীশচীন্দ্র নাথ সান্যাল যিনি সারা জীবন জেল খেটেছেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডভোগ করেছেন তিনিও এ দুর্ণাম থেকে রেহাই পান নি। আমি জানি কোন একজন বিশিষ্ট নেতা বর্তমানে কংগ্রেসের মাতব্বর, শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসুকে দিয়ে জোর করে কোন মিটিংএ বলিয়ে দিলেন যে শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র পুলিশের গুপ্তচর সুভাষ বাবু তখন জানতেন না আসল ব্যাপারটা কি? পরে জেনে খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন। ব্যাপারটা এই—বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন একবার বিপ্লববাদীদের সঙ্গে একটা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন—। সে আলোচনায় বিপ্লবীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন ও যুক্তি তর্কে যোগ দিতে পারেন এমন লোকের খোঁজ করেছিলেন। পুলিশ থেকে নাম করা হয় শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসুর। কিন্তু তিনি তখন বাংলার বাইরে—ছিলেন মান্দালয় জেলে ১৮১৮ সনের ৩ নং রেগুলেশনে বন্দী। কাজেই দ্বিতীয় ব্যক্তির

নাম করল পুলিশ শ্রীসন্তোষকুমার মিত্রের। সন্তোষদাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল দার্জিলিং জেলে—সেখানে গভর্ণর তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন—তাঁর এই প্রাধান্যই অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়েছিল।

সেই রকম বিপ্লবী শ্রীঅবনী মুখার্জীকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে কোন বিশিষ্ট নেতা একখানা চিঠি তাঁর লেখা বলে অভিযোগ করলেন। তাঁর বক্তব্য অবনীবাবুর জার্মানী থেকে লেখা চিঠি তাঁর কাছে আছে তা' থেকে এ চিঠি যে তাঁরই হাতের লেখা এ বিষয়ে তিনি যাচাই করে দেখেছেন। অথচ দিল্লীর মহাফেজখানায় সে চিঠির ফটোষ্টাট কপি থেকে দেখা যায় সেটা হাতের লেখা নয়—টাইপ করা চিঠি এবং তাতে অবনীবাবুর সই নেই।

এ সময় একদিন কোন কাজে অফিসে গিয়ে দেখি কমাণ্ডেন্টের টেবিলে একখানা টাইপ করা কাগজ—সই হবার জন্যে পড়ে আছে। তাতে আমাদের কয়েকজনের নাম লেখা। সেটার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে এ ক'জন সিরীয়াস টাইপের লোক এরা দিনরাত রাজনীতির বই পড়ে আলোচনা করে এঁদের সম্বন্ধে জেলকর্তৃপক্ষের ধারণা মোটেই ভাল নয়। সেটা পড়ে মনে মনে হাসলুম। মনে পড়ল সেই রাতের কথা—বন্ধু শ্রীসুশীল সেন ও আমি দাঁড়িয়ে কথা বলছি কানে এল একজন সুবেদার বলছেন 'ভট্টচায্ তুম্ খাড়া রহো হাম্ ডাণ্ডাসে চাটনি বানায় গা।' যাঁদের সঙ্গে এতকাল কাটিয়ে এলুম একসঙ্গে সুখে দুঃখে হর্ষ বিষাদে তাঁরাই বললেন—'আমরা পুলিশের গুপ্তচর' আর জেল কর্তৃপক্ষ বললেন যে আমরা ভয়ানক রকমের লোক। এদের যেন ছাড়া না হয় আর সুবেদার আমাদের ডাণ্ডার চোটে চাটনি বানাতে চাইলেন—ব্যাপার মজারই বটে।

সেদিন বার বার এই কথাটাই মনে হতে লাগল যে এরই নাম রাজনীতি। ভুল বোঝার অপরাধে কত লোকই না জগতে শাস্তি বা দুর্ণাম পেয়েছেন। মানবদরদী খ্রীষ্ট, তত্ত্বজ্ঞানী সক্রেটিস্,

আব্রাহাম লিঙ্কন কেউই বাদ যান নি। এই ত দুনিয়া—ভাল কাজ করতে গেলেই মূল্য দিতে হয় কঠোর। মনে পড়ল রাষ্ট্র-গুরু সুরেন্দ্রনাথের কথা—দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তাঁকে কত দুর্ণামই নিতে হয়েছে। কিছুদিন পরে গোলমাল গেল মিটে: আমাদের যাঁরা হেয় করতে চেয়েছিলেন তাঁদের দলের নেতারা আমাদের ডাক দিয়ে সমস্ত গোলমাল মিটিয়ে দিয়ে দেখালেন বিপ্লবী জীবনের উদারতার আদর্শ। পুরাণো বন্ধুত্ব আবার ফিরে এল। এ ও বিপ্লবী জীবনের একটা দিক। অনেককেই হয়ত এ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।

মাইকেল ও'ডায়ার পাঞ্জাবের গভর্ণর থাকার সময়ে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হয়। ১৯১৯ সনের ৩০শে মে তিনি ভারতবর্ষ থেকে চলে যান। তাঁর স্বদেশবাসীরা তাঁর এ কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে কুড়ি হাজার পাউণ্ডের একটি তোড়া হাতে দিয়ে লণ্ডনে অভ্যর্থনা জানালেন। ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গার তখনও থামে নি। তিনি ভারতবাসীদের কুৎসা করে বই লিখলেন India as I know it. কিন্তু ভারতের অগণ্য নরনারীর দীর্ঘশ্বাস ও মর্মভেদী কান্নার বেদনা হয়ত দেবতার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। ১৯৪০ সনের ১৩ই মার্চ মাইকেল ও'ডায়ার ক্যাক্সটন্ হলে রয়েল সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি ও ইষ্টইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসন আয়োজিত মিটিং-এ আফগানিস্তান সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্যে এলেন। লর্ড জেটলাণ্ড সে সভায় সভাপতি। সভা শেষে যখন সকলে যাবার জন্যে উঠছেন সেই সময়ে পাঞ্জাবের তরুণ যুবক শ্রীউধম সিং এগিয়ে গিয়ে পাঁচ ছ'বার গুলি ছুড়লেন আর 'সরে যাও সরে যাও' বলে দরজার দিকে এগুলেন কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। মাইকেল ও'ডায়ারের মৃতদেহ রইল পড়ে। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীউধম সিং তাঁর নাম বললেন মহম্মদ সিং আজাদ। ২রা এপ্রিল আরম্ভ হ'ল বিচার। শ্রীউধম সিং তাঁর জবানবন্দীতে

বললেন 'আমি এ কাজ করেছি কেননা ও'ডায়ারের বিরুদ্ধে আমার বহুদিনের বিদ্বেষ ছিল। আমার দেশের লোকদের তিনি যে নির্মম-ভাবে মেরেছেন, নির্দয়ভাবে কত নারী ও শিশু যে হত্যা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই, তাই তার উপযুক্ত শাস্তি তাঁকে দিয়েছি। সে জন্যে আমার কোন অনুশোচনা নেই, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। বুড়ো বয়েস পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। আমার দেশের জন্যে আমি আনন্দে প্রাণ দিচ্ছি। লর্ড জেটল্যাণ্ড কি মরেন নি? আমি ত তাঁর পেট লক্ষ্য করে দু'টো গুলি ছুড়েছিলুম তার মরা উচিত ছিল।' শ্রীউধম সিং-এর কাছে পাওয়া গেল পঁচিশ বছর আগের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের জন্যে আমেরিকায় তৈরী ৪৫৫ বোরের ছ'ঘরা রিভলভার ও প্রায় ত্রিশ বছরের পুরানো কার্তুজ। মনে হয় ১৯১৯ সন থেকে তিনি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার আশায় অস্ত্র সংগ্রহ করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর পুরানো ডায়েরী থেকে পাওয়া গেল যে প্রতি বছর তিনি মাইকেল ও'ডায়ারের ঠিকানা লিখে রেখেছেন। ২ই জুন তাঁর Pentonville জেলে ফাঁসি হয়ে গেল। (১)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকজন প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বা পরিচয় দেওয়া খুবই কঠিন। বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গেছে তা' থেকে বলা যায়—জেলে বন্দী অবস্থায় মারা গেলেন বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত সর্বশ্রীগণেশিলাল. কেহার সিং ও রবীন্দ্রমোহন কর, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য রাজসাহী জেলে, বিহার অস্ত্র প্রাপ্তি মামলায় দণ্ডিত মোহিত অধিকারী ও ধনেশ ভট্টাচার্য মেদিনীপুর জেলে, ধীরেন্দ্র নাথ দে ও মনীন্দ্র উকীল দেউলী বন্দী নিবাসে, গোপেশ চন্দ্র রায়, বাথুয়া অর্থসংগ্রহ মামলায় দণ্ডিত মহেশ বড়ুয়া,

(১) Department of Public Relations and Tourism.

বরিশালের সুনীল চক্রবর্তী, জিতেন সমাদ্দার, নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত রামজি কালাহাটকর ও সিঙ্গাপুরে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের চেষ্টার অপরাধে দণ্ডিত পাঠক। ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছেন শ্রীপ্রীতম খাঁন আর বোমা তৈরীর সময় দুর্ঘটনায় মারা গেছেন মাদ্রাজের সর্বশ্রীভেঙ্কটারমন, ভূপেন মজুমদার, যশোদা পাল, বীরেন্দ্রনাথ দে, শচীন্দ্রনাথ রায়, হারাণ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া আর পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন সুশীল দত্ত, মনীন্দ্র বসু ও আরও কয়েকজন। (১)

কুড়ি

এ সময় বাংলার বিপ্লবীদের জীবনে মতবাদের দিক থেকে এসে গেল দ্রুত পরিবর্তন। অল্পবিস্তর সকলেই মার্ক্সীয় মতবাদের বই পড়াশুনা আরম্ভ করলেন। আরম্ভ হ'ল নিয়মিত ক্লাস, বক্তৃতা আলোচনা ও বিতর্ক সভা। চিন্তাধারার স্রোত বইতে লাগল অন্যদিকে। বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী আস্তে আস্তে লাগল বদলাতে কয়েকজন এর বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন যে ভারতবর্ষের মাটিতে কম্যুনিজম একেবারেই অচল। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—ভারতবাসীর অধিকাংশ ধর্মপরায়ণ, নিরীশ্বরবাদ এদেশে অপাংক্তেয়। কিন্তু মন যখন নতুনের দিকে টলেছে তখন তার গতিরোধ করবে কে? নবজীবনের জটিল পথে তরুণদের মনে দ্বিধাতরঙ্গের জোয়ার ভাঁটায় এ প্রশ্নই জাগল যে বিপ্লববাদের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। তাঁদের সামনে পড়ে রয়েছে রাশিয়ার সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস—মহামতি লেনিনের অমূল্য গ্রন্থরাজি—মার্ক্স এঙ্গেলসের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী। দেখছেন নতুন চিন্তার যুগ। 'নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃজনসৃষ্টিশীলতার চিরদিনই বিরোধী।'

---

(১) Roll of Honour—Kali Charan Ghose p. 363—64.

দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের (Dialectics) ভিত্তিতে তাঁর ছাত্র কার্ল মার্ক্স শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের সংকেত দেন। আপনার শ্রমলব্ধ-অধিকার-বঞ্চিত শোষণ ব্যবস্থা লোপ করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই তিনি জগৎকে দিলেন উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নতুন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের (scientific socialism) সূত্র। দিলেন Materialistic Interpretation of History, Theory of Class Struggle আর Theory of Surplus Value. তিনি দেখালেন যে একমাত্র উৎপীড়িত সর্বহারা প্রলিটারিয়েটরাই শ্রেণীহীন সমাজ, বিপ্লবের ভেতর দিয়ে আনতে পারে। এই হ'ল marxism-এর গোড়ার কথা। মহামতি লেনিন সেই চিন্তাধারাকে কেমন করে দেশ কাল ও অবস্থা অনুযায়ী রূপায়িত করে রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন তারই কর্মসূচীতে (Leninism) আমরা তখন বেশী আগ্রহশীল। আমাদের মনে তখন যুক্তিভিত্তিক দৃঢ় প্রত্যয় যে দু'টো ইংরেজ বা পুলিশ মেরে দেশের স্বাধীনতা আসবে না—আনতে হবে গণবিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার মত শ্রেণীহীন সমাজ। এই চিন্তাতেই তখন আমরা মশগুল—কাজেই সে সময় বিপ্লববাদের চিন্তাধারাব আকর্ষণ ক্রমেই কমে গেল।

এই নতুনের ডাকে সাড়া দিল বাংলার যুবশক্তি। অনেক নেতা এ জিনিসটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু তরুণেরাই চিরদিন কাজের মধ্যে এগিয়ে আসেন, নেতারা দেন বুদ্ধি ও প্রেরণা। কিন্তু এখনকার প্রেরণা হ'ল স্বতঃপ্রণোদিত। বিপ্লববাদের গতি ও নবীন চিন্তাধারা চলল অন্যপথে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে আন্দোলনকে দমন কববার জন্যে এত আইন, এত অর্ডিনান্স, এত ধরপাকড় কবেও সুবিধে করতে পারেন নি সেই আন্দোলনের আপনা হতেই হ'ল পট পরিবর্তন। আমাদের বিপ্লববাদ-যজ্ঞ উৎসবের দেবতা হলেন উপহসিত। কালের সঙ্গে সংগ্রামে

তাকে হার মানতে হ'ল। বহুদিন পরে গান্ধীবাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেছিলেন যে "গান্ধীইজিম্ ভারতবর্ষে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করে নি করেছে ভারতের টেররিজম্‌কে।" কথাটার মধ্যে প্রথম অংশটাই সত্য, শেষটা মোটেই সত্য নয়।

আমাদের সঙ্গে আটক বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ভাল ভাল সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, অভিনেতা, সাংবাদিক, সমালোচক, গায়ক ও ক্রীড়াকুশলী। অনেকেরই প্রতিভা এমন দেখেছি যা' ভোলবার নয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন নয়, মহৎ উদার প্রাণেরও অভাব ছিল না। হয়ত কোন স্বাধীন দেশে জন্মালে তাঁরা মস্ত বড় হতে পারতেন। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সুসাহিত্যিক ও সমালোচক। দৃষ্টিতে ছিল তাঁর কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা—প্রাণে অবিচলিত সংকল্প–লেনিনের অধিকাংশ বইয়েরই বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। জেলে যাবার আগে দু'খানা বই লিখেছিলেন 'শ্রীভাঁওতা' ও 'গঞ্জিকা ভস্ম', সাহিত্যের ও সমালোচনার দিক থেকে অপরূপ সৃষ্টি। শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মন ছিলেন সাংবাদিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত। শ্রীরাতুল চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীটুটু নাহা ছবি আঁকতেন অতি চমৎকার। শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী ছিলেন সুকবি—এমনি আরও অনেক। বেদনায় বিক্ষত, দুশ্চিন্তায় চিহ্নিত জীবনে নিষ্ঠুর সত্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও সীমাহীন ধৈর্য মানুষকে হয় বড় করে, না হয় তাকে পিষে মারে। দস্যু রত্নাকরের ঘৃণ্য পাপের তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে শেষ জীবনে করেছিল জ্ঞান-প্রেম-সত্যদ্রষ্টা মহর্ষি বাল্মীকি। জীবন যুদ্ধের বহুদিনের অভিজ্ঞতায় নেপোলিয়ন অতি সামান্য যোদ্ধা থেকে হতে পেরেছিলেন অদ্বিতীয় সার্থকতায় ফ্রান্সের বীরশ্রেষ্ঠ বিজয়ী সম্রাট্। ইতিহাস আজও তার সাক্ষী দেয়। দরিদ্র রাখাল হয়েছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট—কামাল আতাতুর্ক। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতাই এনে দিয়েছে এঁদের জীবনে পরম কল্যাণ। মানুষ কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে দুঃখের আগুনে

পুড়ে পুড়ে পাকাসোনার রং চেনে। জ্ঞান, প্রেম, কল্যাণ ও অভিজ্ঞতার জগৎই মানুষের যথার্থ জগৎ।

জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ও আত্মনিগ্রহের প্রধান সাক্ষী ম্যাক্সিম গর্কী। নিজের নাম নিজে রেখেছিলেন—গর্কী মানে তিক্ত। কোন্ অজ্ঞাত লগ্নে জন্মে জীবনে সব কাজই করেছেন—রেলের কুলি, রাঁধুনি, চাষের কাজ, চৌকীদারী, উকীলের মুহুরী, ভুগেছেন ক্ষয় রোগে একাধিকবার। সহ্য করেছেন জীবনের সব কিছু দারিদ্র্য, দুঃখ, অবসাদ, লাঞ্ছনা—উপলব্ধি করেছেন ধৈর্যের মহিমা—তিনি আজ সাহিত্যজগতে বিশ্ববরেণ্য—এই তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে নিয়ে গেছে চরম উৎকর্ষের দিকে। চেয়ে দেখি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের পানে—বিরাট ধৈর্যের হিমগিরি। হয়েছেন মুদিখানা দোকানের চাকর, নৌকার মাঝি, পোষ্ট অফিসের কেরাণী, যুদ্ধের সৈনিক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ্, মহাপ্রাণ মানবতার পূজারী। পণ্ডিত ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত—ইতিহাসে এ রকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। বন্দীশালায় বহু যুবক ছিলেন যাঁদের অভিজ্ঞতা এঁদের চেয়ে কম নয়। যা' অনিবার্য তা'কে অক্ষুণ্ণ মনে স্বীকার করে নেবার দুঃসাহস দেখেছি তাঁদের মধ্যে। এমনি কত জীবন যে পুলিশের নির্মম অত্যাচারে বৈদেশিক রাজশক্তির নিষ্পেষণে নষ্ট হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। দুর্জয় প্রাণের অমোঘ শক্তিকে দুর্গম দুর্যোগে রাজশক্তি নিশ্চিহ্ন করে ছেড়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের সাহসী শক্তিমানেরা আজ কোথায়? দারিদ্র্যের পীড়নে সীমাহীন অধ্যবসায়ে, কর্মজীবনের নব নব অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে তাঁদেরও আজ উপরে উঠতে দেখছি না। সে বিপুল কর্মপ্রেরণার ঔৎসুক্য কি সত্যিই আজ অবগুণ্ঠনের ভেতর অবলুপ্ত।

আজ এতদিন পরে মনের মাঝে ভিড় করে আসছে সেই সব ভাই বোনেরা যাঁরা দেশের জন্যে শুধু দুঃখই বরণ করলেন। এত

দুঃখ, এত নির্যাতন, অপমান, ত্যাগ কি বৃথাই হবে? এঁদের কি শুধু অতীতই আছে? বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে কি কিছুই নেই? অসংস্কৃত আবেষ্টনে ক্ষুধিত আত্মার নিঃশব্দ কান্না কি নিরুদ্দিষ্ট পথহারা অনন্তের সঙ্গে মিশে যাবে? মহাকালের রূপহীন পৃষ্ঠায় কোন তারিখ লেখা থাকে না শুধু বৈশিষ্ট্যহীন ঘটনার পুনরাবৃত্তি। স্থান ও কালের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন নয়। তারই ভেতর থেকে খুঁজে নিতে হয় বৈচিত্র্যের পদচিহ্ন। কালের গতির অন্ধ অনুসরণে মানুষ পথ চলে নি—সে চলেছে ইতিহাস সৃষ্টি করে। স্মরণ করি বিশ্ব কবিকে—

> 'নিদারুণ দুঃখরাতে মৃত্যুঘাতে
> মানুষ চূর্নিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
> তখন দিবে না দেখা দেবতার অপার মহিমা?'

এই বিশ্বাস নিয়েই দিন কাটাই—নাইবা জুটল স্বাধীনতার উৎসব-যজ্ঞে আমাদের নিমন্ত্রণ। স্মৃতিপটে জীবন্ত হয়ে আছে প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বহুধা বিভক্ত বৈচিত্র্য। আর আছে বৃহত্তম বিপদ, মহত্তম ত্যাগ, ও দুঃসহতম বিচ্ছেদের ইতিহাস।

একুশ

আইনের শেষ পরীক্ষা দেবার সময় হাতের অসুখ নিয়ে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলুম বলে আমাকে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হ'ল প্রেসিডেন্সী জেলে। আমার হাত পরীক্ষা করলেন ডাঃ প্রেম নীহার রায়। বললেন 'অপারেশন করা দরকার তবে খুবই আশঙ্কা আছে হাতটা জন্মের মত অবশ হয়ে যেতে পারে।' মন সায় দিল না ভাবলুম অপারেশন যদি করাতে হয় ত বাইরে গিয়েই করাব। তখন কিন্তু সব সময় যন্ত্রণা হয়ে হয়ে সেইটেই গা-সহা

হয়ে উঠেছে। মনে মনে অবশ্য যথেষ্ট ভয় ছিল যে ডান হাতটা যদি জন্মের মত অবশ হয়ে যায় ত জীবনে আর কিছুই করতে পারব না। বিকলাঙ্গের জীবন বড়ই করুণ, বড়ই দুর্বিসহ।

মনের এ রকম অবস্থা নিয়ে প্রায় তিনমাস কাটালুম প্রেসিডেন্সী জেলে। জেলগুলো তখন ছিল ঠিক রেলষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতো। বন্দীরা আসছেন যাচ্ছেন -- কয়েকদিনের জন্যে জেলখানায় কাটিয়ে গেলেন—ধর্মশালা বললেও চলে। বাস্তবিকই ধর্মশালা ও জেলখানায় বিশেষ কোন তফাৎ নেই। সব রকম চরিত্রের কয়েদী—খুনী, ডাকাত, চোর, বাটপাড়, দুশ্চরিত্র, পকেটমার, গাঁটকাটা, নির্দোষ বেশ মিশে গেছে। ক'দিন পরে আবার ডাক পড়ল ইলিসিয়াম রোডে। যিনি এ নামটি বের করেছিলেন তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল—স্বর্গের রাস্তাই বটে। এখন অবশ্য নাম বদলে লর্ড সিংহ রোড হয়েছে। আগে এটা কাদের স্বর্গ ছিল জানি না তবে আমাদের নিশ্চয়ই নয়। এমন বিপ্লবী কমই ধরা পড়েছেন যাঁরা এখানকার কর্তাদের হাতের কিছু না কিছু আস্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হন নি। তার আগে ছিল দালান্দা হাউস বিপ্লবী দলনের জন্যে। আবার সেই মামুলী ধরণের জিজ্ঞাসাবাদ 'ছাড়া পেলে কি করবেন? এখন ত আর দু'টো সাহেব বা পুলিশ মারায় বিশ্বাস করেন না—কম্যুনিজম্ কি এদেশে চলবে?' ইত্যাদি নানা রকমের অতিষ্ঠকর প্রশ্ন। আমাদের অবশ্য সকলেরই একই রকমের উত্তর —কিছুই করি নি—করবও না—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।' শেষ পর্যন্ত হুকুম হ'ল আবার ফিরে যাও বহরমপুর—ঘরে নয়। এই বদলীর ব্যাপারে আমাদেরও উৎসাহ ছিল প্রচুর কেন না খবরাখবরের এইটেই সুবিধে।

অদৃশ্য কালিতে লেখা চিঠিপত্র নিয়ে এক একজন যেতুম। আমিও একদিন অদৃশ্য কালির অনেকগুলো চিঠি নিয়ে ফিরলুম বহরমপুর—। আমার জেলখানার সম্পত্তির মধ্যে বইয়ের দু'টো

বড় বড় ট্রাঙ্ক—ওজন প্রায় বার মণ আর একটা স্যুটকেশে কয়েকটা জামা কাপড়। যথারীতি তল্লাসী শেষ করে ভেতরে পাঠাবার আধঘণ্টার মধ্যেই আবার নতুন করে আমার জিনিস পত্র তল্লাসী হ'ল—ততক্ষণে বন্ধুবর শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত চিঠিগুলির সদ্গতি করে ফেলেছেন। যাঁর যাঁর চিঠি তাঁদের কাছে দেওয়া হয়ে গেছে। যখন তল্লাসীতে কিছু পাওয়া গেল না তখন অ্যাসিষ্টাণ্ট কমাণ্ডেণ্ট শ্রীপবিত্র বসু বললেন 'খুব সরে এসেছেন—খবরটা একটু দেরীতে এসেছে।' আমি কিছুই না বোঝার ভান করে বললুম 'কিসের খবর? আসবার সময় ত সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করেই তল্লাসী করলেন।'

এর কিছুদিন পরে বক্সাবন্দীশিবির উঠে গেল। বক্সার রাজ-বন্দীরা চলে এলেন বহরমপুরে। অনেককে পাঠানো হ'ল আজমীঢ় মাড়োয়ারের দেউলী বন্দী শিবিরে। মরুভূমির সেই দারুণ গরমে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আমাদের শাস্তি দেবার জন্যেই দেউলী শিবিরের ব্যবস্থা হয়েছিল। লোক দেখানো অজুহাত ছিল যে বাংলাদেশের জেলে রাজবন্দীদের রাখা হ'লে সহজেই বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোলমাল সৃষ্টি করবেন। জেল থেকে পালানোর কথাও বলা হয় কেন না সব ক্যাম্প থেকেই কয়েকজন করে পালিয়েছিলেন। তাই বাংলাদেশ থেকে অনেকদূরে আমাদের ভেতর থেকে কয়েকজনকে বেছে বেছে সরিয়ে দেবার প্রধান কারণ বলে দেখান হ'ল। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। তবে এ কথা ঠিক যে অনেক পুলিশের গুপ্তচরকে আমাদের মধ্যে রাখা হ'ত বিপ্লবী সাজিয়ে—ভেতরের খবরাখবর নেবার জন্যে। দুঃখ হয় কংগ্রেসের দু'একজন হোমরা চোমরাও নেপথ্যে অগোচরে এ দলে ছিলেন—স্বাধীনতা লাভের পর মন্ত্রিত্ব পেয়ে তাঁরা চাইলেন তাঁদের পুলিশ রিপোর্ট ও ফাইলগুলি নষ্ট করতে যাতে তাঁদের যথার্থ পরিচয় না পাওয়া যায়। ফলে কয়েকজন পুলিশ অফিসার যাঁদের অধীনে তাঁরা গুপ্তচরবৃত্তি করতেন তাঁদেরও পদোন্নতি হয়ে

গেল—সামান্য এ. এস. আই. থেকে একজন এ. আই. জি. পর্যন্ত হলেন শুধু এই কারণে।

বক্সার বন্দীদের মধ্যে অনেকেই পুরানো বন্ধু ছিলেন—অনেক দিন পর তাঁদের পেয়ে খুবই আনন্দ হ'ল। তখন সরকারের মনোভাব অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যে আমার আর কয়েকজনের গ্রামে অন্তরীণ হবার হুকুম এল। আগে হতে জানা যেত না কোন্ গ্রামে পাঠানো হচ্ছে—শুধু হুকুম আসত অমুক সময় মালপত্র অফিসে পাঠাতে হবে আর অমুক সময় ক্যাম্প ছেড়ে যেতে হবে। সেখানে যাবার পর কোথায় যেতে হবে তার নোটিশ জারি হ'ত। ডাক্তার বাবুর কাছে খোঁজ নিয়ে জানলুম ঢাকা জেলার বায়পুরা গ্রামে যেতে হবে।

বিদায় দিতে এলেন অনেকে গেট পর্যন্ত। বরিশালের শ্রীইন্দুভূষণ সেন ও কলকাতার শ্রীলালমোহন ঘোষের কাছে পড়েছিলুম দর্শনশাস্ত্রের কিছু কিছু বই। এঁরা দুজনেই আমাকে পড়িয়েছিলেন খুবই যত্ন নিয়ে। লালুদা'র কাছে যখন ক্যাণ্ট পড়তে গেলুম তিনি হেসে বললেন 'যে ছেলে মার্কস্‌বাদে সুপণ্ডিত, ক্যাপিটেল পড়ে আয়ত্ব করে তাকে কি পড়াব?' আমি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নই। শেষপর্যন্ত লালুদা পড়ালেন—তবে প্রতিদিনই হ'ত গুরুশিষ্যের লড়াই। ইন্দুদা' পড়ালেন হেগেলের Phenomenology of mind আর সোপেনহোরের দর্শন। ভারি ভালো লেগেছিল সোপেনহোরের লেখা। ভদ্রলোক সারাজীবন লড়েছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে, জীবিতাবস্থায় কোনদিনই সম্মান পান নি। পারিবারিক জীবন ছিল বিষময়—বাস করতেন লোকালয়ের বাইরে কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে রেখে গেছেন অমৃতের উৎস, চিন্তাধারার পারিজাতমঞ্জরী—মানুষের হাসিকান্নার উচ্ছ্বসিত গভীর প্রস্রবণ।

যাবার সময় তাঁরা বললেন 'এতদিন ত পড়াশুনা করলে কিছু

লিখতে চেষ্টা কর। গ্রামের নির্জন পরিবেশে চিন্তাধারা ব্যাহত হবে না।' এই ত শিক্ষকের মত কথা। চলে এলুম বহরমপুর থেকে ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসে। আটক থাকতে হবে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রায়পুরা থানায়। ছোট্ট খাঁচার পাখী এল বড় খাঁচায়। এ জায়গাটা ঢাকা মৈমনসিং ও ত্রিপুরার সীমান্ত বরাবর। নারায়ণগঞ্জ থেকে মেথিকান্দা ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়— মেঘনা নদীর ধারে জায়গাটা মোটামুটি স্বাস্থ্যকর।

প্রথম এলুম ঢাকা সহরে। সেদিন আবার ছুটির দিন—সব অফিস বন্ধ। ডি. আই. বি অফিসে অনেকক্ষণ থাকবার পর অফিসার এলেন। তাঁর নির্দেশ মত আমাকে পাঠানো হ'ল রেলষ্টেশনে। তখনও ট্রেন ছাড়তে প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা দেরী ছিল। আমার সঙ্গের পুলিশ ভদ্রলোক এর আগে কোনদিন ঢাকায় আসেন নি। তাঁর ইচ্ছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সহরটা ঘুরে আসবেন, তবে ভয় আছে যদি সরে পড়ি। ভদ্রলোক শেষকালে বলে ফেললেন কথাটা। হেসে বললুম, ভয় নেই আপনাকে বিপদে ফেলব না। ভদ্রলোক কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন। আমার মালপত্র একজন জমাদারের জিম্মায় রেখে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম। মোটরে করে সহরের প্রধান প্রধান জায়গাগুলো দেখে ফিরে এলুম। রাত্রি ১টায় পৌঁছুলুম মেথিকান্দা ষ্টেশনে—সেখান থেকে থানা দু'মাইল। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। থানায় এলুম রাত দু'টোয়।

একটি ছিটে বেড়ার ঘর—টিনের চাল, একটি দরজা ও ছোট ছোট তিনটে জানালা এইটেই আমার অন্তরীণ বাসের জায়গা। আমার আগে থেকেই সেখানে ছিলেন শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য, বাড়ী দিনাজপুর। পরে আর একজন এলেন শ্রীপ্রতুলপতি লাহিড়ী, বাড়ী পাবনা। তিনজনে অনেকদিন ছিলুম এক সঙ্গে। থানাটুকু শুধু এলাকা তবে স্নানের জন্যে মেঘনায় ও বাজার করতে বাজার পর্যন্ত যাবার ছিল অনুমতি।

আমি যাবার দু'তিন পরেই থানায় নতুন দারোগা বদলী হয়ে এলেন নাম শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর দাদা শ্রীকানু রায় ১৯১১ সনে মোহনবাগান ক্লাবের ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। যিনি বদলী হয়ে চলে গেলেন তাঁর নাম শ্রীনকুলেশ্বর আচার্য। পণ্ডিত লোক পড়াশুনা করেছেন অনেক—কেন যে দারোগার চাকরি নিয়েছিলেন জানি না। মাত্র দু'দিনের আলাপ—তবুও ভদ্রলোককে মনে আছে। বিপ্লবীদের জন্যে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল প্রচুর। যাবার সময় বললেন 'যাঁরা জগতের দুঃখ কষ্ট লাঘব করবার জন্যে অমর বাণী এনেছেন তাঁদেরই উপর মানুষের নির্যাতন হয়েছে সব চেয়ে বেশী। তাঁরা কিন্তু মরেন নি—বহু সহস্র বছর ধরে সজীব হয়ে আছেন। তাঁরা নির্যাতীত কেননা তাঁরা অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যু দিয়েই তাঁরা অমৃতকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই মৃত্যুকেই মারবার জন্যে তাঁরা যুগে যুগে এসে নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বকে অমৃত সুধায় ভরিয়ে দেন। তাঁরা তার সন্ধান পেয়েছেন তাই মৃত্যুকে হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের কাজে কোন ক্লান্তি নেই, ত্যাগে কোন কৃপণতার চিহ্ন নেই। তাঁরাই ত সত্যিকারের ভবিষ্যৎ যুগ তৈরী করেছেন। এঁরা কি জানি কেমন করে পাখীর মত আগে হ'তে নবযুগের প্রভাতের সন্ধান পান। ভোর না হ'তে ভোরের খবর তাঁদের কাছে এসে যায়। আপনারা মুক্তি সংগ্রামের যোদ্ধা। ভগবান আপনাদের তপঃপূত জীবনের বিচিত্র সাধনা সার্থক করুন।' মনে হ'ল আমাদের সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে এতবড় কথা ত কোন পুলিশ অফিসারকে কোনদিন বলতে শুনি নি।

তাঁকে বললুম 'মন্থন করতে করতে দুধ থেকে মাখন আলাদা হ'য়ে বেরিয়ে আসে। আমাদের সংগ্রামের মন্থনে পরাধীনতার জীর্ণ প্রাচীনতা থেকে নবীন স্বাধীনতা উঠে আসবে।'

খগেন বাবুও আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন—বললেন

আপনারা যা' ইচ্ছে করতে পারেন তবে আমার চাকরির যেন ক্ষতি না হয়। আমি আপনাদের বিরক্ত করব না, আপনারাও আমাকে বিরক্ত হতে বাধ্য করবেন না।' সুন্দর ব্যবস্থা—প্রচুর স্বাধীনতা, শুধু দু'বার মাত্র থানায় হাজরে দেওয়া। বিশ্বাস করলুম তাঁর ঔদার্য। বিশ্বাসহীন মানুষের মন দুঃস্বপ্নে ভরা।

বহুদিন পরে গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশ ভালই লাগল। তখন আমরা তিনজনেই পরীক্ষার্থী—আমি এম. এ., প্রতুলবাবু বি. এ. ও অমিয় বাবু আই. এ.। তিনজনেই পড়াশুনা করি—অন্য কোন কাজ নেই। মাঝে মাঝে মনে পড়ে অতীত দিনের কথা—কত দুরাশা, কত উৎসাহ, কত নৈরাশ্য, অত্যাজ্য ধর্মের মত কত একাগ্র সতর্কতা, উন্মেষিত যৌবনের পরিপূর্ণতায় কর্তব্য সাধনের কত অপরূপ গৌরব—সবই মনের মাঝে ভীড় করে আসে। মনে পড়ে আবেগে রক্তিম, আনন্দে উচ্ছল, প্রসন্নতায় প্রাণবন্ত নামহীন পরিচয়হীন বিপ্লবী বন্ধুদের কথা—মন যায় অবসাদে ভরে। সে সঙ্গে মনে পড়ে চন্দননগরে একজনের কাছে রিভলভার কিনতে গেছি গণেশ দা—শ্রীগণেশ ঘোষকে নিয়ে। ভদ্রলোক দেখালেন একটি সুন্দর যন্ত্র ঠিক নোট বইয়ের মতো দেখতে। প্রথমে দাম বলেছিলেন চল্লিশ টাকা—আমাদের আগ্রহ দেখে সন্দেহে, দাম বেশী দিতে চাইলেও বিক্রী করলেন না—হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হ'ল।

মনে পড়ে একবার খালাসি সেজে আমেরিকা পাড়ি দেবার বন্দোবস্ত করেছিলুম কিন্তু আমার মামাতো ভাই কোন রকমে যেতে দেন নি। সেদিনও এমনি হতাশ হয়েছিলুম। এ রকম ছোটখাট অনেক ঘটনাই মাঝে মাঝে মনের মধ্যে ভীড় করে আসে। মনে পড়ে কত প্রতিহত দুরাশায় ম্লায়মান উৎসাহের উৎকণ্ঠা। বহুদিনের বঞ্চিত জীবন স্মৃতির দোলায় হয় গৌরবান্বিত।

থানায় থাকবার সময় একদিন অনেক রাতে দরজায় টোকা মারার শব্দ শুনলুম। বললুম—কে? উত্তর এল ইংরেজীতে 'দরজা

খুলুন।' আমিও আইনমত বললুম 'দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আসুন।' উত্তরে বললেন 'আমি এই মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট।' ঘুম চোখে দরজা খুললুম। টেবিলের উপর বইপত্র ছড়ান ছিল। তিনি দেখেই Shakespeare থেকে এক লাইন বলে বললেন, 'কে বলেছে ও কখন বলেছে?' জানা ছিল, উত্তর দিলুম। খুসী হয়ে বললেন 'কাল সকালবেলা আলাপ হবে।' বেশ পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আলাপ জমে গেল। আই. সি. এস. পরীক্ষাতে তাঁকে কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কতগুলোর উত্তর দিতে পেরেছিলেন, কতগুলো পারেন নি—এসব আলোচনা জমিয়ে তুললেন। ভদ্রলোক মাদ্রাজের অধিবাসী নাম মিঃ ষ্ট্রাসী জাতে খৃষ্টান, লোক চমৎকার। কথায় কথায় গল্প করলেন তাঁর জীবনের প্রথম বিচারের কথা। তিনি রংপুরে এস. ডি. ও. হয়ে নিজেই বিচার করবার চার্জ পেয়েছেন—প্রথম মোকদ্দমা এক গরুচুরির মামলা। ফরিয়াদী প্রমাণ করে দিল যে আসামী তার গরু চুরি করেছে। হ'ল এক বছরের জেল। হুকুম দিয়ে তিনি বাংলোয় ফিরেছেন—খানিক পরে দেখেন ফরিয়াদী তাঁর ফটকে ঢোকবার জন্যে চাপরাশিকে অনুনয় বিনয় করছে—তিনি দেখতে পেয়ে ডাকলেন তাকে। সে এসে বললে 'সাহেব আমি আসামীকে জব্দ করতে চেয়েছিলুম—জেলে দিতে চাই নি। গরু চুরি সে করে নি। জ্ঞাতি শত্রু হিসেবে আমি তাকে প্যাঁচে ফেলতে চেয়েছিলুম।' শুনে তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিচারেই নির্দোষীকে শাস্তি দিয়ে অনেকদিন অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে ছিল। পাকা আই. সি. এস. তখনও হতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ফরিয়াদীকে বলেছিলেন 'কাল তুমি এই মর্মে দরখাস্ত কোরো।' কিন্তু উকীলের পরামর্শে সে সরে পড়ে। মঙ্গলবুদ্ধি হয় পরাজিত।

যখনই তিনি থানায় আসতেন তখন সময় পেলেই আমাদের

সঙ্গে গল্প করে কাটাতেন। এ সময় থানায় ট্রেনিং নেবার জন্যে এলেন একজন আইরিশম্যান—এস. ডি. পি. ও.—নাম মিঃ জেমিসন। প্রথম দিনেই আলাপ জমে গেল। দারোগা বাবু হেসে বললেন 'মশাই আপনারা দেখছি অদ্ভুত লোক। এলেন এস. ডি. ও. বন্ধুত্ব করে ফেললেন—এলেন এস. ডি. পি. ও. জমিয়ে তুললেন তাঁর সঙ্গে।' বললুম 'নিজের কথাটা বাদ দিলেন কেন?'

মিঃ জেমিসনের নেশা ছিল দাবা খেলায়—খেলতেনও চমৎকার। আমরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে হারাতে পারতুম না প্রায়ই। ভদ্রলোক কিন্তু প্রতিদিনই খোঁজ নিতেন আমাদের কি চাই না চাই। নিজে পয়সা খরচ করে কিছু বইও আনিয়ে দিয়েছিলেন বিলেত থেকে। এমনি করে দিনগুলো বেশ কাটছিল। এমন সময় বসন্ত এল মহামারীরূপে—সাত আটজন কনেষ্টবল বিছানা নিল—তাদের সেবা করবার কেউ নেই—অধিকাংশই মুসলমান। হাস-পাতালে পাঠাবার মতো অবস্থা তখন পেরিয়ে গেছে। আমাদেরও এল কর্তব্যের ডাক। লেগে গেলুম সেবায়। অনেকেই বারণ করলেন গোপনে—জানালেন আমাদের মাথা ব্যথা কেন? উত্তরে বললুম 'মানুষ ত—হোক্ না ২৭৲ টাকা মাইনের সামাজিক অসম্মানে লাঞ্ছিত কনেষ্টবল। আমাদের সেবা করবার ফল এই হ'ল যে তারা আমাদের দেখতে লাগলো দেবতার মতো। হয়ত এরই নাম ব্যবহারের পরিচর্যা। এই সেবার ভেতর দিয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—এই পরহিতব্রতের মাঝেই শ্রী ও শান্তি, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য।

মিঃ জেমিসনের শেষ খবর পাই—মৈমনসিংহে থাকবার সময় কোন এক চৌকীদারকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি বাঘের সঙ্গে লড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন। বহুদিন থাকতে হয়েছে হাসপাতালে, তবে বাঁচিয়েছেন চৌকীদারকে।

থানায় থাকবার সময়কার একটা ঘটনা বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে।

ঢাকার পুলিশ সুপার তখন মিঃ কীড্। কথায় বার্তায় অহংকারের ছোঁয়াচ লেগে আছে। মনে হ'ল অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ। তিনি থানা পরিদর্শনে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'কিছু অসুবিধে আছে?' হেসে বললুম 'না'। তিনি ব্যঙ্গস্বরে বললেন 'এই প্রথম রাজবন্দীর কাছে শুনলুম যে কোন অসুবিধে নেই। যেখানেই গেছি সকলেই অসুবিধের লম্বা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন।' তাঁর ব্যঙ্গোক্তি শুনে মেজাজ গেল বিগড়ে। বললুম 'অভিযোগ আছে কিন্তু তা' দূর করবার ক্ষমতা আপনার নেই তাই আপনাকে সেগুলো বলে লাভ নেই—আপনি হাজার চেষ্টা করলেও তা' দূর করতে পারবেন না, কেন না সেটা আপনার ক্ষমতার বাইরে।' শুনে তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠল। হয়ত মনে করলেন যে তাঁকে তাঁর নিম্নস্তরের অফিসারদের কাছে ছোট করে দিলুম।

কয়েকদিন পরে প্রতুল বাবু চলে গেলেন, এলেন শ্রীঅর্ধাংশু মিত্র —আমাদের বন্ধু লোক। তিনিও ধরা পড়ার সময় আমার মতো গোলমাল করেছিলেন। পুলিশের লোকেরা মাঝে মাঝে ভুলে যেত যে হাতকড়াও আমাদের একটা অস্ত্র। যেখানে প্রাণের ভয় নেই সেখানে হাতে একটা বড় ছুঁচ থাকলেও বিপদ। তাই আমাদের কাছে একটা জীবনের চেয়ে একটা রিভলভারের দাম অনেক বেশী। একজন কর্মীর বদলে আর একজন কর্মী পাওয়া সোজা কিন্তু একটা যন্ত্র গেলে আর একটা যোগাড় করা খুব শক্ত।

রায়পুরায় থাকার সময় একদিন দারোগা বাবু বললেন 'একজন আই. বি. অফিসার কাল আসছেন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন বলে।' আমরা সাবধানেই রইলুম, কেন না সব সময়েই আইন মান্য করার চেয়ে অমান্য করাটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরের দিন যিনি এলেন তাঁর নাম শ্রীশশধর মজুমদার। ভদ্রলোক শুধু শিক্ষিতই নন ব্যবহারও চমৎকার। কথাবার্তা বললেন বেশ খোলাখুলি ভাবে। বললেন 'আপনার সম্বন্ধে আমাদের যা

রিপোর্ট আছে তা আপনি সত্যি বলে স্বীকার করবেন না জানি তাই আপনি কি বলতে চান শুনতে এসেছি।' বললুম 'আমার সম্বন্ধে আপনাদের এখন মনোভাব কি রকম তাই বলুন।' ভদ্রলোক বললেন 'আমরা জানি আপনি আর সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন না। কম্যুনিজম সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা করেছেন অনেককে পড়িয়েছেনও। ছাড়া পেলে কি করবেন?' বললুম 'আগে ত পাই তখন ভাবা যাবে কি করব।' ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন—বললেন 'এ কথাটা ঠিক উকীলের মত হয়েছে বটে।' বললুম 'ওকালতি করবার ইচ্ছে আছে।'

ভদ্রলোক আরও অনেক কথা বললেন। মনে পড়ে গেল হাওড়া জেলের সেই দুর্বাসাটির কথা—দু'জনেই পুলিশের লোক অথচ ব্যবহারে ও কথাবার্তায় কত তফাৎ। শেষে কম্যুনিজম্ নিয়ে আলোচনা করলেন। দেখলুম সুন্দর পড়াশুনা করেছেন কিন্তু অর্থ করছেন বিকৃত—ইচ্ছাকৃত কিনা জানিনা। আমি শুধু শুনে গেলুম তর্কের মধ্যে ঢোকবার ইচ্ছে হ'ল না। ডিমিট্রভকে নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন—কিন্তু আমার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে খানিকটা ভারতের দর্শন সম্বন্ধে কথা বললেন। দ্বৈত অদ্বৈতবাদ নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, আমি শুধু তাঁর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বললুম 'শঙ্করাচার্যের কর্মসন্ন্যাসমার্গ তাঁর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গিয়ে সাধারণ লোককে বিভ্রান্ত ও নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল। এই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ ও কর্মসন্ন্যাসমার্গের বিরুদ্ধে যখন দ্বৈতবাদ মাথা তুলে দাঁড়াল, মানুষের জীবনেও তার প্রভাব বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। আমাদের দেশে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের অবিদ্যার পর্য্যায়ে ঠেলে দিয়ে বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিল। বলা হয়েছিল, ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা দরকার। সেই পথই শ্রেষ্ঠ যাকে সকল কাল, সকল মানুষ স্বীকার করে।'

ভদ্রলোক শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। হয়ত ঠিক এ উত্তর আশা করেন নি বা আমি তাঁর প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারি নি। যাবার সময় বললেন 'বেশ ত আনন্দেই আছেন।' মনে হ'ল ইঙ্গিত করলেন যে আমার অন্তরীণের মেয়াদ শেষ হ'তে অনেক দেরী। বললুম 'অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে মানুষ যখন প্রতিফলিত দেখে তখন তার আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আরও বেশী করে।'

দেখতে দেখতে রায়পুরায় আরও একটা বছর কেটে গেল। জড়িয়ে রইল এই বন্দীজীবনের মধ্যে কত ছোট বড় ঘটনা কত করুণ স্মৃতি, কত দুঃখ দুরাশার অনুচ্চারিত ভাষা, কত স্পর্ধিত অধ্যবসায়, কত অলক্ষিত অপ্রজ্বলিত অগ্নি সঞ্চয়, কত কঠোর শাসনের ইঙ্গিত ও কত মহৎ প্রাণের স্পর্শরস ও সান্নিধ্য।

১৯৩৭ সনে ডিসেম্বর মাসে হ'ল গান্ধী-এণ্ডারসন প্যাক্ট— আমাদের অসহায় নৈরাশ্য অবসানের পরিকল্পনায়। মন্দ্রিত হ'ল বন্দীশালার দ্বারে মুক্তির জাগরণী। ঘোষণা হ'ল মুক্তি দেওয়া হবে সেই সব বিপথগামী তরুণদের যাঁরা উপার্জ্জনের অক্ষমতায় হিংসার পথ, বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে অবাস্তবের পেছনে অজানা আশায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। জীবিকা এ যুগে জীবনের চেয়ে বড়ো। গান্ধীজি প্রকারান্তরে অবশ্য স্বীকার করে নিলেন যে বেকারত্বই বিপ্লববাদের মূল কারণ। তাঁর ধারণা শাসন পদ্ধতির মাঝে ইংরেজের সভ্যতার ঔদার্যগুণ অতুলনীয়। গান্ধীজি ভুলে গেলেন যে তাঁরই আহ্বানে একদল মহিলা সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার একদল কুষ্ঠরোগী ভাড়া করে সেই ভিক্ষুকদের সত্যাগ্রহীদের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল। কুষ্ঠী ভিক্ষুকরা তাদের রোগক্ষত মূর্তি নিয়ে মহিলাদের তাড়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিহার ও উত্তর প্রদেশের অনেক নিরীহ জমিদারকে নগ্ন অবস্থায় হাত পা বেঁধে মৌমাছির চাকে ভরা গাছের নিচে ফেলে দিয়ে

মৌচাক খুঁচিয়ে দিয়েছিল। (১) তাঁর চিন্তাশীল মনে এ অহেতুক অযৌক্তিক কথাটা একবারও উঁকি মারল না যে আমাদের শতকরা নব্বইজন ছাত্র। আমাদের লোভ নেই, সংসারের আসক্তি আমাদের পিছু ডাকে না, মন্ত্রীত্বের মোহ আমাদের পথ রোধ করে না। আমরা পরিণতির অন্তহীন পথে ঝাঁপিয়ে পড়েছি অভাবের অপরিমেয় তাড়নায় নয়—আমাদের স্বভাবের অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তিতে। বেকারত্বের জন্যে সকলেই রাজনীতিতে অংশ নেয় না। দেশবন্ধু, মতিলাল, সুভাষচন্দ্র, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রমুখ মনীষিগণ কেউ বেকার ছিলেন না। আমরা যখন বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম তখনও উপার্জন-চিন্তামালিন্যের জীবনাদর্শের সিংহদ্বার অনেক দূরে। বাস্তব-সমস্যা-পীড়িত জীবনযুদ্ধের মানসিক অন্তঃপুরে তখন আমাদের প্রবেশাধিকার নিষেধ। তবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে অকৃতকার্য হ'য়ে শেষ পর্যন্ত রাজনীতিকেই পেশা রূপে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ আইন ব্যবসায়ে সুবিধে করতে না পেরে অবশ্য রাজনীতিই জীবনের একমাত্র কর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর হয়ত ধারণা ছিল যে স্বাধীনতার জন্যে আমাদের অবদান নগণ্য।

ইংরেজ কিন্তু চিরদিনই আমাদের ভয় করে এসেছে। মনে পড়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সদস্যা মিস্ উইলকিন্‌সনের কথা 'ইংরেজের ভয় গান্ধীকে ততটা নয় যতটা ঐ ক্ষ্যাপা ছেলের দলকে। গান্ধী ইংরেজের সব চাইতে বড় পুলিশ অফিসার।' যে ইংরেজ চিরদিন ভারতকে অবজ্ঞা করে এসেছে তাদের মুখে এই কথা। ইংরেজ আমাদের ও কংগ্রেসকে হেয় করে অপপ্রচার চালাতে কোনদিনই কুণ্ঠিত হয় নি। এমন কি ইউরোপে ছবি দেখান আরম্ভ হ'ল 'Every body loves music'—নেংটি পরা গান্ধীজি ইংরেজ রমণীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলনৃত্য করছেন। সেদিন ত কংগ্রেসের হোমরা চোমরা

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা—২৯শে অক্টোবর ১৯৬৫।

অনেকেই ইউরোপ গিয়েছিলেন তাঁরা ত কোনরকম আপত্তি জানাতে সাহস করেন নি। ওদেশ ত দেখিয়েই চলেছিল একই ধরণের ছবি 'ইণ্ডিয়া স্পাক্‌স,' 'বেঙ্গলী' ইত্যাদি। শুধু একজন বীর্যবান পুরুষ এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সব বন্ধ করে দিয়েছিলেন—তিনি হলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। তখন ভিয়েনায় দেখান হচ্ছে 'বেঙ্গলী'। তিনি নিজে গেলেন Archbishop Cardinal Intizar-এর কাছে জানালেন তাঁর আপত্তি, ছবি দেখান বন্ধ হ'ল। নিজে হিটলারকে অনুরোধ করলেন, জার্মানীতে বই দেখান বন্ধ হ'ল। সেই সুভাষচন্দ্রকেই পরে গান্ধীজি কংগ্রেস থেকে তাড়ালেন তিন বছরের জন্যে, অপরাধ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আজও মনে পড়ে দেশের সেই দুর্দিনে যিনি সুভাষচন্দ্রকে প্রথম আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি লিখলেন—'ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে অসাধারণ আত্মমর্যাদা ও ধৈর্যের যে পরিচয় তুমি দিয়েছ, তার তুলনা নেই। তোমার নেতৃত্ব শক্তিকে আহ্বান জানাই। বাংলাকে দীর্ঘদিন চলতে হবে এই পথে। তোমার আপাতঃ পরাজয় অবিনশ্বর বিজয়ের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।'

এ লিখেও তিনি শান্তি পান নি। পরে আবার ডাকলেন তাঁকে শান্তিনিকেতনে। নিজের হাতে মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন 'সুভায, বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে আমি তোমাকেই দেশনায়কের পদে বরণ করি।' জ্ঞানবৃদ্ধ বিশ্বকবির আশীর্বাদ ত বিফল হবার নয়।

যাক্ গান্ধী এণ্ডারসন চুক্তি মতো ৬ই ডিসেম্বর থেকে এক একদলে একশ'জন করে মুক্তি পেতে লাগলেন। আমরাও দিন-গুণি। যতদিন অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটক ছিলুম ততদিন ছাড়া পাবার জন্যে মন চঞ্চল হয় নি। এখন কিন্তু ছাড়া পাবার সম্ভাবনায় মন অস্থির হয়ে উঠল। হয়ত সব বন্দীরাই এমনি করে আসন্ন মুক্তির দিন গোণে।

১৫ই ডিসেম্বর পেলুম মুক্তির আদেশ—১৬ই রায়পুরা ছাড়তে হবে। গ্রামের ছোটবড় সকলের সঙ্গে দেখা করে এলুম। সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলেন এমন কি যাঁরা কোনদিন ভয়ে কথা পর্যন্ত বলেন নি তাঁরাও খাতির করলেন সেদিন। যা' ছিল অকিঞ্চিৎকর তা' হয়ে উঠল অপরূপ। পরিসমাপ্তি হ'ল আমার অন্তরীণ জীবনের। আমাদের মুক্তি হ'ল কিন্তু দণ্ডিত বিপ্লবীরা মুক্তি পেলেন না।

যে সংকল্পকে একদিন জীবনে আলোর মত সত্য বলে মনে করে কাজে নেমেছিলুম, সেই সত্য, সেই আহ্বান তখনও ছিল অটুট আমাদের মনে, আমাদের ধ্যানে, আমাদের আদর্শে, আমাদের সর্বগৃধ্নু চেতনায়। যে আহ্বান মানুষকে দুর্গম পথের ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে যায়, আমাদের অন্তরের আহ্বান তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

এতদিন পরেও আজ খুঁটিনাটি প্রতিটি ঘটনা মনের মাঝে উঁকি মারছে। জীবনের সব চেয়ে ভালো সময়টা কেটেছে বিদীর্ণ সমাজ ও বিভক্ত মনুষ্যত্বের ভেতর দিয়ে রাজরোষে কারাভ্যন্তরে। পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে জীবনের অনুত্তরঙ্গ অপরাহ্ন বেলার সেই সব দুর্বিষহ নিষ্ফলতা ও দুরাকাঙ্খার অকিঞ্চিৎকর আবর্জনার অন্তরালে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বিকশোন্মুখ তারুণ্য ও নব নব আনন্দময় কর্মপ্রেরণার জ্যোতির্ময়ী প্রত্যাশার প্রখর দীপ্তির স্মৃতিটুকু আজও অমলিন—অবিস্মরণীয়।

পরিশিষ্ট—ক

কয়েকটি অর্থসংগ্রহের তালিকা

তারিখ	স্থান	সংগ্রহ
৬।১২।১৯০৬	চিংড়িপোতা	৩২০০৲
৩।৪।১৯০৮	শিবপুর	৪০০৲
২।৬।১৯০৮	বড়া	২৫০০০৲
		অলঙ্কার ৮৩৭৲
২১।৬।১৯০৮	কাঁকিনাড়া	
১২।৮।১৯০৮	শ্যামনগর	
১৪।৮।১৯০৮	সীতার পাড়া	
১৫।৮।১৯০৮	বাজিতপুর	১৫০০৲
১৬।৯।১৯০৮	বিঘাতি	৫৩৬৲
৩০।১০।১৯০৮	নড়িয়া	৬৭০৲
২৪।১১।১৯০৮	বেলঘরিয়া আগরপাড়া	
২৭।১১।১৯০৮	রায়তা	
২।১২।১৯০৮	মোরহাল	
৩।১২।১৯০৮	দেহের গতি	
২১।১২।১৯০৮	শোধপুর	
২৭।২।১৯০৯	মাগুপুর	৫০০৲
২৩।৪।১৯০৯	নেত্রা	২৪০০৲
১৬।৮।১৯০৯	নাঙ্গলা	১০৭০৲
১১।১০।১৯০৯	রাজেন্দ্রপুর ট্রেন	১৬০০০৲
২৮।১০।১৯০৯	হলুদবাড়ী	১৪০০৲
১১।১২।১৯০৯	মোহনপুর	১৬৬০০৲
২৭।১২।১৯০৯	বিক্রী	৮১৪৲
৭।২।১৯১০	শোলগাঁথি	২০০৲
১১।২।১৯১০	ধুলগ্রাম	৬১৭৫৲

৩০।৩।১৯১০	নন্দনপুর	৬৫০০৲
৫।৭।১৯১০	মহিষা	২২০৪৲
৩০।৯।১৯১০	হলদিয়া হাট	১৫০০৲
৭।১১।১৯১০	কলার গাঁ	১২৬৬০৲
৩০।১১।১৯১০	দাদপুর	৪৯,৩৬৮৲
২১।১।১৯১১	সোনারং	
৫।২।১৯১১	পণ্ডিতচর	৫৫০০৲
২০।২।১৯১১	গোয়াড়িয়া	৭৪৫৭৲
৩১।৩।১৯১১	স্বয়াকেরে	১২০০৲
১০।৪।১৯১১	রাউতভোগ	
২২।৪।১৯১১	লক্ষণকাঠি	১০২০০৲
৩০।৪।১৯১১	চরশসা	২১৫০৲
৫।৯।১৯১১	সিঙ্গের	৮১৭০৲
৩।১০।১৯১১	কালিয়াচর	৩১২৫৲
৬।১১।১৯১১	বালিয়াগ্রাম	১২১৮৲
৩১।১২।১৯১১	চাউলপটি	১৯৭৭৲
২৩।১।১৯১২	বাইগুনতেয়ারী	৩৪৭০৲
২১।২।১৯১২	আমাপুর	৭৫৯৩৲
১৭।৪।১৯১২	কুশঙ্গল	
১৯।৪।১৯১২	কাকুরিয়া	৬০৲
৩।৫।১৯১২	বীরঙ্গল	৮০৮০৲
১১।৭।১৯১২	পানাম	২০,০০০৲
১৫।৭।১৯১২	প্রতাপপুর	৭৫৯৫৲
১৪।১১।১৯১২	নাঙ্গলবাঁধ	১৬০০০৲
১৮।১১।১৯১২	কোনা	৯৫৲
৪।২।১৯১৩	ভারাকির	৩৪০০৲
৬।২।১৯১৩	ধূলদিয়া	৯০৪৬৲
৩।৪।১৯১৩	গোপালপুর	৬৯৪৫৲
২৯।৫।১৯১৩	কাওয়াখুড়ি	৫১৩০৲
২৮।৬।১৯১৩	কামরাঙ্গীর চর	২২৫০৲

১৬৮।১৯১৬	কেদারপুর	১৯৮০০৲
৭।১১।১৯১৩	ছাত্রবেড়িয়া	৮৬৮৲
২৪।১১।১৯১৩	সারাচর	৪৩৯০৲
৩।১২।১৯১৩	খামারপুর	৬৮০০৲
১৯ ১২।১৯১৩	পশ্চিম সিং	৩১০০
৮।৫।১৯১৪	গোঁসাই পাড়া	৫৫০০৲
২৮ ৮ ১৯১৪	বেতাতি	১৭৭০০৲
১।১০।১৯১৪	মাদারীপুর	৩০০৲
২৮।১২।১৯১৪	মাদারীপুর	
১৩।১১ ১৯১৪	উক্রাসাল	৪৮০০৲
১৮।১২।১৯১৪	রাধানগর	৪৯০০৲
২০।১২।১৯১৪	দারকপুর	২৩০০০৲
২২।১।১৯১৫	বাঘমারা	৪১৭০৲
১২।২।১৯১৫	গার্ডেনরীচ	১৮০০০৲
১১।২।১৯১৫	বেলিয়াঘাটা	২২০০০৲
৬।৪।১৯১৫	এঁড়িয়াদহ	৫০০৲
১১।৪।১৯১৫	বলদা	৪০০৲
৩০।৪।১৯১৫	প্রাগপুর	২৭০০
২৫।৫।১৯১৫	আওরালি	৪২৫০৲
৫।৬।১৯১৫	গাজীপুরা	১৫০০০৲
১৪।৮।১৯১৫	হবিপুর	১৮০০০৲
৭।৯।১৯১৫	চন্দ্রকোণা	২১০০০৲
৩০।৯।১৯১৫	শিবপুর	২০,৭০০৲
১৭।১১।১৯১৫	কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট	৮০০৲
২১।১১।১৯১৫	রসুলপুর	৪৬০৲
৩০।১১।১৯১৫	কর্পরেশন ষ্ট্রীট	২১০০০৲
১৪।১২।১৯১৫	শেঠবাগান	৬১০০৲
২২।১২।১৯১৫	কালিয়াচাপড়া	৮৫০৲
২৭।১২।১৯১৫	চাউলপটি	৭৫০৲
২৯।১২।১৯১৫	কারতলা	১৫০০০৲

১৭।১।১৯১৬	হাওড়া	৬০০০৲
৩।৩।১৯১৬	দরকপুর	২০০০৲
৬।৬।১৯১৬	গান্দোয়া	১৪৬৯০৲
৩০।৪।১৯১৬	নাথগড়	১৭৫০০৲
৯।৬।১৯১৬	ধানকাটি	৪৩০০০৲
২৬।৬।১৯১৬	গোপীমোহন রায় লেন	১১৫০০৲
২।৯।১৯১৬	সাহাপদিয়া	৩৩৭০৲
১১।৯।১৯১৬	ললিতেশ্বর	৫৩০৲
১৭।১০।১৯১৬	মহিলদেও	৮০০০০৲
৭।১১।১৯১৬	পারাইল	৩৮০০৲
২৫ ২।১৯১৭	পাইকার চর	১২০০৲
১৫।৪।১৯১৭	জামনগর	২৬৫৬৭৲
২০।৬ ১৯১৭	রাখালরাজ	৩১০৮৬৲
২৭।১০।১৯১৭	আবদুল্লাপুর	২৪৮৫০৲+৮০০০৲
৩।১১।১৯১৭	মাঝিয়ারা	৩৩০০০৲
৩।১১।১৯১৭	৩১ আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট	* ৫৪৫৯৲
১৫।২।১৯২৩	কোনা	
৩।৮।১৯২৩	শাঁখারীটোলা পোষ্টাফিস	
১৪।১২।১৯২৩	পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ	১৭০০০৲

* রাউলাট কমিটির রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ

পরিশিষ্ট—খ

Dr. Jadu Gopal Mukherjee

61, Circular Road,
Ranchi

১৩. ৯. ৬৪.

সোদরপমেষু,

গঙ্গানারায়ণ বাবু, আপনার "অবিস্মরণীয়" একখণ্ড পেয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। আপনার ইচ্ছামত একটা সমালোচনা এই সঙ্গে লিখে পাঠালাম।

আপনার হাত স্বর্ণ-প্রসূ। ভগবৎ কৃপায় এগিয়ে চলুন। ইতি

শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

অবিস্মরণীয়

প্রথম খণ্ড, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র

প্রথম প্রকাশন ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৪, মূল্য সাত টাকা।

গ্রন্থকার "নিজের কর্মপ্রচেষ্টার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিপ্লব আন্দোলনের গতির ইঙ্গিত ও পুরানো ইতিহাস" দিয়ে এই পুস্তকটি লিখেছেন। পড়লাম। বেশ ভাল লাগল। গ্রন্থকার কবি মনোভাবের মানুষ। লেখার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা উঁকি মেরেছে।

ভাষা মার্জিত ও সুন্দর। লেখার ধারা কোথাও ক্ষুন্ন হয় নাই। জীবনে মিষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা দুইই যথেষ্ট সঞ্চয় করেছেন। মারও খেয়েছেন, আবার সুধাপানও করেছেন।

সবচেয়ে চমৎকার লাগল তিনি কোন দল বিশেষের ঢাক পেটান নাই যদিও একটা দল নিয়ে তাঁর জীবন আরম্ভ করতে হয়েছিল। সকলের চিত্র বেশ ভাল ভাবেই এঁকেছেন। "সিংহ নিজের প্রতিকৃতি নিজে অঙ্কিত করলে" ভাল হ'ত না। যা বলতে চেয়েছেন তা অক্ষমের কলমে নয়—শক্তির সঙ্গে ভাল রকমে বিবৃত করেছেন। আর একটা বৈশিষ্ট্য—তিনি খুব সংক্ষেপে, কথা গুছিয়ে, ভক্তিভরে আমাদের চিরশ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায়ের—প্রফেসার জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আলেখ্য চিত্রিত করেছেন। মাষ্টার মশাই হচ্ছেন নিজের প্রতিভায় স্বয়ং ভাস্বর—a class by himself লেখার আখ্যান ভাগে কিছু কিছু ভুল আছে। যথা :—

পৃঃ ২৩-২৪ বাংলার ছোটলাট এন্ড্রুজ ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টাকারীর

নাম লেখা হয়েছে জীতেন মুখোপাধ্যায় কিন্তু এঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে জীতেন রায় চৌধুরী।

ঐ পৃষ্ঠায় আছে "আত্মোন্নতি লুপ্ত হয়ে কর্মীরা দু'দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন—একদল যুগান্তর নাম নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন অন্যদল অনুশীলন······। এ তথ্য একদম ভুল। ১৯০২ সনে অনুশীলন দল স্থাপন করেন সতীশ বসু এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে। New Indian School এর হেড্‌মাষ্টার নরেন ভট্টাচার্য্য (ভবিষ্যতের এম, এন, রায় নন) বঙ্কিমের অনুশীলন থেকে ঐ নামটি দেন। সমিতি স্থাপিত হয় দোল পুর্ণিমার দিন।

পৃঃ ১৫ সুশীল সেনের তখন বয়স ১৫, তেরো নয়।

পৃঃ ১৬ ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে হত্যার চেষ্টা করা হয় সিরাজগঞ্জে নয়—গোয়ালন্দে। বোমার ব্যর্থতার বহু উল্লেখ বইটিতে আছে।

ব্যাখ্যান ভাগেও গোলযোগ বাদ পড়ে নি। বিষয়টা ক্রমশঃ ফুটিয়ে তুলছি। যেমন ধরা যাক্ বোমার কথা। বোমা, উত্তরাধিকারসূত্রে রুশ সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে নেওয়া। কিন্তু এদেশে বোমা একেবারেই ব্যর্থতার পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যেতে পারে।

(১) প্রথম বোমা পরখ করতে গিয়ে দেশকর্মী প্রফুল্ল চক্রবর্তী দেওঘরে আহত হয়ে মারা যান।

(২) নারায়ণগড়ে বোমার ফলে ছোটলাটের কোন ক্ষতি হয় নাই।

(৩) মুজাফরপুরে বোমায় দুটী নির্দোষী স্ত্রীলোক মারা যান। "কসাই কাজী" কিংসফোর্ডের কোন ক্ষতি হয় নাই।

(৪) ১৯১১ সনে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে বোমা পড়লে লাট হার্ডিঞ্জের সামান্য আঘাত লাগে—কিন্তু মরে নির্দোষী চোপদার।

(৫) মৌলভী বাজারে দুর্বৃত্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে বোমা মারতে গিয়ে আক্রমণকারী যোগেন চক্রবর্তী মারা যান। গর্ডন সাহেবের কোন ক্ষতি হয় নাই।

(৬) ঐ গর্ডন বদলী হয়ে লাহোরে যায়। সেখানে বসন্ত বিশ্বাস তার জন্যে যে বোমা রেখেছিল তাতে একজন নির্দোষী লোক মারা যায়।

(৭) ১৯১৩ সালে—আন্দাজ করছি—কলকাতার মুসলমান পাড়া লেনের

বাড়ীতে গোয়েন্দা ধুরন্ধর বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যা করতে গেলে তার দেহরক্ষী শিউ পূজন মারা যায়। আসল লক্ষ্য ফসকে যায়।

আর উদাহরণ বাড়াব না। শুধু ১৯১৩ সালে মৈমনসিংএ এক পুলিশ কর্মচারী শিশুপুত্র সহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইটিই সাফল্য। এই কারণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা বোমা বর্জন করেছিলেন যদিও ১৯১৫ সালে জার্মানী হতে প্রেরিত ৺ডাক্তার অবিনাশ ভট্টাচার্য্য মশায় জার্মানীর ফৌজের ব্যবহারের জন্য উচ্চশক্তি যুক্ত বোমার formula এনেছিলেন।

বইটিতে গান্ধীজির উপর সুবিচার করা হয় নি। এবার বিচার্য বিষয়ের মর্মস্থলে আসা যাক্। আমি বা আমার বহু বন্ধু কোনদিন সন্ত্রাসবাদী ছিলাম না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বন্ধুরা একে একে ছাড়া পান। যাঁরা ধরা পড়েন নি তাঁরা ১৯২১ সালের শেষ দিকে ফিরলেন কিন্তু এবার সমস্যা হ'ল কিংকর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর ভারতের রাজনীতিগগনে ক্রমশঃ আবির্ভাব। ১৯১৫ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটা সাফল্যের ছটা (Halo) নিয়ে ভারতে ফেরেন। তাঁর রাজনীতির গুরু গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে তাঁকে একবছর মুখটি বুঁজে ভারত ঘুরে ঘুরে এদেশের ধাত বুঝতে উপদেশ দেন। এদেশে এলে তাঁকে মহাত্মা উপাধি দেন রবীন্দ্রনাথ এবং কবিকে গুরুদেব দেন তিনি। এই খবর আমি ৺ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মুখে শুনি।

এ সময়টা বিপ্লবী কর্মসূচীতে ভরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। বিপ্লবীরা কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ইতিপূর্বে রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুট হয়ে গিয়েছিল। প্রথম মোটরে রাজনীতিক ডাকাতি দু'বার হয়ে চুকেছিল। এমন কি "অবিস্মরণীয়" গ্রন্থকার লিখিত "বাংলার থার্মোপলি" অর্থাৎ বালেশ্বরের অস্ত্রযুদ্ধ গৌরবের সঙ্গে শেষ হয়েছিল। এবং কর্মকাণ্ড চলেই চলেছিল।

বোধ হয় ১৯১৫ সালের শেষদিকে, ইংরেজ সরকারের মহাশক্তিশালী I. C. S. সভ্য মিঃ P. C. Lyon কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে

এক বিশেষ বক্তৃতা দিতে উৎসুক হন। কতকগুলি পুস্তিকা তিনি ছাপিয়ে এনেছিলেন। সেগুলি এই সভায় বিলি করা হচ্ছিল।

তিনি বলেন তিনি নিজেকে একজন বাঙালী মনে করেন। দুঃখ করেন যে ভবিষ্যতে তাঁর দেশ বা বাংলাকে ঐতিহাসিকরা বলবে দেশদ্রোহীর দেশ (Land of the Traitors) সেটা তাঁর প্রাণে সইবে না।

শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর গান্ধীজি ছিলেন। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। উঠে প্রতিবাদ করলেন—এই এনার্কিষ্টদের সঙ্গে আমরা একমত নই। কিন্তু তাদের দেশপ্রেম, নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগকে সম্মান করি। তখনকার দিনে বৃটিশ সরকার কিছু দেশ প্রেমিকদের anarchist বলত।

আবার ১৯১৬ সালে বেনারস হিন্দু মহাবিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন কল্পে মালব্যজী দেশীয় নৃপতিদের আমন্ত্রণ করেন। তাঁরা সভায় আসন গ্রহণ করলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী গান্ধীজীকে মুখপাতে কিছু বলতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন—মহাবিদ্যালয়ের কোনই মূল্য নাই যদি সেখান থেকে বাংলার এনার্কিষ্টদের মত দেশভক্ত না বেরোয়। এতে নৃপতিরা উঠে চলে যান।

মনে রাখতে হবে ইংরেজরা যাদের ১৯০৮ সাল থেকে এনার্কিষ্ট—বলত তাদেরই ১৯৩০ সাল থেকে টেররিষ্ট আখ্যা দিয়েছিল।

গান্ধীজি আবার ১৯২২ সালে ইয়ংইণ্ডিয়া পত্রিকার ফেব্রুয়ারীর এক সংখ্যায় বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রশংসা করে দুটী প্যারাগ্রাফ ভরে দিয়েছিলেন।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐখানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তখনও বাংলার ছ'জন বিপ্লবী গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। ইংরেজ সরকার বহু পুরস্কার ঘোষণা করেও তাঁদের ধরতে পারে নি।

সেই সময় জেল থেকে সদ্য মুক্ত বিপ্লবী সভ্য ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত নাগপুরে গান্ধীজির সঙ্গে নূতন কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলাপ করেন যার ফলে গান্ধীজি বলেন অহিংসা তাঁর নিজস্ব মতবাদ যা তিনি ধর্ম্মের মত (creed) মানেন। অন্যেরা নীতি বা policy হিসাবে সেটাকে গ্রহণ করতে পারেন।

এরপর ভূপেন্দ্র কুমার পণ্ডিচেরী গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি সব শুনে বলেন খোলাখুলি কাজের জন্য কতকগুলি আশ্রম স্থাপনের সুবিধার কথা। তারই ফলে খুলনা ও অন্যান্য কয়েক স্থানে সত্যাশ্রম স্থাপন করা হয়েছিল।

এ তথ্যগুলি না জানা থাকার জন্য মনে হয় গ্রন্থকার গান্ধীজির প্রতি সুবিচার করেন নি।

এবার বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের আলোচনা করি। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় বিপ্লব চতুরঙ্গ। তাতে থাকবে ছাত্র বা যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্য। শুধু যুবশক্তির জাগরণ বিপ্লব নয়। শুধু সন্ত্রাসবাদও বিপ্লব নয়। যুবকরা হচ্ছে বিপ্লবের প্রাণশক্তি। তারা না হলে কিছুই হবে না। তাণ্ডব নৃত্যরত শিব তাতা থৈ তাতা থৈ করে রুদ্রতালে প্রলয় নাচনে মেতে উঠেছেন; সেখানে "বৃদ্ধ স্থাবত চিন্তামগ্নে"র অবকাশ নেই। সেখানে পোগ্রাম বা কর্মসূচী—'এখনই এতদ্দণ্ডেই—নয়ত আর কখনও নয়"—Now or Never. আয়র্লাণ্ড ও ভারতের মুক্তি সংগ্রাম প্রায় সমসাময়িক। আয়র্ল্যাণ্ডে Labor বলেছেন—A beginning must be made by some one, somewhere and some how. বাংলার বিপ্লবী বীর দেবব্রতবাবু বা "যোগা ক্ষ্যাপা" বলেছেন "যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল, দুর্ব্বল—সবল সে কি ভাবিবে? এসো কে কেঁদেছ নীরবে।"

কিন্তু চারণের গানের সঙ্গে এটা হচ্ছে মাত্র প্রথম জাগরণ। তারপর আরও ব্যবস্থা চাইবে কি? নৈলে চতুরঙ্গ সেনা তৈরী হয় না। কাজেই প্রশ্ন এসে গেল কৃষক, শ্রমিকদের জাগরণ কি করে আনা যায়? সৈন্যদেরও আনতে হবে।

গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ নীতি "পোড় খেকোরা" গ্রহণ করল। কিন্তু তাদের মনের কথা "মারি অরি পারি যে কৌশলে।" বিপ্লবীদের উপর ম্যাট্সিনির প্রভাব অনস্বীকার্য্য।

পৃঃ ৭—গ্রন্থকার লিখেছেন "একদিন মুখে মুখে বললেন (মাষ্টার মশাই) ম্যাট্সিনী, গ্যারিবল্ডীর কাহিনী ও ব্রাণ্ডিয়েরা ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মত্যাগের কথা।" ভাল লাগবারই কথা। ম্যাট্সিনি বলেছেন গুপ্ত ষড়যন্ত্র পরাধীন

জাতির ধর্ম। "Conspiracy is the religion of the dependent people."

গঙ্গানারায়ণ বাবুর এই ইতিহাস লেখা সার্থক হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আরও ঐতিহাসিক তথ্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

'অবিস্মরণীয়' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অমূল্যগ্রন্থ। এতে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের এবং অন্যান্যদের প্রায় ৪৪ খানি ছবি আছে। এর অনেকগুলিই দুষ্প্রাপ্য। পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইতি—

শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

Amrita Bazar Patrika dt 24. 10. 64

Lest we forget ! Abismaraniya by Ganganarayan Chnndra is the first volume of the saga of the early revolutionary movement in Bengal. To call it a mere book of biography of revolutionary—miscalled terrorist or anarchist—leaders is to do an injustice to those patriots as well as the present author whose treatment of the subject is more scientific than emotional. Students of the Indian freedom movement will learn much from this book. Even elderly readers will find a new angle—and much authentic data—from a perusal of 'Abismaraniya'—a copy of which deserves an honoured place in every patriotic home—Royjee.

3. 9. 64

Abismaraniya Bharat (Unforgettable India) : By Ganganarayan Chandra. In Bengali. Published by the author from 59, Grey Street, Calcutta-6.

Sri Ganganarayan Chandra has brilliantly recreated one of the most vital periods of Indian history in the twentieth century. Though the author has given a short summary of the struggle for Indian Independence since the days of the Sepoy Mutiny (1857), his account becomes very graphic when he appear on the stage in later years. He received his early inspiration from Prof. Jyotish Chandra Ghosh who was once a professor of the Hooghly College and his elder brother Sri Harinarayan Chandra who was a great patriotic revolutionary.

The highly interesting book is very detailed in the collection of data. It is sad to note that it has no index at the end for reference.

There is no doubt about it that the Revolutionary Movement which came into existence after the Partition of Bengal (1905) created in the people of India a desire for freedom from the British yoke. This intriguing and moving book flashes a cold and remorseless searchlight on many events and personalities before India became free.

The volume contains about forty-five full-page illustrations of notable leaders, revolutionaries and patriots. S. B. (R15336)

Hindusthan Standard dt 27. 9. 64

The "terrorists" who waged an undeclared war aganist the British rulers in India were believers in violence. They led a parallel compaign while the National Congress rejected violence as a creed. They set up secret Societies, cells and operational squads and were equipped with bombs, muskets and revolvers. Their patriotism was pure and spirit of sacrifice unparalleled. They suffered death and persecution with a smile and left a trail of glory behind, They are our legendary heroes honoured in ballads and songs. The most important quality of the "Movement" was its dare devil youthfulness and it is for this quality that the memory or history of the Movement is so dear to our young men and women. As materials for an authoritative history to be written of our national movement and all its facets, the memoirs of the revolutionaries themselves are invaluable. Chandra, who came in contact with the revolutionists quite early in life proved himself to be a seasoned fighter, dedicated as well as wonderfully resourceful. His eye writness accounts, of sevral episodes now famous, is interesting for a number of details, notably young Chandra's Burma adventure, which we read in this book for the first time. The author does not romanticize the episodes at the cost of truth, but his account is marvellously lively. Chandra's self denying modesty gives the autobiographic elements of his narrative a rare literary flavour. He has beautifully sketched the character and achievements of many of our martyrs and freedom fighters.

আনন্দবাজার—সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৬৪

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এমন কয়েকটি অধ্যায় আছে যা ইতিহাস হলেও গল্পকাহিনীর মতো আশ্চর্য। সেই সব অধ্যায়ের যাঁরা নায়ক তাঁরা আধুনিক রাজনৈতিক পুরাণের কিংবদন্তীসিদ্ধ পুরুষ। অগ্নি যুগ বলতে ঠিক একটি যুগ বা দশকই বোঝায় না, অর্ধশতাব্দীকাল ধরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ তরুণীদের দুর্জয় প্রচেষ্টার প্রচলিত নামই 'অগ্নিযুগ'। শ্রীঅরবিন্দ, ক্ষুদিরাম থেকে হিজলী বন্দীনিবাসের রাজবন্দী পর্যন্ত সকলেই এমন এক সমান্তরাল মুক্তি অভিযান পরিচালনা করে গেছেন যার মন্ত্রগুপ্তি,

নিয়মানুবর্তিতা, সাহসিক দক্ষতা, তারুণ্য ও আদর্শনিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে; বিপ্লবীরা নিজেরাও একাধিক স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। এ ধরণের বই যত প্রকাশিত হয় ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদের পক্ষে ততোই ভাল। লেখক শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র অতি অল্প বয়স থেকে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং নিজেকে একজন যোগ্য বিপ্লবী বলে পরিগণিত হন। এমন কতকগুলি ঘটনা ও ঘটনাংশ বিশেষতঃ তাঁর দুঃসাহসিক বর্মা পরিক্রমা, তাঁর গ্রন্থে লিপিভুক্ত হয়েছে যা' একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকেই উদ্ধার করা সম্ভব এবং সেই হিসাবে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হবার দাবি রাখে। তিনি অকুতোভয় ও সত্যানুরাগী জীবনদর্শনে বিশ্বাস করেন, কাজেই তাঁর উক্তিগুলির যাথার্থ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। তাঁর রচনার মধ্যে কল্পনাবিলাস একেবারেই নেই এবং তদানীন্তন বিভিন্ন রাজপুরুষ সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তিগত উষ্মা প্রকাশ করেন নি। এই স্মৃতিচারণ প্রকৃতই অবিস্মরণীয়। বই পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করা পর্যন্ত থামা যায় না। অথচ কোন চেষ্টাকৃত রচনাকুশলতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন এ বইতে নেই। প্রথম খণ্ডটি সমাপ্ত করবার পর স্বতঃই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য পাঠকমন উন্মুখ হয়। অগ্নিযুগের স্মৃতি-সাহিত্যে অবিস্মরণীয় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বসুমতী—১৯শে আশ্বিন ১৩৭১

বইটির নাম অবিস্মরণীয়, সত্যই অবিস্মরণীয়। যাদের কাহিনী ও আলোকচিত্র নিয়ে বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের কথা দেশের লোকের কোনদিন ভোলা উচিত নয়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা ফাঁসিকাঠে, গুলির আঘাতে অথবা পুলিশের নির্মম অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের কথা হয়ত আজ অনেকেই জানেন না। সেই সব আত্মদানকারী বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপের ইতিহাস রচনায় লেখক যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। লেখকের বলিষ্ঠ ভাষা ও লেখনী নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। এ বইখানি প্রচারের যথেষ্ঠ প্রয়োজন আছে। লেককের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ব্রহ্মবিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ বইয়ে অনবদ্য।

যুগান্তর—১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

'অবিস্মরণীয়' (১ম খণ্ড)—**লেখক ও প্রকাশক শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। ৫১গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।**

বইটির বিষয়বস্তু হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী বীর বিপ্লবীদের অজ্ঞাত কীর্ত্তিকাহিনী। লেখক নিজে বিপ্লবীদের অন্যতম এবং বিপ্লবযুগের কর্ম্মধারার সঙ্গে তাঁর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বিপ্লবীরা 'বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি অসংখ্য যুগের তাঁরা একান্ত সাধন'—এই ভাবধারার একটি সুন্দর প্রমাণালেখ্য বইখানিতে সুপরিস্ফুট। বইটির রচনাশৈলী ও বিন্যাস পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। কেবল লেখনী-নৈপুণ্যের জন্য নয় ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনায় লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয়। বিপ্লবযুগের ইতিহাস হিসাবে আগে হয়ত অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে তবু প্রমাণসিদ্ধ তথ্য পরিবেশন করে লেখক তাঁর গবেষণামূলক মৌলিক অবদানের স্বীকৃতি নিশ্চয় দাবী করতে পারেন। বিপ্লবীদের দুর্লভ আলোকচিত্র ও প্রশস্তি সন্নিবেশিত এই ধরণের বই সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বইটির প্রচ্ছদপটের প্রতীক আকর্ষণীয়। যাঁদের আত্মোৎসর্গে ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল সেই বীর বিপ্লবীদের কথা ও কাহিনী বাংলা দেশে আদৃত হবে বলেই আশা করি। লেখকের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

প্রীতিভাজনেষু,

বছর বছর আমরা বন্যার খবর পড়ি। খবর পাই ক'টা গ্রাম ডুবল, ক'জন মানুষ প্রাণ হারাল, ক'টা গরু মরল। তারপর প্রকাশ হয় সরকারী আন্দাজ—কত ফসল নষ্ট হ'ল। যে উদ্দামতায় নদী-কূল ছাড়ায়, যে তাণ্ডব নৃত্যে জলস্রোত প্রধাবিত হয় তার বর্ণনা কেউ লেখে না। লেখে না, লিখতে পারে না বলে।

তোমার 'অবিস্মরণীয় ভারত' পড়তে পড়তে বন্যা কল্লোলের ধ্বনি শুনছিলাম। যেদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস রচিত হ'বে, বইখানি প্রয়োজনে লাগবে।

একটা কথা মনে হচ্ছিল। যাঁদের কথা আলোচিত হয়েছে, তাঁদের অনেকেরই ফৌজদারী বিচার হয়েছিল। সেই সব মামলার রেকর্ড আজও আছে। সেগুলি পড়ে অনুসন্ধান করলে, হয়তো আরও তথ্য বেরুতে পারে। শ্রীক্ষুদিরামের মামলার রেকর্ড আলিপুরে জেলাজজের খাস কামরায় একটা গ্লাস কেসে সাজান আছে। কেউ পড়েনা।

বইখানি পড়ে ভালই লেগেছে। তোমার ঐতিহাসিক সাহিত্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতি—

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণানুক্রমিক সূচী

আ

কালিপদ সেন ২৫২
কালিপদ সরকার ৭৮
কালিপদ চক্রবর্তী ৫৮,১৮৯,২৬৩, ২৮৭,২৮৮

ট

ন

ফ

ভ

ম

স

হ

ক্ষ

যে যে গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে সঙ্কলিত হয়েছে

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম—শ্রীঅনন্ত সিংহ

অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

অগ্নিদিনের কথা—শ্রীপাকড়াশী

অমৃত বাজার পত্রিকা

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বাংলায় বিপ্লববাদ—শ্রীনলিনী কিশোর গুহ

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

কমরেড ঘাটের পত্রাবলী

কমরেড সৌকত ওসমানির পত্রাবলী

Communist Party of India—Muzaffar Ahmad

Communism in India—Gene D. Overstreet & Marshall Wind Miller

Confidential Circular—Government of India

Calcutta Law Journal

Calcutta Weekly Notes

Echo from old Calcutta 1858—Busteed H. E.

Facts and Comments—Herbert Spencer

Fight for the cause of Truth—S. G. Dutta

Gazette of India

History of Freedom Movement—Dr. R. C. Mazumdar

Historical Development of Communist movement in India —Tagore

History of British India 1858—Mill. J & Willson H. H

Indian Law Reports

Jugantar

ঘুব বিদ্রোহ—শ্রীঅনন্ত সিংহ

Link

Life of Myself—Harindra Chattopadhaya

Life of Mohandas Karanchand Gandhi—D. G. Tendulkar

Life work of Sri Aurabinda—Prof. Jyotish Chandra Ghose

Maharaj Nanda Kumar, a study—N. N. Ghose

New Times

নবাবী আমলের বাংলা—শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী

প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন—শ্রীমুজফ্ফর আহমদ

Pioneer

Roll of Honour—Kali Chandra Ghose

Rowlatt Committee Report

রক্ত বিপ্লবের এক অধ্যায়—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রক্ত তীর্থ—শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

Russian Revolution—How M. N. Roy distorts it

—G. N. Chandra

স্বামী কেশবানন্দ অভিনন্দন গ্রন্থ

Soviet Land

সবার অলক্ষ্যে—শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়

Tribune

উত্তর প্রদেশের এক বিপ্লবী নেতার স্মৃতিকথা

—শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়